



ব্যাচেলর অব এডুকেশন

ভূগোল ও পরিবেশ শিক্ষণ Teaching Geography and Environment

EDBN 1417

রচনা

প্রফেসর ড. মো: আবদুল আউয়াল খান
প্রফেসর এস এম আবু সাইদ
ড. ডি. এম. ফিরোজ শাহ
মো: আবুল বাশার
ফারজানা কবির
সঞ্জয় গোলদার

মূল্যায়ন

মো: শওকত আলী খান
মোহাম্মদ আব্দুল হক
খন্দকার রকিবুল হাসান

সম্পাদনা

সঞ্জয় গোলদার
ড. ডি. এম. ফিরোহ শাহ

স্কুল অব এডুকেশন



বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

ভূগোল ও পরিবেশ শিক্ষণ

EDBN 1417

বিএড প্রোগ্রাম

প্রধান সমন্বয়ক

মোঃ জহির উদ্দিন বাবর

প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)

টিচিং কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট-২ (টিকিউআই-২) ইন সেকেন্ডারি এডুকেশন প্রজেক্ট

সমন্বয়ক

রায়হানা তসলিম, উপ-প্রকল্প পরিচালক (প্রশিক্ষণ), টিকিউআই-২ প্রকল্প

ড. রেহেনা খাতুন, সহকারী প্রকল্প পরিচালক (প্রশিক্ষণ), টিকিউআই-২ প্রকল্প

কাজী সাখাওয়াৎ হোসেন, প্রকল্প কর্মকর্তা (প্রশিক্ষণ), টিকিউআই-২ প্রকল্প

রিজওয়ানুল হক, প্রকল্প কর্মকর্তা (প্রশিক্ষণ), টিকিউআই-২ প্রকল্প

সহযোগিতায়

প্রফেসর মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন, উপ-প্রকল্প পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), টিকিউআই-২ প্রকল্প

ড. সুধাংশু রঞ্জন রায়, সহকারী প্রকল্প পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), টিকিউআই-২ প্রকল্প

আবু সাঈদ মজুমদার, সহকারী প্রকল্প পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), টিকিউআই-২ প্রকল্প

রওশন আরা বেগম, সহকারী প্রকল্প পরিচালক (প্রশিক্ষণ), টিকিউআই-২ প্রকল্প

মাকসুদা বেগম, প্রকল্প কর্মকর্তা (প্রশাসন ও অর্থ), টিকিউআই-২ প্রকল্প

গাজী মোহাম্মদ নাজমুল হোসেন, হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, টিকিউআই-২ প্রকল্প

গ্রন্থস্বত্ব

শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষিত। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের লিখিত অনুমতি ব্যতীত এ বইয়ের সম্পূর্ণ বা আংশিক মুদ্রণ, পুনঃমুদ্রণ সংশোধিত আকারে প্রকাশ ও বিক্রয় নিষিদ্ধ। এ ক্ষেত্রে কপিরাইট আইন প্রযোজ্য। তবে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণামূলক কার্যক্রমে এ বই ব্যবহার করা যেতে পারে।

প্রথম মুদ্রণ: ডিসেম্বর ২০১৮

পুনঃমুদ্রণ: মার্চ ২০২০

প্রচ্ছদ

কাজী সাইফদ্দীন আব্বাস

প্রকাশনায়

প্রকাশনা, মুদ্রণ ও বিতরণ বিভাগ

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর- ১৭০৫।

(স্মারক নম্বর: ৩৭.০০.০০০০.০৮২.১৪.০০৫.১৮.১০০ তারিখ: ৩১ জুলাই ২০১৯ ইংরেজি, ১৬ শ্রাবণ ১৪২৬ বাংলা অনুযায়ী অনুমোদনক্রমে TQI-II প্রকল্পের আওতায় প্রণীত জাতীয় বিএড প্রোগ্রামের পাঠ্যপুস্তক বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পুনঃমুদ্রণ করা হলো।)

ISBN: 978-984-34-0109-0

মুদ্রণে:

সূচিপত্র

ইউনিট	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
ইউনিট ১	ভূগোল ও পরিবেশ শিক্ষা সম্পর্কিত ধারণাসমূহ	১-৫
	১.১ ভূগোল, পরিবেশ, ভূগোল ও পরিবেশ শিক্ষা, ভূগোল ও পরিবেশ শিক্ষা শিক্ষণ	১
	১.২ ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ের পরিধি	৩
	১.৩ মাধ্যমিক শিক্ষাক্রমে ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ের অবস্থান ও ভূমিকা	৪
ইউনিট ২	মাধ্যমিক স্তরে ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ের শিক্ষাক্রম	৬-১৬
	২.১ মাধ্যমিক স্তরের ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ের শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, শিখনফল, পাঠপরিসর, মূল্যায়ন পদ্ধতি ও কৌশল এবং বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ	৬
	২.২ ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ের উত্তম পাঠ্যপুস্তকের মানদণ্ড	১১
	২.৩ মাধ্যমিক স্তরের ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক পর্যালোচনা	১৪
ইউনিট ৩	ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ের বিষয়বস্তু	১৭-৭৫
	৩.১ অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমা, আন্তর্জাতিক তারিখরেখা, পৃথিবীর আকার	১৭
	৩.২ আর্থিক ও বার্ষিক গতি	২৬
	৩.৩ পৃথিবীর বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ গঠন	২৯
	৩.৪ ভূমিকম্প, আগ্নেয়গিরি	৩০
	৩.৫ বিচূর্ণীভবন	৪৩
	৩.৬ বায়ুমণ্ডল, আবহাওয়া ও জলবায়ু: জলবায়ুর পরিবর্তন	৪৭
	৩.৭ বারিমণ্ডল: সাগর, মহাসাগর ও উপসাগর	৫২
	৩.৮ সমুদ্র শ্রোত ও জোয়ারভাঁটা	৫৭
	৩.৯ পরিবেশের উপাদান, পরিবেশ দূষণের কারণ ও পরিবেশ সংরক্ষণ	৭০
ইউনিট ৪	ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ক বিষয়বস্তু শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কলাকৌশল এবং কার্যকর পাঠের পরিকল্পনা	৭৬-১০০
	৪.১ ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ে বিভিন্ন শিখন-শেখানো ধারা, পদ্ধতি ও কলা কৌশলের ধারণা ও প্রয়োগ	৭৬
	৪.২ ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ক শিখনকে আকর্ষণীয় করা, শিখনে ভূগোল সম্পর্কিত খেলা ও ভিডিও ব্যবহার	৮৩
	৪.৩ পাঠপরিকল্পনা ও ইউনিটপরিকল্পনা এবং ভূগোল ও পরিবেশ শিক্ষা পাঠের জন্য একটি পরিকল্পনা কাঠামো/ছক	৮৭
	৪.৪ অনুশিক্ষণ, ছদ্মশিক্ষণ ও ফলাবর্তনে ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ের বিষয়বস্তু ব্যবহার	৯৩
	৪.৫ ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ক একটি সামাজিক সচেতন মেলার আয়োজন পরিকল্পনা	৯৭
	ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ক একটি ফিল্ডট্রিপ পরিকল্পনা	
ইউনিট ৫	শিক্ষাউপকরণ তৈরি, সংগ্রহ ও উন্নয়ন, শিখন-শেখানো পরিবেশ তৈরিকরণ ও শিক্ষকদের পেশাগত উন্নয়ন	১০১-১২৯
	৫.১ শিক্ষাউপকরণ: তৈরি, সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও 3Rs এর ব্যবহার	১০১
	৫.২ যন্ত্রপাতিসহ দুর্লভ সামগ্রী এবং অপ্রতুল উপকরণের ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং স্বল্পমূল্যে-বিনামূল্যে শিখন-শেখানো উপকরণ তৈরি, সংগ্রহ ও সংরক্ষণ	১০৬
	৫.৩ মানচিত্র ও ভূগোলক ব্যবহারের নিয়মাবলি	১০৯
	৫.৪ মাধ্যমিক স্তরের ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ে ডিজিটাল কন্টেন্ট প্রণয়ন ও ব্যবহার	১১৪
	৫.৫ ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ের আদর্শ শ্রেণিকক্ষ: পরিকল্পনা ও সজ্জিতকরণ	১১৯
	৫.৬ ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ের শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় শিক্ষক যোগ্যতাসমূহ এবং এ সকল যোগ্যতা অর্জনে শিক্ষক প্রশিক্ষণের ভূমিকা	১২৩

ইউনিট ৬	মানব ভূগোল, বাংলাদেশের ভৌগোলিক বিবরণ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ	১৩০-২০৬
	৬.১ বিশ্বের ও বাংলাদেশের জনসংখ্যার বর্তমান পরিস্থিতি এবং পরিবর্তনের ধারা; অর্থনৈতিক কার্যাবলি	১৩০
	৬.২ বাংলাদেশের ভৌগোলিক বিবরণ: আয়তন ও অবস্থান	১৩৪
	৬.৩ বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতি, নদ-নদী	১৩৬
	৬.৪ বাংলাদেশের জলবায়ু	১৪৪
	৬.৫ বাংলাদেশের কৃষিপণ্য (অর্থকরী ও খাদ্যদ্রব্য)	১৪৮
	৬.৬ খনিজসম্পদ, শিল্প, যোগাযোগ ও বাণিজ্য, বাংলাদেশের পর্যটন ও প্রযুক্তি	১৫৯
	৬.৭ বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা	১৯৭
ইউনিট ৭	মাধ্যমিক স্তরের ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ের মূল্যায়ন	২০৭-২১৭
	৭.১ ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ে শিখন-শিখনো কার্যক্রমে মূল্যায়নকারীর ধরন- গঠনকালীন ও প্রান্তিক এবং আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক মূল্যায়নকারী এবং ধারাবাহিক মূল্যায়নকারী কার্যক্রম শ্রেণিকক্ষে প্রয়োগ প্রক্রিয়া	২০৭
	৭.২ অভিক্ষার প্রকারভেদ ও অভিক্ষা প্রণয়ন: সৃজনশীল ও নৈর্ব্যক্তিক অভিক্ষা	২১৩
	৭.৩ ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ের বিষয়বস্তু ব্যবহার করে সৃজনশীল ও বহুনির্বাচনী অভিক্ষা প্রণয়ন	২১৪
ইউনিট ৮	ব্যবহারিক ভূগোল	২১৮-২৫০
	৮.১ স্কেল (সরল ও কর্ণীয়)	২১৮
	৮.২ মানচিত্র সংকোচন ও সম্প্রসারণ	২৩০
	৮.৩ মানচিত্রে তথ্য ও উপাত্ত উপস্থাপন এবং আন্তর্জাতিক সাংকেতিক চিহ্ন	২৩৪
	৮.৪ শিক্ষামূলক সফর ও প্রতিবেদন প্রণয়ন	২৪২
	গ্রন্থপঞ্জি	২৫১-২৫৪

ইউনিট ১ : ভূগোল ও পরিবেশ শিক্ষা সম্পর্কিত ধারণাসমূহ

বুদ্ধিমান প্রাণী হিসেবে মানুষের যাত্রা যেদিন থেকে, সেদিন থেকেই মানুষ তার পারিপার্শ্বিকতা ও পরিবেশকে জানার চেষ্টা করেছে। সম্ভবত সেদিন থেকেই ভূগোলের যাত্রা শুরু। জ্ঞান-বিজ্ঞানের শাখাসমূহের মধ্যে ভূগোল শাস্ত্র সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। ভূগোল বাস্তবসম্মত একটি প্রায়োগিক বিজ্ঞান। ভূগোলের সাথে পরিবেশ শিক্ষা যোগ হয়ে এর গুরুত্ব বহুগুণ বৃদ্ধি করেছে। এই অধ্যায়ে ভূগোল ও পরিবেশ শিক্ষা সম্পর্কিত ধারণাসমূহ মোট ৩টি পাঠে বিভক্ত করে আলোচনা করা হয়েছে -

১.১ : ভূগোল, পরিবেশ, ভূগোল ও পরিবেশ শিক্ষা, ভূগোল ও পরিবেশ শিক্ষা শিক্ষণ

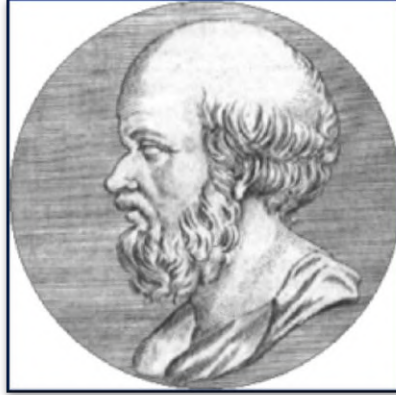
১.২ : ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ের পরিধি

১.৩ : মাধ্যমিক শিক্ষাক্রমে ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ের অবস্থান ও ভূমিকা

১.১ ভূগোল, পরিবেশ, ভূগোল ও পরিবেশ শিক্ষা, ভূগোল ও পরিবেশ শিক্ষা শিক্ষণ

ভূগোল

ভূগোল- গ্রিক শব্দ Geographia থেকে ইংরেজি Geography শব্দটির উৎপত্তি। Geographia শব্দের প্রথমটি 'Geo' যার অর্থ পৃথিবী এবং দ্বিতীয়টি 'graphia' অর্থ বর্ণনা। সাধারণভাবে অতীতের ভূগোলবিদগণ ভূগোল বলতে পৃথিবী সম্পর্কিত বর্ণনাকে বুঝতেন। প্রাচীন মিশরীয় পণ্ডিত ইরাটসথেনিস ভূগোল শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত ভূগোল বিষয়টির স্বতন্ত্র কোন মর্যাদা ছিলনা। এ বিষয়টিকে ভূতত্ত্ববিদ্যার অংশ হিসেবে গণ্য করা হত। এ প্রসঙ্গে ইংল্যান্ডের খ্যাতনামা ভূতত্ত্ববিদ স্যার আরকিবোল্ড ১৮৯৫ খ্রিষ্টাব্দে মন্তব্য করেছেন, "In its true sense Geography is a part of Geology". কালের বিবর্তনে ভূগোলের বিষয়বস্তু সম্প্রসারিত হতে থাকে। ফলে ভূগোলের সংজ্ঞা বিভিন্নভাবে বিভিন্ন ভূগোলবিদ দিয়েছেন। একক ব্যক্তির দেয়া একটি ভূগোলের সংজ্ঞা থেকে ভূগোল কী তা বুঝা যায় না। তাই একাধিক ব্যক্তির দেয়া ভূগোলের সংজ্ঞা থেকে ভূগোল কী তা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে। ইরাটসথেনিসকে আধুনিক ভূগোলের জনক বলা হয়।



চিত্র ১.১: ইরাটসথেনিস (২৭৬-১৯৫ বিসি)

নিচে কয়েকজন খ্যাতনামা ভূগোলবিদের দেয়া ভূগোলের সংজ্ঞাউল্লেখ করা হলো-

১. অধ্যাপক ফ্রাংক ডিবেনহাম বলেন- “জ্ঞানের যে শাখা বস্তু সংক্রান্ত তথ্যের ব্যাখ্যা দান করে এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে মানুষের সম্পর্ক নির্ণয় এবং মানবিক ও প্রাকৃতিক উপাদানের পারস্পরিক কার্যকরণের ব্যাখ্যা প্রদান করে তা-ই হলো ভূগোল।”
২. অধ্যাপক চেম্বারস- এর মতে, “ভূগোল হলো পৃথিবী পৃষ্ঠ ও এর মধ্যে বসবাসকারী অধিবাসীদের বর্ণনামূলক বিবর্তন।”
৩. কাজী ফারুকী ও এএসআর মজুমদার বলেন- “ভূগোল হলো এমন একটি গতিশীল বিজ্ঞান যা মানুষ ও পরিবেশের বর্ণনা দেয় এবং এদের পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণপূর্বক একে অন্যের উপর প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করে।”
৪. প্রখ্যাত জার্মান ভূগোলবিদ কার্ল রিটার বলেন- “পৃথিবী ও মানব জাতির পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় করে ভূগোল।”
৫. অধ্যাপক ডাডলি স্ট্যাম্প বলেন, “ভূগোল হচ্ছে পৃথিবী ও তার অধিবাসীদের বিবরণ।”

৬. অধ্যাপক ম্যাকিন্ডার-এর মতে, “ভূগোলের কাজ হলো পৃথিবীর বিভিন্ন পরিবেশের সাথে মানুষের জীবনধারার সম্পর্ক নির্ণয় করা।”
৭. অধ্যাপক স্টল-এর মতে, “ভূগোল হচ্ছে উদ্যোগের বিজ্ঞান, কারণ এর মাধ্যমেই আমরা পৃথিবীর সংগে সম্পর্ক স্থাপন করি। আর এ সম্পর্ক নির্ণয় ব্যতিরেকে প্রগতি পিছিয়ে পড়তে বাধ্য, কারণ ভূগোলের জ্ঞান ছাড়া রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয়।”
৮. অধ্যাপক জেমস ফেয়ারহিভ বলেন, “ভূগোলের কাজ হলো ভাবী নাগরিককে বিশ্ব রঙ্গমঞ্চের অবস্থা সম্পর্কে সঠিক ধারণা অর্জনের জন্য শিক্ষা দেয়া যা বিশ্বের সর্বত্র যে সকল সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যা রয়েছে সে সম্পর্কে সুষ্ঠুভাবে চিন্তা করতে সাহায্য করে।”
- এছাড়া বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ক পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত আরো কিছু প্রখ্যাত ভূগোলবিদের দেয়া সংজ্ঞা নিচে উল্লেখ করা হলো-
১. অধ্যাপক ই এ ম্যাকনি বলেন, “মানুষের আবাসভূমি হিসেবে পৃথিবীর আলোচনাকে ভূগোল বলে।”
২. রিচার্ড হার্টশোন বলেন, “পৃথিবীপৃষ্ঠের পরিবর্তনশীল বৈশিষ্ট্যের যথাযথ যুক্তিসংগত ও সুবিধাশ্রিত বিবরণের সংশ্লিষ্ট বিষয় হলো ভূগোল।”
৩. আলেকজেন্ডার ফন হামবোল্ট বলেন, “ভূগোল হলো প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত বিজ্ঞান, প্রকৃতিতে যা কিছু আছে তার বর্ণনা ও আলোচনা এর অন্তর্গত।”
- সর্বশেষ (১৯৬৫) খ্রিষ্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসির বিজ্ঞান একাডেমি ভূগোলের একটি সংজ্ঞা দিয়েছে। এটি হলো “পৃথিবী পৃষ্ঠে প্রাকৃতিক পরিবেশের উপদানগুলো কীভাবে সংগঠিত এবং এর প্রাকৃতিক বিষয় বা অবয়বের সঙ্গে মানুষ নিজেকে কীভাবে বিন্যস্ত করে তার ব্যাখ্যা দান করে ভূগোল।”

পরিবেশ

পরিবেশ এর ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো Environment যা দুটি ফরাসী শব্দ হতে উৎপত্তি হয়েছে। শব্দ দুটি হলো Enviroenar এবং Ment যার অর্থ যথাক্রমে ‘চারপাশ’ এবং ‘ক্রিয়াকর’। অতএব পরিবেশ বা Environment বলতে আমরা বুঝি পৃথিবীর যে স্থানে আমরা বসবাস করি তার চারপাশে বিভিন্ন জৈবিক, ভৌতিক ও রাসায়নিক বস্তু ক্রিয়াশীল রয়েছে যা আমাদের জীবনকে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণভাবে সদা প্রভাবিত করে। অতএব আমাদের চারপাশে যে সব বস্তু ক্রিয়াশীল রয়েছে তাদেরকে সমষ্টিগতভাবে পরিবেশ বলা যেতে পারে।

প্রখ্যাত পরিবেশ বিজ্ঞানী Mc Naughton & Wolf-এর মতে, “পরিবেশ জীবের বৃদ্ধি, বিকাশ, আয়ুষ্কাল ও বংশ বিস্তার ঘটতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।”

The environment is a system consisting of natural and artificial elements that are interrelated and which are modified by human action. It's the environment that affects the way of life of the society, including natural, social and cultural values that exist in a place and time.-Didactic Encyclopedia

পরিবেশের উপাদানগুলোর ভিত্তিতে পরিবেশকে প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করা হয়। নিচের এ ভাগ দুটি দেখানো হলো-

পরিবেশ		
প্রাকৃতিক পরিবেশ / ভৌত পরিবেশ		সামাজিক পরিবেশ
ক. জীব	খ. জড়	
উপাদান		উপাদান
১. গাছপালা	১. মাটি	১. মানুষের আচার-আচরণ
২. পশুপাখি	২. পানি	২. উৎসব-অনুষ্ঠান
৩. কীটপতঙ্গ	৩. বায়ু	৩. চাল-চলন/হাব-ভাব
৪. মানুষ ও অন্যান্য সকল প্রাণী	৪. পাহাড়/পর্বত	৪. রীতিনীতি/মূল্যবোধ
৫. ছত্রাক ও ব্যাকটেরিয়া ইত্যাদি	৫. নদী, সাগর	৫. শিক্ষা ও সংস্কৃতি
	৬. আলো	৬. অর্থনীতি, রাজনীতি ইত্যাদি
	৭. তাপমাত্রা	
	৮. অক্সিজেন, কার্বন ডাইঅক্সাইড ও অন্যান্য গ্যাস ইত্যাদি	

ভূগোল ও পরিবেশ শিক্ষা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রণীত জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর আলোকে ২০১১ খ্রিষ্টাব্দে মাধ্যমিক স্তরের ভূগোল বিষয়ের শিক্ষাক্রম পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও উন্নয়নের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। কারণ বিশ্বে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনেক প্রসার ঘটেছে এবং ভূগোল বিষয়ের জ্ঞান ভান্ডারের বহু পরিবর্তন এসেছে। ভূগোল এখন শুধু দেশ, রাজধানী, পাহাড়, পর্বত, নদী, সাগর আমদানী-রপ্তানী, শিল্প ও খনিজ বিষয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, এর পরিধি এখন আগের চেয়ে অনেক ব্যাপক হয়েছে। যেমন-মানুষ ও তার পরিবেশ, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, মানুষ কর্তৃক পরিবেশের পরিবর্তন বা পরিবেশের কারণে মানুষের জীবন ধারার পরিবর্তন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রভৃতি ভূগোল বিষয়ের অন্তর্গত। এ কারণে জ্ঞানার্জনের জন্য ভূগোল বিষয়ের শিক্ষাক্রম পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। যে জন্য ভূগোল বিষয়টির নাম পরিবর্তন করে ভূগোল ও পরিবেশ করা হয়েছে। বিষয়টি সুষ্ঠুভাবে মাধ্যমিক পর্যায়ে পড়ানোর জন্য শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে **ভূগোল ও পরিবেশ শিক্ষা** নামে একটি স্বতন্ত্র বিষয় চালু করা হয়েছে।

ভূগোল ও পরিবেশ শিক্ষা শিক্ষণ

ভূগোল ও পরিবেশ শিক্ষা শিক্ষণ (Teaching Geography and Environment) হলো- ভূগোলের বিষয়বস্তু কীভাবে পাঠদান করা হবে সে সম্পর্কিত কলাকৌশল। প্রত্যেকটি পাঠদানের নিজস্ব কিছু ধরন রয়েছে যা ঐবিষয়টি বুঝতে সহায়তা করে। ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়টি অন্য বিষয় থেকে আলাদা। একটি প্রায়োগিক বিষয় হিসেবে পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি, প্রদর্শন পদ্ধতি, প্রকল্পপদ্ধতি, শিক্ষামূলক ভ্রমণ পদ্ধতি ভূগোল ও পরিবেশ শিক্ষায় খুবই কার্যকর। শিক্ষার্থীদের সক্রিয় রাখতে এবং তাদের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে শিক্ষামূলক ভ্রমণ অত্যন্ত কার্যকর।

১.২ ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ের পরিধি

বর্তমানে প্রচলিত মাধ্যমিক স্তরের ভূগোল ও পরিবেশ শিক্ষাক্রমটি এনসিটিবি কর্তৃক ২০১২ খ্রিষ্টাব্দে প্রণীত হয়েছে। শিক্ষাক্রমে ‘ভূগোল’ ও ‘পরিবেশ’ দুটি আলাদা বিষয়কে একত্র করে একটি মাত্র বিষয়ে রূপদান করা হয়েছে, কেবলই আলোচনার সুবিধার্থে ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ের পরিধি আলাদাভাবে আলোচনা করা হলো।

ভূগোলের পরিধি

জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশ, নতুন নতুন আবিষ্কার, উদ্ভাবন, চিন্তা-ধারণার বিকাশ, সমাজের মূল্যবোধের পরিবর্তন, সমাজনীতি, রাজনীতি, শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে নতুন সংযোজন ইত্যাদি ভূগোলের পরিধিকে অনেক বিস্তৃত করেছে। ভূমিরূপবিদ্যা, আবহাওয়াবিদ্যা, সমুদ্রবিদ্যা, অর্থনীতি, রাজনীতি, চিকিৎসাবিদ্যা প্রত্নতত্ত্ববিদ্যা ইত্যাদি ভূগোল বিষয়ের অন্তর্গত হয়েছে। ফলে ভূগোলের বিষয়বস্তুর পরিধি বৃদ্ধি পেয়েছে। জনসংখ্যা, দুর্যোগ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, সংখ্যাতত্ত্ব, পরিবহণ, নগরায়ণ, চিকিৎসা ইত্যাদি ভূগোলের বিষয়ে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ফলে ভূগোলের আলোচ্য সূচির পরিধি ব্যাপক হয়েছে। উদ্ভিজ্জ, প্রাণিজ, শিল্প, খনিজ, পরিবহণ ও যোগাযোগ ইত্যাদিও ভূগোলের আলোচ্য বিষয়। আধুনিককালের উন্নত তথ্য ও প্রযুক্তি বিষয়ও ভূগোলের অন্তর্গত হওয়ায় বিষয়টির পরিধি বিস্তৃত হচ্ছে। শুধু তাই নয় এটি মানুষের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর পরিবেশের প্রভাব বিশ্লেষণ করে। এছাড়া প্রতিকূল পরিবেশকে মানুষ নিজের সুবিধার্থে কীভাবে মোকাবেলা করে তারও বিস্তারিত আলোচনা ভূগোলের বিষয়বস্তু। বর্তমান ভূরাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ভূগোলের পরিধি ও গুরুত্ব অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশ্ব বাণিজ্য ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে ভৌগোলিক অবস্থান একটি গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর, ভৌগোলিক জ্ঞান এক্ষেত্রে অনেক সুবিধা দিতে পারে।

পরিবেশ বিদ্যার পরিধি

ইতোপূর্বে আমরা পরিবেশের বিভিন্ন প্রকার উপাদান সম্পর্কে জেনেছি। এসব উপাদানের প্রতিটির রয়েছে নিজ নিজ বিশেষ বৈশিষ্ট্য। উপাদানগুলোর মধ্যে জনসংখ্যা, জনসম্পদ, বাস্তুসংস্থান (Ecology), মানুষ ও পরিবেশ, পরিবেশের জৈব ও অজৈব উপাদান, প্রচলিত ও অপ্রচলিত শক্তির উৎস, বিষবিজ্ঞান (Toxicology), বায়ুদূষণ, পানিদূষণ, মৃত্তিকা দূষণ, তেজস্ক্রিয়া দূষণ, শব্দ দূষণ, আর্সেনিক দূষণ, জলবায়ু, জনস্বাস্থ্য, জীব-বৈচিত্র্য, পরিবেশ সম্পর্কিত ইত্যাদি বিষয়ক আলোচনা।

১.৩ মাধ্যমিক শিক্ষাক্রমে ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ের অবস্থান ও ভূমিকা

বাংলাদেশে মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরে কখন ভূগোল শিক্ষা শুরু হয় তার সঠিক তারিখ বা দিনক্ষণ জানা যায়নি। তবে ব্রিটিশ শাসনামলেই আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ধারায় মাধ্যমিক পর্যায়ে সুনির্দিষ্ট শিক্ষাক্রম চালু হয়। আলোচনার সুবিধার্থে মাধ্যমিক শিক্ষাক্রমে ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ের অবস্থান তুলে ধরা হলো।

ব্রিটিশ আমল (শুরু হতে ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত): জানা যায় উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে শিক্ষাক্রমে মাধ্যমিক স্তরে ভূগোল কোন আলাদা বিষয় হিসেবে পড়ানো হত না। এলিমেন্টারি মেকানিক ও ভূগোল এ দুটি বিষয় একত্রে একটি বিষয় হিসেবে পড়ানো হতো। প্রতিটি বিষয়ের মান ছিল ৫০। বিষয়টি মাধ্যমিক পর্যায়ে আবশ্যিক বিষয় হিসেবে গণ্য হতো।

পাকিস্তান আমল (১৯৪৭⁺ থেকে ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত): পাকিস্তান আমলে ১৯৬০ থেকে যে শিক্ষাক্রম চালু হয় তাতে মাধ্যমিক শিক্ষাস্তর কয়েকটি উপব্যবস্থায় বিভক্ত ছিল। এসব উপব্যবস্থায় একমাত্র মানবিক শিক্ষা শাখার শিক্ষার্থীরা ভূগোল বিষয়টি আবশ্যিক বিষয় হিসেবে এবং অন্যান্য শিক্ষা শাখায় সাধারণ শিক্ষার্থীরা বিষয়টি ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে পড়ার সুযোগ পেত। ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরও এ শিক্ষাক্রম বেশ কিছু বছর চালু ছিল। কখনো কখনো এ বিষয়টি মাধ্যমিক পর্যায়ে আবশ্যিক বিষয় হিসেবেও গণ্য করা হয়েছিল।

বাংলাদেশ আমল (১৯৭১⁺ থেকে বর্তমান পর্যন্ত): গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রণীত প্রথম শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট ১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দ থেকে বাস্তবায়িত হয়। এ শিক্ষা কমিশনের সূত্র ধরে ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম নতুন করে প্রণীত হয়। তখন থেকে ভূগোল বিষয়টি মাধ্যমিক স্তরে কোন কোন শাখায় আবশ্যিক এবং অন্যান্য শাখায় বিষয়টি ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে পড়ানো হতো। তখন এর মান ছিল ১০০। ব্যবহারিক অংশ কাজে লাগানো হতো না। বিংশ শতাব্দীর আশির দশকে বিষয়টির মর্যাদা পুনর্নির্ধারণ করা হয়। ১৯৯৫ খ্রিষ্টাব্দ থেকে মাধ্যমিক স্তরে তিনটি শাখা চালু ছিল। শাখা তিনটি হলো- বিজ্ঞান শাখা, মানবিক শাখা ও ব্যবসায় শিক্ষা শাখা। বিষয়টির নামকরণ করা হয়েছিল ‘ভূগোল’। কেবল মানবিক শাখায় এবং বিজ্ঞান শাখায় বিষয়টি নৈর্ব্যক্তিক বিষয় হিসেবে পড়ানো হতো এবং এর মান ছিল ১০০। ব্যবসায় শিক্ষা শাখায় বিষয়টি পড়ানোর সুযোগ ছিল না। এ শাখায় বাণিজ্যিক ভূগোল বিষয়টি ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে পড়ানোর সুযোগ রাখা হয়েছিল।

সর্বশেষ অবস্থা: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষানীতি ২০১০ এর আলোকে ২০১২ খ্রিষ্টাব্দে ভূগোল বিষয়টির স্থলে ভূগোল ও পরিবেশ নামকরণ করা হয়েছে। বিষয়টি মানবিক শাখায় আবশ্যিক বিষয় হিসেবে পড়ানোর সুযোগ রাখা হয়েছে। বিষয়টির উপর নতুন পাঠ্যপুস্তক রচনা করা হয়েছে। এর মান ১০০। পাঠ্যপুস্তকে চৌদ্দটি অধ্যায় রয়েছে। এতে ব্যবহারিক অংশ পৃথকভাবে রাখা হয়নি।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২ এর বিষয় কাঠামোতে (৯ম-১০ম শ্রেণি) শাখাভিত্তিক বিষয় হিসেবে ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়টি মানবিক শাখার জন্য আবশ্যিক বিষয়। কিন্তু বিজ্ঞান ও ব্যবসায় শিক্ষা শাখার জন্য ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে নির্ধারিত।

এনসিটিবি কর্তৃক প্রণীত জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২- এর বিষয় কাঠামোয় ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ের অবস্থান দেখানো হলো-
নবম-দশম শ্রেণির বিষয় কাঠামো, নম্বর, সময় বন্টন

বিষয়ের ধরন	বিষয়	পরীক্ষার নম্বর	সময় বন্টন (ক্লাস/ পিরিয়ড)		
			সাপ্তাহিক	সাময়িক	বার্ষিক
আবশ্যিক	১.বাংলা	২০০	৫	৮০	১৬০
	২.ইংরেজি	২০০	৫	৮০	১৬০
	৩.গণিত	১০০	৪	৬৪	১২৮
	৪.ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা:(ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা/হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা/খ্রিষ্টধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা/বৌদ্ধধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা)	১০০	২	৩২	৬৪
	৫.তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি	৫০	২	৩২	৬৪
	৬.ক্যারিয়ার শিক্ষা	৫০	১	১৬	৩২
	৭.শারীরিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য বিজ্ঞান ও খেলাধুলা	১০০	২	৩২	৬৪
	সর্বমোট=	৮০০	২১	৩৩৬	৬৭২

শাখাভিত্তিক বিষয়					
বিজ্ঞান শাখার জন্য আবশ্যিক বিষয়	৮.পদার্থ বিজ্ঞান	১০০	৩	৪৮	৯৬
	৯.রসায়ন	১০০	৩	৪৮	৯৬
	১০.জীববিজ্ঞান/উচ্চতর গণিত	১০০	৩	৪৮	৯৬
	১১.বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়	১০০	৩	৪৮	৯৬
বিজ্ঞান শাখার ঐচ্ছিক বিষয় (একটি নেওয়া যাবে)	১২.জীববিজ্ঞান/উচ্চতর গণিত/ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতি, কৃষিশিক্ষা/গার্হস্থ্যবিজ্ঞান/ভূগোল ও পরিবেশ/চারু ও কারুকলা/সংগীত/বেসিক ট্রেড/শারীরিক শিক্ষা ও ক্রীড়া	১০০	৩	৪৮	৯৬
	সর্বমোট=	১৩০০	৩৬	৫৭৬	১১৫২
ব্যবসায় শিক্ষা শাখার আবশ্যিক বিষয়	১৩.ব্যবসায় উদ্যোগ	১০০	৩	৪৮	৯৬
	১৪.হিসাববিজ্ঞান	১০০	৩	৪৮	৯৬
	১৫.ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং	১০০	৩	৪৮	৯৬
	১৬.বিজ্ঞান	১০০	৩	৪৮	৯৬
ব্যবসায় শিক্ষা শাখার ঐচ্ছিক বিষয় (একটি নেওয়া যাবে)	১৭.ভূগোল ও পরিবেশ/বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়/কৃষিশিক্ষা/গার্হস্থ্যবিজ্ঞান/ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতি/চারু ও কারুকলা/সংগীত/বেসিক ট্রেড	১০০	৩	৪৮	৯৬
	সর্বমোট=	১৩০০	৩৬	৫৭৬	১১৫২
মানবিক শাখার জন্য আবশ্যিক বিষয়	১৮.বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা	১০০	৩	৪৮	৯৬
	১৯.ভূগোল ও পরিবেশ	১০০	৩	৪৮	৯৬
	২০.অর্থনীতি/পৌরনীতি ও নাগরিকতা	১০০	৩	৪৮	৯৬
	২১.বিজ্ঞান	১০০	৩	৪৮	৯৬
মানবিক শাখার ঐচ্ছিক বিষয় (একটি নেওয়া যাবে)	২২.অর্থনীতি/পৌরনীতিও নাগরিকতা/চারুও কারুকলা/কৃষিশিক্ষা/গার্হস্থ্যবিজ্ঞান/ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষাও সংস্কৃতি/আরবি/সংস্কৃত/পালি/সংগীত/বেসিক ট্রেড/শারীরিক শিক্ষা ও ক্রীড়া	১০০	৩	৪৮	৯৬
	সর্বমোট=	১৩০০	৩৬	৫৭৬	১১৫২

সময়ের প্রেক্ষিতে ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হলেও নবম-দশম শ্রেণির বিষয় কাঠামোতে সকল শিক্ষার্থীর জন্য এ বিষয়টি আবশ্যিকীয় নয়। শুধু মানবিক শাখার জন্য আবশ্যিক বিষয় হওয়ায় বিজ্ঞান ও ব্যবসায় শিক্ষা শাখার শিক্ষার্থীরা এটি অধ্যয়ন করছে না। ফলে ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হলেও অবহেলিত থেকে যাচ্ছে।

প্রশ্নমালা

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. ভূগোল বলতে কী বুঝায়?
২. পরিবেশ কী ?
৩. ভূগোল ও পরিবেশ শিক্ষা বলতে কী বুঝায়?
৪. ভূগোল ও পরিবেশ শিক্ষা শিক্ষণ কী ?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. ভূগোল, পরিবেশ, ভূগোল ও পরিবেশ শিক্ষার মধ্যে সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য নির্ণয় করুন।
২. ভূগোল ও পরিবেশ শিক্ষা শিক্ষণের গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতিগুলো ব্যাখ্যা করুন।
৩. ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ের পরিধি ব্যাখ্যা করুন।
৪. মাধ্যমিক শিক্ষাক্রমে ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ের অবস্থান ও ভূমিকা বিশ্লেষণ করুন।

ইউনিট ২ : মাধ্যমিক স্তরে ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ের শিক্ষাক্রম

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় মাধ্যমিক স্তরটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অনেক শিক্ষার্থীর জন্য এটি একটি প্রান্তিক শিক্ষা (Terminal Education)। প্রচলিত শিক্ষা কাঠামোতে বিদ্যালয় ও মাদরাসায় ৯ম-১০ম শ্রেণি মাধ্যমিক স্তর হিসেবে বিবেচিত। জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২ অনুযায়ী অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত অভিন্ন শিক্ষাক্রম প্রচলিত। অষ্টম শ্রেণির পরীক্ষা অর্থাৎ Junior Certificate Examination (JSC) পাশ করে একজন শিক্ষার্থী নবম শ্রেণিতে ভর্তি হয় এবং তার পছন্দমত শাখা (Group) নির্বাচন করে। প্রচলিত শাখাগুলো হলো- বিজ্ঞান, মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা শাখা। নবম-দশম শ্রেণিতে ৭টি আবশ্যিক বিষয় এবং প্রত্যেক শাখার জন্য ৪টি করে নৈর্বাচনিক ও একটি করে ঐচ্ছিক বিষয় নির্বাচনের ব্যবস্থা রয়েছে।

মাধ্যমিক স্তরে ভূগোল ও পরিবেশ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা ইতোপূর্বে শুধু ভূগোল নামে পরিচিত ছিল। মানবিক শাখার জন্য এটি শাখাভিত্তিক আবশ্যিক বিষয়। ব্যবসায় শিক্ষা শাখায় এটি ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে এক নং ক্রমিকে এবং বিজ্ঞান শাখার শিক্ষার্থীদের জন্য ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে ছয় নং ক্রমিকে রয়েছে। মাধ্যমিক স্তরের ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ের শিক্ষাক্রম- এ ইউনিটে বিষয়টির লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, শিখনফল, পরিসর, মূল্যায়ন, এ বিষয়ের উত্তম পাঠ্য পুস্তকের মানদণ্ড, এনসিটিবি কর্তৃক প্রকাশিত মাধ্যমিক স্তরের ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়গুলো ৩টি পাঠে বিভক্ত করে এ ইউনিটে বর্ণনা করা হয়েছে। এ পাঠগুলো হলো-

- ২.১ : মাধ্যমিক স্তরের ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ের শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, শিখনফল, পাঠ পরিসর, মূল্যায়ন পদ্ধতি ও কৌশল এবং বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ
- ২.২ : ভূগোল পরিবেশ বিষয়ক উত্তম পাঠ্যপুস্তকের মানদণ্ড
- ২.৩ : মাধ্যমিক স্তরের ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ের পাঠ্যপুস্তকের পর্যালোচনা

২.১ মাধ্যমিক স্তরের ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ের শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, শিখনফল, পাঠ পরিসর, মূল্যায়ন পদ্ধতি ও কৌশল এবং বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ

মাধ্যমিক স্তরের ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ের শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২ তে ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ে মোট ১৩টি উদ্দেশ্য চিহ্নিত করা হয়েছে। যথা-

১. ভূগোল ও পরিবেশের স্বরূপ এবং পরিসর সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা।
২. মহাবিশ্ব, সৌরজগত, পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা।
৩. পৃথিবীর গতি, দিবা-রাত্রির হ্রাস-বৃদ্ধি এবং ঋতু পরিবর্তন সম্পর্কে জানা।
৪. মানচিত্র পাঠের গুরুত্ব অনুধাবন করা এবং এর ব্যবহারিক প্রয়োগ করতে পারা।
৫. ভৌগোলিক তথ্য উপাত্ত সংশ্লিষ্ট চার্ট, ডায়াগ্রাম, সারণি, চিত্র, মডেল, মানচিত্র, প্রভৃতি ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ করতে পারা।
৬. পৃথিবীর বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ গঠন সম্পর্কে অবগত হওয়া।
৭. আবহাওয়া ও জলবায়ুর ধারণা লাভ করা এবং বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সম্পর্কে অবগত হওয়া।
৮. নদী, সাগর, মহাসাগর ও জোয়ার ভাটা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা।
৯. জনসংখ্যা ও পরিবেশ এবং এদের পারস্পরিক প্রভাব সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা।
১০. মানব বসতি এবং পরিবেশের গুণগত মানোন্নয়ন ও সংরক্ষণে দায়িত্বশীল হওয়া।
১১. অর্থনৈতিক কার্যাবলি ও সম্পদ সম্পর্কে জানা।
১২. প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণ ও ফলাফল জানা এবং দুর্যোগ মোকাবেলায় জীবনদক্ষতা অর্জন করা।
১৩. বাংলাদেশের ভৌগোলিক পরিচয় সম্পর্কে জানা।

শিখনফল

এনসিটিবি কর্তৃক প্রণীত জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২ এ ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ের শিক্ষাক্রমে মোট ১৪টি অধ্যায় রয়েছে এবং প্রতিটি অধ্যায়ের নির্ধারিত বিষয়বস্তুর আলোকে সুনির্দিষ্টভাবে বুদ্ধিবৃত্তীয়, আবেগিক ও মনোপেশিজ শিখনফল প্রদর্শন করা হয়েছে। নিম্নের টেবিলে অধ্যায়ভিত্তিক শিখনফল উপস্থাপন করা হলো।

অধ্যায়ের নাম	শিখনফল
প্রথম অধ্যায়: ভূগোল ও পরিবেশ	বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. ভূগোল ও পরিবেশের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. ভূগোল ও পরিবেশের পরিধি বর্ণনা করতে পারবে। ৩. ভূগোল ও পরিবেশ পাঠের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে। আবেগীয় ৪. ভূগোল ও পরিবেশের গুরুত্ব অনুধাবন করে এর পাঠে আগ্রহী ও মনোযোগী হবে।
দ্বিতীয় অধ্যায়: মহাবিশ্ব ও আমাদের পৃথিবী	বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. মহাবিশ্বের জ্যোতিষ্কমণ্ডলে সৌর জগত, পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহের অবস্থান এবং বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবে। ২. পৃথিবীর আকার-আকৃতি ও উপগ্রহ সম্বন্ধে বর্ণনা করতে পারবে। ৩. অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমা রেখাসহ গুরুত্বপূর্ণ রেখাসমূহ ব্যাখ্যা এবং গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবে। ৪. অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমা রেখা ব্যবহার করে মানচিত্রে বিভিন্ন স্থান শনাক্ত করতে পারবে। ৫. আর্থিক গতি ও বার্ষিক গতি ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৬. দিবা-রাত্রি সংঘটন ও হ্রাস-বৃদ্ধির কারণ এবং প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবে। ৭. ঋতু পরিবর্তনের কারণ ও প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবে। মনোপেশিজ ৮. বিভিন্ন উপকরণের সাহায্যে সৌরজগতের মডেল তৈরি করতে পারবে। আবেগীয় ৯. আমাদের বসবাসের একমাত্র পৃথিবী সম্পর্কে আরও বেশি জানার আগ্রহ প্রকাশ করবে।
তৃতীয় অধ্যায়: মানচিত্র পঠন ও ব্যবহার	বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. মানচিত্রের ধারণা, ব্যবহার ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. বিভিন্ন প্রকারের মানচিত্র সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবে। ৩. মানচিত্রে তথ্য-উপাত্ত উপস্থান নিয়মাবলি বর্ণনা করতে পারবে এবং ব্যবহারিক প্রয়োগ করতে পারবে। ৪. স্থানীয় সময় ও প্রমাণ সময় বর্ণনা করতে পারবে। ৫. স্থানভেদে সময়ের পার্থক্য হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৬. মানচিত্রে জিপিএস ও জিআইএস এর ব্যবহার বর্ণনা করতে পারবে। মনোপেশিজ ৭. কোন নির্দিষ্ট স্থানের মানচিত্র অঙ্কন করে এতে বিভিন্ন বর্ণ ও প্রতীক উপস্থাপন করতে পারবে।
চতুর্থ অধ্যায়: পৃথিবীর বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ গঠন	বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. পৃথিবীর বাহ্যিক গঠন বর্ণনা করতে পারবে। ২. পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ গঠন বর্ণনা করতে পারবে। ৩. ভূপৃষ্ঠের পরিবর্তন প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৪. ভূপৃষ্ঠের আকস্মিক পরিবর্তনের কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৫. ভূমিকম্প, সুনামি ও অগ্ন্যুৎপাতের কারণ এবং ফলাফল বিশ্লেষণ করতে পারবে। ৬. তথ্য-উপাত্ত পর্যালোচনার ভিত্তিতে অতীতে সংঘটিত কোন একটি সুনামির প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবে।

	৭. ভূপৃষ্ঠের ধীর পরিবর্তনের কারণ ও ফলাফল ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৮. নদীর গতিপথ ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৯. নদী দ্বারা সৃষ্ট ভূমিরূপ বর্ণনা করতে পারবে। ১০. পৃথিবীর প্রধান ভূমিরূপের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবে।
পঞ্চম অধ্যায়: বায়ুমণ্ডল	বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. বায়ুর উপাদান বর্ণনা করতে পারবে। ২. বায়ুমণ্ডলের স্তর বিন্যাস ও তাদের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৩. বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন স্তরের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবে। ৪. আবহাওয়া ও জলবায়ুর উপাদান বর্ণনা করতে পারবে। ৫. জলবায়ুর নিয়ামক বর্ণনা করতে পারবে। ৬. বায়ুপ্রবাহ ও তার প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবে। ৭. পানিচক্র ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৮. বিভিন্ন প্রকারের বৃষ্টিপাত সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে। ৯. জলবায়ুর শ্রেণিবিন্যাস ব্যাখ্যা করতে পারবে। ১০. বিশ্ব উষ্ণায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তনের পারস্পরিক সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবে। ১১. বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে পৃথিবীর বিশেষ অঞ্চলে সম্ভাব্য যে প্রভাব পড়বে তা বিশ্লেষণ করতে পারবে। ১২. জলবায়ু পরিবর্তনে বাংলাদেশের মানুষের বাসস্থান, জীবন-জীবিকা ও পরিবেশের উপর সম্ভাব্য প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবে।
ষষ্ঠ অধ্যায়: বারিমণ্ডল	বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. বারিমণ্ডলের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. সাগর, মহাসাগর ও উপসাগর বর্ণনা করতে পারবে। ৩. সমুদ্র তলদেশের ভূমিরূপ ও সমুদ্র সম্পদ বর্ণনা করতে পারবে। ৪. সমুদ্রস্রোতের কারণ ও প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৫. জোয়ার ভাটার কারণ ও প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারবে।
সপ্তম অধ্যায়: জনসংখ্যা	বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. বিশ্বের জনসংখ্যার বর্তমান পরিস্থিতি ও পরিবর্তনের ধারা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. জনসংখ্যার পরিবর্তনকে প্রভাবিত করার নিয়ামকসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৩. প্রাকৃতিক সম্পদের উপর অতিরিক্ত জনসংখ্যার প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবে। ৪. জনসংখ্যা ঘনত্ব ও জনসংখ্যা বন্টন ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৫. জনসংখ্যা ঘনত্ব ও জনসংখ্যা বন্টনের প্রভাবকসমূহ বিশ্লেষণ করতে পারবে। ৬. বাংলাদেশের বর্তমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার, সৃষ্ট সমস্যা এবং সমাধানের উপায় ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৭. বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধের উপায় ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৮. অভিবাসনের কারণ ও সুফল-কুফল ব্যাখ্যা করতে পারবে। আবেগীয় ৯. অভিবাসনের সুফল-কুফল সম্পর্কে সচেতন হবে এবং অন্যকেও সচেতন করবে।
অষ্টম অধ্যায়: মানব বসতি	বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. গ্রামীণ বসতি ও নগর বসতি বর্ণনা করতে পারবে। ২. বসতি স্থাপনের নিয়ামকসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৩. গ্রামীণ বসতির ধরন ও বিন্যাস বর্ণনা করতে পারবে। ৪. নগরায়ণ কী তা বলতে পারবে এবং নগরের শ্রেণিবিন্যাস ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৫. নগরায়ণের প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৬. অপরিকল্পিত নগরায়ণের ফলে সৃষ্ট সমস্যা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৭. নিজ এলাকার বসতির ধরন ও বিন্যাস ব্যাখ্যা করতে পারবে। আবেগীয় ৮. নিজের চারপাশের প্রকৃতি এবং পরিবেশের যত্নের ব্যাপারে সচেতন ও তৎপর থাকবে।

নবম অধ্যায়: সম্পদ ও অর্থনৈতিক কার্যাবলি	বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. সম্পদের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে এবং সম্পদের শ্রেণিবিন্যাস করতে পারবে। ২. সম্পদ সংরক্ষণের উপায় ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৩. অর্থনৈতিক কার্যাবলি ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৪. অনুন্নত, উন্নয়নশীল ও উন্নত দেশের অর্থনৈতিক কার্যাবলি ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৫. শিল্প গড়ে উঠার নিয়ামক ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৬. শিল্পের শ্রেণিবিন্যাস ও অবস্থানগত কারণ বিশ্লেষণ করতে পারবে। ৭. বিশ্বব্যাপী শিল্পায়নের স্থানিক পরিবর্তনের কারণ বিশ্লেষণ করতে পারবে। ৮. আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্য ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৯. বাণিজ্য ভারসাম্য ও উন্নয়নের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে পারবে। আবেগীয় সম্পদ সংরক্ষণে যত্নবান হবে এবং অন্যকেও সম্পদ সংরক্ষণ করতে উৎসাহিত করবে।
দশম অধ্যায়: বাংলাদেশের ভৌগোলিক বিবরণ	বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান এবং ভূপ্রকৃতি বর্ণনা করতে পারবে। ২. বাংলাদেশের প্রধান নদ-নদী, উপনদী এবং শাখা নদী সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবে। ৩. বাংলাদেশের নদী ও জলাশয় ভরাটের মানবসৃষ্ট কারণ, প্রভাব ও প্রতিরোধের উপায় ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৪. বাংলাদেশের জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য, ঋতুভিত্তিক তাপমাত্রা, বায়ুপ্রবাহ ও বৃষ্টিপাত সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবে। ৫. মৌসুমি জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য এবং কালবৈশাখী সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে। আবেগীয় ৬. নদী ও জলাশয় ভরাটের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করতে পারবে। ৭. কালবৈশাখী ঝড় ও বজ্রপাতের ক্ষেত্রে সতর্কতা এবং নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করবে, অন্যকেও এ ব্যাপারে সচেতন করবে।
একাদশ অধ্যায়: বাংলাদেশের সম্পদ ও শিল্প	বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. বাংলাদেশের প্রধান কৃষিপণ্য ও তাদের বণ্টন বর্ণনা করতে পারবে। ২. বাংলাদেশের বিভিন্ন বনাঞ্চলের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৩. বাংলাদেশের তেল, গ্যাস ও কয়লা ক্ষেত্রের অবস্থান মানচিত্রে প্রদর্শনপূর্বক বর্ণনা করতে পারবে। ৪. বাংলাদেশের অর্থনীতিতে তেল, গ্যাস ও কয়লার গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবে। ৫. বাংলাদেশের প্রধান শিল্প সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবে এবং মানচিত্রে উপস্থাপন করতে পারবে। ৬. বাংলাদেশের অর্থনীতিতে পোশাক শিল্পের অবদান বিশ্লেষণ করতে পারবে। ৭. বাংলাদেশের প্রধান পর্যটন কেন্দ্রের বর্ণনা করতে পারবে এবং মানচিত্রে প্রদর্শন করতে পারবে। ৮. বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের গুরুত্ব ও সম্ভাবনা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবে। ৯. বাংলাদেশের কোন একটি পর্যটন কেন্দ্র ভ্রমণ করে তার বর্তমান অবস্থা, সমস্যা এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্পর্কে সচিত্র বর্ণনা দিতে পারবে। আবেগীয় ১০. বনজ সম্পদ সংরক্ষণে সচেতন হবে এবং সর্বত্র সচেতনতা সৃষ্টি করবে। ১১. পর্যটক হিসেবে পর্যটন কেন্দ্রের সুস্থ পরিবেশ সংরক্ষণে নাগরিক দায়িত্ব পালন করবে।
দ্বাদশ অধ্যায়: বাংলাদেশের যোগাযোগ ও বাণিজ্য	বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. বাংলাদেশের সড়ক, রেল, নৌ ও আকাশ পথের বর্ণনা করতে পারবে। ২. যোগাযোগ ও পরিবহণে সড়ক, রেল, নৌ ও আকাশপথের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবে। ৩. বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্য ব্যাখ্যা করতে পারবে।

	৪. বাণিজ্য আমদানি ও রপ্তানি পণ্য সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবে। আবেগীয় ৫. সড়ক, রেল ও নৌপথে চলাচলের ক্ষেত্রে দুর্ঘটনা এড়াতে সর্বদা সাবধানতা অবলম্বন করবে এবং অন্যকে সাবধান করবে।
এয়োদশ অধ্যায়: বাংলাদেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ও পরিবেশের ভারসাম্য	বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. পরিবেশের ভারসাম্য এবং ভারসাম্যহীনতা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. পরিবেশের ভারসাম্যহীনতার পরিণতি বিশ্লেষণ করতে পারবে। ৩. উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের ব্যাখ্যাসহ বাংলাদেশের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বর্ণনা করতে পারবে। ৪. বাংলাদেশের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সম্পাদনের সময় কীভাবে পরিবেশ দূষণ ও ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ছে তা ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৫. উন্নয়ন কর্মকাণ্ড কীভাবে পরিবেশের ভারসাম্যকে প্রভাবিত করে তা বিশ্লেষণ করতে পারবে। ৬. বাংলাদেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সম্পাদনের সময় পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার উপায় ব্যাখ্যা করতে পারবে। আবেগীয় ৭. পরিবেশের ভারসাম্যহীনতার পরিণতি সম্পর্কে সচেতন হবে এবং অন্যকে সচেতন করবে।
চতুর্দশ অধ্যায়: বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগ	বুদ্ধিবৃত্তীয় ১. দুর্যোগ ও বিপর্যয় ব্যাখ্যা করতে পারবে। ২. বাংলাদেশে সংঘটিত বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ বর্ণনা করতে পারবে। ৩. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা চক্র ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৪. বাংলাদেশের উপকূলীয় প্রাকৃতিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার উপায় ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৫. ভূমিকম্পের মাত্রা ও সুনামির পূর্বাভাস প্রদানে প্রযুক্তির ব্যবহার ও কার্যকারিতা মূল্যায়ন করতে পারবে। আবেগীয় ৬. প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় করণীয় সম্পর্কে সচেতন হবে এবং অন্যকে সচেতন করবে।

পাঠ পরিসর

ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ের পাঠ পরিসর ১৪টি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রতিটি অধ্যায়ের বিষয়বস্তুকে একাধিক পাঠে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রদত্ত ১৪টি অধ্যায়ের মধ্যে ৯ম শ্রেণির জন্য বরাদ্দ অধ্যায় ৭টি (১ম-৭ম অধ্যায়) এবং মোট পিরিয়ড সংখ্যা ১২৩টি এবং ১০ম শ্রেণির জন্য বরাদ্দ অধ্যায় ৭টি (৮ম-১৪তম অধ্যায়) এবং মোট পিরিয়ড সংখ্যা ৯৩টি। ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ে ৯ম ও ১০ম শ্রেণির সর্বমোট পিরিয়ড সংখ্যা ১২৩+৯৩=২১৬টি। বিষয়টির পাঠ শুরু হয়েছে ভূগোল ও পরিবেশ (১ম অধ্যায়) সংক্রান্ত সাধারণ আলোচনা দিয়ে এবং শেষ হয়েছে বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগ (অধ্যায়-১৪)-এর মাধ্যমে। এর মাঝের অধ্যায়গুলোতে ভূগোল ও পরিবেশ সংক্রান্ত মৌলিক ও প্রাসঙ্গিক বিষয়বস্তু নির্দিষ্ট করে তথ্যবহুল আলোচনা করা হয়েছে।

মূল্যায়ন পদ্ধতি ও কৌশল

জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২ এর জেনেরিক অংশে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। মূল্যায়নের সময় ও ধরন বিবেচনায় ২ ধারায় শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের কথা বলা হয়েছে। যেমন-

ক) গঠনকালীন/ ধারাবাহিক মূল্যায়ন

খ) সামষ্টিক মূল্যায়ন

মূল্যায়নের কৌশল হিসেবে শ্রেণির কাজ, বাড়ির কাজ, অনুসন্ধানমূলক কাজ, শ্রেণিঅভীক্ষা ইত্যাদি ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে। ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ের শিক্ষাক্রমের ছকে অধ্যায় ও বিষয়বস্তুভেদে সুনির্দিষ্ট মূল্যায়ন নির্দেশনা রয়েছে। উল্লিখিত ছকের মূল্যায়ন নির্দেশনার মূল বক্তব্য হলো- বিষয়বস্তুর ধারণা ব্যাখ্যা করা, ছকের মাধ্যমে শ্রেণিবিভাগ উপস্থাপন, গুরুত্ব বর্ণনা, মানচিত্র ও চিত্রাঙ্কন, অবস্থান নির্ণয় ও চিহ্নিতকরণ, বৈশিষ্ট্যাবলি চিহ্নিতকরণ, তুলনাকরণ/পার্থক্যকরণ, ফলাফল চিহ্নিতকরণ, প্রভাব বিশ্লেষণ, উপাদান চিহ্নিতকরণ ইত্যাদি।

বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত ২০১২ খ্রিষ্টাব্দের জাতীয় শিক্ষাক্রমে ভূগোল ও পরিবেশ পাঠ্যপুস্তকে মোট ১৪টি অধ্যায় রয়েছে। এগুলো হলো-

প্রথম অধ্যায়: ভূগোল ও পরিবেশ

দ্বিতীয় অধ্যায়: মহাবিশ্ব ও আমাদের পৃথিবী

তৃতীয় অধ্যায়: মানচিত্র পঠন ও ব্যবহার

চতুর্থ অধ্যায়: পৃথিবীর বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ গঠন

পঞ্চম অধ্যায়: বায়ুমণ্ডল

ষষ্ঠ অধ্যায়: বারিমণ্ডল

সপ্তম অধ্যায়: জনসংখ্যা

অষ্টম অধ্যায়: মানব বসতি

নবম অধ্যায়: সম্পদ ও অর্থনৈতিক কার্যাবলি

দশম অধ্যায়: বাংলাদেশের ভৌগোলিক বিবরণ

একাদশ অধ্যায়: বাংলাদেশের সম্পদ ও শিল্প

দ্বাদশ অধ্যায়: বাংলাদেশের যোগাযোগ ও বাণিজ্য

এয়োদশ অধ্যায়: বাংলাদেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ও পরিবেশের ভারসাম্য

চতুর্দশ অধ্যায়: বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগ

উল্লিখিত ১৪টি অধ্যায়ে সমসাময়িক ও প্রাসঙ্গিক বিষয়বস্তু সংযোজিত হয়েছে।

২.২ ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ের উত্তম পাঠ্যপুস্তকের মানদণ্ড

শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে একটি উত্তম পাঠ্যপুস্তক। একটি উত্তম পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ একটি শ্রমসাধ্য ও সময়সাপেক্ষ কাজ। একজন/একদল দক্ষ অভিজ্ঞ বিষয় বিশেষজ্ঞ এবং পেডাগোজিস্ট ছাড়া একটি উত্তম পাঠ্যপুস্তক রচনা করা সম্ভব নয়।

ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ক উত্তম পাঠ্যপুস্তক রচনায় মানদণ্ড হিসেবে যে সব বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিতে হবে তা হলো-

ক. পাঠ্যপুস্তকের বিষয়-কাঠামো

খ. উত্তম পাঠ্যপুস্তক নির্বাচনের মাপকাঠি

গ. ভূগোল ও পরিবেশের পাঠ্যপুস্তকের বৈশিষ্ট্য, গুণাবলি ও পরিকল্পনা

ঘ. বিষয়বস্তুর সংগঠন

ঙ. বিষয়বস্তুর সংগঠন এর নীতিসমূহ

চ. বিষয়বস্তুর বৈশিষ্ট্য

ক. পাঠ্য পুস্তকের বিষয়-কাঠামো

মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা হচ্ছে উদ্দেশ্যভিত্তিক। জ্ঞানের ভিত্তি নির্মাণ, জাতীয় আদর্শ, লক্ষ্য অর্জনের জন্য মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষাক্রম, পাঠ্য বিষয় এবং পাঠ্যসূচি দেশ ও সমাজের চাহিদা অনুযায়ী নির্ধারিত হয়ে থাকে। আর উদ্দেশ্যমুখী এ শিক্ষাক্রমের আলোকে বাছাইকৃত পাঠ্যসূচি অনুযায়ী পাঠ্যপুস্তক রচনা করা হয়ে থাকে। ফলে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তর এবং কারিগরি ও অন্যান্য শিক্ষাধারায় (উচ্চ মাধ্যমিক ও স্নাতক পর্যায়ে কিছু বই) জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা হয়।

ভূগোল ও পরিবেশ শিক্ষাদানে পাঠ্যপুস্তক খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য প্রয়োজন উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক। ভূগোল ও পরিবেশ পাঠ্যপুস্তকের নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্য থাকা আবশ্যিক। যথা-

১. **বিষয়বস্তুর নির্ভুলতা:** পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু নির্ভুল হতে হবে। এজন্য লেখক ও প্রকাশকের একটি মান থাকা দরকার। লেখককে ঐ বিষয়ে দীর্ঘ পাঠদানের অভিজ্ঞতা ও উচ্চতর শিক্ষাগত যোগ্যতার অধিকারী হতে হবে। তাঁর অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে।

২. **ভাষার শুদ্ধতা:** পাঠ্যপুস্তকের ভাষা হবে সহজ, স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল। বক্তব্য পরিষ্কারভাবে বুঝানোর জন্য আঞ্চলিক শব্দ, প্রতিশব্দ ইত্যাদির ইংরেজি শব্দ বন্ধনীর মধ্যে থাকা উচিত।

৩. সহজ ডায়াগ্রাম: পাঠ্যপুস্তকে বিষয় সংশ্লিষ্ট সহজবোধ্য ডায়াগ্রাম থাকা দরকার। এগুলো এমন হবে যেন শিক্ষার্থীরা নিজেরাই বুঝতে পারে।

৪. মুদ্রণ ও বাঁধাইয়ের মান: পাঠ্যপুস্তক উন্নত কাগজে নিখুঁতভাবে মুদ্রিত হওয়া প্রয়োজন। তাছাড়া বাঁধাইয়ের মানও ভাল হওয়া প্রয়োজন।

একটি আদর্শ পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু মনোবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ক্রমান্বয়ে সন্নিবেশিত হওয়া উচিত। প্রত্যেকটি অধ্যায়ের শুরুতে বিষয়বস্তুর সংক্ষিপ্ত ধারণা এবং আলোচনা শেষে বিষয়বস্তুর সারাংশ থাকা উচিত। এছাড়া অধ্যায় শেষে রচনামূলক, সংক্ষিপ্ত ও নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন থাকতে হবে। পুস্তকের শুরুতে বিষয়বস্তু ও সূচি এবং শেষে একটি বিষয় নির্ঘণ্ট ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের একটি শব্দকোষ থাকা উচিত।

উপরিউক্ত বিষয় ছাড়াও পাঠ্যপুস্তকের আরও কতগুলো বৈশিষ্ট্যের প্রতি নজর দিতে হবে। এগুলো হলো -

- পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু ও পাঠ্যসূচি সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীদের বয়ঃকঠামো অনুযায়ী নির্ভুল কি-না।
- বিষয়বস্তুর ধারণা জটিল বা অস্পষ্ট নয়।
- সঠিক শব্দ ভাষার ব্যবহার এবং ভাষার সাহিত্য মান শিক্ষার্থীদের জন্য উৎসাহব্যঞ্জক।
- নিখুঁত ছবি/আলোকেচিত্রের ব্যবহার।
- উদাহরণের সংখ্যা ও মান উত্তম।
- পুস্তকের মেকআপ, গেটআপ, আকার, কাগজ ও ছাপার মান ইত্যাদি।

খ. উত্তম পাঠ্যপুস্তক নির্বাচনের মাপকাঠি

জ্ঞান অর্জনের জন্য শিক্ষার্থীর নিকট পাঠ্যপুস্তক গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। শিক্ষার্থীর চাহিদা পূরণ করতে পাঠ্যপুস্তক যথেষ্ট সহায়তা করে। বাংলাদেশে শিক্ষা সহায়ক অন্যান্য উপাদানের অস্তিত্ব নগণ্য। ফলে শিক্ষার্থী পাঠ্যপুস্তকের ওপর অত্যধিক নির্ভরশীল। এ জন্য শিক্ষার্থীর হাতে ভাল পাঠ্যপুস্তক পৌঁছে দেয়া কর্তৃপক্ষের একান্ত কর্তব্য। বাংলাদেশে এনসিটিবি কর্তৃক শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করা হয়। পাঠ্যপুস্তক কোন একক প্রচেষ্টার ফসল নয় বরং এটি সমষ্টিগত প্রচেষ্টার সার্থকরূপ। শিক্ষাক্রমেই শ্রেণিভিত্তিক প্রতিটি বিষয়ের শিক্ষাসূচি নির্ধারিত থাকে। পাঠ্যসূচি নির্বাচনের ওপর নির্ভর করে পাঠ্যপুস্তকের সার্থকতা। পাঠ্যপুস্তক রচয়িতাগণ এ নির্বাচিত পাঠ্যসূচি অনুসারে পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন। পরবর্তীতে কর্তৃপক্ষের যথাযথ অনুমোদন সাপেক্ষে এনসিটিবি কর্তৃক পাঠ্যপুস্তক প্রকাশিত হয়। পাঠ্যপুস্তকের গুরুত্ব উপলব্ধি করে উন্নতমানের পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন করা প্রয়োজন। এ জাতীয় পাঠ্যপুস্তক নির্বাচনের জন্য কতগুলো নীতি মেনে চলা প্রয়োজন। যেমন-

- শিক্ষাক্রম অনুযায়ী পাঠ্যপুস্তক প্রণীত হবে;
- ইংরেজি ব্যতীত বিভিন্ন বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক মাতৃভাষা বাংলায় রচিত হবে;
- পাঠ্যপুস্তকের ভাষা ও বাক্য কাঠামো শ্রেণি উপযোগী হবে। সে সাথে চলিত ভাষারীতি মেনে চলতে হবে;
- পাঠ্যপুস্তকে জাতীয় আদর্শের প্রতিফলন ঘটেছে কি-না তা দেখতে হবে;
- পাঠ্যপুস্তকে নিজ দেশের সংস্কৃতির উল্লেখ অবশ্যই থাকতে হবে;
- বিষয়বস্তুর বিন্যাস সঠিকভাবে পরিবেশন হয়েছে কি-না তা লক্ষ্য করতে হবে;
- বিষয়বস্তুর আকার শ্রেণি উপযোগী এবং তা যথেষ্ট কি-না দেখে নিতে হবে;
- পাঠ্যবিষয়ে তথ্য যুক্ত হলে তা অবশ্যই সর্বশেষ তথ্য সম্বলিত হবে;
- পাঠ্যপুস্তকে সঠিক ও সত্য তথ্য পরিবেশন হয়েছে কি-না তা যাচাই করতে হবে;
- ভূগোল ও পরিবেশ পাঠ্যপুস্তকে যথেষ্ট পরিমাণ চিত্র, মানচিত্র, নকশা থাকতে হবে;
- পাঠ্যপুস্তকে সন্নিবেশিত মানচিত্র এবং অন্যান্য চিত্রাদির সাথে আলোচ্য বিষয়বস্তুর সামঞ্জস্য থাকতে হবে;
- পাঠ্যবিষয়গুলোতে সহজ থেকে কঠিন, জানা থেকে অজানা, মূর্ত থেকে বিমূর্ত এ রীতির প্রভাব থাকবে;
- সহজে বোধগম্যতার জন্য বিষয়বস্তুতে যথেষ্ট পরিমাণ উদাহরণ রয়েছে কিনা তা দেখতে হবে;
- পাঠ্যপুস্তকে যথেষ্ট পরিমাণ অনুশীলনী থাকবে;
- ভাল কাগজ, উপযুক্ত বাঁধাই, ছাপা সুন্দর ও স্পষ্ট রয়েছে কি-না তা দেখে পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন করতে হবে;
- পাঠ্যপুস্তকের মূল্য সবার ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে থাকবে;
- পাঠ্যপুস্তক রাষ্ট্রবিরোধী ও বিতর্ক সৃষ্টিকারী বিষয় মুক্ত রয়েছে কি-না তা লক্ষ্য করতে হবে।

গ. ভূগোল ও পরিবেশ পাঠ্যপুস্তকের বৈশিষ্ট্য, গুণাবলি ও পরিকল্পনা

ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ের একটি উত্তম পাঠ্যপুস্তকের নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি থাকা আবশ্যিক। যথা-

১. শিক্ষাক্রমের সাথে পাঠ্যপুস্তকের সামঞ্জস্য থাকতে হবে।
২. ভৌগোলিক বিষয়ের আলোচনার জন্য সাধারণীকরণ প্রণালি প্রয়োগ করা প্রয়োজন। সাধারণীকরণ প্রণালিতে শিক্ষার্থী প্রথমে সাধারণত সূত্রগুলো আলোচনার মাধ্যমে, পরে বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারবে।
৩. ভূগোল ও পরিবেশ একটি গতিশীল ও ক্রমপরিবর্তনশীল বিষয়। প্রাকৃতিক বা রাজনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের কর্মধারারও পরিবর্তন হয়। পাঠ্যপুস্তক রচনার সময়ে বিষয়টির এ গতিশীলতার প্রতি বিশেষ নজর দেয়া প্রয়োজন।
৪. মানচিত্র ও অন্যান্য ভৌগোলিক চিত্র, পরিসংখ্যান ইত্যাদি অঙ্কন ও উপস্থাপনের সময়ে সেগুলোতে যথাযথ নাম, স্কেল, অক্ষাংশ, দ্রাঘিমাংশ ইত্যাদি উল্লেখ থাকা প্রয়োজন। প্রাকৃতিক ভূগোলের চিত্র সুস্পষ্ট হতে হবে। পরিসংখ্যান নির্ভুল ও সর্বাধুনিক হতে হবে।
৫. অধ্যায়ের শেষে নির্বাচিত প্রশ্নোচ্চ ও নানাবিধ কর্মভিত্তিক অনুশীলনী, সার-সংক্ষেপ, পরিভাষা ও প্রয়োজনে প্রাসঙ্গিক গ্রন্থের নাম উল্লেখ করতে হবে।
৬. কোন তাত্ত্বিক বিষয় আলোচনার ক্ষেত্রে উদাহরণ থাকা আবশ্যিক। উদাহরণ প্রয়োগে বাস্তবতার দিকে নজর দিতে হবে।
৭. পাঠ্যপুস্তক শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ের উপযোগী হতে হবে। বিষয়বস্তু মনোবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিন্যাস করতে হবে যেন শিক্ষকের চাহিদা পূরণ হয়।
৮. পুস্তকের আকার হবে সহজে বহনযোগ্য।
৯. পুস্তকের মেকআপ, গেটআপ সুন্দর ও আকর্ষণীয় হবে। অক্ষর ও ছাপা যেন শিক্ষার্থীদের চোখের উপর প্রভাব না পড়ে।
১০. বিষয়বস্তু এমন হবে যেন শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণ করে।
১১. পাঠ্যপুস্তক নির্ভুলভাবে রচিত হবে। বিষয়বস্তুর মধ্যে কোন ভুল যেন না থাকে।
১২. শিক্ষার্থীদের বয়ঃকঠামো অনুযায়ী মনোবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে রচিত হবে। পুস্তক রচনার ধরণ হবে সহজ, স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল। বিষয়বস্তু যেন শিক্ষার্থীদের আকর্ষণ ধরে রাখতে পারে।
১৩. নির্দিষ্ট বয়সের শিক্ষার্থীদের সকল প্রয়োজনীয় ও প্রাসঙ্গিক উপাদান পাঠ্যপুস্তকে থাকবে।
১৪. বিভিন্ন শ্রেণির পাঠ্য পুস্তকের মধ্যে সংযোগ থাকবে এবং তা একে অন্যের পরিপূরক হবে।
১৫. পাঠ্যপুস্তক হবে কুসংস্কার মুক্ত। এতে এমন কোন বিষয় থাকবে না যা কোন বর্ণ বা সম্প্রদায়ের অনুভূতিতে আঘাত করে।
১৬. পাঠ্যপুস্তকের প্রয়োজনীয় স্থানে পর্যাপ্ত চার্ট, নকশা, মানচিত্র, ডায়াগ্রাম ও ছবি থাকবে।
১৭. পুস্তকের শেষে পরিশিষ্টাংশে গ্রন্থপঞ্জি, পরিভাষা থাকবে।
১৮. প্রতিটি অধ্যায়ে বিষয়বস্তুর উপস্থাপন শেষে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন সংযোজিত অনুশীলনী থাকবে।
১৯. সর্বোপরি ভূগোল ও পরিবেশ পাঠ্যপুস্তক একটি শিক্ষা উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হবে।

ঘ. বিষয়বস্তুর সংগঠন

সংগঠনের আভিধানিক অর্থ সুসংবদ্ধকরণ বা একত্রকরণ। বিষয়বস্তুর সংগঠন বলতে শিক্ষাসূচি বা পাঠ্যসূচির অন্তর্গত বিষয়বস্তুর বিন্যাসকে বোঝায়। বিষয়বস্তুর বিন্যাসের ওপর একটি পাঠ্যপুস্তক পরিপূর্ণতা লাভ করে এবং শিক্ষার্থীর চাহিদা সুষ্ঠুভাবে নিবৃত্ত করতে পারে। তবে এক্ষেত্রে কিছু নিয়মনীতি অনুসরণ করা হয়। ভূগোল বিষয়ের ক্ষেত্রে এ নীতিমালাকে ভূগোলের ব্যাকরণ বলা হয়।

ঙ. বিষয়বস্তু সংগঠনের নীতিসমূহ

১. **অনুক্রমিক নীতি:** ক্রমানুযায়ী বিন্যাসকে অনুক্রমিক নীতি বলা হয়। পূর্ব অভিজ্ঞতার সাথে সঙ্গতি সাধন করে নতুন অভিজ্ঞতা অর্জনের দিক বিবেচনা করে বিষয়বস্তু সজ্জিত করা উচিত। কারণ পাঠ্যপুস্তকে এ নীতি অনুসরণ করলে শিখন সহজ হয় ও শিক্ষার্থীর কৌতূহলের উদ্বেক করে।
২. **ধারাবাহিকতা রক্ষা:** বিষয়বস্তুগুলোর মধ্যে ধারাবাহিকতা বজায় রাখা একান্ত প্রয়োজন। কারণ বিন্যাসের মধ্যে ধারাবাহিকতা না থাকলে শিখনের ক্ষেত্রে জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে। বিষয়বস্তুর ধারাবাহিকতা শিক্ষার্থীর মনে আত্মহের সৃষ্টি করে দুর্বোধ্যতা কাটিয়ে উঠতে সহায়ক হয়।

৩. অখণ্ডতা রক্ষা: বিষয়বস্তুগুলো কার্যকর সম্পর্কযুক্ত হওয়া প্রয়োজন। মূল বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তুর সমন্বয় থাকা প্রয়োজন। তাহলে সমগ্র পাঠটি শিক্ষার্থীর নিকট আবেদন সৃষ্টি করবে।
৪. সামঞ্জস্য সংরক্ষণ: বিষয়বস্তুতে সামঞ্জস্যতা বজায় থাকবে। এ পন্থা শিক্ষার্থীকে কাক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে সহায়তা করে। সামঞ্জস্যতা পাঠের কাঠিন্য দূর করে।
৫. বৈচিত্র্য আনয়ন: একটি পাঠ্যপুস্তকের বিভিন্ন বিষয়বস্তুর মধ্যে বৈচিত্র্য রাখা প্রয়োজন। এ বৈচিত্র্য এক্ষেয়েমি দূর করতে সক্ষম হয়, আবার শিক্ষার্থীর জ্ঞান পিপাসা জাহত করে।

চ. বিষয়বস্তুর বৈশিষ্ট্য

১. বিষয়বস্তু শিক্ষার সাধারণ উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে।
২. ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে বিষয়বস্তুর সঙ্গতি থাকবে।
৩. বিষয়বস্তু মূল বিষয়ের অন্তর্গত হতে হবে।
৪. ভৌগোলিক ও পরিবেশগত জ্ঞান অর্জনের জন্য বিষয়বস্তু প্রয়োজনীয় কি-না তার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে।
৫. বিষয়বস্তু হবে আগ্রহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টিকারী এবং চাহিদা পূরণে সমর্থ হবে।
৬. লব্ধজ্ঞানের প্রয়োগযোগ্যতার প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে।
৭. ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ের বিষয়বস্তুর মধ্যে গতিময়তা লক্ষ্য করা যায়। এ গতিশীলতা রক্ষা করতে হবে।
৮. ভূগোল ও পরিবেশ একটি সমন্বিত বিষয়। সুতরাং এর বিষয়বস্তু অন্যান্য বিষয় যেমন- বিজ্ঞান, ইতিহাস, অর্থনীতি, পৌরনীতি, গণিত, চিত্রাঙ্কন, জ্যোতির্বিদ্যা ইত্যাদি বিষয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত হবে। বিষয়বস্তু গতানুগতিক না হয়ে বৈচিত্র্যপূর্ণ হবে।
৯. সৃজনশীলতা বিকাশে বিষয়বস্তুকে সহায়ক হতে হবে।
১০. শ্রেণি ও বয়ঃক্রম অনুসারে বিষয়বস্তুর পরিমণ্ডল সজ্জিত হবে।
১১. শিখনে পরিণমন সৃষ্টিকারী উপাদান বিষয়বস্তুতে অন্তর্ভুক্ত থাকবে।
১২. বিষয়বস্তু হবে অনাবশ্যক তথ্যের ভারমুক্ত।
১৩. যুক্তিসঙ্গতভাবে বিষয়বস্তু বিন্যস্ত হবে।
১৪. বিষয়বস্তু ভারমাস্য হবে।

পাঠ্যপুস্তকের গুরুত্ব

উন্নয়নশীল দেশে যেখানে শিখন সামগ্রীর পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেই, পাঠ সহায়ক উপকরণেরও যথেষ্ট অভাব রয়েছে সেখানে পাঠ্যপুস্তক একমাত্র ও প্রধান শিক্ষা উপকরণ হিসেবে বিবেচিত। এ প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে পাঠ্যপুস্তকের গুরুত্ব অপরিসীম। তাছাড়া শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির প্রতিফলন যেহেতু পাঠ্যপুস্তকে ঘটে, তাই পাঠ্যপুস্তক অবলম্বন করেই শিক্ষাদান প্রক্রিয়া চলে। এদিক থেকেও পাঠ্যপুস্তকের গুরুত্ব অনেক বেশি। বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান শ্রেণিশিক্ষার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। শ্রেণিতে সফল উপস্থাপনের প্রস্তুতিতে শিক্ষক তাঁর প্রয়োজনীয় তথ্যের উৎস এবং পাঠের লক্ষ্য নির্ধারণী হিসেবে পাঠ্যপুস্তকের উপর নির্ভর করতে পারেন। আবার শিক্ষার্থীও তার প্রয়োজনীয় শিক্ষালাভের নির্ভরযোগ্য সূত্র হিসেবে পাঠ্যপুস্তক ব্যবহার করতে পারে। উভয়ের জন্যই পাঠ্যপুস্তক প্রয়োজনীয় সহায়ক উপাদান। নির্দিষ্ট বিষয় শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে স্তর ও শ্রেণিভিত্তিক জাতীয় লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অবগত হওয়া এবং পদ্ধতি ও কৌশল আয়ত্ত করার জন্যও শিক্ষক পাঠ্যপুস্তক ব্যবহার করতে পারেন। সুতরাং সব দিক বিবেচনায় দেখা যায়, শ্রেণি পাঠদান ও শিক্ষার প্রধান উপকরণ হিসেবে পাঠ্যপুস্তকের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

২.৩ মাধ্যমিক স্তরের ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক পর্যালোচনা

পাঠ্যপুস্তক পর্যালোচনা শিক্ষার্থীদের পুস্তক পাঠ, পর্যবেক্ষণ, ও যৌক্তিকভাবে সমালোচনা করার সক্ষমতা বৃদ্ধি করে। নমুনা হিসেবে এখানে আগস্ট, ২০১৬-এ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত নবম-দশম শ্রেণির ভূগোল ও পরিবেশ বইটির পর্যালোচনা করা হলো।

পুস্তকের নাম: ভূগোল ও পরিবেশ

শ্রেণি: নবম-দশম

প্রকাশক: জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ৬৯-৭০ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।

রচনায়: সেলিনা শাহজাহান
ড. শেখ মোঃ রেজাউল করিম
জুলেখা শাহীন
সম্পাদনা: ড. হাফিজা বেগম
প্রকাশকাল: প্রথম প্রকাশ অক্টোবর, ২০১২
পুনঃমুদ্রণ-আগস্ট, ২০১৬
পাঠ্যপ্রণয়নের সমন্বয়ক: তাহমিনা রহমান
প্রচ্ছদ: সুদর্শন বাহার
সুজাউল আবেদীন
মানচিত্রাঙ্কন: গ্রাফোসম্যান
ডিজাইন: জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
মেকাপ এন্ড এডিটিং: পারফর্ম কালার এন্ড গ্রাফিক্স (প্রাঃ)
মূল্য: সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য
পৃষ্ঠা সংখ্যা: ১৯৬
ফর্ম্যা সংখ্যা: ২৩
পুস্তকের সাইজ: ১/৮
মোট অধ্যায়: ১৪ টি
কাগজ: সাদা
মুদ্রণ: মেসার্স জননী প্রিন্টার্স, ১৯, প্রতাপ দাস লেন, সিংটোলা, সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০।

বিষয়বস্তুর বিন্যাস: ভূগোল ও পরিবেশ, নবম-দশম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকে শিক্ষাক্রম অনুযায়ী মোট ১৪টি অধ্যায়ে বিন্যাস করা হয়েছে, যেখানে প্রথম ৭টি অধ্যায় নবম শ্রেণির এবং পরবর্তী ৭টি অধ্যায় দশম শ্রেণির জন্য নির্ধারিত। প্রথম অধ্যায়ে ভূগোল ও পরিবেশ সংক্রান্ত ধারণা দিয়ে বিষয়বস্তুর সূচনা করা হয়েছে। এরপর ভূগোল ও পরিবেশের প্রধান উপাদান যেমন- মহাবিশ্ব ও আমাদের পৃথিবী, মানচিত্র পঠন ও ব্যবহার, পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক গঠন, বায়ুমণ্ডল, বারিমণ্ডল, জনসংখ্যা, মানববসতি, সম্পদ ও অর্থনৈতিক কার্যাবলি, বাংলাদেশের ভৌগোলিক বিবরণ, বাংলাদেশের সম্পদ ও শিল্প, বাংলাদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা ও বাণিজ্য, বাংলাদেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ও পরিবেশের ভারসাম্য এবং বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগ।

বিষয়বস্তুর সংগঠন: বইটিতে বিষয়বস্তু সংগঠনে উল্লম্ব ও আনুভূমিক রীতি ব্যবহার করা হয়েছে। অধ্যায়ের শিরোনামের পর ভূমিকা দেয়া হয়েছে এবং শিখনফল উল্লেখ করে সে মতে বিষয়বস্তুর সংগঠন ও বিন্যাস করা হয়েছে। বিষয়বস্তু ও সংগঠনে তৃতীয় অধ্যায় মানচিত্র পঠন ও ব্যবহার যথার্থ হয়নি বলে মনে হয়। এতে পূর্বাধিকার বিষয়বস্তুর মধ্যে একটি ছন্দপতন ঘটেছে। এ অধ্যায়টি শেষে থাকলে ভাল হতো। পুস্তকের নাম যেহেতু ভূগোল ও পরিবেশ তাই দুটি আলাদা অধ্যায়ে ভূগোল ও পরিবেশ সংক্রান্ত ধারণা থাকলে ভাল হতো।

পুস্তকের অনেক তথ্য সমসাময়িক নয় (২০০৯ খ্রিষ্টাব্দের তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে)। আবার নির্দিষ্ট খ্রিষ্টাব্দ উল্লেখ না করে বর্তমানে শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে যা মোটেও কাম্য নয় (বর্তমান চলমান, তাই নির্দিষ্ট খ্রিষ্টাব্দ উল্লেখ জরুরি)। কিছু ক্ষেত্রে তথ্যগত ভুল রয়েছে; যেমন- পৃ. ১৩৩ এ বাংলাদেশের প্রধান নদ-নদী আলোচনায় নদীর সংখ্যা ৭০০টি বলা হয়েছে যার কোন তথ্যসূত্র নেই। একই আলোচনায় পদ্মা নদী বাংলাদেশের সীমানা বরাবর এসে কুষ্টিয়ার উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে বলা হয়েছে যা যথার্থ নয়। প্রকৃতপক্ষে পদ্মা নদী বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা দিয়ে।

চিত্র, মানচিত্র, সারণি: ভূগোল ও পরিবেশ সংক্রান্ত পুস্তকে চিত্রের ব্যবহার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পুস্তকে অনেক চিত্র অঙ্কিত ও আলোকচিত্র, সারণি ও মানচিত্র ব্যবহার হয়েছে। যেসব ক্ষেত্রে রঙিন আলোকচিত্র ব্যবহার হয়েছে সেগুলো পুস্তকে ছাপার পর কালো দেখাচ্ছে, যা খুবই অস্পষ্ট (পৃ. ৬১, ৬৭, ৭৪, ১১০, ১১২, ১২০, ১২৮, ১৫৭, ১৬১, ১৭৩, ১৭৫, ১৭৭, ১৮২, ১৮৬, ১৮৮, ১৮৯ দ্রষ্টব্য)। এক্ষেত্রে পুস্তকটি ছাপা রঙিন হলে চিত্র স্পষ্ট, বোধগম্য ও আকর্ষণীয় হতো। মানচিত্রের ব্যবহার যথার্থ হলেও পর্যাপ্ত সারণি ও তথ্য নেই।

অনুশীলন ও কাজ: পুস্তকের প্রতি অধ্যায়ে বিষয়বস্তু বিশ্লেষণকালে বস্তুর ভিতর কাজ দেয়া হয়েছে যা একটি ভাল উদ্যোগ। তবে অনুশীলনীতে পর্যাপ্ত অনুশীলন করার মত প্রশ্ন নেই। সৃজনশীল প্রশ্নগুলোর উদ্দীপক ও প্রশ্ন দুর্বলভিতের উপর তৈরি। বইটি ছাপার মান ভাল। উপরে নীচে এবং লাইনের মধ্যে পর্যাপ্ত ফাঁক রাখা হয়েছে। এ ছাড়া শিরোনাম, উপ-শিরোনাম, বোল্ড করে দৃশ্যমান করা হয়েছে যা বইটির গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি করেছে। তবে অনেক ক্ষেত্রে বাংলার সাথে ইংরেজি পরিভাষায় ব্যবহার যথার্থ হয়নি (পৃ. ১৯, আর্থিক গতি, Rotation), পৃ. ১৯১, প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ (Essential Metre) সহ আরো কিছু ক্ষেত্রে।

ভূগোল ও পরিবেশ নামে মাধ্যমিক স্তরে এটি প্রথম পুস্তক। ইতোপূর্বে এর নাম ছিল ভূগোল। ভূগোল ও পরিবেশ পাঠ্যপুস্তকে সংযোজিত বিষয়বস্তু মাধ্যমিক স্তর অনুযায়ী যথার্থ। ভূগোল বিষয়ের সাথে পরিবেশ যুক্ত হওয়ায় বিষয়টি ও বিষয়বস্তু পূর্ণতা পেয়েছে। সার্বিক বিষয়ে বইটির মান ভাল বলেই প্রতীয়মান হয়।

প্রশ্নমালা

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. মাধ্যমিক স্তরের ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ের শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য উদ্দেশ্য কী কী?
২. মাধ্যমিক স্তরের ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ের ২টি শিখনফল লিখুন।
৩. ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ের পাঠ পরিসর কী?
৪. মাধ্যমিক স্তরের ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ের ২টি করে মূল্যায়ন পদ্ধতি ও কৌশলের নাম লিখুন।
৫. বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ বলতে কী বুঝায়?
৬. ভূগোল পরিবেশ বিষয়ক উত্তম পাঠ্যপুস্তকের মানদণ্ড কী কী?

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর

১. মাধ্যমিক স্তরের ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ের শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলো বর্ণনা করুন।
২. মাধ্যমিক স্তরের ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ের শিখনফলের যথার্থতা যাচাই করুন।
৩. মাধ্যমিক স্তরের ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ের পাঠ পরিসর ব্যাখ্যা করুন।
৪. মূল্যায়ন পদ্ধতি ও কৌশল এবং বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ পর্যালোচনা করুন।
৫. ভূগোল পরিবেশ বিষয়ক উত্তম পাঠ্যপুস্তকের মানদণ্ডের ব্যাখ্যা দিন।
৬. মাধ্যমিক স্তরের ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ের পাঠ্যপুস্তকটি পর্যালোচনা করুন।

ইউনিট ৩ : ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ের বিষয়বস্তু

সচেতন মানুষ মাত্রই প্রাত্যহিক জীবনের কতগুলো মৌলিক বিষয়ে জ্ঞান থাকা আবশ্যিক। ভূগোল ও পরিবেশ হলো এমন একটি বিষয় যার জ্ঞান ও দক্ষতা দৈনন্দিন জীবনে কাজে লাগে। বি.এড কোর্সে ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ে বিষয়বস্তু সংযোজন করার উদ্দেশ্য হচ্ছে এসব বিষয়বস্তুর আলোকে শিখন-শেখানো পদ্ধতির অনুশীলন করা। এ অধ্যায়ের বিষয়বস্তুকে ৯টি পাঠে বিভক্ত করে আলোচনা করা হয়েছে। এগুলো হলো-

- ৩.১ : অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমা, আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা ও পৃথিবীর আকার
- ৩.২ : আর্থিক ও বার্ষিক গতি
- ৩.৩ : পৃথিবীর বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ গঠন
- ৩.৪ : ভূমিকম্প ও আগ্নেয়গিরি
- ৩.৫ : বিচূর্ণীভবন
- ৩.৬ : বায়ুমণ্ডল, আবহাওয়া ও জলবায়ু; জলবায়ুর পরিবর্তন
- ৩.৭ : বারিমণ্ডল: সাগর, মহাসাগর ও উপসাগর
- ৩.৮ : সমুদ্র শ্রোত ও জোয়ার ভাঁটা
- ৩.৯ : পরিবেশের উপাদান, পরিবেশ দূষণের কারণ ও পরিবেশ সংরক্ষণ

৩.১ অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমা, আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা ও পৃথিবীর আকার

অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমা

পৃথিবীর কোন স্থানের অবস্থান নির্ণয় করার জন্য অক্ষাংশ এবং দ্রাঘিমার প্রয়োজন হয়। ভূগোলকের গায়ে বিভিন্ন রেখা কল্পনা করে অবস্থান নিরূপণ করা হয়। অক্ষাংশ জানা থাকলে শুধু স্থান নয়, সে স্থানের আবহাওয়াগত বৈশিষ্ট্যও জানা সম্ভব হয়। অন্যদিকে পৃথিবী অভিজগতগোলক ও পরিক্রমণশীল হওয়ায় সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত একই সময়ে হয় না। সে কারণে অঞ্চলগত সময়ের ব্যবধান হয়ে থাকে। মূলত দ্রাঘিমার পার্থক্যের জন্যই সময়ের পার্থক্য ঘটে থাকে।

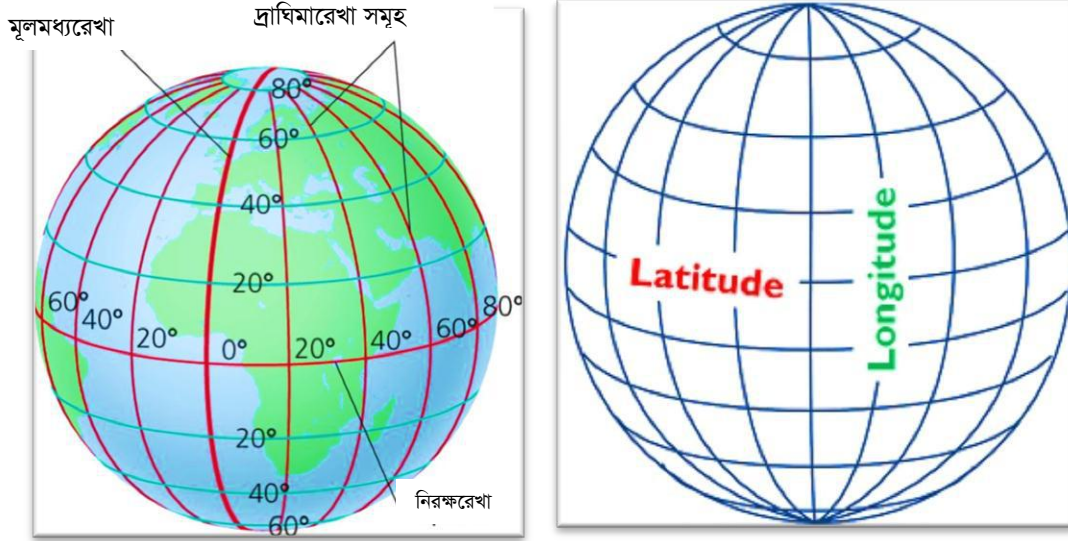
অক্ষাংশ (Latitude)

নিরক্ষরেখা হতে উত্তর বা দক্ষিণে কোন স্থানের কৌণিক দূরত্বকে সে স্থানের অক্ষাংশ বলা হয়। ভূপৃষ্ঠের কোন স্থান থেকে পৃথিবীর কেন্দ্র পর্যন্ত যদি কোন সরলরেখা টানা যায় তাহলে ঐ রেখা নিরক্ষীয় তলের সঙ্গে যে কোণ (angle) তৈরি করবে সে কোণই হবে ঐ স্থানের অক্ষাংশ (Latitude)। নিরক্ষরেখার অক্ষাংশকে শূন্য ডিগ্রি ধরে সুমেরু ও কুমেরু অক্ষাংশ যথাক্রমে 90° উত্তর ও 90° দক্ষিণ। সমাক্ষরেখাগুলো নিরক্ষরেখার সমান্তরাল বলে একই সমাক্ষরেখায় অবস্থিত বিভিন্ন স্থানের অক্ষাংশ একই। অক্ষাংশকে ডিগ্রি, মিনিট ও সেকেন্ড একক দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

Latitudes are imaginary lines on a globe or map used to measure distance from the equator; Parallel lines running east to west.

পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগে ভূকেন্দ্রকে ছেদ করে উত্তর-দক্ষিণ বরাবর যে রেখা কল্পনা করা হয় তাকে মেরুরেখা বা অক্ষ (axis) বলে। অক্ষের উত্তর প্রান্তবিন্দুকে উত্তরমেরু বা সুমেরু (north pole) এবং দক্ষিণ প্রান্তবিন্দুকে দক্ষিণমেরু বা কুমেরু (south pole) বলে। মেরুদ্বয় হতে সমান দূরত্বে পৃথিবীকে পূর্ব-পশ্চিমে বেঁটন করে একটি রেখা কল্পনা করা হয়েছে। এ রেখাকে বলা হয় নিরক্ষরেখা বা বিষুবরেখা (Equator)।

নিরক্ষরেখা উত্তর-দক্ষিণে পৃথিবীকে সমান দুটি ভাগে ভাগ করেছে। উত্তর ভাগের নাম উত্তর গোলার্ধ এবং দক্ষিণ ভাগের নাম দক্ষিণ গোলার্ধ। পৃথিবীর কৌণিক মাপ 360° এবং কিলোমিটার হিসেবে এর দৈর্ঘ্য প্রায় ৪০,০০০ কিলোমিটার। সুতরাং 1° অক্ষাংশ পরিমিত স্থান প্রায় ১১১.১ কিলোমিটার হয়। সাধারণভাবে অক্ষরেখাগুলো পরস্পরের সমান্তরাল বলে অক্ষরেখাগুলোর প্রত্যেকটি একে অপরের থেকে প্রায় ১১১.১ কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত। তবে পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ মেরু প্রদেশে কিছুটা চাপা বলে সেখানে 1° অক্ষাংশের রৈখিক ব্যবধান ১১১ কিলোমিটার ধরা হয়। প্রতি ডিগ্রি অক্ষাংশকে ৬০ মিনিট এবং প্রতি মিনিট অক্ষাংশকে ৬০ সেকেন্ডে ভাগ করা হয়। প্রতি মিনিট অক্ষাংশ গড়ে ১,৮৫৩ মিটারের সমান এবং প্রতি সেকেন্ডে অক্ষাংশ গড়ে প্রায় ৩১ মিটারের সমান।



চিত্র-৩.১: অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমা

অক্ষরেখার বৈশিষ্ট্যাবলি (Characteristics of Latitude)

১. অক্ষরেখাগুলো পরস্পরের সমান্তরাল হওয়ায় যে কোন দুটো অক্ষরেখার মধ্যবর্তী দূরত্ব সব সময় সমান হয়।
২. প্রতিটি অক্ষরেখা নিরক্ষরেখার সমান্তরালভাবে অবস্থিত, এজন্য একই অক্ষরেখায় অবস্থিত যে কোন স্থান হতে নিরক্ষরেখার দূরত্ব সব সময় সমান।
৩. অক্ষরেখাগুলোর পরিধি নিরক্ষরেখা হতে মেরুবিন্দুদ্বয়ের দিকে ক্রমশ ছোট হতে হতে শেষে বিন্দুতে পরিণত হয়। এ কারণে অক্ষরেখাগুলোর পরিধি সর্বত্র সমান নয়।
৪. নিরক্ষরেখা নিজেও একটি অক্ষরেখা, পৃথিবীর ঠিক মধ্যস্থান ঘিরে আছে বলে নিরক্ষরেখার পরিধি সর্ববৃহৎ। অনুরূপভাবে মেরু অঞ্চলে পরিধি সর্বনিম্ন।
৫. অক্ষরেখাগুলো পূর্ব-পশ্চিমে পৃথিবীকে বেষ্টিত করে আছে। তাই অক্ষরেখাগুলোর সবখানে একই সময়ে সূর্যোদয়, মধ্যাহ্ন ও সূর্যাস্ত হয় না।
৬. একই অক্ষরেখায় অবস্থিত বিভিন্ন স্থানের দিন-রাত্রির দৈর্ঘ্য এবং জলবায়ু প্রায় একই রকম হয়।

অক্ষাংশের কাজ (Functions of Latitude)

১. অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমা সাহায্যে ভূপৃষ্ঠের কোন স্থানের অবস্থান সঠিকভাবে জানা যায়। একই অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমা বিশিষ্ট স্থান ভূপৃষ্ঠে কেবল একটিই হতে পারে।
২. অক্ষাংশ দ্বারা তাপমাত্রার পরিমাপ জানা যায়। নিরক্ষরেখা হতে ক্রমশ উত্তর ও দক্ষিণে তাপ হ্রাস পায়। একই অক্ষরেখায় অবস্থিত বিভিন্ন স্থানের তাপমাত্রা সাধারণত একই হয়।
৩. অকূল সমুদ্রে বিপদাপন্ন জাহাজ বেতারের সাহায্যে তার অবস্থানের অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমা জানিয়ে দিলে সহজেই তার সাহায্যের ব্যবস্থা করা যায়।

প্রধান কিছু অক্ষরেখা

- নিরক্ষরেখা বা বিষুবরেখা: 0° ধরা হয়;
- কর্কটক্রান্তি রেখা: উত্তর গোলার্ধের 23.5° উত্তর অক্ষরেখা;
- মকরক্রান্তি রেখা: দক্ষিণ গোলার্ধের 23.5° দক্ষিণ অক্ষরেখা;
- সুমেরু বৃত্ত: উত্তর গোলার্ধের 66.5° উত্তর অক্ষরেখা;
- কুমেরু বৃত্ত: দক্ষিণ গোলার্ধের 66.5° দক্ষিণ অক্ষরেখা।

অক্ষাংশ নির্ণয় পদ্ধতি

সাধারণত ৫টি পদ্ধতিতে অক্ষাংশ নির্ণয় করা যায়। যথা-

১. প্রবতারার সাহায্যে
২. হ্যাডলির অকট্যান্ট নক্ষত্রের সাহায্যে
৩. সূর্যের উন্নতির সাহায্যে
৪. সেক্সট্যান্ট যন্ত্রের সাহায্যে
৫. ঝুঁটির সাহায্যে

১. প্রবতারার সাহায্যে: উত্তর গোলার্ধের যে কোন স্থান হতে প্রতি রাতে উত্তর আকাশে একটি নির্দিষ্ট স্থানে প্রবতারা দেখা যায়। তবে এ গোলার্ধের সব জায়গা হতে প্রবতারা আকাশে দিগন্ত হতে সমান উচ্চতায় দেখা যায় না। স্থানভেদে এ উচ্চতার পার্থক্য হয়। বিষুবরেখা হতে প্রবতারাটি ঠিক দিগন্তরেখায় অবস্থান করে। নিরক্ষরেখায় প্রবতারার উন্নতি 0° ধরা হয়। তবে নিরক্ষরেখা হতে সুমেরুর দিকে প্রতি 1° অগ্রসর হলে প্রবতারার উন্নতিও 1° করে বেড়ে যায়। সুমেরুতে প্রবতারাকে ঠিক মাথার ওপর দেখা যায়। তাই সুমেরুতে প্রবতারার উন্নতি 90° ধরা হয়। অর্থাৎ নিরক্ষরেখা যতই উত্তরে যাওয়া যায় অক্ষাংশ ততই বৃদ্ধি পায়। সুতরাং উত্তর গোলার্ধের কোন স্থানের অক্ষাংশ প্রবতারার উন্নতির সমান হয়। এ ক্ষেত্রে প্রবতারার উন্নতি জানতে পারলে অতি সহজে অক্ষাংশ নিরূপণ করা যায়। তবে এ পদ্ধতি দিনের বেলা বা দক্ষিণ গোলার্ধের জন্য প্রযোজ্য নয়।

২. হ্যাডলির অকট্যান্ট নক্ষত্রের সাহায্যে: দক্ষিণ গোলার্ধ প্রবতারা দেখা যায় না। তবে কুমেরুবিন্দু বরাবর দক্ষিণ গোলার্ধের আকাশে হ্যাডলির অকট্যান্ট নামে একটি নক্ষত্র দেখা যায়। দক্ষিণ গোলার্ধের কোন স্থানের অবস্থান নির্ণয় করার সময় এ নক্ষত্রের সাহায্য নেয়া হয়। তবে এ ক্ষেত্রেও একই পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়।

৩. সূর্যের উন্নতির সাহায্যে: উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধে দিনের বেলায় সূর্যের উন্নতির সাহায্যে যে কোন স্থানের অক্ষাংশ নির্ণয় করা যায়। এ ক্ষেত্রে একটি সূত্র ব্যবহার করা হয়।

সূত্র: অক্ষাংশ = 90° - মধ্যাহ্ন সূর্যের উন্নতি $\pm$ বিষুবলম্ব।

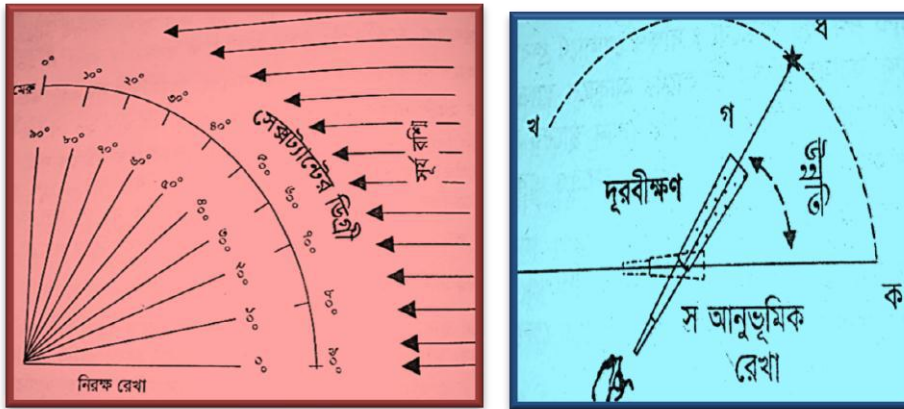
সূর্যের বিষুবলম্ব বলতে সূর্য যে দিন যে অক্ষাংশের ওপর লম্বভাবে কিরণ দেয় তাকে বোঝায়। পৃথিবীর বার্ষিক গতি জন্য সূর্যের আপাত পরিক্রমণ পথ বিষুবরেখা হতে 23.5° উত্তর অক্ষাংশ বা কর্কটক্রান্তি রেখা (Tropic of Cancer) ও 23.5° দক্ষিণ অক্ষাংশ বা মকরক্রান্তি রেখা (Tropic of Capricorn)। এ কারণেই সূর্যের বিষুবলম্ব 23.5° উত্তর অক্ষাংশ হতে 23.5° দক্ষিণ অক্ষাংশ পর্যন্ত হয়। ২১ মার্চ হতে ২৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সূর্যের বিষুবলম্ব উত্তরে এবং ২৩ সেপ্টেম্বর হতে ২১ মার্চ পর্যন্ত সূর্যের বিষুবলম্ব দক্ষিণে হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ২১ জুন তারিখে কর্কটক্রান্তির ওপর সূর্য লম্বভাবে কিরণ দেয়। সুতরাং ২১ শে জুন তারিখে সূর্যের বিষুবলম্ব 23.5° উত্তরে। এভাবে ২৩ সেপ্টেম্বর বিষুব লম্ব 0° এবং ২১ ডিসেম্বর তারিখের বিষুবলম্ব 23.5° দক্ষিণ।

এক্ষেত্রে স্থানটি যদি উত্তর গোলার্ধে হয়, তবে উত্তরবাচক বিষুবলম্ব যোগ করতে হবে এবং দক্ষিণবাচক বিষুবলম্ব বিয়োগ করতে হবে। $\pm$ চিহ্ন দ্বারা এটি বোঝান হয়েছে। এ সূত্র অনুসারে উত্তর গোলার্ধে কোনদিন মধ্যাহ্ন সূর্যের উন্নতি 80° থাকলে এবং সেদিনের বিষুবলম্ব 20° উত্তর হলে সে স্থানের অক্ষাংশ $90^\circ - 80^\circ + 20^\circ = 90^\circ$ উত্তর হবে। এভাবে দক্ষিণ গোলার্ধের কোন স্থানের অক্ষাংশও নিরূপণ করা হয়। তবে এ ক্ষেত্রে সূর্যের উন্নতির সাথে উত্তর বিষুবলম্ব বিয়োগ ও দক্ষিণ বিষুবলম্ব যোগ করতে হবে।

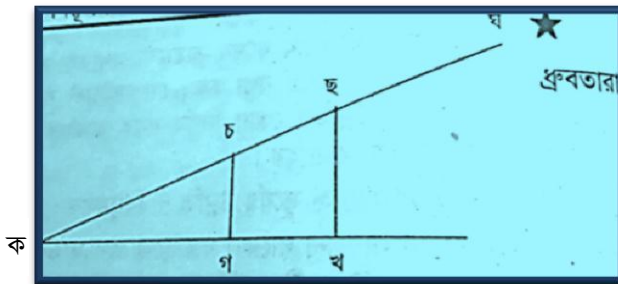
৪. সেক্সট্যান্ট যন্ত্রের সাহায্যে: যে যন্ত্রের সাহায্যে সূর্যের উন্নতি পরিমাপ করা হয়, তাকে সেক্সট্যান্ট যন্ত্র বলা হয়। সেক্সট্যান্ট যন্ত্রের সহায়তায় উত্তর গোলার্ধে মধ্যাহ্ন সূর্যের উন্নতির কোণ নির্ণয় করে অক্ষাংশ নির্ণয় করা যায়। এ ক্ষেত্রে একটি সূত্র ব্যবহার করা হয়।

সূত্র: অক্ষাংশ = 90° - মধ্যাহ্ন সূর্যের উন্নতি $\pm$ বিষুবলম্ব

এ যন্ত্রে একটি দূরবীক্ষণ লাগানো থাকে। যন্ত্রটিকে প্রথমে উত্তরমুখী করে ভূমিতলের সাথে আনুভূমিক করে এটিকে ধীর গতিতে ওপরমুখী তোলা হয়, যেন এ যন্ত্রের মধ্য দিয়ে প্রবতরাকে দেখা যায়।



চিত্র-৩.২: সেক্সট্যান্ট যন্ত্রের সাহায্যে অক্ষাংশ নির্ণয়



চিত্র-৩.৩: খুঁটির সাহায্যে অক্ষাংশ নির্ণয়

৫. **খুঁটির সাহায্যে:** উত্তর গোলাার্ধের কোন সমতল স্থানের ওপর একটি খুঁটি পুঁতে সে স্থানের অক্ষাংশ নিরূপণ করা যায়। যেমন- উত্তর গোলাার্ধের একটি সমতল স্থানের ওপর খ হু নামক একটি খুঁটি লম্বভাবে পোঁতা হলো। এবার তার বাম দিকে অল্প দূরত্বে আর একটি খুঁটি গ চ লম্বভাবে পোঁতা হলো। এ ক্ষেত্রে একটা মাপ থাকবে, যেন খুঁটিদ্বয়ের বাম পাশে দাঁড়িয়ে তাদের মাথা বরাবর একটি কল্পিত সরলরেখাকে উত্তর দিকে বাড়িয়ে দিলে তার শেষ প্রান্তে ধ্রুব নক্ষত্র দেখা যায়। উল্লেখ্য যে, এ উপায়ে মধ্যাহ্ন সূর্যের উন্নতিও লক্ষ্য করা সম্ভব। ওপরের চিত্র গ চ ও খ হু নামক দুটি খুঁটি। এখানে চ হু রেখার নিচু অংশ গ খ রেখার বামদিকের অংশের সাথে ক বিন্দুতে মিলিত হয়েছে। এভাবে ক বিন্দুতে $< চ ক গ$ বা $< হু ক খ$ দুটি কোণ উৎপন্ন করেছে। যে কোণ উৎপন্ন হলো সেটি ক চিহ্নিত স্থান হতে ধ্রুব নক্ষত্রের উন্নতি।

দ্রাঘিমা রেখা (Longitude)

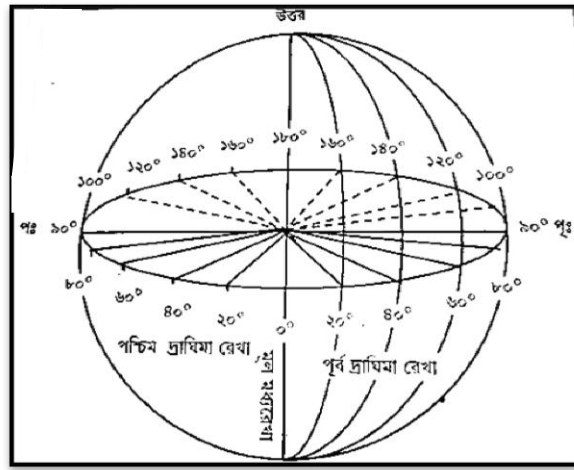
গ্রিনিচের মূল মধ্যরেখা হতে পূর্ব বা পশ্চিমে কোন স্থানের কৌণিক দূরত্বকে সে স্থানের দ্রাঘিমা বলে। নিম্নরেখার উপর এ কৌণিক দূরত্বের মাপ নেয়া হয়। পূর্ব দিকের কৌণিক দূরত্বকে পূর্ব দ্রাঘিমা এবং পশ্চিম দিকের কৌণিক দূরত্বকে পশ্চিম দ্রাঘিমা বলে।

Longitude is imaginary lines on a globe or map used to measure distance from the Prime Meridian.

তিনিচের মূল মধ্যরেখার দ্রাঘিমা 0° ধরা হয়। এখান থেকে এক ডিগ্রি অন্তর পশ্চিমে ১৮০টি ও পূর্বে ১৮০টি দ্রাঘিমা রেখা কল্পনা করা হয়। নিরক্ষরেখা ও মূলমধ্যরেখা যেখানে পরস্পরকে লম্বভাবে ছেদ করে সেখানে অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমা উভয়েই 0° । এ স্থানটি গিনি উপসাগরে অবস্থিত। পৃথিবী সর্বত্র পশ্চিম হতে পূর্ব দিকে আবর্তন করছে। এ কারণে পূর্বে অবস্থিত স্থানগুলোর সময় বেশি হতে দেখা যায়। দ্রাঘিমার কারণে সময়ের পার্থক্য হয়ে থাকে। সমাক্ষরেখা হতে পূর্ব বা পশ্চিমের অবস্থান জানার জন্য ভূপৃষ্ঠে দুই মেরুকে সংযুক্ত করে উত্তর-দক্ষিণে অনেকগুলো রেখা কল্পনা করা হয়। রেখাগুলো বিষুবরেখাকে লম্বভাবে ছেদ

করেছে। রেখাগুলোকে ডিগ্রি, মিনিট ও সেকেন্ডে বিভক্ত করা হয়েছে। এ রেখাগুলোকে দ্রাঘিমা রেখা বলে। এ রেখাগুলো পৃথিবীর পরিধির অর্ধেকের সমান এবং অর্ধবৃত্ত বলা হয়। এ রেখাগুলোর মধ্যে যে রেখাটি লন্ডনের গ্রিনিচ শহরের জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কিত মানমন্দিরের ওপর দিয়ে অতিক্রম করেছে তাকে মূলমধ্যরেখা বলে (Prime Meridian)। এ মূল মধ্যরেখা হতে পূর্ব বা পশ্চিমে কোন স্থানের কৌণিক দূরত্বকে সে স্থানের দ্রাঘিমা বলে। গ্রিনিচের দ্রাঘিমা 0° ধরে পৃথিবীর পরিধিকে মূল মধ্যরেখার এক ডিগ্রি অন্তর অন্তর পূর্বে ১৮০টি এবং পশ্চিমে ১৮০টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। কিন্তু পৃথিবী গোলাকার হওয়ায় 180° পূর্ব দ্রাঘিমা রেখা ও 180° পশ্চিম দ্রাঘিমা রেখা প্রকৃত পক্ষে একই দ্রাঘিমা রেখা হিসেবে বিবেচিত।

অক্ষাংশের মত প্রতি ডিগ্রি দ্রাঘিমাকে মিনিট এবং সেকেন্ডে ভাগ করা হয়। দ্রাঘিমা রেখাগুলো পরস্পর সমান, তবে সমান্তরাল নয়। দুই দ্রাঘিমা রেখার মধ্যবর্তী ব্যবধান নিক্ষেপে হতে উত্তর-দক্ষিণে ক্রমশ কম হতে থাকে এবং 90° উত্তর অক্ষাংশে ও 90° দক্ষিণ অক্ষাংশে পৌঁছে একেবারে মেরু বিন্দুতে মিশেছে। নিক্ষেপের ওপর 1° দ্রাঘিমার রৈখিক দূরত্ব প্রায় ১১১.২৬ কিলোমিটার; 30° উত্তর ও দক্ষিণ অক্ষাংশে ৯৬.৪৪ কিলোমিটার; 60° উত্তর ও দক্ষিণ অক্ষাংশে ৫৬ কিলোমিটার এবং 80° উত্তর ও দক্ষিণ অক্ষাংশে ১৯.৩৮ কিলোমিটার।



চিত্র-৩.৪: দ্রাঘিমা রেখা

দ্রাঘিমা রেখার বৈশিষ্ট্যাবলি (Characteristics of Longitude)

১. দ্রাঘিমা রেখাগুলোর পরিধি সর্বত্র সমান।
২. দ্রাঘিমা রেখাগুলো পরস্পর সমান্তরাল নয়।
৩. সর্বাধিক দ্রাঘিমা রেখার মান 180° ।
৪. দ্রাঘিমা রেখাগুলোর মান মূলমধ্যরেখার পূর্ব ও পশ্চিম বাড়ে।
৫. প্রতিটি দ্রাঘিমা রেখা প্রতিটি অক্ষরেখাকে লম্বা লম্বিভাবে ছেদ করেছে।

দ্রাঘিমা নির্ণয়

১. সময়ের পার্থক্য অনুসারে: প্রতি ৪ মিনিট সময়ের জন্য দ্রাঘিমার পার্থক্য 1° । কোন একটি স্থানের সময় ও দ্রাঘিমা জানা থাকলে সে স্থানের সাথে অন্য স্থানের সময়ের পার্থক্য নিয়ে স্থানটির দ্রাঘিমা নির্ণয় করা যায়।

২. গ্রিনিচের সময় দ্বারা: গ্রিনিচের দ্রাঘিমা 0° কল্পনা করা হয়েছে। সুতরাং গ্রিনিচের সময় অনুসারে অন্য স্থানটির দ্রাঘিমা নির্ণয় করা হয়। গ্রিনিচের পূর্ব দিকে অবস্থিত দেশগুলোর সময় গ্রিনিচের চেয়ে এগিয়ে থাকে এবং গ্রিনিচের পশ্চিমে অবস্থিত দেশগুলোর সময় গ্রিনিচের সময়ের থেকে কম হয়। গ্রিনিচে যখন বেলা ১২টা তখন অন্য কোন স্থানে যদি সন্ধ্যা ৬টা হয় তবে প্রমাণিত হবে যে, ঐ স্থানটি গ্রিনিচের পূর্বে এবং দ্রাঘিমা হবে $(15 \times 6 = 90^\circ)$ বা 90° পূর্ব। আবার গ্রিনিচে যখন বেলা ১২টা তখন কোন স্থানের সময় যদি সকাল ৫টা হয় তাহলে বোঝা যাবে স্থানটি গ্রিনিচের পশ্চিমে অবস্থিত। স্থানটির সময়ের পার্থক্য ৭ ঘণ্টা হওয়ায় দ্রাঘিমা হবে $15 \times 7 = 105^\circ$ পশ্চিম।

দ্রাঘিমারেখার কাজ

১. অবস্থান নির্ণয়: দ্রাঘিমার দ্বারা (অক্ষাংশের সাহায্যে) ভূপৃষ্ঠের কোন স্থানের অবস্থান সঠিকভাবে জানা যায়। যেমন- কোন স্থানের অক্ষাংশ 25° উত্তর ও দ্রাঘিমা 35° পূর্ব বলা হলে বোঝা যাবে যে, ঐ স্থানটি 25° উত্তর সমাক্ষরেখা ও 35° পূর্ব দ্রাঘিমার সংযোগস্থলে অবস্থিত।

২. স্থানীয় সময় নির্ধারণ: একই দ্রাঘিমায় অবস্থিত বিভিন্ন দেশের স্থানীয় সময় একই। এ ছাড়া দ্রাঘিমান্তর থেকে দুটি দেশের সময়ের পার্থক্য জানা যায়।

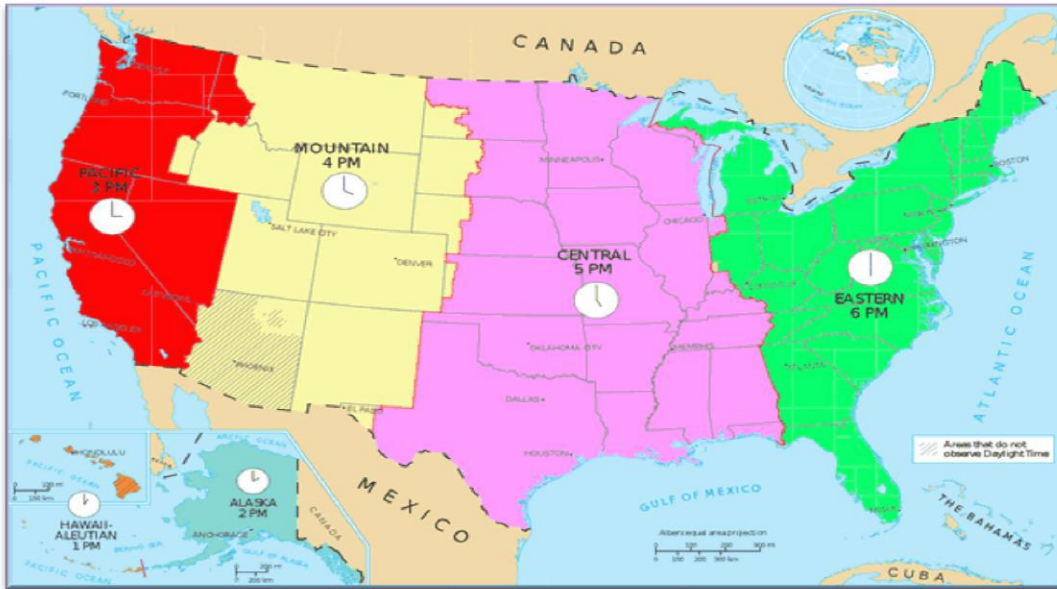
৩. বিপদাপন্ন জাহাজকে সাহায্যে প্রদান: অকূল সমুদ্রে বিপদাপন্ন জাহাজ বেতারের সাহায্যে তার অবস্থানগত অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমা জানালে সহজেই তার অবস্থান জেনে সাহায্য পাঠানো যায়।

স্থানীয় সময় ও প্রমাণ সময় (Local Time and Standard Time)

স্থানীয় সময়: পৃথিবীর পূর্বদিকে অবস্থিত দেশগুলোতে প্রথমে সূর্যোদয় হয়। পৃথিবীর আবর্তনের ফলে কোন স্থানের সূর্য যখন ঠিক মাথার উপরে আসে বা সর্বোচ্চ উচ্চতায় অবস্থান করে তখন সে স্থানে মধ্যাহ্ন এবং ঘড়িতে বেলা ১২টা ধরা হয় এবং এ সময় থেকে দিনের অন্যান্য সময় স্থির করা হয়। এভাবে আকাশে সূর্যের অবস্থান হতে যে সময় স্থির করা হয় তাকে স্থানীয় সময় বলা হয়।

অন্যভাবে বলা যায়, আকাশে সূর্যের উন্নতি লক্ষ্য করে সেক্সট্যান্ট যন্ত্রের সাহায্যে যে সময় নির্ধারণ করা হয় তাকে স্থানীয় সময় বলে। একটি দেশের বিভিন্ন স্থানের দ্রাঘিমা এক নয়। কোন নির্দিষ্ট স্থানের স্থানীয় সময় নির্ণয় করার জন্য ঐ স্থান হতে সূর্যের অবস্থান দেখে করা যায়। এ ছাড়া ঐ দেশের প্রমাণ সময় যে দ্রাঘিমা থেকে করা হয়েছে তা থেকে ঐ নির্দিষ্ট স্থানের দ্রাঘিমা বাদ দিলেও প্রাপ্ত দ্রাঘিমার ভিত্তিতে স্থানীয় সময় নির্ধারণ করা যায়। 1° দ্রাঘিমার জন্য সময়ের ব্যবধান ৪ মিনিট এবং 1 মিনিট দ্রাঘিমার জন্য ৪ সেকেন্ড।

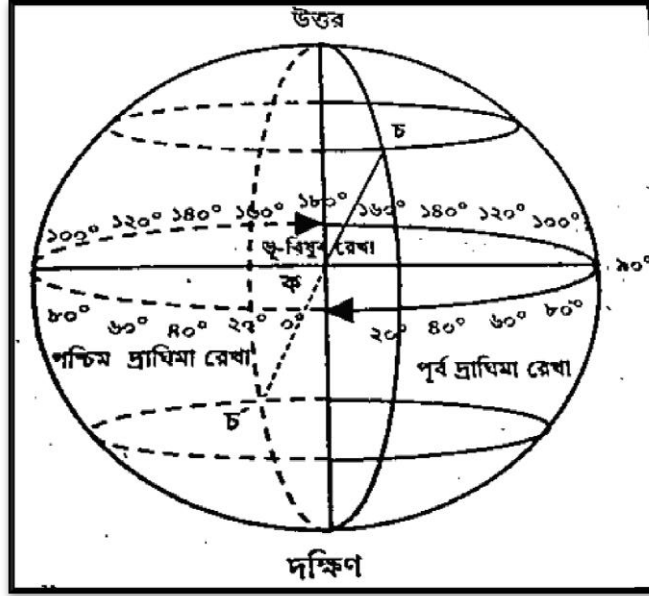
প্রমাণ সময়: একই দ্রাঘিমায় অবস্থিত সব স্থানে একই সময় মধ্যাহ্ন হয়; সুতরাং তাদের স্থানীয় সময় এক। কিন্তু একই অক্ষরেখায় অবস্থিত বিভিন্ন স্থানের স্থানীয় সময় এক হয়না। ফলে সময়ের বিভ্রাট দেখা দেয়। সেজন্য প্রত্যেক দেশেই একটি করে প্রমাণ সময় নির্ণয় করা হয়। প্রত্যেক দেশেই সেই দেশের মধ্যভাগের কোন স্থানের দ্রাঘিমারেখা অনুযায়ী যে সময় নির্ণয় করা হয় সে সময়কে ঐ দেশের প্রমাণ সময় বলে। যেমন- বাংলাদেশের প্রমাণ সময় 90° পূর্ব দ্রাঘিমায় ধরা হয় এবং তা গ্রিনিচ সময় অপেক্ষা ৬ ঘণ্টা বেশি। প্রমাণ সময় কোন দেশের একটি দ্রাঘিমাকে ঠিক করে নির্ধারণ করা হয়। বৃহৎ দেশসমূহে তাদের কয়েকটি স্থানীয় সময়কে প্রমাণ সময় হিসেবে ধরা হয়। যেমন- যুক্তরাষ্ট্রে 95° , 90° , 150° , ও 120° পশ্চিম দ্রাঘিমা। এদের স্থানীয় সময়কে চারটি প্রমাণ সময় ধরা হয়।



চিত্র-৩.৫: যুক্তরাষ্ট্রের একাধিক প্রমাণ সময়

প্রতিপাদ স্থান (Antipod)

ভূপৃষ্ঠের কোন বিন্দুর ঠিক বিপরীত বিন্দুকে প্রথম বিন্দুর প্রতিপাদ স্থান বলে। ভূপৃষ্ঠস্থ কোন বিন্দু থেকে পৃথিবীর কোন কল্পিত ব্যাস ভূকেন্দ্র ভেদ করে অপর দিকে ভূপৃষ্ঠকে যে বিন্দুতে স্পর্শ করে, তাকে সেই বিন্দুর প্রতিপাদ স্থান বলে। ঢাকার প্রতিপাদ স্থান দক্ষিণ আমেরিকার চিলির নিকট প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত। প্রতিপাদ স্থান দুটির অক্ষাংশের মান সমান হয়। কিন্তু একটি অপরটির বিপরীত গোলাধারে অবস্থিত। একটি স্থানের অক্ষাংশ ৬০° উত্তর হলে তার প্রতিপাদ স্থানের অক্ষাংশ ৬০° দক্ষিণ হবে।



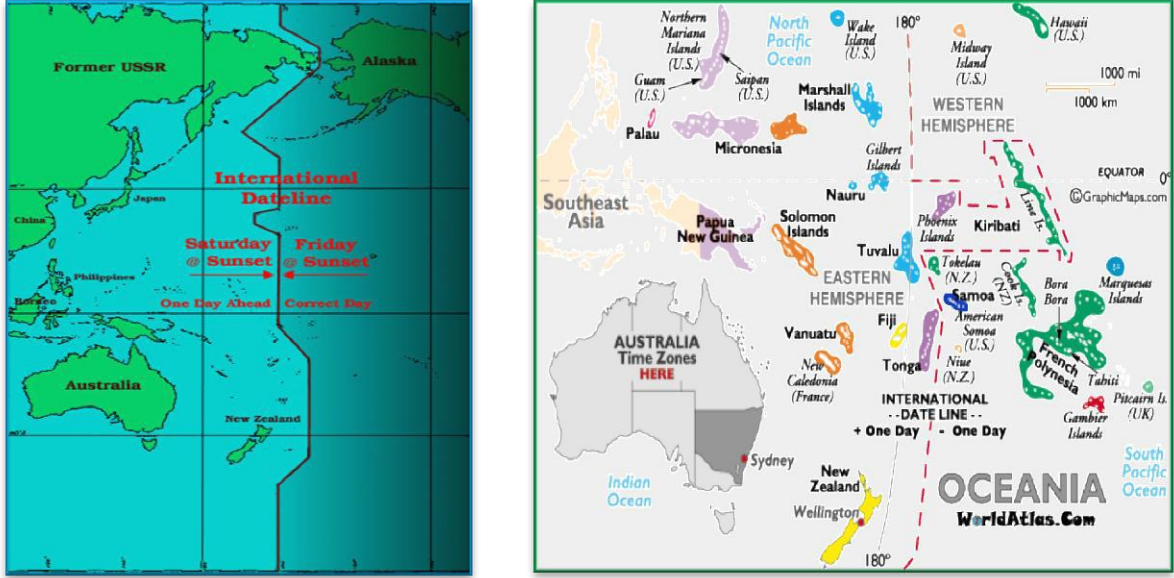
চিত্র-৩.৬: প্রতিপাদ স্থান

আন্তর্জাতিক তারিখরেখা (International Date Line)

দ্রাঘিমা রেখার পরিবর্তনের সাথে স্থানীয় সময়ের যে পরিবর্তন হয়, তাতে দীর্ঘ পথ ভ্রমণ করার সময় বা ভূপ্রদক্ষিণ করার সময় স্থানীয় সময়ের পার্থক্য এবং দিনের হিসেবের অসুবিধা হয়ে থাকে। এ সমস্যা প্রকট হয় যখন কোন নির্দিষ্ট স্থান হতে কোন বিমান/সমুদ্রগামী জাহাজ পূর্ব বা পশ্চিম দিকে ১৮০° দ্রাঘিমা রেখা অতিক্রম করে। এ সমস্যা সমাধানের জন্য ১৮০° দ্রাঘিমা রেখাকে অবলম্বন করে জলভাগের ওপর দিয়ে উত্তর-দক্ষিণে প্রসারিত একটি রেখা কল্পনা করা হয়। কাল্পনিক এ রেখাকে আন্তর্জাতিক তারিখরেখা (International Date Line সংক্ষেপে (IDL) বলে। উল্লেখ্য যে, উত্তর-দক্ষিণ দিকে ভ্রমণ করলে সময় বা দিনের কোন রকম অসুবিধা হয় না। কিন্তু পূর্ব-পশ্চিম দিকে ভ্রমণ করলে সময় বা দিন গণনায় অসুবিধা হয়।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, গ্রিনিচ হতে কোন জাহাজ যদি সোমবার সকাল ৯টায় যাত্রা আরম্ভ করে পূর্ব দিকে যেতে থাকে এবং যদি আর একটি জাহাজ একই গতিতে পশ্চিম দিকে যেতে থাকে, তবে পূর্বগামী জাহাজ লক্ষ্য করবে যে প্রতি 1° দ্রাঘিমা অন্তর স্থানীয় সময় ৪ মিনিট করে বেশি হচ্ছে এবং ঐ জাহাজ যখন ১৮০° পূর্ব দ্রাঘিমা পৌঁছবে তখন সেই স্থানের সময় হবে ১২ ঘণ্টা বেশি অর্থাৎ সেখানে তখন সময় হবে সোমবার রাত ৯টা। কিন্তু পশ্চিমগামী জাহাজ লক্ষ্য করবে যে, প্রতি 1° দ্রাঘিমান্তর স্থানীয় সময় ৪ মিনিট করে কমে যায় এবং ঐ জাহাজ ১৮০° পশ্চিম দ্রাঘিমা পৌঁছালে দেখা যাবে স্থানীয় সময় ১২ ঘণ্টা কম অর্থাৎ সেখানে সময় হবে রবিবার রাত ৯টা। প্রকৃতপক্ষে ১৮০° পূর্ব দ্রাঘিমা ও ১৮০° পশ্চিম দ্রাঘিমা মূলত একই দ্রাঘিমা রেখা। সুতরাং একই স্থানে একই সময়ে একটি জাহাজের ঘড়িতে স্থানীয় সময় হবে সোমবার রাত ৯টা, অন্যটিতে রবিবার রাত ৯টা অর্থাৎ ১ দিন বা ২৪ ঘণ্টা সময়ের পার্থক্য হবে যা অসম্ভব। এ অসুবিধা দূর করার জন্য ১৮০° দ্রাঘিমা রেখাকে আন্তর্জাতিক তারিখরেখা ধরা হয়েছে এবং জলভাগের ওপর দিয়ে কল্পনা করা হয়েছে। পশ্চিমগামী জাহাজ এ রেখা অতিক্রম করলে তার সময়ের সাথে ১ দিন যোগ করে এবং পূর্বগামী জাহাজ তার সময় হতে ১ দিন বাদ দিয়ে স্থানীয় সময়ের সাথে মিল রাখে। ১৮০° দ্রাঘিমা রেখা সাইবেরিয়ার উত্তর-পূর্ব অংশ অ্যালিউসিয়ান, ফিজি, চ্যাথাম দীপপুঞ্জের ওপর দিয়ে গিয়েছে। ফলে

এসব স্থানের এক অংশের অধিবাসীদের হিসেবে যখন রবিবার তখন অন্য অংশের লোকদের হিসেবে হবে সোমবার। স্থানীয় অধিবাসীদের বারের এ অসুবিধা দূর করার জন্য আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা অ্যালিউসিয়ান দীপপুঞ্জের কাছে 9° পশ্চিম এবং ফিজি ও চ্যাথাম দীপপুঞ্জের কাছে 11° পূর্বে বেকে গিয়েছে।



চিত্র-৩.৭: আন্তর্জাতিক তারিখরেখা

আন্তর্জাতিক তারিখরেখার প্রয়োজনীয়তা (Necessity of International Date Line)

1° দ্রাঘিমার পার্থক্যের জন্য সময়ের ব্যবধান হয় ৪ মিনিট। তাই 180° দ্রাঘিমার পার্থক্যের জন্য সময়ের ব্যবধান হয় ১২ ঘণ্টা। গ্রিনিচের মূল মধ্যরেখায় যখন সোমবার সকাল ১০টা তখন 180° পূর্ব দ্রাঘিমায় সোমবার রাত্রি ১০টা এবং 180° পশ্চিম দ্রাঘিমায় রবিবার রাত্রি ১০টা। কিন্তু 180° পূর্ব ও 180° পশ্চিম দ্রাঘিমা মূলত একই রেখা। একই দ্রাঘিমায় সময়ের পার্থক্য ২৪ ঘণ্টা হয়ে থাকে কিন্তু যুক্তিসংগতভাবে এটা হতে পারেনা। এ অসুবিধা দূর করার জন্য পৃথিবীর সকল জাতি সম্মিলিতভাবে প্রশান্ত মহাসাগরের জলভাগের উপর মানচিত্রের 180° দ্রাঘিমাকে অবলম্বন করে একটি রেখা কল্পনা করা হয়েছে যা আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা নামে পরিচিত। এ রেখা অতিক্রম করলে দিন ও তারিখের পরিবর্তন হয় বলে এ রেখাকে আন্তর্জাতিক তারিখরেখা বলে।

দেশ-বিদেশগামী জাহাজসহ যাত্রীদের জন্য স্থানীয় সময়ের সাথে আন্তর্জাতিক সময়ের মিল রাখার জন্য এ রেখার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। গ্রিনিচ থেকে পূর্ব দিকে গমনকারী কোন বিমান বা জাহাজের নাবিকেরা এ রেখা অতিক্রম করলে একদিন পিছিয়ে বা বিয়োগ করেন এবং পশ্চিমগামী জাহাজের নাবিকেরা একদিন যোগ করেন। ফলে স্থানীয় সময়ের সাথে সামঞ্জস্য থাকে। দ্রাঘিমা ও সময় গাণিতিক পদ্ধতিতে নির্ণয় করা যায়।

পৃথিবীর আকার (Shape of the Earth)

আপাতদৃষ্টিতে ভূপৃষ্ঠকে সমতল মনে হলেও পৃথিবীর আকার প্রকৃতপক্ষে গোলায়। এর কারণ কোন বৃহৎ বস্তুর অংশ বিশেষ হতে তার আকার সঠিকভাবে বোঝা যায় না। আয়তনের তুলনায় পৃথিবীর অতিক্ষুদ্র অংশকেই আমরা এক সঙ্গে দেখতে পাই এবং তা সরল রেখার মত সমতল দেখায়। এ কারণে প্রাচীনকালে লোকদের ধারণা ছিল, পৃথিবী সমতল এবং এর প্রান্ত রয়েছে। বর্তমানে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, পৃথিবীর আকার অনেকটা গোল।

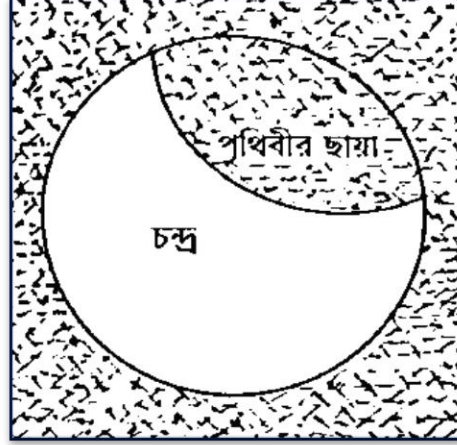
পৃথিবীর গোলকত্বের প্রমাণ

পৃথিবী যে গোলায় বা গোল তা নিম্নের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সহজেই প্রমাণ করা যায়। যথা-

১. দূরবীক্ষণ যন্ত্রের দ্বারা: শক্তিশালী দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে আকাশে সকল জ্যোতিষ্কে গোলায় দেখায়। পৃথিবী ও একটি জ্যোতিষ্ক। তাই এর আকার গোলায় হওয়ায় স্বাভাবিক।

২. একই দিকে যাত্রাকরে: পৃথিবীর যে কোন স্থান হতে যে কোন একটি নির্দিষ্ট দিকে ক্রমাগত জাহাজ বা এরোপ্লেনে চড়ে একই দিকে ভ্রমণ করলে পুনরায় যাত্রা স্থানে ফিরে আসতে হয়। কুক, ম্যাগিল্যান, ড্রেক প্রমুখ বহুনাবিক প্রায় একইদিকে ক্রমাগত জাহাজ চালনা করে পুনরায় যাত্রা স্থানে ফিরে এসেছিলেন। পৃথিবী গোলাকার বলে এরূপ হয়েছে। কিন্তু পৃথিবী সমতল হলে দিক পরিবর্তন না করে তারা পুনরায় যাত্রা স্থানে ফিরে আসতে পারতেন না।

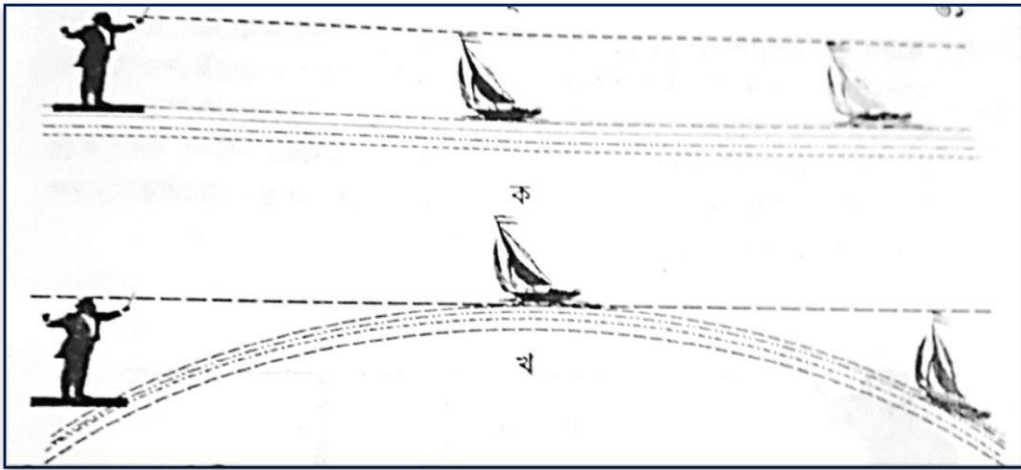
৩. চন্দ্র গ্রহণের সাহায্যে: চন্দ্র পৃথিবীর চতুর্দিকে এবং পৃথিবী চন্দ্রকে নিয়ে সূর্যের চারদিক ভ্রমণ করছে। এভাবে ভ্রমণ করতে করতে কখনও কখনও চন্দ্রের উপর পৃথিবীর ছায়া পড়ে এবং চন্দ্রগ্রহণ হয়। চন্দ্রগ্রহণের সময় পৃথিবীর ছায়ার সীমারেখা গোলাকার দেখা যায়। পৃথিবী গোল না হলে এর ছায়া কখনও গোলাকার হত না।



চিত্র-৩.৮: চন্দ্রগ্রহণের সাহায্যে

৪. দিগন্ত রেখার সাহায্যে: কোন বিস্তীর্ণ প্রান্তরে সমুদ্র বক্ষ থেকে চারদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে মনে হবে যে আকাশ ধীরে ধীরে নীচু হয়ে চক্রাকারে পৃথিবীর সাথে মিলিত হয়েছে। পৃথিবীর আকার গোল হওয়ার কারণে এ রকম মনে হয়। পৃথিবী ও আকাশের এ মিলন স্থলকে দিগন্ত বলে। দিগন্তই ভূপৃষ্ঠে আমাদের দৃষ্টির সীমারেখা।

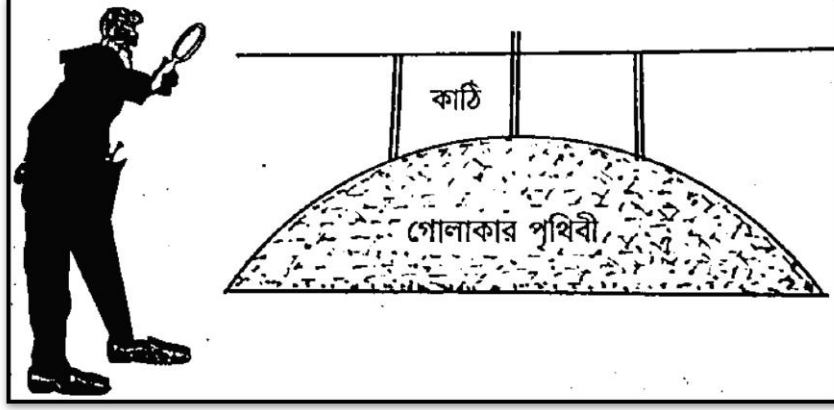
৫. সামুদ্রিক জাহাজের সাহায্যে: দূর সমুদ্র হতে কোন জাহাজ তীরের দিকে আসার সময় প্রথমে তার ধোঁয়া, মাস্তুল ইত্যাদি এবং ক্রমান্বয়ে চোঙ্গা, ছাদ প্রভৃতি দেখা যায়। আবার তীর হতে সমুদ্রে যাওয়ার সময়ে প্রথমে জাহাজের নিচের অংশগুলো এবং ক্রমে ক্রমে মাস্তুল অদৃশ্য হয়। পৃথিবী গোলাকার বলে এর বক্র অংশ আমাদের দৃষ্টিকে আড়াল করে রাখে। সেজন্য আমরা বহু দূর থেকে জাহাজের সকল অংশ এক সময় দেখতে পাইনা। পৃথিবী সমতল হলে দূর হতে জাহাজের সকল অংশ একই সঙ্গে দেখা যেত।



চিত্র-৩.৯: সমুদ্রগামী জাহাজের সাহায্যে পৃথিবীর গোলকত্ব পর্যবেক্ষণ

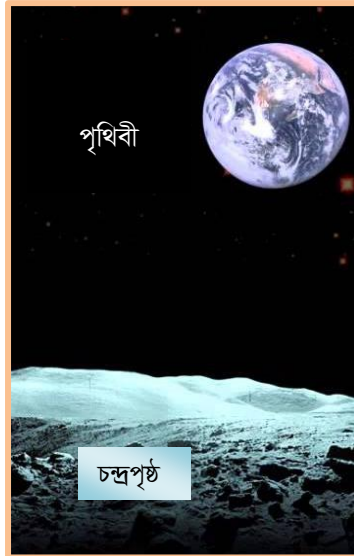
৬. সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সাহায্যে: পূর্বদিকের দেশসমূহে তাদের পশ্চিমে অবস্থিত দেশগুলোর আগে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত হয়। পৃথিবী সমতল হলে সর্বত্র একই সময়ে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত হত।

৭. কাঠখণ্ডের সাহায্যে: ১৮৭০ খ্রিষ্টাব্দে অ্যালফ্রেড রাসেল ওয়ালেস ইংল্যান্ডের বেডফোর্ডের খালের শোতহীন পানির উপর এক মাইল পর পর একই সরল রেখায় ভাসিয়ে রাখা সমান দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট ৩টি কাঠখণ্ডের সাহায্যে পৃথিবীর গোলত্বের প্রমাণ করেছিলেন। দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পৃথিবীর গোলকত্বের প্রমাণ করেছিলেন। দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে তিনি ভাসমান কাঠখণ্ড ৩টিকে লক্ষ্য করে দেখলেন যে, মধ্যবর্তী কাঠখণ্ডটির মাথা সামান্য উঁচুতে আছে। পৃথিবীর সমতল হলে কাঠখণ্ডগুলো একই সরলরেখায় দেখা যেত।



চিত্র-৩.১০: কাঠখণ্ডের সাহায্যে পৃথিবীর গোলত্বের প্রমাণ

৮. চাক্ষুষ প্রমাণ: সম্প্রতি বিভিন্ন মহাকাশচারী চন্দ্রে অবতরণকালে পৃথিবীর যে চিত্র গ্রহণ করেছেন তা হতে স্পষ্টই দেখা যায় যে, পৃথিবীর আকৃতি গোলাকার। তাঁদের মতে, পৃথিবী হতে চন্দ্রকে যেমন গোলাকার দেখা যায়, চন্দ্র হতে পৃথিবীকেও অবিকল সে রকম গোলাকার দেখায়, তবে কয়েক গুণ বড়। এটি পৃথিবীর গোলকত্ব সম্পর্কিত চাক্ষুষ প্রমাণ।



চিত্র-৩.১১: পৃথিবীর গোলত্বের চাক্ষুষ প্রমাণ

৩.২ আঙ্গিক গতি ও বার্ষিক গতি

পৃথিবীর গতি (Motion of the Earth)

পৃথিবী একটি গতিশীল গ্রহ। সূর্যের আকর্ষণ এবং অন্যান্য গ্রহের প্রভাবে পৃথিবী গতিশীল অবস্থায় একটি নির্দিষ্ট কক্ষপথে সূর্যকে পরিক্রমণ করছে। পৃথিবীর দুটি গতি রয়েছে। যথা-

১. আবর্তন বা আঙ্গিক গতি (Diurnal Motion)
২. পরিক্রমণ বা বার্ষিক গতি (Annual Motion)

আহ্নিক গতি (Diurnal Motion)

গতিশীল পৃথিবী সূর্যকে কেন্দ্র করে নিজ অক্ষে পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে ঘুরছে। পৃথিবীর এ গতিকে আবর্তন বলে। পৃথিবীর নিজ অক্ষের চারদিকে একবার ঘুরে আসতে সময় লাগে ২৩ ঘণ্টা ৫৬ মিনিট ৪.০৯ সেকেন্ড অর্থাৎ প্রায় ২৪ ঘণ্টা। এ ২৪ ঘণ্টাকে একদিন হিসেবে গণ্য করা হয়। পৃথিবীর এ দৈনিক গতিকেই আহ্নিক গতি (Diurnal Motion) বলে। আহ্নিক কথাটির অর্থ দৈনিক। এ আবর্তনের ফলে দিন ও রাত্রি সংঘটিত হয় বলে একে আহ্নিক গতি বলা হয়। একটি পূর্ণ আবর্তনের সময়কে সৌরদিন (Solar day) বলা হয়।

পৃথিবীর আবর্তন গতি কেন অনুভূত হয়না

পৃথিবীর প্রবল আহ্নিক গতি (নিরক্ষরেখায় ঘণ্টায় গতি প্রায় ১,৭০০ কি. মি.) থাকা সত্ত্বেও আমরা তা অনুভব করি না। কারণ-

১. পৃথিবীর আয়তনের তুলনায় আমরা খুবই ক্ষুদ্র।
২. পৃথিবীর সামনে এমন কোন স্থির বা চলমান বস্তু নেই যার সাপেক্ষে আমরা পৃথিবীর আবর্তন গতি বুঝতে পারি।
৩. পৃথিবীর গতির সাথে তাল রেখে বায়ুমণ্ডলও পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে আবর্তন করায় পৃথিবীর আবর্তন গতি অনুভব করি না।
৪. পৃথিবীর প্রতিটি স্থানের আবর্তন গতি সুনির্দিষ্ট।

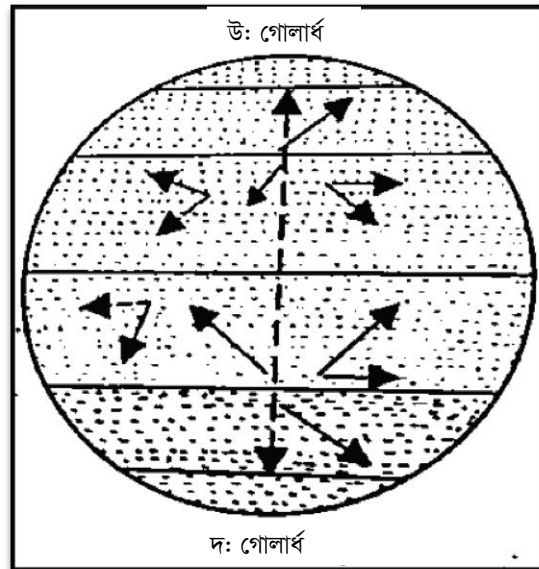
আহ্নিক গতির কারণ (Causes of Diurnal Motion)

আহ্নিক গতির কারণগুলো নিচে বর্ণনা করা হলো-

১. সৌরজগতের সকল গ্রহই সূর্যকে পরিক্রমণ করে। পৃথিবীও সৌরজগতের একটিগ্রহ, তাই এটিও পরিক্রমণশীল।
২. পৃথিবী শুধু সূর্যকে একটি উপবৃত্তাকার পথেই পরিক্রমণ করে না, নিজেও নিজ অক্ষে বা মেরু রেখায় আবর্তন (ঘুরতে থাকে) করে, ফলে আহ্নিক গতির সৃষ্টি হয়।
৩. নিউটনের মহাকর্ষ সূত্রের নিয়মানুসারে দেখা যায় যে, ক্ষুদ্র বস্তুই বৃহত্তর বস্তুর চারদিকে আবর্তন করে। পৃথিবী সূর্য অপেক্ষা ছোট। তাই সূর্যের চারদিকে নিজ মেরুদণ্ডের উপর পৃথিবী ঘোরে। ফলে আহ্নিক গতির সৃষ্টি হয়।

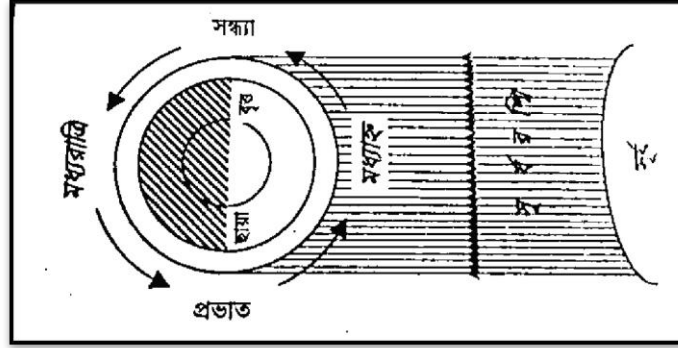
আহ্নিক গতির প্রমাণ

১. পৃথিবী হতে মহাশূন্যে যে সব মহাকাশযান ও কৃত্রিম উপগ্রহ পাঠানো হয়েছে সে সবার প্রেরিত ছবি হতে দেখা যায় যে পৃথিবী সর্বদা পশ্চিম হতে পূর্বে আবর্তন করছে। আহ্নিক গতির সর্বাধুনিক প্রমাণ হিসেবে ছবিগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে।
২. পৃথিবীর অধিকাংশ স্থানে পর্যায়ক্রমে দিন ও রাত্রির আবর্তন হয়, যা আহ্নিক গতির প্রমাণ করে। মূলত আহ্নিক গতি না থাকলে পৃথিবীর একদিকে চিরকাল দিন এবং অপরদিকে চিরকাল রাত থাকতো।
৩. পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধে সমুদ্র শ্রোত, বায়ুপ্রবাহ ডানদিকে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে বাম দিকে বেঁকে যায়। এ সূত্রটি ফেরেলের সূত্র নামে অভিহিত। বায়ুপ্রবাহ ও সমুদ্র শ্রোতের এ গতি হতে প্রমাণিত হয় যে আহ্নিক গতির জন্য পৃথিবী পশ্চিম হতে পূর্বে আবর্তন করে।



চিত্র-৩.১২: আহ্নিক গতির প্রমাণ- ফেরেলের সূত্র

৪. যখন বায়ু স্থির থাকে তখন উঁচু স্থান হতে কোন কঠিন বস্তু নিচের দিকে ফেললে দেখা যায় কঠিন বস্তুটি সোজাসুজি নিচে না পড়ে সামান্য পূর্ব দিকে বেঁকে পড়ে। এ পরীক্ষা হতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, পৃথিবী পশ্চিম দিক হতে পূর্ব দিকে আবর্তন করে।
৫. ফরাসী প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ফুকো (Foucault) ১৮৫১ খ্রিষ্টাব্দে প্যারিসের প্যাঙ্কিয়ান গির্জায় লম্বা সরু তারের সহায়তায় পেঁতুলামের মাথায় একটি পিন লাগান। এবার তিনি পেঁতুলামটিকে উত্তর-দক্ষিণে দু'লিয়ে ছেড়ে দেন। কিছু সময় পর দেখা গেল দাগগুলো ক্রমশ পূর্ব দিকে সরে গেছে। এর কারণ হিসেবে বলা যায়, আর্হিক গতির ফলে পৃথিবী ক্রমশ পশ্চিম দিক হতে পূর্ব দিকে অগ্রসর হয়।
৬. মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, শুক্র প্রভৃতি সৌরজগতের গ্রহের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় গ্রহগুলোর আর্হিক গতি আছে। পৃথিবী সৌরমণ্ডলের একটি গ্রহ হওয়ায় আর্হিক গতি থাকাই স্বাভাবিক।



চিত্র-৩.১৩: পৃথিবীর আবর্তনের ফলে বিভিন্ন সময়

৭. পৃথিবীর মেরুদ্বয় কিছুটা চাপা এবং মধ্যভাগ স্ফীত। কোন নরম জাতীয় বস্তু তার নিজস্ব অক্ষের চারদিকে আবর্তন করলে এ রকম আকৃতি হয়ে থাকে। বিজ্ঞানী নিউটনের মতে, পৃথিবীর আবর্তন গতির ফলে এমনটি ঘটেছে।

বার্ষিক গতি (Annual Motion)

সৌরজগতের প্রতিটি গ্রহ সূর্যকে পরিক্রমণ করেছে। পৃথিবী সৌরজগতের অন্যতম একটি গ্রহ। আপন কক্ষে (Orbit) একবার আবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবী একটি নির্দিষ্ট উপবৃত্তাকার পথে পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে বছরে একবার পরিক্রমণ করে। পৃথিবী নিজ অক্ষে ২৪ ঘণ্টায় একবার আবর্তনের সাথে সাথে একটি নির্দিষ্ট পথে বছরে একবার সূর্যের চতুর্দিকে পরিক্রমণ করে। পশ্চিম হতে পূর্বদিকে পৃথিবীর এ পরিক্রমণ কালকে সৌরবছর (Solar Year) বলা হয়। সূর্যকে একবার পূর্ণ পরিক্রমণ করতে পৃথিবীর ৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট ৪৫ সেকেন্ড বা ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টা সময় লাগে। কিন্তু ৩৬৫ দিনে সৌর বছর গণনা করা হয়। ফলে চার বছরে সময়ের কম হয় ১ দিন বা ২৪ ঘণ্টা। সুতরাং প্রতি ৪ বছর অন্তর ১ দিন বেশি ধরে অর্থাৎ চতুর্থ বছরে ৩৬৬ দিন গণনা করা হয়। এজন্য ফেব্রুয়ারি মাসে ২৮ দিনের পরিবর্তে ২৯ ধরা হয়। যে বছর ১ দিন বেশি ধরা হয় তাকে অধিবর্ষ বা Leap year বলে।

পৃথিবীর কক্ষপথের পরিধি ৯৩ কোটি ৮০ লক্ষ কিলোমিটারের কিছু বেশি। বার্ষিক গতির গড় বেগ প্রতি ঘণ্টায় ১,০৬,২৬০ কিলোমিটার অর্থাৎ পৃথিবী প্রতি সেকেন্ডে ৩০ কিলোমিটার বেগে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। পৃথিবী যে পথে সূর্যকে পরিক্রমণ করে তাকে পৃথিবীর কক্ষপথ বলে। এর দৈর্ঘ্য ৯৩,৮০,৫১,৮২৭ কিলোমিটার। এ কক্ষপথে পরিক্রমণ কালে সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব কম-বেশি হয়। পহেলা জানুয়ারিতে পৃথিবী সূর্যের নিকটতম অবস্থানে থাকে। একে পৃথিবীর অনুসূর অবস্থান বলে। ৪ জুলাই সূর্য হতে পৃথিবীর দূরত্ব সর্বাধিক হয়। একে পৃথিবীর অপসূর অবস্থান বলে। পৃথিবী হতে গ্রীষ্মকালে অধিক দূরত্বের জন্য সূর্যকে ছোট এবং শীতকালে কম দূরত্বের জন্য সূর্য বড় দেখায়। আবার দূরত্বের পার্থক্যেও জন্য পৃথিবীর পরিক্রমণের বেগ পরিবর্তিত হয়। শীতকালে পরিক্রমণের বেগ বাড়ে এবং গ্রীষ্মকালে বেগ কম হয়।

বার্ষিক গতির প্রমাণ

কয়েকটি পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণ করা যায় যে পৃথিবী একটি নির্দিষ্ট পথে, নির্দিষ্ট দিকে এবং নির্দিষ্ট সময়ে সূর্যের চারদিকে প্রদক্ষিণ করে, যাকে আমরা বার্ষিক গতি বলে থাকি।

১. **কৃত্রিম উপগ্রহ ও মহাকাশযানের তোলা ছবি:** বিভিন্ন কৃত্রিম উপগ্রহ ও মহাকাশযানের তোলা ছবি হতে দেখা যায়, পৃথিবী নিয়মিত ভাবে সূর্যের চারদিকে পশ্চিম হতে পূর্ব দিকে প্রদক্ষিণ করছে।

২. **মহাকর্ষ সূত্র:** নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র অনুসারে ছোট বস্তু সব সময় বড় বস্তুর চারপাশে প্রদক্ষিণ করে। এ সূত্র অনুযায়ী পৃথিবীর চেয়ে প্রায় ১৩ লক্ষ গুণ বড় সূর্যের চারদিকে প্রদক্ষিণ করাই স্বাভাবিক। সুতরাং সূর্যের মহাকর্ষ শক্তির প্রভাবে পৃথিবী তার চারপাশে নিয়মিত ঘুরছে।

৩. আকাশে সূর্যের পরিবর্তিত অবস্থান: বছরের বিভিন্ন সময়ে সূর্যকে বিভিন্ন অবস্থানে দেখা যায়। সূর্য প্রতিদিন পূর্ব আকাশে একই জায়গায় উদিত হয় না এবং পশ্চিম আকাশে একই জায়গায় অস্ত যায় না। বছরের ছয় মাস সূর্য একটু একটু করে দক্ষিণ দিকে সরে গিয়ে পূর্ব আকাশে উদিত হয়। বাকি ছয় মাস একটু একটু করে উত্তর দিকে সরে গিয়ে পূর্ব আকাশে উদিত হয়। পৃথিবীর বার্ষিক গতির কারণে এমন ঘটনা ঘটে।

৪. নক্ষত্র আপাতগতি: রাতের আকাশে কয়েকটি নক্ষত্রকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় এগুলো আকাশে পূর্ব হতে পশ্চিম দিকে সরে যাচ্ছে। এ হতে প্রমাণিত হয় পৃথিবী একটা নির্দিষ্ট পথে প্রদক্ষিণ করে যা বার্ষিক গতি নামে খ্যাত। বার্ষিক গতি না থাকলে ঋতু পরিবর্তন ও দিন-রাত্রির হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটতো না। এছাড়া মেরুদ্বয়ে সর্বক্ষণ দিন ও সর্বক্ষণ রাত্রি বজায় থাকতো।

৫. বাস্তব অভিজ্ঞতা: মহাশূন্যচারীগণ মহাশূন্যযান হতে পৃথিবীর পরিক্রমণ গতি প্রত্যক্ষ করেছেন।

৩.৩ পৃথিবীর বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ গঠন

মহাবিশ্বের গ্রহগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বৈচিত্র্যময় গ্রহ হলো পৃথিবী (Earth)। সূর্যকেন্দ্রিক সৌরজগতে বর্তমানে মোট আটটি গ্রহের (প্লুটোকে গ্রহের তালিকা থেকে বাদ দেয়া হয়েছে) মধ্যে একমাত্র পৃথিবীতে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী বসবাসের মত আদর্শ পরিবেশ রয়েছে। রয়েছে বন্ধুর ভূমিরূপ, বিশাল জলরাশি, বায়ুমণ্ডল ও দিগন্ত বিস্তৃত মহাকাশ। ভূগোলের একজন শিক্ষার্থী হিসেবে প্রত্যেকে পৃথিবীর গঠন- অর্থাৎ এর ভূমিরূপ, জল-স্থল ভাগের সৃষ্টি ও এর অবস্থান জানতে হবে। এ জ্ঞান তাকে প্রকৃতির সাথে সহঅবস্থান করতে প্রেরণা দেবে।

পৃথিবীর গঠনকে প্রধান ২টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন-

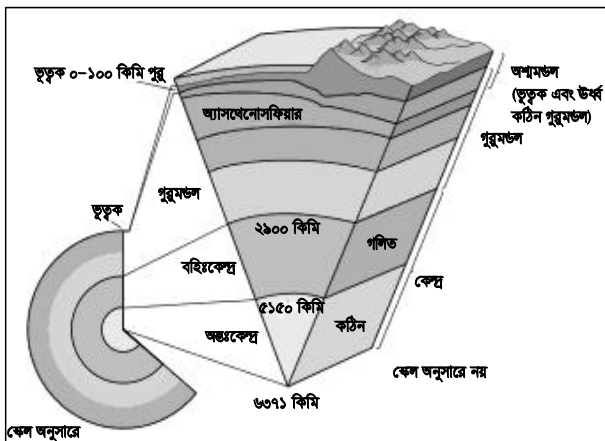
১. পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ গঠন

২. পৃথিবীর বাহ্যিক গঠন

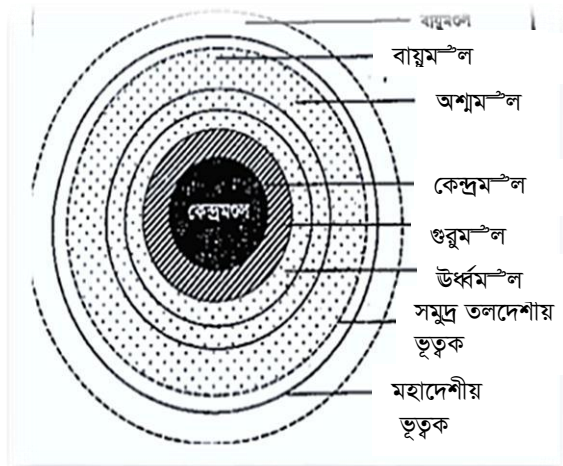
এ পাঠে পৃথিবীর অভ্যন্তরীণের বর্ণনা করা হলো।

পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ গঠন (Interior Formation of the Earth)

পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগ সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান অতি সীমিত। পৃথিবী প্রায় একটি গোলকের মত। এর ব্যাসার্ধ আনুমানিক ৬৪০০ কি. মি.। ভূঅভ্যন্তরের গভীরতা বা গভীরে সরাসরি পর্যবেক্ষণের কোন সুযোগ নেই। ভূবিজ্ঞানীরা ভূঅভ্যন্তরে সংঘটিত ভূকম্পন, তরঙ্গের গতি-প্রকৃতি, মধ্যাকর্ষণ ও চুম্বক ক্ষেত্রের বৈশিষ্ট্য পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে ভূঅভ্যন্তরের গঠন কাঠামো ও উপাদান সম্পর্কে ধারণা লাভ করেন। পৃথিবী গঠনকারী প্রধান উপাদানগুলো হলো- অক্সিজেন, সিলিকন, এলুমিনিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, লৌহ, ক্যালশিয়াম, সোডিয়াম, পটাশিয়াম ইত্যাদি। ঐ উপাদানগুলোর মধ্যে ভারী উপাদানগুলো পর্যায়ক্রমে কেন্দ্রের দিকে থাকে।



চিত্র-৩.১৪: পৃথিবীর মণ্ডলীকরণ



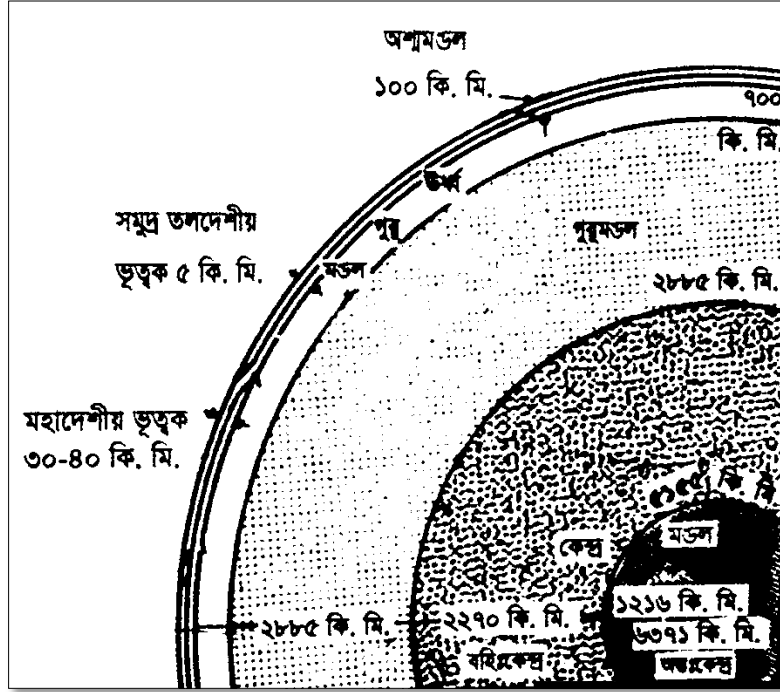
চিত্র- ৩.১৫: পৃথিবীর মণ্ডলীকরণ

গঠন অনুযায়ী পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগকে তিনটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। যথা-

১. অশ্মমণ্ডল (Lithosphere)
২. গুরুমণ্ডল (Barysphere)
৩. কেন্দ্রমণ্ডল (Centrosphere)

১. অশ্মমণ্ডল (Lithosphere)

ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগ থেকে পৃথিবীর অভ্যন্তরে প্রায় ৬০ কি. মি. গভীর পর্যন্ত হালকা ধাতব অক্সাইড ও সিলিকেটের সংমিশ্রণে অশ্মমণ্ডল গঠিত। ভূপৃষ্ঠে শিলার যে কঠিন বহিরাবরণ দেখা যায় তাই ভূত্বক। ভূত্বকের গড় পুরুত্ব ২০ কি. মি.।



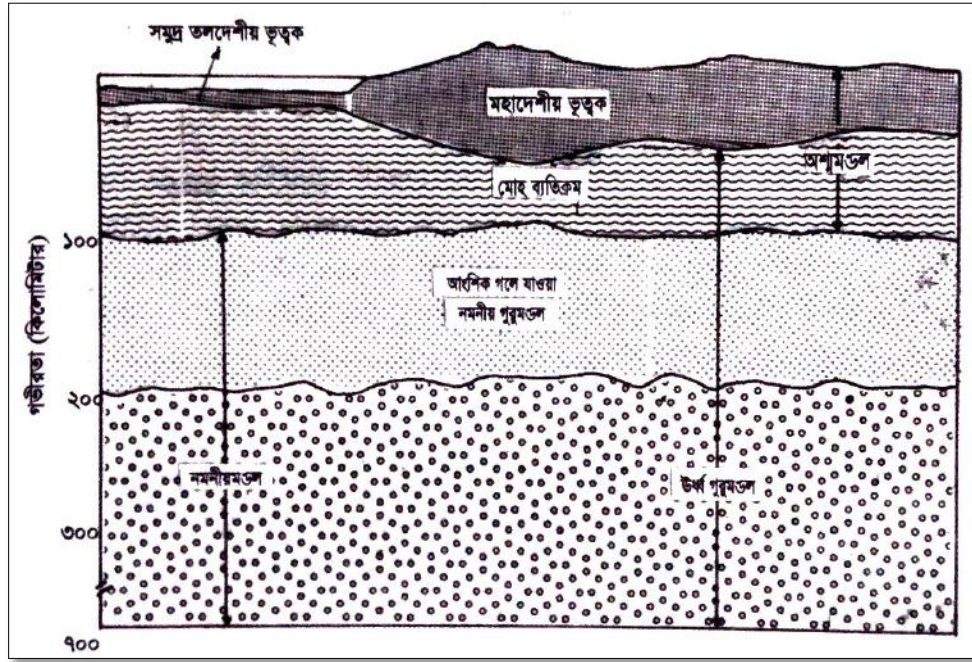
চিত্র-৩.১৬: ভূঅভ্যন্তরের আড়াআড়ি গঠন কাঠামো

মহাদেশীয় ভূত্বকের স্তরকে সিয়াল (SiAl) স্তর এবং সমুদ্র তলদেশের স্তরকে ব্যাসাল্ট স্তর বা সীমা (SiMa) বলে। সিয়াল স্তর সিলিকন (Si) ও অ্যালুমিনিয়াম (Al) দ্বারা গঠিত এবং ব্যাসাল্ট স্তর প্রধানত ব্যাসাল্ট জাতীয় শিলা দ্বারা গঠিত এবং প্রধান খনিজ উপাদান হলো সিলিকন (Si) এবং ম্যাগনেসিয়াম (Ma)। ব্যাসাল্ট স্তর সিয়াল স্তরের তুলনায় ভারি এবং এ ব্যাসাল্ট স্তরই পৃথিবী জুড়ে বহিরাবরণ হিসেবে সিয়াল স্তরের নিচে ও গভীর সমুদ্র তলদেশে বিদ্যমান।

উপাদান: ভূত্বক গঠনকারী উপাদানগুলোর মধ্যে অক্সিজেন (৪৭%), সিলিকন (২৮%), অ্যালুমিনিয়াম (৮%), লোহা (৫%), ক্যালসিয়াম (৩.৫%), সোডিয়াম (২.৫%), পটাসিয়াম (২.৫%), ম্যাগনেসিয়াম (২.২%) প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

২. গুরুমণ্ডল (Barysphere)

অশ্মমণ্ডলের নিচের স্তরই হলো গুরুমণ্ডল। ভূত্বক ও অশ্মমণ্ডলের মধ্যে একটি অত্যন্ত পাতলা স্তর আছে, যাকে মোহাবিচ্ছেদ বলা হয়। গুরুমণ্ডলের স্তরটি মোহাবিচ্ছেদ থেকে নিচের বহিঃকেন্দ্রমণ্ডল পর্যন্ত ২,৮৮৫ কি. মি. পুরু। গুরুমণ্ডলের উপর্ধাংশের শিলা কঠিন ও ভঙ্গুর যা ১০০ কি. মি. পর্যন্ত গভীর। এর নিচের স্তরের নাম নমনীয়মণ্ডল যা ৩০০ কি. মি. পর্যন্ত গভীর।



চিত্র-৩.১৭: নমনীয়মণ্ডল, অশ্মমণ্ডল ও মোহাবিচ্ছেদের অবস্থান

গুরুমণ্ডলের বৈশিষ্ট্য

- গুরুমণ্ডলের স্তরটি প্রায় ২,৮৮৫ কিলোমিটার পুরু;
- গুরুমণ্ডলের উর্ধ্বাংশের ১০০ কিলোমিটার শিলা কঠিন ও ভঙ্গুর;
- গুরুমণ্ডলের নিচের ৩০০ কিলোমিটার অংশ গলনাংকের কাছাকাছি হওয়ায় আংশিক নরম অবস্থায় থাকে;
- এটি মূলত ব্যাসাল্ট শিলা দ্বারা গঠিত;
- গুরুমণ্ডলে সিলিকা ও ম্যাগনেশিয়ামের প্রাধান্য দেখা যায়;
- গুরুমণ্ডলের ১০০ কিলোমিটার গভীরতায় তাপমাত্রা ১১০০-১২০০° সেলসিয়াস এবং ৭০০ কিলোমিটার গভীরতায় তাপমাত্রা ১,৯০০° সেলসিয়াস। বহিঃকেন্দ্র মণ্ডলের সীমানায় তাপমাত্রা ৩০০০° সেলসিয়াসের কাছাকাছি।

উপাদান: গুরুমণ্ডল মূলত ব্যাসাল্ট শিলা দ্বারা গঠিত। গুরুমণ্ডলের উর্ধ্বভাগ প্রধানত লৌহ ও ম্যাগনেশিয়াম সমৃদ্ধ সিলিকেট খনিজ দ্বারা গঠিত এবং নিম্নভাগ আয়রন অক্সাইড (FeO), ম্যাগনেশিয়াম অক্সাইড (MgO) এবং সিলিকন ডাইঅক্সাইড (SiO₂) খনিজ সংমিশ্রণে গঠিত।

৩. কেন্দ্রমণ্ডল (Centrosphere)

গুরুমণ্ডলের নিম্নভাগ থেকে পৃথিবীর কেন্দ্র পর্যন্ত বিস্তৃত স্তরকে কেন্দ্রমণ্ডল বলে। এ স্তরের পুরুত্ব ৩,৪৮৬ কি. মি. প্রায়। কেন্দ্রমণ্ডল পৃথিবীর মোট আয়তনের ১.৬ ভাগ এবং এর ওজন প্রায় এক তৃতীয়াংশ।

কেন্দ্রমণ্ডলের বৈশিষ্ট্য

- কেন্দ্রমণ্ডল পৃথিবীর কেন্দ্রে অবস্থিত;
- এর গভীরতা ৩,৪৮৬ কিলোমিটার;
- কেন্দ্রমণ্ডলের একটি তরল বহিরাবরণ আছে যা প্রায় ২,২৭০ কিলোমিটার পুরু এবং একটি কঠিন অন্তঃভাগ আছে যা ১,২১৬ কিলোমিটার পুরু;
- কেন্দ্রমণ্ডল পৃথিবীর মোট আয়তনের ১.৬ ভাগ এবং এর ওজনের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ;
- এ স্তরের বায়ুর চাপ পৃথিবী পৃষ্ঠের বায়ু চাপের চেয়ে কয়েক লক্ষ গুণ বেশি;
- এ স্তরের প্রধান উপাদান লোহা, নিকেল ও কোবাল্ট;
- এ স্তরের তাপমাত্রা ৩,০০০° থেকে ৫,০০০° সেলসিয়াস।

উপাদান : কেন্দ্রমণ্ডলের প্রধান উপাদান লোহা (Fe) ও নিকেল (Ni)-যাদের একত্রে নাইফ (Nife) বলা হয়। এছাড়া কোবাল্টের মিশ্রণও রয়েছে।

ভূগর্ভের সম্ভাব্য অবস্থা: পৃথিবী অভ্যন্তরের বা ভূগর্ভের উত্তাপ সম্পর্কে বিভিন্ন বিজ্ঞানী তত্ত্ব ও তথ্য নির্ভর মতামত প্রদান করেছেন। তাঁরা সকলেই একমত যে, পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে যতই যাওয়া যাবে উত্তাপ ও চাপের প্রচণ্ডতা ততই বৃদ্ধি পাবে। ভূগর্ভের চাপ সম্বন্ধে বিজ্ঞানীগণ ধারণা করেন যে, পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে ভূপৃষ্ঠ পর্যন্ত যে পরিমাণ শিলান্তর অবস্থান করেছে, ভূকেন্দ্রে তার চাপ বায়ুমণ্ডলের চাপের তুলনায় ৩০ লক্ষ গুণ বেশি। বৈজ্ঞানিক গবেষণাতে প্রমাণিত হয়েছে যে, পৃথিবীর অভ্যন্তর অত্যন্ত উত্তপ্ত। এ উত্তাপের কারণ মূলত তিনটি—

প্রথমত প্রায় পাঁচশ কোটি বছর ধরে তাপ বিকিরণ করলেও মূল উত্তাপের কিছু অংশ অভ্যন্তরে অবশিষ্ট রয়েছে।

দ্বিতীয়ত পৃথিবীর উপরস্থিত বস্তুর প্রচণ্ড চাপের দরুন ভূগর্ভে প্রচুর তাপ সৃষ্টি হয়।

তৃতীয়ত তেজস্ক্রিয় পদার্থের বিকিরণকৃত তাপের ফলে ভূঅভ্যন্তরের প্রচুর তাপ সৃষ্টি হয়ে থাকে। পরীক্ষা প্রমাণের ভিত্তিতে পৃথিবীর কেন্দ্রে এ তাপের পরিমাণ ৪,০০০-৫,০০০° সে.। এত অধিক তাপে ভূঅভ্যন্তরে কোন বস্তুই কঠিন অবস্থায় এমনকি তরল অবস্থায়ও থাকতে পারে না। যেহেতু চাপ বৃদ্ধির সাথে সাথে পদার্থের গলনাংক বৃদ্ধি পায় এবং ভূগর্ভে প্রচণ্ড চাপ বিদ্যমান, সেহেতু ভূগর্ভের পদার্থগুলো কঠিন ও তরল অবস্থার মাঝামাঝি অর্থাৎ পিচের মত নমনীয় ও স্থিতিস্থাপক অবস্থায় আছে।

‘ভূকম্পন লেখ’ যন্ত্রের সাহায্যে ভূকম্পন তরঙ্গ এর গতিবিধি নির্ণয় করে দেখা যায় যে, ভূকম্পন রেখাগুলো কখনই সরল নয় বরং আঁকাবাঁকা। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, ভূঅভ্যন্তরে একজাতীয় কঠিন পদার্থ নেই, পৃথক ঘনত্ব সম্পন্ন ভিন্ন ভিন্ন উপাদানে ইহা গঠিত। প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায়, ভূকম্পন তরঙ্গ তিন প্রকারের হয়ে থাকে। ভূকম্পন তরঙ্গের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করে বিজ্ঞানীরা এ সিদ্ধান্তে আসেন যে, ভূঅভ্যন্তরের মৌলিক স্তর তিনটি। উপরের স্তর (অশ্মাণ্ডল) সবচেয়ে লঘু, মধ্যবর্তী স্তর (গুরুমণ্ডল) কিছুটা গুরু এবং কেন্দ্রস্থিত স্তর (কেন্দ্রমণ্ডল) সবচেয়ে গুরু।

অভ্যন্তরীণ উত্তাপ: ভূঅভ্যন্তরভাগে উত্তাপ নির্ণয় করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। কারণ ভূঅভ্যন্তরে প্রবেশ করা কোন ক্রমেই সম্ভব নয়। তবে খনির গভীরতায় প্রাপ্ত তাপ হতে কিছুটা তথ্য পাওয়া সম্ভব। খনির অভ্যন্তরে প্রতি ৩০ মিটার গভীরতায় তাপ ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি পায়। এ থেকে সহজেই অনুধাবন করা যায় ভূপৃষ্ঠের ৫/৬ কি. মি. নিচে যে পরিমাণ তাপ বিরাজ করে তা কোন প্রাণী সহ্য করতে পারে না।

পৃথিবীর উপরস্থিত বস্তুর প্রচণ্ড চাপের কারণে ও ভূঅভ্যন্তরে তেজস্ক্রিয় পদার্থের দ্বারা প্রচুর তাপ সৃষ্টি হয় যা নির্ণয় করা কষ্টকর ব্যাপার। তবুও পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগে বিভিন্ন স্তরে উত্তাপ সম্বন্ধে বিভিন্ন বিজ্ঞানী বিভিন্ন সময়ে যে সব তত্ত্ব ও তথ্য পেয়েছেন তা প্রায় একই ধরনের। তারা সকলে একমত যে, ভূপৃষ্ঠ হতে কেন্দ্রের দিকে তাপমাত্রা ক্রমশ বেশি। তবে তাপ বৃদ্ধির হার কোথাও সমান নয়। চম্বারলীন এবং কেলভিন ৩০০ হতে ৪০০ কিলোমিটার গভীরতায় অভ্যন্তরীণ তাপ বৃদ্ধির হার নির্ণয়ের চেষ্টা চালিয়েছেন। তার ধারণা ৩০০ কি. মি. পর্যন্ত প্রতি ৭৫ মিটার গভীরতায় ১° সেলসিয়াস তাপ বৃদ্ধি পায় এবং তারপরে ৪০ কি. মি. পর্যন্ত এ বৃদ্ধির হার প্রতি ১০০ মিটারে ১° সেলসিয়াস।

আবার **এডস্যাগ ডরফার** নামক একজন খনিজ তেলবিদের মতে তাপ বৃদ্ধির এ হার প্রতি ১০০ মিটারে ৩° সেলসিয়াস। বৈজ্ঞানিক হোমস আক্কিক উপায়ে বিভিন্ন গভীরতায় তাপ নির্ণয় করেছেন যা গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়। নিম্নে তার নির্ণীত উত্তাপ প্রদত্ত হলো—

সারণি-১

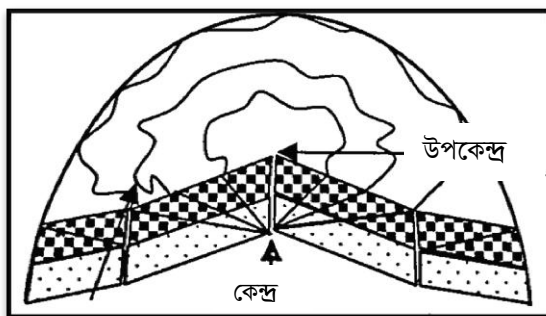
ভূঅভ্যন্তরের গভীরতা	পৃথিবীর মূল উত্তাপ	তেজস্ক্রিয়াজাত উত্তাপ	মোট উত্তাপ
১০ কি. মি.	৭৯° সেন্টিগ্রেড	২৬৪° সেন্টিগ্রেড	৩৪৩° সেন্টিগ্রেড
২০ „	১৫৯° „	৪৪১° „	৬০০° „
৩০ „	২৪০° „	৫৬০° „	৮০০° „
৪০ „	৩১৮° „	৬৪০° „	৯৫৮° „
৫০ „	৩৯৬° „	৬৯২° „	১০৮৮° „
৬০ „	৪৭৯° „	৭২৭° „	১২০৬° „
৭০ „	৫৫৫° „	৭৫২° „	১৩০৭° „
৮০ „	৬৩৪° „	৭৬৮° „	১৪০২° „
৯০ „	৭১৩° „	৭৭৮° „	১৪৯১° „
১০০ „	৭৯০° „	৭৮৫° „	১৫৭৫° „

উৎস : Igneous rocks and the depths of the earth.

৩.৪ ভূমিকম্প ও আগ্নেয়গিরি

ভূমিকম্প (Earthquake)

প্রাকৃতিক কারণবশত পৃথিবীর কঠিন ভূত্বক সময়ে সময়ে ক্ষণিকের জন্য অকস্মাৎ কেঁপে উঠে। ভূপৃষ্ঠের বা ভূত্বকের এ ক্ষণিক কেঁপে উঠাকে ভূমিকম্প বলে। বিশিষ্ট ভূগোলবিদ P. Lake এর মতে- 'An earthquake is a shaking of the crust of the earth'. ভূমিকম্প সাধারণত কয়েক সেকেন্ড স্থায়ী হয়। তবে কখনও কিছুক্ষণ পর পর কম্পন অনুভূত হয়। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের মাত্রা পরিমাপ করা হয়। এতে ১-১০ পর্যন্ত দাগ কাটা থাকে। পৃথিবীর অভ্যন্তরে কোন একটি স্থানে ভূমিকম্পের উৎপত্তি হয়। উৎপত্তি স্থানকে কেন্দ্র বা ফোকাস (Centre or Focus) বলে। কেন্দ্রের সোজা উপরে ভূপৃষ্ঠস্থ স্থানকে উপকেন্দ্র (Epicentre) বলে। ভূমিকম্পের কেন্দ্র অভ্যন্তরের প্রায় ১৬-২০ কিলোমিটার এর মধ্যে অবস্থিত থাকে।



চিত্র-৩.১৮ : ভূমিকম্পের কেন্দ্র ও উপকেন্দ্র

পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগের শিলাচ্যুতি, অগ্ন্যুৎপাত, ভূআন্দোলন প্রভৃতির কারণে ভূত্বকে আকস্মিক ও ক্ষণিককালে কম্পন অনুভূত হলে তাকে ভূমিকম্প বলে।

ভূমিকম্পের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Earthquake)

ভূমিকম্পের নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো লক্ষ্য করা যায়। যথা-

- ভূমিকম্প প্রাকৃতিক কারণে ঘটে;
- ভূমিকম্প হঠাৎ ঘটে। এখনও কোন পূর্বাভাস দেয়া সম্ভব হয়নি;
- ভূমিকম্পের স্থায়িত্ব খুবই কম (১০-৩০ সেকেন্ড);
- কোথাও স্বল্পমাত্রার ভূমিকম্প বার বার হলে সেখানে বড় আকারের ভূমিকম্প হতে পারে।

ভূমিকম্পের কারণ (Causes of Earthquake)

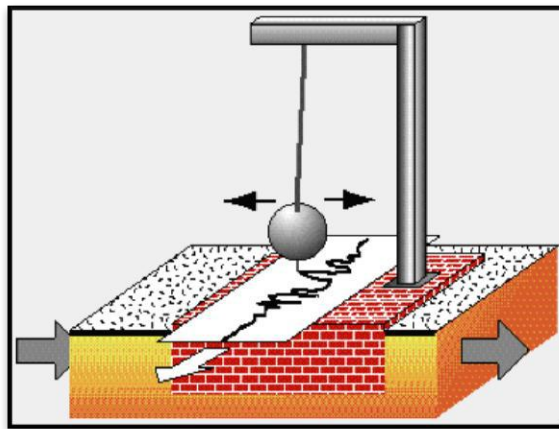
ভূমিকম্পের বেশিরভাগ কারণ হলো অশ্রামগুলোর বিভিন্ন প্লেটগুলোর চলাচলের চাপজনিত ফল। এর পরের কারণগুলো হলো: ভূত্বকের বিভিন্ন চ্যুতি বরাবর ভূঅভ্যন্তরের চাপ বিমুক্ত করা। চাপ বিমুক্ত করার ফলে যে কম্পনের সৃষ্টি হয় তাকে ভূপৃষ্ঠ কেঁপে উঠে। এছাড়া আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, শিলাচ্যুতি, ভূমিধ্বস এবং বিস্ফোরণের ফলেও ভূমিকম্প হতে পারে। ভূমিকম্পের প্রধান কারণগুলো হলো-

- **ভূপাত (Land Slide):** যদি কোন কারণে পাহাড় হতে বৃহৎ শিলা খণ্ড ভূত্বকের উপর ধসে পড়ে তাহলে ভূমিকম্প হতে পারে। নবীন ভাঁজ পর্বতের শিলাগুলো দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত না হওয়ায় সহজেই ভূপাত ঘটে এবং ভূমিকম্প হয়। ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দে পামীর মালভূমিতে বিশাল ভূপাতে তুর্কীস্থানে ভূমিকম্প হয়;
- **শিলাচ্যুতি বা শিলাতে ভাঁজের সৃষ্টি:** কোন কারণে ভূঅভ্যন্তরে বড় রকমের শিলাচ্যুতি ঘটলে বা শিলাতে ভাঁজের সৃষ্টি হলে ভূমিকম্প হয়। চ্যুতি ঘটায় ফলে ভূত্বকের কোন অংশ উপরে উত্থিত হয় বা নিচে বসে যায়। ১৯৩৪ খ্রিষ্টাব্দে বিহারে এবং ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দে আসামে এ কারণে ভূমিকম্প হয়েছিল;

- **তাপ বিকিরণ:** ভূত্বক তাপ বিকিরণ করে সংকুচিত হলে ফাটল ও ভাঁজের সৃষ্টি হয়ে ভূমিকম্প হয়;
- **ভূগর্ভস্থ বাষ্প:** কোন কারণে ভূগর্ভে যদি বাষ্পের সৃষ্টি হয় এবং তা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেলে ভূত্বকের নিম্নভাগে চাপ দেয়। ফলে ভূমিকম্প হয়;
- **ভূগর্ভস্থ চাপ হ্রাস:** অনেক সময় ভূগর্ভস্থ চাপ হঠাৎ হ্রাস পেলে শিলাচ্যুতি ঘটে। এতে ভূত্বক কেঁপে ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয়;
- **আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত:** আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের সময় তার জ্বালামুখ দিয়ে প্রবল বেগে বাষ্প, লাভা প্রভৃতি বের হতে থাকে ফলে ভূমিকম্প হয়;
- **ভূপৃষ্ঠের চাপ বৃদ্ধি:** ভূপৃষ্ঠের চাপ বৃদ্ধি পেলে তার নিচে শিলাচ্যুতি ঘটে ভূমিকম্প হয়। যেমন- নতুন পলি জমা হয়ে ভারী বা পুরু হলে ঐ শিলার চাপে ভূমিকম্প হয়;
- **হিমবাহের প্রভাব:** কখনও কখনও প্রকাণ্ড হিমবাহ পর্বত গাত্র হতে সজোরে হঠাৎ নিচে পড়ে যায়। এতে ভূপৃষ্ঠ কেঁপে উঠে এবং ভূমিকম্প হয়;
- **ভূঅভ্যন্তরে পানির প্রবেশ:** ভূপৃষ্ঠস্থ পানি ভূঅভ্যন্তরে প্রবেশ করলে বাষ্প পরিণত হয়। এ বাষ্প বেশি হলে ভূত্বকের নিচে ধাক্কা দেয় ও ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয়।

ভূমিকম্প পরিমাপনের যন্ত্র ও স্কেল

ভূমিকম্প পরিমাপক যন্ত্রের নাম সিসমোগ্রাফ (Seismograph)। কোন স্থানে ভূমিকম্প হলে এ যন্ত্রের সাহায্যে ভূমিকম্পের মাত্রা জানা যায়। এ যন্ত্রটি মাটিতে দৃঢ়ভাবে স্থাপন করা হয়। এ যন্ত্রের বেলনে একখণ্ড কাগজ লাগানো থাকে। এছাড়া এটির উপরিভাগের দণ্ড হতে একটি দাগকাটার যন্ত্র ঝুলানো থাকে। ভূমিকম্প শুরু হলে ভূমিকম্পের তীব্রতা অনুসারে এ যন্ত্রের ভিত্তি কাঁপতে থাকে। ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য সাথে সাথে দাগ কাটার যন্ত্রটিও দুলতে বা ঝুলতে শুরু করে এবং বেলন লাগানো কাগজে দাগ কাটতে থাকে। এভাবে ভূমিকম্পযন্ত্রের (Seismograph) সাহায্যে ভূমিকম্পের অনুলিপি করা সম্ভব হয়।



চিত্র-৩.১৯ : Seismograph

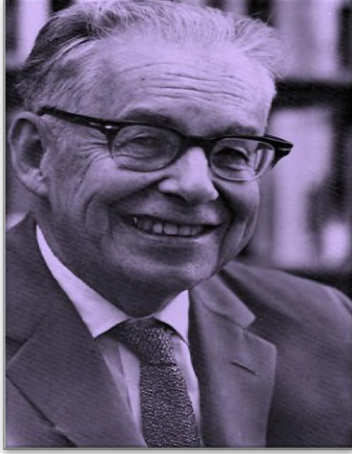
বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণে চট্টগ্রাম শহরের আমবাগানে ভূমিকম্প পরিমাপ যন্ত্র বসানো রয়েছে। তবে বাংলাদেশ ভূমিকম্প সম্পর্কিত তথ্য পেয়ে থাকে ‘United States Geological Survey (USGS)’ থেকে।

ভূমিকম্পের মাত্রা নির্ণয়

কত মাত্রায় বা তীব্রতায় ভূমিকম্প হয়েছে পরিমাপের জন্য দুটো মাপক স্কেল রয়েছে। যথা—

১. রিখটার স্কেল ২. মার্সেলির স্কেল

১. রিখটার স্কেল (Richter Scale): আমেরিকার ভূকম্প বিশারদ সি. এফ. রিখটার ১৯৩৫ ভূমিকম্প পরিমাপের জন্য যে যন্ত্রটি আবিষ্কার করেন সেটি তাঁর নামানুসারে রিখটার স্কেল নামকরণ করা হয়েছে। এ স্কেলে ১-১০ পর্যন্ত দাগ কাটা থাকে যা ভূমিকম্পের তীব্রতা নির্দেশ করে। সাধারণত রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ৫ মাত্রা অতিক্রম করলেই জীবন ও সম্পদ হানির আশংকা থাকে।



Richter Scale of Earthquake Energy:

Each level is **10 time stronger** than the previous level

	Description	Occurrence	In Population	Movement
1	Small	Daily	Every minute	Small
2	Small	Daily	Every hour	Small
3	Small	Daily	Every day	Small
4	Small	Daily	Every week	Moderate sudden
5	Moderate	Monthly	Every 10 years	Strong Sudden
6	Moderate	Monthly	Every 30 years	Strong Sudden
7	Major	Monthly	Every 50 years	Severe Sudden
8	Great	Yearly	Every 100 years	Very Severe
9	Great	Yearly	Every 300 years	Very Severe
10	Super	Rarely	Every 1,000 years	Extreme

চিত্র-৩.২০: ভূকম্পন বিশারদ সি.এফ. রিখটার ও রিখটার স্কেলে শক্তির পরিমাপ

২. মার্সেলির স্কেল (Mercali Scale): তীব্র ভূমিকম্প মাপার জন্য ইতালির বিজ্ঞানী মার্সেলি আবিষ্কৃত মার্সেলি স্কেল ব্যবহার করা হয়। এতে ১-১২ পর্যন্ত দাগ কাটা থাকে। প্রথম ৩টি মৃদু কম্পন, পরের ৪টি (৪-৭) সামান্য তীব্র এবং বাকি ৫টি (৮-১২) অধিকতর তীব্র কম্পনের নির্দেশ করে। সাধারণত ভূপৃষ্ঠের অগভীর তলদেশে ৫ কি. মি. হতে প্রায় ১,১২৬ কি. মি. গভীর অভ্যন্তরের মধ্যই ভূমিকম্প হয়। ভূকম্পন কেন্দ্রের অবস্থানের গভীরতার ভিত্তিকে কেন্দ্রকে তিন শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। যথা—

- অগভীর (Shallow): ভূপৃষ্ঠ থেকে ৬০ কি. মি. গভীরতায় ভূকম্পন সৃষ্টি হয়। ৯০% ভূমিকম্প এ অঞ্চলেই হয়।
- মাঝারী (Intermediate): ৬০-৩০০ কি. মি. গভীরতায় সৃষ্টি ভূমিকম্প।
- গভীর (Deep): ৩০০-১১২৬ কি. মি. গভীরতায় সৃষ্টি ভূমিকম্প।

ভূকম্পনপ্রবণ বলয় (Earthquake Zone)

ভূমিকম্পের প্রকোপ পৃথিবীর সর্বত্র সমান নয়। বেশির ভাগ ভূমিকম্প পৃথিবীর অল্প কিছু জায়গায় ঘটে, যা আয়তনে দীর্ঘ ও সরু। যেমন- বৃত্তচাপীয় দ্বীপমালা, নবীন ভঙ্গিল পর্বতসমূহ এবং সামুদ্রিক শৈলশিরা। ভূমিকম্প বলয় এলাকাকে তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা—

১. প্রশান্ত মহাসাগরীয় ভূকম্পন বলয়: প্রশান্ত মহাসাগরের বহিঃসীমানা বরাবর সবচেয়ে বেশি ভূমিকম্প হয়। এ অংশে জাপান, আলিউশিয়ান দ্বীপপুঞ্জ, ফিলিপাইনস, চিলি, আলাস্কা প্রভৃতি এলাকা। জাপানে বৎসরে গড়ে ৭,৫৫০টি ভূমিকম্প হয়।

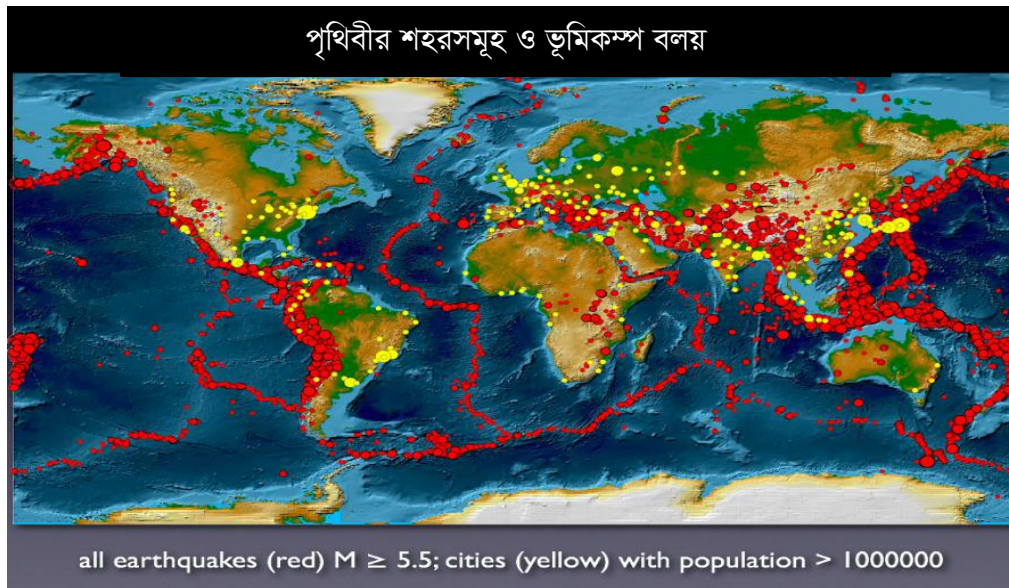


চিত্র-৩.২১: পৃথিবীর ভূমিকম্পন প্রবণ অঞ্চলসমূহ

২. ভূমধ্যসাগরীয়-হিমালয় বলয়: ইউরোপের আল্পস পর্বতমালা থেকে ভূমধ্যসাগরের উত্তর তীর হয়ে ককেশাস, ইরান, হিমালয় পর্বতমালা, ইন্দোচীন (কম্বোডিয়া, লাওস, ভিয়েতনাম) ও পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ হয়ে নিউজিল্যান্ড পর্যন্ত বিস্তৃত। ইতালীতে বৎসরে গড়ে ৫০০ বার ভূকম্পন হয়।

৩. মধ্য আটলান্টিক ও ভারত মহাসাগরীয় শৈলশিরা: উত্তর-দক্ষিণ বরাবর মধ্য আটলান্টিক শৈলশিরা ও ভারত মহাসাগরীয় শৈলশিরা মিশে আফ্রিকার লোহিত সাগর হয়ে ভূমধ্যসাগরীয় অংশে মিশেছে।

এছাড়াও আগ্নেয়গিরি অঞ্চল, খাড়া প্রণবভূমি অঞ্চল, খাড়া উপকূল অঞ্চলে ভূমিকম্প সংঘটিত হয়ে থাকে।

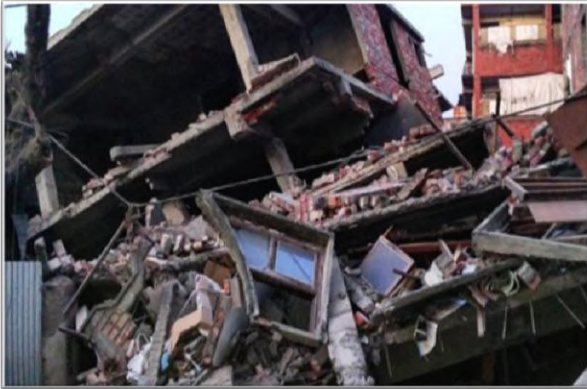


চিত্র-৩.২২: পৃথিবীর ভূমিকম্প প্রবণ বলয়সমূহ

ভূমিকম্পের ফলাফল (Effect of Earthquake)

- ফাটল ও চ্যুতির সৃষ্টি: ভূমিকম্পের ফলে ভূত্বকে অসংখ্য ফাটল ও চ্যুতির সৃষ্টি হয়।
- সমুদ্রতলদেশের পরিবর্তন: সমুদ্রের তলদেশে উঁচু হয় ও নিমজ্জিত হয়। ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দে টোকিও উপসাগরের তলদেশ ৬০ মি. উঁচু হয়। ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দে ভারতের কচ্ছ উপসাগরের উপকূলে ৫,০০০ বর্গ কি. মি. এলাকা সমুদ্র গর্ভে নিমজ্জিত হয়।
- নদ-নদীর গতিপথ পরিবর্তন: ভূমিকম্পের ফলে নদীর গতিপথ বন্ধ কিংবা পরিবর্তন হয়। ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দে ভূমিকম্পে আসামের কিবং নদীর গতিপথ পরিবর্তিত হয়। ১৭৮৭ খ্রিষ্টাব্দে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদীর গতিপথ পরিবর্তিত হয়।
- ভাঁজের সৃষ্টি: ভূমিকম্পের ঝাঁকুনিতে অনেক সময় ভূপৃষ্ঠে ভাঁজের সৃষ্টি হয়। এ ভাঁজ অল্প স্থানে জুড়ে হয়।
- ভূমির উত্থান ও পতন: কখনও উচ্চভূমি সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়, আবার কখনও সমুদ্রের তলদেশ উঁচু হয়ে দ্বীপের সৃষ্টি হয়।
- হিমালী সম্প্রপাত: ভূমিকম্পের ঝাঁকুনিতে পর্বত হতে বৃহৎ বরফের খণ্ড নিচে পতিত হয়ে হিমালী সম্প্রপাতের সৃষ্টি করে।
- ভূপাত: ভূমিকম্পের ফলে পার্বত্য অঞ্চলে বিশাল শিলাখণ্ড হঠাৎ নিচে পতিত হয় এবং পর্বতের পাদদেশে ব্যাপক ক্ষতি করে।
- বন্যার সৃষ্টি: ভূমিকম্পের ধাক্কায় পানি তীর থেকে নেমে গিয়ে আবার প্রবল বেগে (১৫-২০ মিটার) বেগে তীরে আঘাত করে সুনামির সৃষ্টি করে।
- ব্যাপক ধ্বংসলীলা: ১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দে বেলুচিস্তান, ১৯৩৪ খ্রিষ্টাব্দে বিহার, ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দে আসাম, ১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দে চিলিতে ভূমিকম্প হয়। ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দে ইন্দোনেশিয়ায় ৫ হাজার লোক মারা যায়। এছাড়া ভারতের ভুজ, জাপানের কোবে শহর ভূমিকম্পে ধ্বংস হয়। তুরস্ক ও ইরানেও ভূমিকম্প ব্যাপক ক্ষতি হয়।

১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দের ২২ জুলাই বাংলাদেশের কক্সবাজার জেলার মহেশখালীতে কয়েকবার ভূমিকম্প আঘাত হানে। রিখটার স্কেলে এর মাত্রা ছিল ৫.২। এতে ৫ জন নিহত হয়। এছাড়া ১৫ হাজার গৃহহীন, ২০ হাজার ঘরে ফাটল ও ১৫০ কোটি টাকার সম্পদের ক্ষতি হয়। ২০০১ খ্রিষ্টাব্দে জানুয়ারি মাসের ভারতের গুজরাট রাজ্যে যে ভূমিকম্প হয় তার তীব্রতা ছিল রিখটার স্কেলে ৭.৮। এতে প্রায় ৭০ হাজার মানুষ মারা যায়। ২০০৪ খ্রিষ্টাব্দে ২৬ ডিসেম্বর ভারত মহাসাগরে ৯.১ মাত্রার ভূমিকম্প হয়। এতে যে সুনামির সৃষ্টি হয় তাতে ইন্দোনেশিয়ার আচেহ প্রদেশ, শ্রীলংকা, থাইল্যান্ড, ভারত ও অন্য ৯টি দেশে অন্তত ২ লক্ষ ২৬ হাজার লোক মারা যায়। বাংলাদেশেও সুনামির ঢেউ আঘাত হানে এবং ভূমিকম্পের তীব্রতা অনুভূত হয়। ২০১০ খ্রিষ্টাব্দের ২৭ ফেব্রুয়ারি চিলিতে ৮.৮ মাত্রার ভূমিকম্প হয়। এতে ৫ শতাধিক লোকের মৃত্যু হয়।



চিত্র-৩.২৩: ভূমিকম্পের ধ্বংসলীলা

২০১১ খ্রিষ্টাব্দের ১১ মার্চ জাপানের পূর্ব উপকূলের সাগরে ৮.৯ মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত হানে। এর ফলে সুনামির সৃষ্টি হয়ে ১০ মিটার উঁচু ঢেউ উপকূলে আঘাত হানে। এতে প্রায় ১৬ হাজার লোক মারা যায় এবং সম্পদের ব্যাপক ক্ষতি হয়।

ভূমিকম্পের পূর্বাভাস ও করণীয়

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রভূত উন্নতি হলেও আজ পর্যন্ত ভূমিকম্পের পূর্বাভাস দেয়া সম্ভব হয়নি। ফলে ভূমিকম্প কোথায়, কখন হবে তা কারো জানা নেই। তবে বিজ্ঞানীগণ গবেষণার মাধ্যমে কোথায় কোথায় ভূমিকম্প হতে পারে তা মোটামুটি চিহ্নিত করেছেন। ভূমিকম্পের পূর্বাভাস দেয়ার জন্য বিজ্ঞানীরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। কোন এলাকায় যদি বার বার মৃদু ভূকম্পন অনুভূত হয় তাহলে সেখানে বড় ধরনের ভূমিকম্প হতে পারে।

প্রস্তুতি (Preparation)

ভূমিকম্পের প্রস্তুতিকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে।

১. পূর্ব-প্রস্তুতি
২. ভূমিকম্পের সময় করণীয়
৩. ভূমিকম্পের পরে করণীয়

১. পূর্ব-প্রস্তুতি (Pre-Preparation)

পূর্ব-প্রস্তুতি হিসেবে করণীয় হলো -

- ভূমিকম্প মোকাবেলায় মানসিক প্রস্তুতি
- বিল্ডিং কোড মেনে বাড়ি তৈরি করা
- বাড়ির সামনে রাস্তা থাকা
- উদ্ধারকারী যন্ত্রপাতি থাকা
- স্বেচ্ছাসেবকদের প্রশিক্ষণ দেয়া
- শুকনো খাদ্য মজুদ রাখা

২. ভূমিকম্পের সময় করণীয় (During the earthquake)

- সম্ভব হলে খোলা স্থানে চলে যাওয়া
- বিদ্যুৎ ও গ্যাস লাইন বন্ধ করা
- বিল্ডিং এর কোনায় অবস্থান
- খাটের নিচে আশ্রয় নেয়া
- সাহস রাখা

৩. ভূমিকম্পের পরে করণীয় (After the earthquake)

- দ্রুত উদ্ধার কাজ করা
- খাদ্য ও আশ্রয় দেয়া
- দ্রুত চিকিৎসা দেয়া
- পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা

আগ্নেয়গিরি (Volcano)

ভূত্বক বিভিন্ন শিলাস্তর দ্বারা গঠিত। এ স্তরগুলো এখনও সর্বত্র সুস্থিত (Stable) অবস্থায় নেই। ভূঅভ্যন্তরে প্রবল তাপ ও চাপের জন্য এবং সংকোচনের জন্য শিলাস্তরে নানা ধরনের বিপর্যয় ঘটে এবং ভূপৃষ্ঠের পরিবর্তন ঘটে। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত এ জাতীয় একটি বিপর্যয়, বিশেষত যা ভূত্বকের আকস্মিক পরিবর্তনের অন্যতম সহায়ক। ভূপৃষ্ঠের দুর্বল স্থান, ফাটল ও ছিদ্র দিয়ে ভূগর্ভস্থ উষ্ণবায়ু, প্রস্তরখণ্ড শিলা, জলীয়বাষ্প, কদম, ভস্ম প্রভৃতি পদার্থ প্রবল বেগে উর্ধ্ব উৎক্ষিপ্ত হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। একে অগ্ন্যুদ্গম (Vulcanicity) বলে।

Morre W.G.-এর মতানুসারে আগ্নেয়গিরি হলো- "A vent in the earth's crust caused by magma forcing its way to the surface is called volcano."

ভূপৃষ্ঠের দুর্বল অংশের ফাটলের মধ্য দিয়ে ভূগর্ভস্থ ধূম, গ্যাস, গলিত শিলা, ধূলি, ভস্ম এবং কঠিন ধাতব পদার্থ প্রবল বেগে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এসব উদ্গিরিত পদার্থসমূহ ক্রমশ জমাট বেঁধে যে উঁচু মোচাকৃতি আগ্নেয় পর্বতের সৃষ্টি হয় তাকে আগ্নেয়গিরি বলে। ভূপৃষ্ঠের দুর্বল ফাটলের অস্তিত্ব থাকলে ভূত্বকের উপরের স্তরের চাপ-হ্রাস কিংবা ভূঅভ্যন্তরের চাপ বৃদ্ধি পেলে ভূঅভ্যন্তরের উত্তপ্ত গলিত পদার্থ প্রবল বেগে নির্গত হয়ে অগ্ন্যুৎপাত (Eruption) ঘটায় এবং আগ্নেয়গিরির সৃষ্টি করে।

Volcano হলো- A feature in the earth crust (on in the surface of same other planet) through which molted lava and gases erupt. A mountain formed by volcanic material.

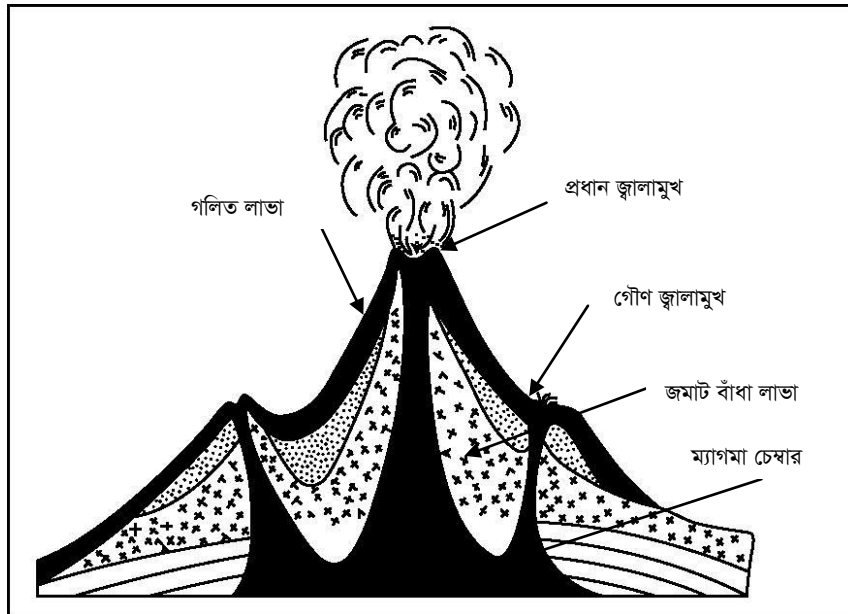
Webster Dictionary (১৯১৩) অনুযায়ী Volcano হলো- A mountain or hill ... more or less conical in form from which lava, cinders stream, sulphur gases and the like the ejected, often popularly called a burning mountain.

আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত দুধরনের। যথা-

১. নিঃসারী অগ্ন্যুৎপাত (Extrusive Vulcanicity) এবং
২. উদবেধী অগ্ন্যুৎপাত (Intrusive Vulcanicity)। আগ্নেয়গিরি নিঃসারী অগ্ন্যুৎপাতের ফলে সৃষ্ট একটি ভূমিরূপ।

নিঃসারী অগ্ন্যুৎপাতের ফলে ভূগর্ভের গলিত ধাতব পদার্থ বা ম্যাগমা ভূপৃষ্ঠের দুর্বল অংশ বা ফাটলের মধ্য দিয়ে বের হয়ে ভূপৃষ্ঠের ওপরে আসে এবং বায়ুর সংস্পর্শে তা দ্রুত শীতল ও কঠিন হয়। এসব পদার্থের কিছু অংশ ফাটলের মুখের চারদিকে স্তূপাকারে সঞ্চিত হয় ও জমাট বাঁধে এবং ক্রমান্বয়ে ঐ স্থান শঙ্কু-আকৃতির (Conical) পর্বতে পরিণত হয়। একে আগ্নেয়গিরি বলে। এসব পদার্থের নির্গমনকে বলা হয় অগ্ন্যুৎপাত (Eruption)।

ভূঅভ্যন্তরের গলিত পদার্থকে ম্যাগমা (Magma) বলে। ভূঅভ্যন্তরে একটি প্রকাণ্ড গহ্বরে গলিত পদার্থসমূহ এবং গ্যাস মিশ্রিত অবস্থায় থাকে, এ গহ্বরকে ম্যাগমা গহ্বর (Magma Chamber or Basin) বলে। ভূগর্ভ হতে ভূপৃষ্ঠ পর্যন্ত কয়েকটি নলাকৃতি পথ থাকে এবং তাদের অগ্রভাগ গোল পাত্রের মত দেখায়। এ গোল পাত্র সদৃশ মুখটিকে জ্বালামুখ (Crater) বলে। জ্বালামুখ একটি নলাকৃতি পথে ভূগর্ভের সাথে সংযুক্ত। এ জ্বালামুখ এক বা একাধিক হতে পারে। তবে যে পথের মাধ্যমে সরাসরি ভূগর্ভের সাথে সংযুক্ত তাকে প্রধান জ্বালামুখ এবং পার্শ্ববর্তী জ্বালামুখগুলোকে গৌণ জ্বালামুখ বলে। ম্যাগমা ভূপৃষ্ঠে প্রবাহিত হলে তাকে লাভা (Lava) বলে।



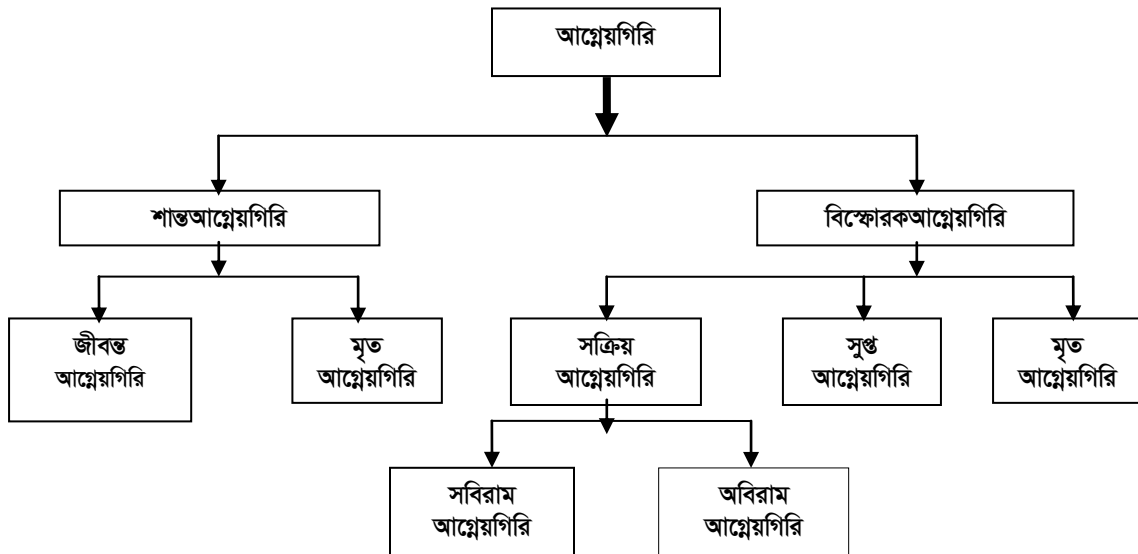
চিত্র-৩.২৪: আগ্নেয়গিরি ও তার বিভিন্ন অংশ

আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের কারণ (Causes of Volcanic Eruption)

- **ভূগর্ভে পানির প্রবেশ:** অনেক আগ্নেয়গিরি সমুদ্রের নিকট অবস্থিত। সেজন্য ভূপৃষ্ঠের ফাটলের মধ্য দিয়ে পানি ভূগর্ভে প্রবেশ করে। আবার পৃথিবীর উপরিভাগ হতে বৃষ্টির পানি, নদ-নদী, খাল বিলের পানিও ভিতরে যায় ও উত্তপ্ত শিলার সঙ্গে ক্রিয়া করে বাষ্পে পরিণত হয়। এ বাষ্প ভূগর্ভে চাপের সৃষ্টি করে। এ উর্ধ্বমুখী চাপ বেশি হলে গলিত পদার্থসহ ভূপৃষ্ঠের ফাটল, ছিদ্র বা দুর্বল অংশ দিয়ে বের হয়।
- **ভূপৃষ্ঠের চাপ হ্রাস:** উচ্চস্থান ক্ষয়ীভবন ও নগ্নীভবনের মাধ্যমে ক্ষয়চক্রের বার্ষিক্য অবস্থায় পৌছে। প্রাকৃতিক কারণ বশত এ স্থানের চাপ তুলনামূলকভাবে কম থাকে। আবার ভূআন্দোলনের ফলেও শিলারাশি স্থানচ্যুত হয়ে ভূত্বকের চাপ হ্রাস পায়। বস্তুত চাপের হ্রাস হলে ভূঅভ্যন্তরীণ তাপমাত্রা ভারসাম্যতা হারায় এবং ঐ স্থানের উপাদানগুলো তরল পদার্থে পরিণত হয়। এ তরল পদার্থ ভূত্বকের ফাটল, ছিদ্র বা দুর্বল অংশ দিয়ে বাইরে বের হয়ে আসে বা অগ্ন্যুৎপাত ঘটায়।
- **ভূত্বকে ফাটলের অবস্থান:** ভূপৃষ্ঠে অসংখ্য ফাটল বা ছিদ্র আছে। সাধারণত ভূপৃষ্ঠের পুরুত্ব অসমান বলে এবং শিলা দুর্বল থাকলে ফাটলের সৃষ্টি হয়। এ ফাটল দিয়ে ম্যাগমা অতি সহজেই বাইরে বের হয়ে আসে। আবার কোন কোন সময় ওপরের চাপ কমে গেলে বা নিচের চাপ অত্যাধিক হলে ফাটলের সৃষ্টি হয়।
- **তেজস্ক্রিয় পদার্থের প্রভাব:** ভূঅভ্যন্তরস্থ বেরিয়াম, থেরিয়াম, ইউরেনিয়াম প্রভৃতি তেজস্ক্রিয় পদার্থগুলো প্রচুর তাপ বিকিরণ করে। এ কারণে ভূগর্ভের উপাদানগুলোর তাপ বৃদ্ধি পায় এবং সেগুলো তরল অবস্থায় পরিণত হয়। তখন অভ্যন্তরভাগের উপাদানগুলোর আয়তন বৃদ্ধি পায় এবং ভূগর্ভের বাইরে আসতে চেষ্টা করে।
- **ভূত্বকের সংকোচন:** ভূআন্দোলনের ফলে সাধারণত ভূত্বক সংকোচিত হয়ে শিলান্তর স্থানচ্যুত হয়। স্থানচ্যুত হওয়ার কারণে ভূত্বকের চাপ কমে যায়। ভূআন্দোলনের প্রভাব ব্যাসল্ট অন্তস্থল পর্যন্ত পড়লে সেখানে ম্যাগমা গহ্বরের সৃষ্টি হয়। আবার ভূআন্দোলনের প্রভাবে ভূঅভ্যন্তরে ফাটল, গর্ত, ছিদ্র প্রভৃতির সৃষ্টি হয়। এর ফলে ঐ স্থান দুর্বল হয় এবং ম্যাগমা বাইরে বের হয়ে আসে।
- **ভূপৃষ্ঠের তাপ বিকিরণ:** ভূপৃষ্ঠ সব সময় তাপ বিকিরণ করে শীতল ও সঙ্কুচিত হয়। এর ফলে কখনও ভাঁজের সৃষ্টি হয়, চাপ হ্রাস পায় এবং ফাটল ও ছিদ্রের সৃষ্টি হয়ে অগ্ন্যুৎপাতের পথ সুগম করে।
- **রাসায়নিক প্রক্রিয়া:** ভূগর্ভে বিভিন্ন প্রকার রাসায়নিক ক্রিয়ার জন্য গ্যাস ও তাপের সৃষ্টি হয়। এ কারণে ভূঅভ্যন্তরভাগের অন্যান্য পদার্থসমূহ উত্তপ্ত হয় এবং উর্ধ্ব চাপের সৃষ্টি করে অগ্ন্যুৎপাত ঘটায়।
- **অভ্যন্তরীণ চাপ বৃদ্ধি:** ভূত্বকের চাপ কম হলে, রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় গ্যাস উৎপন্ন হলে এবং তেজস্ক্রিয় পদার্থের জন্য তাপের বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণে ভূঅভ্যন্তরের উপাদানগুলো তরল এবং আয়তনে বৃদ্ধি পায়। তখন উপাদানগুলো উর্ধ্বদিকে চাপের সৃষ্টি করে। এর ফলে আগ্নেয় পদার্থগুলো প্রবল বেগে বাইরে আসে বা অগ্ন্যুৎপাত ঘটায়।

আগ্নেয়গিরির শ্রেণিবিভাগ (Classification of Volcanos)

অগ্ন্যুৎপাতের গতি-প্রকৃতির উপর নির্ভর করে আগ্নেয়গিরিকে নিম্নলিখিত উপায়ে শ্রেণিবিভাগ করা যায়।



ছক: আগ্নেয়গিরির শ্রেণিবিভাগ

১. বিস্ফোরক আগ্নেয়গিরি: সাধারণত ম্যাগমা গহ্বরে প্রচুর গ্যাস জমা হলে এবং জ্বালামুখ ফেটে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটিয়ে এ জাতীয় আগ্নেয়গিরির সৃষ্টি হয়। জ্বালামুখ দিয়ে কঠিন, তরল ও বায়বীয় সকল প্রকার পদার্থই প্রবলবেগে বের হয়। বিস্ফোরণের পূর্বে গ্যাস ও ধোঁয়া মিশ্রিত ঘনকালো মেঘে আকাশ ছেয়ে যায়। ভূমিকম্পের ধাক্কা ও বিস্ফোরণের শব্দ প্রচণ্ডভাবে হয়।

বিস্ফোরক প্রকৃতির আগ্নেয়গিরিকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়। যথা-ক. সক্রিয় আগ্নেয়গিরি, খ. সুপ্ত আগ্নেয়গিরি, গ. মৃত আগ্নেয়গিরি

ক. সক্রিয় আগ্নেয়গিরি: উৎপত্তি লাভের পর হতে এখনও পর্যন্ত যে সব আগ্নেয়গিরি হতে মাঝে মাঝে বিস্ফোরণের সাথে অগ্ন্যুৎপাত হয় তাকে বিস্ফোরক সক্রিয় আগ্নেয়গিরি বলে। এ আগ্নেয়গিরি আবার দুই প্রকার, যথা- সবিরাম, অবিরাম আগ্নেয়গিরি।

১) সবিরাম আগ্নেয়গিরি: যে সকল সক্রিয় আগ্নেয়গিরি হতে মাঝে মাঝে বা বিরতি দিয়ে আগ্নেয় পদার্থ বিস্ফোরিত হয় তাদের সক্রিয় সবিরাম আগ্নেয়গিরি বলে। এ জাতীয় আগ্নেয়গিরিতে একবার অগ্ন্যুৎপাত হওয়ার পর ম্যাগমা গহ্বরে আগ্নেয় পদার্থের চাপ কমে যায় বলে কিছুদিন অগ্ন্যুৎপাত বন্ধ থাকে। যখন এ চাপ বৃদ্ধি পায় তখন আবার অগ্ন্যুৎপাত হয়। ইটালীর ভিসুভিয়াস, সিসিলির এটনা এ জাতীয় আগ্নেয়গিরি।

২) অবিরাম আগ্নেয়গিরি: সক্রিয় আগ্নেয়গিরি হতে বিরামহীনভাবে অগ্ন্যুৎপাত ঘটলে তাকে সক্রিয় অবিরাম আগ্নেয়গিরি বলে। এ জাতীয় আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ হতে অবিরাম ধারায় আগ্নেয় পদার্থ বিস্ফোরিত হয়ে চলেছে। পৃথিবীতে অনেক সক্রিয় অবিরাম আগ্নেয়গিরি রয়েছে। তার মধ্যে ক্যালিফোর্নিয়ার লাসেন পিক (Lassen peak) অন্যতম। কামচাটকা উপদ্বীপে ১৩টি এ জাতীয় আগ্নেয়গিরি রয়েছে। ইউরোপের ক্লুচেভস্কি (Klyuchevskaya) আগ্নেয়গিরিটি এধরণের একটি আগ্নেয়গিরি। আগ্নেয়গিরিটি ৫,০০০ বছরের পুরানো এবং এ যাবৎ প্রায় ৪০ বার বিস্ফোরণ ঘটেছে।

খ. সুপ্ত আগ্নেয়গিরি: যে সকল বিস্ফোরক আগ্নেয়গিরি হতে পূর্বে অগ্ন্যুৎপাত ঘটেছে এবং অনেকদিন যাবত বন্ধ আছে, কিন্তু যে কোন সময় অগ্ন্যুৎপাত ঘটান সম্ভাবনা রয়েছে তাকে বিস্ফোরক জাতীয় সুপ্ত আগ্নেয়গিরি বলা হয়। সাধারণত প্রচুর পরিমাণ আগ্নেয় পদার্থ বের হওয়ার পর ম্যাগমা গহ্বরে চাপ কম থাকে এবং নিষ্ক্রিয় অবস্থা বিরাজ করে। এ অবস্থার উন্নতি ঘটলে আবারও অগ্ন্যুৎপাত ঘটান সম্ভাবনা থাকে। জাপানের ফুজিয়ামা, আইসল্যান্ডের হাকলা ও ইন্দোনেশিয়ার ক্রাকাতোয়া বিস্ফোরক সুপ্ত আগ্নেয়গিরি। প্রায় ২০০ বছর পূর্বে ফুজিয়ামা আগ্নেয়গিরি হতে একবার অগ্ন্যুৎপাত ঘটেছিল, তবে আবার যে কোন সময় অগ্ন্যুৎপাত ঘটতে পারে।

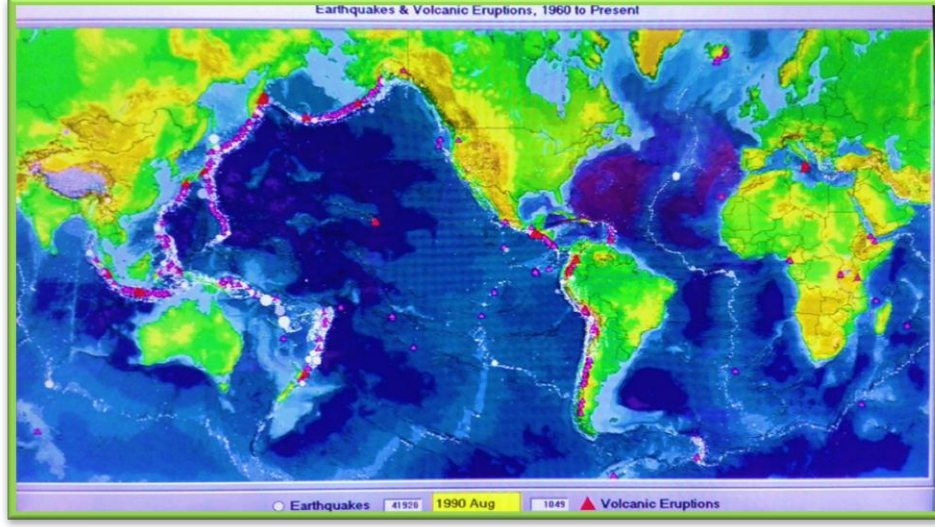
গ. মৃত আগ্নেয়গিরি: কোন কোন বিস্ফোরক আগ্নেয়গিরি হতে অতীতে প্রচণ্ড বিস্ফোরণের সাথে অগ্ন্যুৎপাত ঘটেছিল, বর্তমানে বন্ধ আছে এবং পুনরায় অগ্ন্যুৎপাতের কোন সম্ভাবনা নেই। এ জাতীয় আগ্নেয়গিরি বিস্ফোরক মৃত আগ্নেয়গিরি নামে পরিচিত। ইরানের কোহিসুলতান, মেক্সিকোর পারিকুটিন, চীনের দাতুং এ জাতীয় মৃত আগ্নেয়গিরি উদাহরণ। কোন কোন মৃত আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখে বৃষ্টির পানি জমে হ্রদের সৃষ্টি হয়।

২. শান্ত আগ্নেয়গিরি: কোন কোন আগ্নেয়গিরি হতে ধীরে ধীরে গলিত পদার্থ বের হয় তাকে শান্ত আগ্নেয়গিরি বলে। এ আগ্নেয়গিরি হতে কোন কঠিন পদার্থ নির্গত হয় না এবং সামান্য বায়বীয় পদার্থের অস্তিত্ব থাকে। শান্ত পদার্থই এর গলিত লাভা, এ জাতীয় আগ্নেয়গিরি হতে সাধারণত বিস্ফোরণ সংঘটিত হয় না। পৃথিবী শীতল হওয়ার দ্বিতীয় পর্যায়ে শান্ত আগ্নেয়গিরিগুলোর সক্রিয়তার পরিচয় পাওয়া যায়।

শান্ত আগ্নেয়গিরি দুটি ভাগে বিভক্ত। যথা- ক. শান্ত জীবন্ত আগ্নেয়গিরি ও খ. শান্ত মৃত আগ্নেয়গিরি।

ক. শান্ত জীবন্ত আগ্নেয়গিরি: যে সকল শান্ত আগ্নেয়গিরি এখনও পর্যন্ত সক্রিয় আছে তাদেরকে শান্ত জীবন্ত আগ্নেয়গিরি বলা হয়। এ প্রকার আগ্নেয়গিরি হতে মাঝে মাঝে লাভা নির্গত হয়। হাওয়াই দ্বীপের মাওনালোয়া (Mauna Loa) এবং তার দক্ষিণে কীলাওয়া (Kilauea) এ জাতীয় আগ্নেয়গিরি। মাওনালোয়া পৃথিবীর অন্যতম সুউচ্চ আগ্নেয়গিরি (৪,১৬৯ মিটার)।

খ. শান্ত মৃত আগ্নেয়গিরি: শান্ত আগ্নেয়গিরির মধ্যে কোন কোন আগ্নেয়গিরি নিষ্ক্রিয় অবস্থায় রয়েছে। এ গুলোর জ্বালামুখের অভ্যন্তরে লাভা জমে স্তরের সৃষ্টি করে এবং এ স্তরে ভেদ করে লাভা নির্গত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। এ ধরনের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আগ্নেয়গিরিকে শান্ত মৃত আগ্নেয়গিরি বলে। হাওয়াই দ্বীপের মাওনাকেয়া (Mauna Kea) শান্ত আগ্নেয়গিরির প্রকৃষ্ট উদাহরণ।



চিত্র-৩.২৫: ভূমিকম্প ও আগ্নেয়গিরির উদগিরণ (১৯৬০- বর্তমান)

(উৎস: এয়ার এন্ড স্পেস মিউজিয়াম, ওয়াশিংটন ডিসি, যুক্তরাষ্ট্র। ছবি- ড. ডি. এম. ফিরোজ শাহ্)

আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফলাফল

- ভূপৃষ্ঠে নিষ্ক্ষিপ্ত লাভা সঞ্চিত হয়ে পর্বত, মালভূমি বা উপত্যকার সৃষ্টি হয়।
- সাগরবক্ষে নিষ্ক্ষিপ্ত লাভা স্তপকৃত হয়ে দ্বীপের সৃষ্টি করে। হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ এভাবে সৃষ্টি।
- ১৮৭৯ খ্রি. ইতালীর ভিসুভিয়াস আগ্নেয়গিরি অগ্ন্যুৎপাতের ফলে হারকুলেনিয়াম (Herculenum) ও পম্পেই (Pompei) নামক দুটি সমৃদ্ধ নগর উত্তপ্ত লাভার নিচে পড়ে ধ্বংস হয়ে গেছে।
- ভূত্বকের অংশ বিশেষ ধ্বংস গিয়ে গভীর খাদের সৃষ্টি করে। ১৮৮৩ খ্রি. ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রা ও জাবাদ্বীপের মধ্যবর্তী ক্রাকাতোয়া (Krakatoa) দ্বীপটির অংশ বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং অপর অর্ধাংশের প্রায় ৩০৫ মি. গভীর গহবরের সৃষ্টি হয়।
- মৃত আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখে হ্রদের সৃষ্টি হয়।
- নিষ্ক্ষিপ্ত লাভা সমতলভূমির উর্বরতা বৃদ্ধি করে।
- অগ্ন্যুৎপাতের ফলে অনেক সময় নদীপথে লাভা জমে নদীর গতিপথ পরিবর্তিত হয়।
- আগ্নেয়গিরি অগ্ন্যুৎপাতের উত্তাপে পার্শ্ববর্তী এলাকায় বরফ থাকলে তা গলে নিকটবর্তী এলাকায় দ্রুত ব্যাপক কদম প্রবাহ বা বন্যার সৃষ্টি করে। এতে লোকালয়ের ব্যাপক ক্ষতি হয়।
- অনেক সময় আগ্নেয়গিরির উত্তপ্ত লাভা, ধূলিকণা উর্ধ্ব আকাশে স্ট্রাটোস্ফিয়ারে (Stratosphere) উঠে যায় এবং দ্রুত তা পৃথিবীব্যাপি ছড়িয়ে পড়ে। ফলে ভূপৃষ্ঠে সূর্যতাপহ্রাস এবং শীত বেড়ে যায়।
- আগ্নেয়গিরি অগ্ন্যুৎপাতের ফলে ব্যাপক ধ্বংস লীলা সংঘটিত হয়। যেমন- ১৯৮৬ খ্রি. মেক্সিকোতে কয়েক হাজার লোকের মৃত্যু ঘটে। ১৯৯৩ খ্রিষ্টাব্দে ফিলিপাইনের মাউন্ট পিনাটুগোতে অগ্ন্যুৎপাতের ফলে প্রবলবেগে শিলাখণ্ড ও ছাই ভষ্ম বেরিয়ে আসে। এতে মার্কিন ক্লার্ক বিমান ঘাটি ও সুবিক নৌঘাটি বন্ধ হয়ে যায় এবং পার্শ্ববর্তী লোকালয়ে ব্যাপক ক্ষতি হয়। ১৯৮০-৮২ খ্রিষ্টাব্দে মাউন্ট সেন্ট হেলেনায় (USA) অগ্ন্যুৎপাতে ২১ জন মারা যায় ও ৬৮ জন নিখোঁজ হয়।

আগ্নেয়গিরির বিশ্বব্যাপী বণ্টন/আগ্নেয়গিরির বলয়

বিশ্বে আগ্নেয়গিরির ২টি প্রধান বলয় আছে-

১. আগ্নেয়গিরির প্রথম ও প্রধান বলয়টি দক্ষিণ আমেরিকার হর্ন অন্তরীপ হতে আন্দিজ পর্বতমালা, মধ্য আমেরিকার বরফ পর্বতমালা, উত্তর আমেরিকার রকি পর্বতমালা মধ্য দিয়ে বিস্তৃত হয়ে অ্যালিউসিয়ান দ্বীপপুঞ্জ, কামচাটকা, জাপান, ফিলিপাইন হয়ে একটু পশ্চিমে বেঁকে পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে গিয়ে মিশেছে। এর একটি শাখা পাপুয়া নিউগিনি হয়ে নিউজিল্যান্ডে মিশেছে। এ বলয়টি প্রশান্ত মহাসাগরকে একটি মালা বা আংটির মত বেটন করে রেখেছে বলে একে প্রশান্ত মহাসাগরের আগ্নেয় মেখলা বা আঙনের আংটি (Fiery Ring of the Pacific) বলা হয়।



চিত্র-৩.২৬ : আগ্নেয়গিরির বিশ্বব্যাপী বণ্টন

২. দ্বিতীয় শাখাটি উত্তর মহাসাগরের আইসল্যান্ড দ্বীপ হতে আয়ারল্যান্ড, অ্যাজোরাস ও কেপভার্ডি দ্বীপ হয়ে গিনি উপসাগরের গিয়ে মিশেছে। এর দুটি শাখার একটি ভূমধ্যসাগরের সিসিলি দ্বীপ হতে ককেশাস পর্বত এবং এশিয়া মাইনর হয়ে ভারত মহাসাগরের মাদাগাস্কার ও কিউলিয়ান দ্বীপপুঞ্জে গিয়ে মিশেছে। অপর শাখাটি গিনি উপসাগর হতে পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে মিশেছে। এ সমস্ত আগ্নেয়গিরি বাদে পূর্ব আফ্রিকার গ্রস্ত উপত্যকায় এবং পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে অনেকগুলো আগ্নেয়গিরি আছে। হাওয়াই দ্বীপের মোনালোয়া পৃথিবীর সবচেয়ে উচ্চতম আগ্নেয়গিরি। সমুদ্র তল থেকে ৪,৮০০ মিটার নিচে এর পাদদেশ এবং শিখরদেশ ৪,২০০ মিটার উচ্চে অবস্থিত।

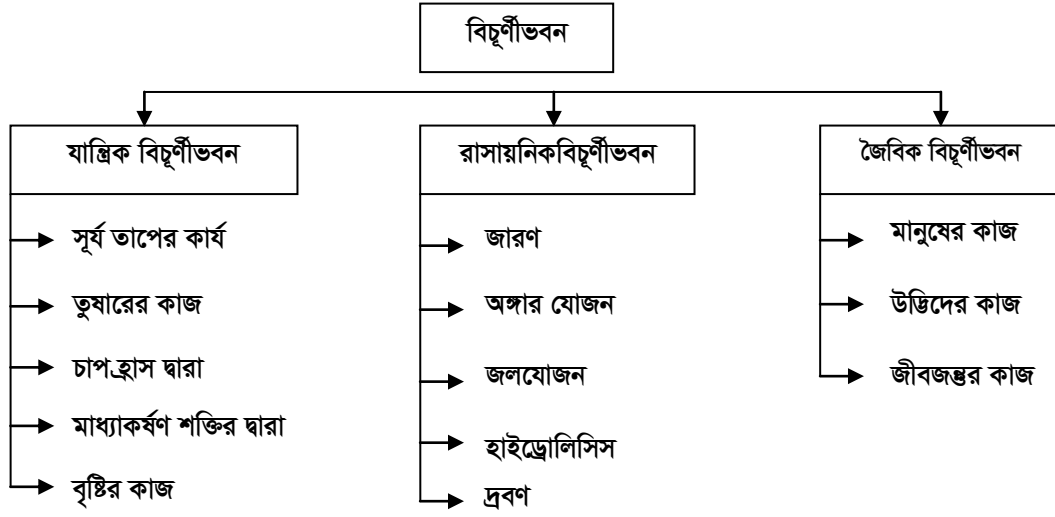
বঙ্গোপসাগরের ব্যারেন দ্বীপে এবং আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের নারকোনডাম দ্বীপে সুপ্ত বা মৃত অবস্থায় দুটি আগ্নেয়গিরি আছে। ব্যারেন দ্বীপের আগ্নেয়গিরিটির উচ্চতা প্রায় ৩৪ মিটার। পাকিস্তানের বেলুচিস্তানের কোহিসুলতান এবং মায়ানমারের মাউন্ট পোপো নামক আগ্নেয়গিরির আছে।

৩.৫ বিচূর্ণীভবন বা আবহবিকার (Weathering)

আবহাওয়ার বিভিন্ন উপাদানের (বায়ুর তাপ, চাপ, আর্দ্রতা, বৃষ্টিপাত) দ্বারা ভূপৃষ্ঠের শিলাস্তরের উপরিভাগের যে ক্ষয়ক্ষতি বা পরিবর্তন ঘটে তাকেই আবহবিকার বলে। আবহবিকারের ফলে চূর্ণ-বিচূর্ণ ও বিশ্লিষ্ট শিলাজাত পদার্থগুলো মূল শিলা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সেখানেই পড়ে থাকে। এ জন্য আবহবিকারকে বিচূর্ণীভবনও বলা হয়। তবে আবহাওয়ার উপাদান ছাড়াও উদ্ভিদ, জীব-জন্তু, এমনকি মানুষও বিচূর্ণীভবনে সহায়তা করে থাকে। আবহবিকার প্রক্রিয়ায় বিচূর্ণীত পদার্থগুলো আদৌ স্থানান্তরিত হয় না।

আবহাওয়ার ইংরেজি প্রতিশব্দ Weather. এ weather থেকে Weathering কথাটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আবহাওয়ার উপাদানগুলো বিচূর্ণীভবন প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত বলে একে আবহাওয়াবিকার বলে।

বিচূর্ণীভবনের প্রকারভেদ (Classification of weathering)



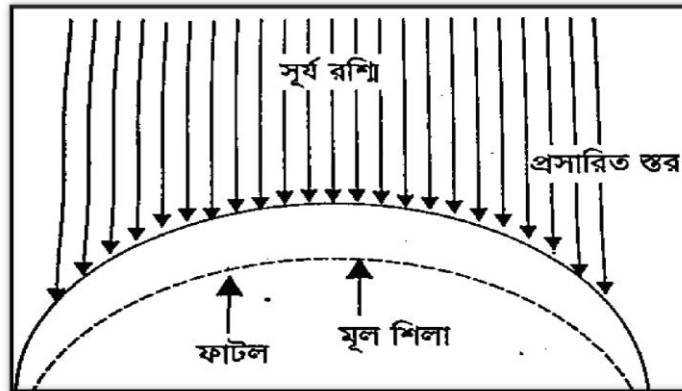
ছক: বিচূর্ণীভবনের প্রকারভেদ

যান্ত্রিক বিচূর্ণীভবন (Mechanical Weathering)

বাহ্যিক প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের দ্বারা শিলারূপে চূর্ণবিচূর্ণ হওয়াকে যান্ত্রিক বিচূর্ণীভবন বলে। যান্ত্রিক বিচূর্ণীভবন মনু অঞ্চলে যেখানে উত্তাপের দ্রুত-ত্বাঙ্গ-বৃদ্ধি ঘটে এবং উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলে যেখানে তুষারের প্রভাব খুব বেশি সেখানে অধিক হয়ে থাকে।

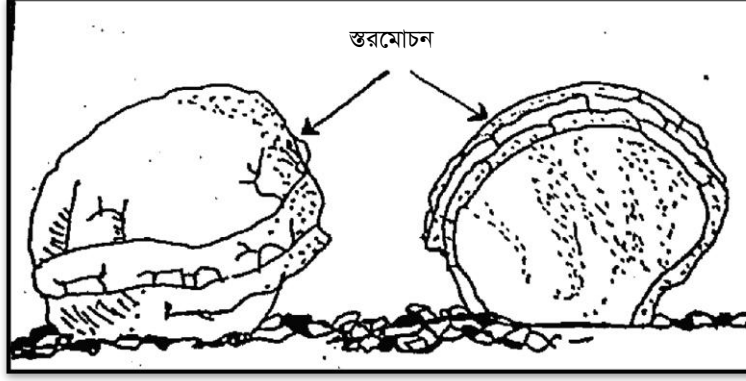
ইহা পাঁচ ধরনের। যথা-

১. সূর্য তাপের কার্য: সূর্যতাপে শিলারূপে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যান্ত্রিক বিচূর্ণীভবনে সহায়তা করে। দিবারাত্রি এবং ঋতু ভেদে উষ্ণতার পার্থক্যের জন্য শিলারূপে অসমভাবে প্রসারিত ও সংকুচিত হয়ে খণ্ডবিখণ্ড হয়। সূর্যতাপে শিলারূপে ৫ ভাবে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়। যেমন-



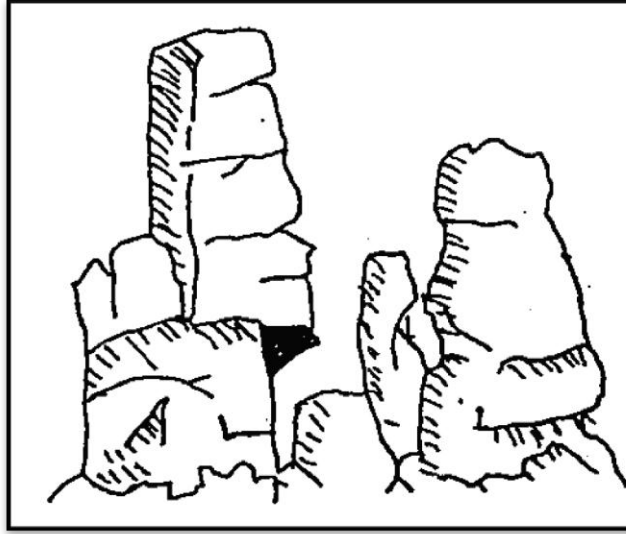
চিত্র-৩.২৭: শিলার উপরের প্রসারিত স্তর মূল শিলা হতে পৃথক হয়

ক. শিলার উর্ধ্ব প্রসারণ: দিনের বেলায় প্রখর সূর্যতাপে ভূত্বকের শিলাস্তর প্রসারিত হয়। যখন কোন কোন নগ্ন শিলাস্তরে সূর্যতাপ পতিত হয় তখন শিলা উত্তপ্ত হয়ে পার্শ্ব বা নিচের দিকে প্রসারিত না হতে পেরে উপরের দিকে প্রসারিত হয়। ফলে উপরের স্তর নিচের শিলাস্তর হতে স্তরে স্তরে বিচ্ছিন্ন হয় যাকে স্তর মোচন (Exfoliation) বলে। ইহা গ্রানাইট শিলায় অধিক দেখা যায়।



চিত্র-৩.২৮: স্তরমোচন

খ.শিলায় টানের সৃষ্টি: ক্রান্তীয় মরুঅঞ্চলে দিনের বেলা অধিক সূর্যতাপে শিলার উপরের স্তরে উত্তপ্ত হয় ও আয়তনে বৃদ্ধি পায়। কিন্তু শিলা তাপের সুপরিবাহী নয় বলে নিচেরস্তরে সমভাবে উত্তপ্ত হয় না ও আয়তনেও বাড়ে না। ফলে দুই স্তরের মধ্যে টানের সৃষ্টি হয় এবং সমান্তরাল ভাবে ফাটলের সৃষ্টি হয়। পাললিক শিলা দ্বারা গঠিত এলাকায় এটা দেখা যায়।



চিত্র-৩.২৯: প্রস্তর চাঁইএর বিচ্ছিন্নকরণ

গ.উষ্ণতার পার্থক্য: মরুঅঞ্চলে দিনে ও রাতে উষ্ণতার ব্যাপক পার্থক্যের জন্য শিলারশি সংকোচন ও প্রসারণ দ্বারা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে বালু, ধূলি, কঁকরে পরিণত হয়।

ঘ.শিলার সংকোচন: মরুঅঞ্চলে সূর্যতাপে শিলা প্রসারিত হয়। এ সময় হঠাৎ বৃষ্টি হলে শিলা দ্রুত শীতল হয়ে সংকুচিত হবার সময় ফেটে যায়।

ঙ.শিলার অসম সংকোচন ও প্রসারণ: শিলা বিভিন্ন খনিজ দ্বারা তৈরি যাদের ধর্ম ও গুণাগুণ ভিন্ন। ফলে দিনের পর দিন উত্তাপ ও অসম সংকোচন ও প্রসারণে শিলার ভিতর টানের সৃষ্টি হয় এবং শিলা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়।

২.তুষারের কার্য: নাতিশীতোষ্ণ ও উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলে বৃষ্টির পানি বা তুষার গলা পানি দিনে শিলার ফাটলে প্রবেশ করে এবং রাতে তাপমাত্রা খুব কমে গেলে তুষারে বা বরফে পরিণত ও আয়তনে বেড়ে যায়। ফলে বর্ধিত জায়গার জন্য শিলা চূর্ণ বিচূর্ণ হয়।

৩.বৃষ্টির পানি: বৃষ্টিবহুল অঞ্চলে পানি শিলা খণ্ডকে আঘাত করে, শিলার ভিতরে প্রবেশ করে এবং শিলা স্তরকে আর্দ্র করে শিলারশি চূর্ণ বিচূর্ণ করে থাকে।

৪.চাপ হ্রাস: বিচূর্ণীত শিলা কালক্রমে বায়ুপ্রবাহ, নদী, হিমবাহ ইত্যাদি দ্বারা অপসারিত হয়। ফলে উপরের শিলার চাপ হ্রাস পায়। ফলে নিচের শিলাস্তর প্রসারিত হয়ে ফেটে যায়।

৫.মাধ্যাকর্ষণ শক্তি: উচ্চ পর্বতগাত্র থেকে কোন প্রকাণ্ড শিলাখণ্ড আলগা হয়ে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে নিচে পতিত হয়। এতে ঐ খণ্ড নিচের শিলারও চূর্ণ বিচূর্ণ হয়। এছাড়াও অন্যান্য শিলাখণ্ডের সাথে সংঘর্ষে শিলা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়।

রাসায়নিক বিচূর্ণীভবন (Chemical Weathering)

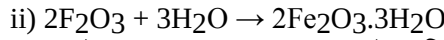
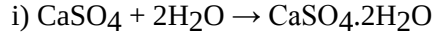
শিলা বিভিন্ন খনিজের সংমিশ্রণে তৈরি। এ সকল খনিজের ধর্ম ও গুণাগুণ ভিন্ন। শিলার এ সকল উপাদানের সাথে অক্সিজেন CO_2 , H_2O প্রভৃতির বিক্রিয়া ঘটে। তাই রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় শিলা রাশি চূর্ণ বিচূর্ণ হওয়াকে রাসায়নিক বিচূর্ণীভবন বলে। ইহা পাঁচ প্রকার—

১. জারণ বা অক্সিডেশন: স্বাভাবিক অবস্থায় অক্সিজেন শিলাকে চূর্ণবিচূর্ণ করতে না পারলেও বায়ুতে অধিক জলীয়বাষ্প থাকলে (বর্ষাকালে) তা রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় শিলাকে খণ্ড-বিখণ্ড করতে পারে। একে অক্সিডেশন বলে।

যেমন- লৌহের মরিচা বায়ুস্থিত লৌহের সাথে মিলিত হয়ে বাদামীকে হলুদ বর্ণের লিমোনাইট ($\text{Fe}_2\text{O}_3\cdot\text{H}_2\text{O}$) তৈরি করে।

২. কার্বনেশন বা অঙ্গার যোজন: CO_2 গ্যাস বৃষ্টির পানির সাথে মিশে কার্বনিক এসিডে ($\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} = \text{H}_2\text{CO}_3$) পরিণত হয়। এ এসিড কতগুলো ক্ষারকীয় শিলাকে (যেমন-Ca, Mg, K, Na, Fe দ্বারা গঠিত) বিচূর্ণীভূত বা বিশিষ্ট করতে পারে। যেমন- $\text{CaCO}_3 + \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 \rightarrow \text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$ (চুনাপাথর)।

৩. হাইড্রেশন বা জলযোজন: শিলার মধ্যস্থিত খনিজ পদার্থ যখন পানির সংস্পর্শে বিশেষভাবে পরিবর্তিত হয়, তখন তাকে হাইড্রেশন বলে। কোন কোন খনিজ বায়ু হতে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় পানি গ্রহণ করে আকারে বৃদ্ধি লাভ করে। ফলে শিলায় টানের সৃষ্টি হয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়। এ প্রক্রিয়ায় অ্যানহাইড্রাইট জিপসামে এবং হেমাটাইট লিমোনাইটে পরিণত হয়। যেমন—



৪. হাইড্রোলিসিস: এ প্রক্রিয়ায় পানি (H_2O) হাইড্রোজেন আয়ন (H^+) ও হাইড্রোক্সিল (OH^-) আয়নে ভেঙ্গে এবং OH^- খনিজের মধ্যে রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটায়। যেমন- আগ্নেয়শিলার দুটি খনিজ অর্ড ও ফেলসপারের রাসায়নিক পরিবর্তন অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন হয়।

৫. দ্রবণ (Solution): পানিতে খনিজ দ্রবীভূত হয় না বা গলে না। কিন্তু শিলাস্থ কোন কোন খনিজ রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে এমন এক অবস্থায় উপনীত হয় যে তখন তা সহজেই দ্রবীভূত হয়। যেমন- CaCO_3 যখন $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$ এ পরিণত হয় তখন তা পানিতে দ্রবীভূত হয়ে অপসারিত হয়। দ্রবণ পরোক্ষভাবে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটিয়ে থাকে।

জৈবিক বিচূর্ণীভবন (Biological Weathering)

মানুষ, উদ্ভিদ ও জীবজন্তুর দ্বারা শিলাকে চূর্ণ বিচূর্ণ হওয়াকে জৈবিক বিচূর্ণীভবন বলে।

- মানুষের কার্য: রাস্তাঘাট, খাল, বাড়ি-ঘর ইত্যাদি তৈরি দ্বারা মানুষ বিচূর্ণীভবনে সহায়তা করে থাকে।
- উদ্ভিদ: উদ্ভিদের শিকড় মাটির ভিতরে প্রবেশ করিয়ে শিলাকে আলগা করে। মস, শৈবাল, লাইকেন প্রভৃতি শিলার উপরিভাগে পানি আটকে রাখে। এগুলো পচে হিউমাস তৈরি করে। হিউমাস বৃষ্টির পানি সংস্পর্শে জৈবিক এসিড (Organic Acid) তৈরি করে। এ এসিড শিলাকে ক্ষয় করে। ফলে শিলা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়।



চিত্র-৩.৩০: শিকড়ের চাপে বিচূর্ণীভবন

- জীবজন্তুর কার্যাবলী: জীবজন্তু গর্ত করে শিলাকে চূর্ণবিচূর্ণ করে। যেমন- কেঁচো, উঁইপোকা, ইঁদুর, পিপড়া, শৃগাল, কুকুর, সজাবু, খরগোশ প্রভৃতি। এসকল প্রাণী প্রতিনিয়ত মাটিতে গর্ত করে শিলাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করছে।

৩.৬ বায়ুমণ্ডল, আবহাওয়া ও জলবায়ু; জলবায়ুর পরিবর্তন

পৃথিবী কিছু সংখ্যক অদৃশ্য গ্যাসের মিশ্রণ দ্বারা পরিবেষ্টিত। পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে উপর দিকে যে বায়বীয় বা গ্যাসীয় পদার্থের আবরণ সমগ্র পৃথিবীকে বেষ্টিত করে থাকে তা বায়ুমণ্ডল। বায়ুমণ্ডল নানা প্রকার গ্যাসীয় উপাদান দিয়ে গঠিত। যেমন- নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, আর্গন এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড ইত্যাদি। এসব পদার্থের পরিমাণ ৯৯.৯৮%। বায়ুমণ্ডলের এই গ্যাসসমূহ পৃথিবীতে বসবাসকারী প্রাণী ও উদ্ভিদজগতের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বেঁচে থাকার জন্য জীবজগত বায়ুমণ্ডলের অক্সিজেন গ্রহণ করে আর খাদ্য তৈরির জন্য উদ্ভিদ বায়ুমণ্ডলের কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্রহণ করে। এ প্রক্রিয়ায় বায়ুমণ্ডলীয় অক্সিজেন ও কার্বন ডাইঅক্সাইডের ভারসাম্য রক্ষা হয়। কোন কোন বিজ্ঞানী বায়ুমণ্ডলের গভীরতা ১০,০০০ কিলোমিটার বলে মত প্রকাশ করেছেন। আবার অনেক বিজ্ঞানী বায়ুমণ্ডলের গভীরতা ১০,০০০ কিলোমিটারের বেশি বলে মত প্রকাশ করেছেন। বায়ুমণ্ডলের উপাদানসমূহ গ্যাসীয়। আমরা জানি গ্যাসীয় পদার্থের ওজন আছে। যার ফলে উপাদানসমূহ অবিরতভাবে পৃথিবীপৃষ্ঠে চাপ সৃষ্টি করে চলেছে। পৃথিবীকে বেষ্টিনকারী এ বায়ুমণ্ডল কয়েকটি স্তরে বিন্যস্ত।

বায়ুমণ্ডলের উপাদান

বায়ুমণ্ডল কিছু সংখ্যক গ্যাসের সংমিশ্রণে গঠিত। এ সংমিশ্রণে ৭৮.০২% নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন ২০.৭১%। বাকি ১ভাগে আছে অন্যান্য গ্যাস যা ০.৯৩% জুড়ে রয়েছে। জীবকূলের শ্বাসগ্রহণ, দেহের শক্তি ও উত্তাপ তৈরির জন্য বায়ুমণ্ডলীয় অক্সিজেন অপরিহার্য।

বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন উপাদানের তালিকা

উপাদানের নাম	শতকরা হার (%)
নাইট্রোজেন	৭৮.০২
অক্সিজেন	২০.৭১
আর্গন	০.৮০
কার্বন ডাইঅক্সাইড	০.০৩
অন্যান্য গ্যাসসমূহ (নিয়ন, হিলিয়াম, ক্রিপটন, জেনন, ওজোন, মিথেন ও নাইট্রাস অক্সাইড)	০.০২
জলীয় বাষ্প	০.৪১
ধূলিকণা	০.০১
মোট = ১০০.০০	

- বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইড এর পরিমাণ অতি নগণ্য হলেও এটি সবুজ উদ্ভিদ কর্তৃক খাদ্য তৈরি ও জলবায়ু নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। কার্বন ডাইঅক্সাইড তাপ শোষণ করে এবং তাপমাত্রা পরিবহণ করে না। যার ফলে পৃথিবী পৃষ্ঠের কাছাকাছি বায়ুর তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।
- বায়ুমণ্ডলের অন্যান্য উপাদানের মধ্যে ওজোন গ্যাসের গুরুত্ব খুব বেশি। এ গ্যাসটি বায়ুমণ্ডলের নিম্নস্তরে অল্প পরিমাণ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু বায়ুমণ্ডলের উচ্চস্তরে প্রচুর পরিমাণে থাকে। এ গ্যাস সূর্যের অতি বেগুনি রশ্মি শোষণ ও প্রতিফলিত করে পৃথিবীতে প্রাণ ধারণের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করতে সাহায্য করে।
- বায়ুমণ্ডলের অন্যান্য গ্যাসসমূহ যেমন- নিয়ন, হিলিয়াম, ক্রিপটন, জেনন এর পরিমাণ অতি নগণ্য এবং বায়ুমণ্ডলে এদের পরিমাণের তেমন কোন পরিবর্তন হয় না।
- জলীয়বাষ্প বায়ুমণ্ডলের অতি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান এবং এর পরিমাণ ঋতুভেদে ও অঞ্চলভেদে কম বেশি হয়ে থাকে। জলীয়বাষ্পের প্রভাবে শিশির, কুয়াশা, মেঘ, বৃষ্টি, তুষারপাত প্রভৃতি সৃষ্টি হয়।
- ধূলিকণাও বায়ুমণ্ডলের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। যা বায়ুমণ্ডলের নিচের অংশে যথেষ্ট পরিমাণে থাকে। ধূলিকণা সাধারণত আগ্নেয়গিরির শিলাচূর্ণ ও ছাই, সমুদ্র তীরের ধূলাবালি, কলকারখানার পোড়া ছাই ইত্যাদি থেকে সৃষ্টি হয়ে বায়ুমণ্ডলে মিশে যায়।
- পৃথিবী পৃষ্ঠে বায়ুমণ্ডলের নানাবিধ উপাদান সূর্য রশ্মি শোষণের মাধ্যমে বায়ুমণ্ডলকে উত্তপ্ত রাখে। তবে এ সকল উপাদান বায়ুমণ্ডলের নিচের স্তরে বেশি এবং উপরের স্তরে কম থাকে। ফলে বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন উচ্চতায় তাপের পার্থক্য ঘটে।

বায়ুমণ্ডলের স্তরসমূহ

বায়ুমণ্ডলের স্তরসমূহকে চারটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন-

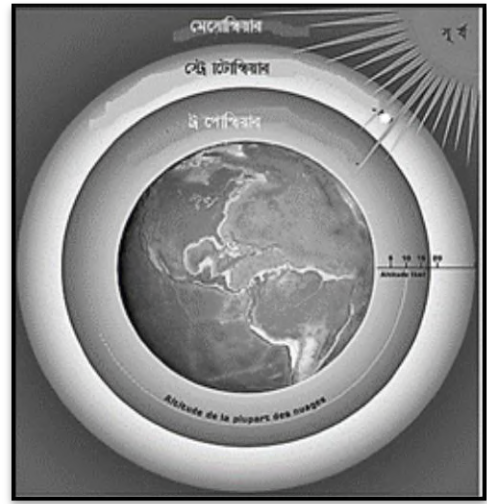
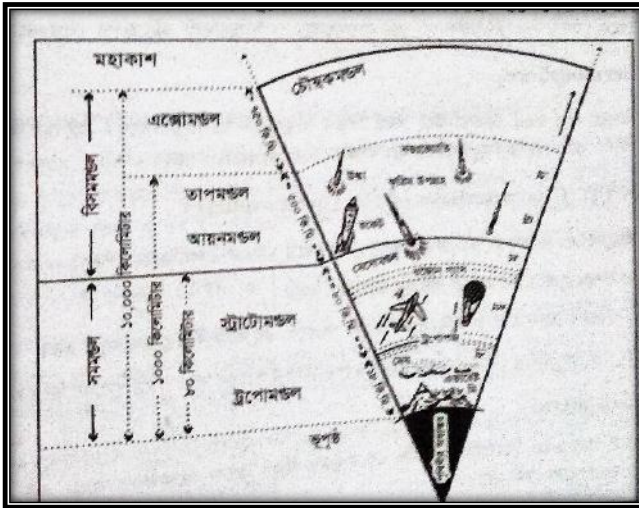
ট্রোপোস্ফিয়ার: পৃথিবী পৃষ্ঠের কাছাকাছি যে স্তরটি দেখা যাচ্ছে, তা ট্রোপোস্ফিয়ার। বায়ুর এ স্তর মানুষের জন্যে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কারণ এ স্তরের নিম্নভাগে মানুষসহ সকল প্রকার প্রাণী ও উদ্ভিদের বাসস্থান। মেঘ, বৃষ্টিপাত, বায়ুপ্রবাহ, কুয়াশা, ঝড় প্রভৃতি সবকিছুই এ স্তরে ঘটে থাকে।

স্ট্রাটোস্ফিয়ার: স্ট্রাটোস্ফিয়ারের বায়ুতে ধূলিকণা ও জলীয়বাষ্পের পরিমাণ অতি নগণ্য এবং মেঘ দেখা যায় না বললেই চলে। এ স্তরের উপরিভাগে ওজোন গ্যাসের স্তরটিই ওজোনোস্ফিয়ার। ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ২০ থেকে ৫০ কিলোমিটার উচ্চতার মধ্যে এ স্তরটি দেখা যায়। এ ওজোন স্তরটি সূর্যরশ্মির অতি বেগুনি রশ্মি শোষণ করে থাকে। এ স্তরটি না থাকলে সূর্যের অতি বেগুনি রশ্মির দহনে জীবদেহ দেহ পুড়ে যেত এবং সমস্ত প্রাণিকূল অন্ধ হয়ে যেত। ফলস্বরূপ পৃথিবী বসবাসের অনুপযোগী হয়ে যেত।

মেসোস্ফিয়ার: ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৫০ কিলোমিটার উপর থেকে প্রায় ৮০ কিলোমিটার পর্যন্ত মেসোস্ফিয়ার অবস্থিত। এ স্তরের উপর থেকে বায়ুমণ্ডলীয় তাপমাত্রা আবার বাড়তে থাকে।

থার্মোস্ফিয়ার: এ স্তরে এসে বায়ুর উষ্ণতা দ্রুত হারে বাড়তে থাকে বলে একে তাপমণ্ডলও বলা হয়। থার্মোস্ফিয়ারের উপরের স্তরটিকে এক্সোস্ফিয়ার বলে। এটি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের একেবারে বাইরের স্তর।

দুটি বায়ুমণ্ডলীয় স্তরের মধ্যবর্তী সংযোগ স্তর পজ (pause) বা স্থির স্তর রূপে অভিহিত করা হয়ে থাকে।



চিত্র-৩.৩১: বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন স্তরসমূহ

বায়ুমণ্ডলের গুরুত্ব

পৃথিবী বায়ুমণ্ডলীয় উপাদান দিয়ে পরিবেষ্টিত। আর তাই নানাদিক থেকে এ বায়ুমণ্ডল পৃথিবীর পরিবেশ উদ্ভিদ ও প্রাণী জীবনের উপর নানাভাবে প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

- বায়ুমণ্ডল একটি তাপ নিরোধক আবরণ, যা পৃথিবীর জীবকূলকে রক্ষা করার জন্যে সূর্যের তাপ শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।
- ওজোন বায়ুমণ্ডলের একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্যাস। এ গ্যাস সূর্যের অতি বেগুনি রশ্মিকে শোষণ ও প্রতিফলিত করে পৃথিবীতে প্রাণধারণের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করতে সাহায্য করে। এটি সূর্যরশ্মির প্রখরতা নষ্ট করে।
- অক্সিজেন, কার্বন ডাইঅক্সাইড, জলীয়বাষ্প বায়ুমণ্ডলের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। বায়ুতে অক্সিজেন আছে যা না থাকলে জীব বাঁচতে পারে না। কেননা অক্সিজেন প্রাণীর শ্বাসকার্যে সহায়ক, দেহের তাপ রক্ষা করে। কার্বন ডাইঅক্সাইড উদ্ভিদের খাদ্য প্রস্তুতে সাহায্য করে, তাপ সংরক্ষণ, জলবায়ু নিয়ন্ত্রণ ও প্রাণিকূলের জীবনধারণের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। আর জলীয়বাষ্প আছে বলেই মেঘের উদ্ভব হয় এবং ঐ মেঘ থেকেই বৃষ্টি হয় এবং বৃষ্টির জন্যে জীবজগৎ রক্ষা পায়।
- বায়ুমণ্ডলের মাধ্যমে শব্দতরঙ্গ সৃষ্টি হয় যার ফলে আমরা একজনের কথা অপরজন শুনতে পারি।
- বাতাসের ওজন ও চাপ আছে বলে পৃথিবীপৃষ্ঠে আমরা দাঁড়াতে পারি ও চলাফেরা করতে পারি।

আবহাওয়া ও জলবায়ু (Weather and Climate)

আবহাওয়া (Weather)

কোনো স্থান বা এলাকার দৈনন্দিন বা স্বল্প সময়ের (১-৭ দিন) তাপ, চাপ, বায়ু প্রবাহ, আর্দ্রতা ও বৃষ্টিপাতের গড় অবস্থাকে ঐ স্থান বা এলাকার আবহাওয়া বলে। যেমন- বাংলাদেশের কোনএকটি স্থানের আজকের দিনের তাপমাত্রা ২৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। অর্থাৎ আজ মোটামুটি গরম অনুভূত হবে। এটিকে আজকের দিনের উক্ত স্থানের আবহাওয়ার উপাদানের একটি অবস্থাকে বোঝায়। প্রতিনিয়ত আবহাওয়ার উপাদানের পরিবর্তন ঘটে। কারণ বায়ুর তাপমাত্রা, বায়ুর চাপ, বায়ুপ্রবাহ, বায়ুর আর্দ্রতা ও মেঘাচ্ছন্নতা, বারিপাত ইত্যাদি সব সময় এক রকম থাকে না। এ জন্য প্রত্যেক দেশের বড় বড় শহর ও বন্দরে এসব পরিমাপের জন্য আবহাওয়া অফিস আছে। দেশের বিভিন্ন অংশের আবহাওয়া অফিস থেকে ও দেশের প্রধান “আবহাওয়া পূর্বাভাস কেন্দ্র” থেকে সর্বদা আবহাওয়ার অবস্থা জানানো হয়। যার ফলে ঐ “আবহাওয়া পূর্বাভাস কেন্দ্র” থেকে অতি সহজেই আবহাওয়ার পূর্বাভাস বেতার, টেলিভিশন ও সংবাদপত্রের মাধ্যমে প্রচার করা সম্ভব হয়।

জলবায়ু (Climate)

কোন অঞ্চল বা দেশের দীর্ঘদিনের (৩০-৪০ বছরের) তাপ, চাপ, বায়ু প্রবাহ, আর্দ্রতা ও বৃষ্টিপাতের গড় অবস্থাকে ঐ অঞ্চল বা দেশের জলবায়ু বলে। অর্থাৎ আবহাওয়ার দীর্ঘ দিনের গড় অবস্থাই হলো জলবায়ু। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, বাংলাদেশের জলবায়ু ক্রান্তীয় প্রকৃতির। অর্থাৎ ক্রান্তীয় এলাকায় অবস্থিত হওয়ায় এই অঞ্চলের জলবায়ু যে বিশেষ প্রকৃতির হয়ে থাকে, বাংলাদেশে তাই প্রতিফলিত হয়।

আবহাওয়া ও জলবায়ু প্রধান উপাদানসমূহ (Elements of Weather and Climate)

আবহাওয়া ও জলবায়ুর কতগুলো প্রধান উপাদান আছে। এই সব উপাদানসমূহকে নিয়ন্ত্রণ করে অক্ষাংশ, ভূপৃষ্ঠের উচ্চতা, সমুদ্র থেকে দূরত্ব, বায়ুপ্রবাহের দিক, সমুদ্রস্রোত ইত্যাদি। আবহাওয়ার এই উপাদানসমূহ ও এদের নিয়ন্ত্রণকারী উপাদানসমূহের পরিবর্তনের সাথে সাথেকোন অঞ্চল/স্থান/জায়গার আবহাওয়া ও জলবায়ুর পরিবর্তন হয়।

আবহাওয়া ও জলবায়ুর উপাদানসমূহ নিম্নরূপ-

● বায়ুর তাপমাত্রা	● বায়ুর আর্দ্রতা
● বায়ুর চাপ	● মেঘাচ্ছন্নতা
● বায়ুপ্রবাহ	● বারিপাত ইত্যাদি

- **বায়ুর তাপমাত্রা (Heat of Air):** সূর্য থেকে আগত রশ্মির কারণে পৃথিবী পৃষ্ঠ উত্তপ্ত হয়। বায়ুমণ্ডলের এই তাপের তীব্রতা অর্থাৎ বায়ুর গরম বা ঠাণ্ডা অবস্থার মাত্রাই তাপমাত্রা।
- **বায়ুর চাপ (Air Pressure):** বায়ু উপরে, নিচে এবং চার পার্শ্বে চাপ দেয়, এ চাপকেই বায়ুচাপ বলে। বায়ুমণ্ডলীয় গ্যাসের কারণে চাপ সৃষ্টি হয় এবং নানা কারণে ভূপৃষ্ঠের সব জায়গায় বায়ুর চাপ সমান থাকে না।
- **বায়ুপ্রবাহ (Movement of Wind):** বায়ু সর্বদা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে প্রবাহিত হয়। অসম সূর্যরশ্মির পতনের কারণে তাপের পার্থক্য ঘটে, ফলশ্রুতিতে বায়ু চাপের পার্থক্য হয় এবং বায়ু প্রবাহের সৃষ্টি হয়।
- **বায়ুর দিক (Wind Direction):** বায়ু সর্বদা উচ্চ চাপ এলাকা থেকে নিম্ন চাপ এলাকার দিকে প্রবাহিত হয়।
- **বায়ুর আর্দ্রতা (Humidity of Air):** বায়ুতে জলীয় বাষ্পের উপস্থিতিতে বায়ুর আর্দ্রতা বলে। অর্থাৎ বায়ুর জলীয়বাষ্প ধারণ করাই আর্দ্রতা। যে বায়ুতে জলীয়বাষ্প থাকে না তাকে শুষ্ক বায়ু বলে।
- **বৃষ্টিপাত (Rainfall):** জলীয় বাষ্পপূর্ণ বায়ু উর্ধ্বে উঠে শীতল হয় ও পরে ক্ষুদ্র জলকণায় পরিণত হয়। পানি কণাগুলো বড় বড় বিন্দুতে পরিণত হলে নিজের ভারে বৃষ্টিরূপে ভূপৃষ্ঠে পতিত হয়।
- **মেঘাচ্ছন্নতা (Cloudiness):** মেঘ বা মেঘাচ্ছন্নতা হচ্ছে ক্ষুদ্র জলকণা যা শীতল বায়ুর সংস্পর্শে শিশিরাক্লে পৌছায় ও পরবর্তীতে ধূলিকণাকে আশ্রয় করে জমাট বেঁধে আকাশে ভেসে বেড়ায়। মেঘ পৃথিবীতে বৃষ্টিপাত ঘটানো ও কোনো অঞ্চলের উষ্ণতা নিয়ন্ত্রণে সরাসরি ভূমিকা রাখে।

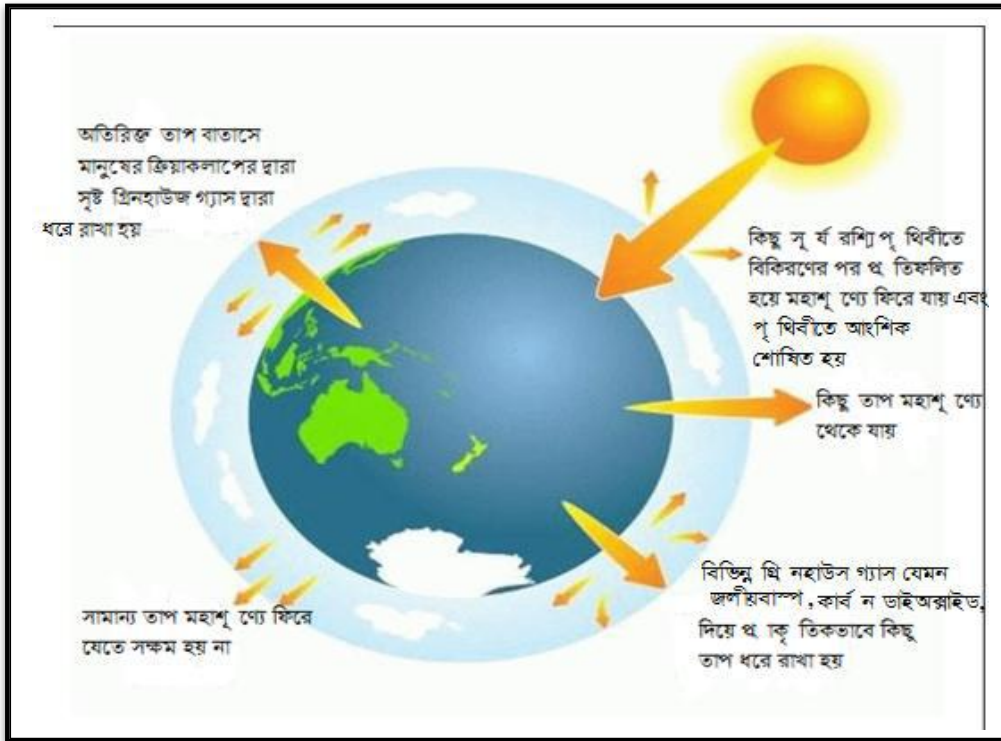
আবহাওয়া ও জলবায়ু পার্থক্য (Difference Between Weather and Climate)

খুব সাধারণভাবে আবহাওয়া এবং জলবায়ু সম্পর্কে বুঝতে আমরা বলতে পারি যে, আবহাওয়া হচ্ছে কোন একটি নির্দিষ্ট স্থানের নির্দিষ্ট সময়ের (সর্বোচ্চ ৭দিনের) বায়ুমণ্ডলের অবস্থা আর জলবায়ু হচ্ছে, কোন অঞ্চলের আবহাওয়া বা বায়ুমণ্ডলের উপাদানসমূহের দীর্ঘদিনের (কমপক্ষে ৩০ বছরের) গড় বা সাধারণ অবস্থা।

আবহাওয়া	জলবায়ু
আবহাওয়া সাধারণত কোন ক্ষুদ্র পরিসরে তাপ, চাপ, বায়ু প্রবাহ, বায়ুর দিক, আর্দ্রতা ও বৃষ্টিপাতের গড় অবস্থা নির্দেশ করে।	জলবায়ু মূলত কোন অধিক বিস্তৃত দেশ বা অঞ্চলের তাপ, চাপ, বায়ু প্রবাহ, আর্দ্রতা ও বৃষ্টিপাতের অবস্থা অর্থাৎ উক্ত স্থানের আবহাওয়ার দীর্ঘ দিনের গড় অবস্থা নির্দেশ করে।
আবহাওয়া দৈনন্দিন বা স্বল্প সময়ের (১-৭ দিনের) তাপ, চাপ, আর্দ্রতা, বায়ু প্রবাহ ও বৃষ্টিপাতের গড় অবস্থা।	জলবায়ু দীর্ঘ সময়ের (৩০-৪০) বছরের তাপ, চাপ, আর্দ্রতা, বায়ু প্রবাহ ও বৃষ্টিপাতের গড় বা সাধারণ অবস্থা।
আবহাওয়া প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল।	জলবায়ু দীর্ঘসময়ের প্রেক্ষিতে পরিবর্তিত হয়।
প্রতিঘণ্টা বা প্রতিদিনের আবহাওয়া পর্যালোচনা করে আবহাওয়ার গড় বের করা হয়।	কমপক্ষে ৩০ থেকে ৪০ বছরের আবহাওয়ার সাধারণ অবস্থা হলো জলবায়ু।

জলবায়ু পরিবর্তন

বিজ্ঞানীদের মতে, বহুকাল আগে থেকেই জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটে চলেছে। পৃথিবীর সকল শক্তির মূলেই রয়েছে সূর্য। সূর্যের আলো ও তাপ পৃথিবীর সকল প্রাণীর জীবনধারণে সাহায্য করে। পৃথিবীতে প্রতিদিন যে সূর্যকিরণ পৌঁছায়, ভূপৃষ্ঠ তা শোষণ করে। শোষিত সূর্যকিরণ আবার মহাশূন্যে বিকিরিত বা প্রতিফলিত হয়ে ফিরে যায়। এটাই প্রাকৃতিক নিয়ম। প্রাকৃতিক নিয়মের এ শোষণ-বিকিরণ প্রক্রিয়ায় কোনো ধরনের বাধা বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হলেই জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটে। জলবায়ু দীর্ঘসময়ের প্রেক্ষিতে পরিবর্তিত হয়। কিন্তু এ পরিবর্তন যখন স্বল্প বা সাময়িক না হয়ে দীর্ঘমেয়াদি পরিবর্তনে রূপ নেয় তখন তাকে জলবায়ু পরিবর্তন বলা যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কোন দেশের এক বা দুই বছরের তাপমাত্রা বা জলবায়ুর অন্যান্য উপাদানের আমূল পরিবর্তনকে জলবায়ু পরিবর্তন বলা যাবে না, কারণ তা দীর্ঘমেয়াদি নয়।



চিত্র-৩.৩২: জলবায়ু পরিবর্তনে প্রভাবকসমূহ

জলবায়ু পরিবর্তন একটি নিয়ত প্রাকৃতিক ঘটনা। কিন্তু বর্তমানে তা মানুষের কর্মকাণ্ড দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত। শিল্প বিপ্লবের পর থেকেই বায়ুমণ্ডলের তাপ ধরে রাখতে সক্ষম গ্যাসসমূহের পরিমাণ বাড়ছে। ফলে বাড়ছে পৃথিবীর তাপমাত্রা। বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় একে গ্রিনহাউস প্রভাব বলে। গত শতাব্দীতে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ বেড়েছে প্রায় ২৫%, নাইট্রাস অক্সাইডের পরিমাণ ১৯% এবং মিথেনের পরিমাণ ১০০%। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে যা বৈশ্বিক উষ্ণায়ন নামে অভিহিত। বৈশ্বিক উষ্ণায়ন আবহাওয়ার ধরণ এবং ঋতু বৈচিত্র্য পাল্টে দিচ্ছে। এর ফলে প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন- খরা, অতিবৃষ্টি, বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদি বেশি বেশি ঘটছে, ফলে ক্ষতির পরিমাণ বাড়ছে।

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রধান কারণ হলো বৈশ্বিক উষ্ণায়ন। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধিজনিত কারণে পৃথিবীর সর্বত্র জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটছে। আন্তঃরাষ্ট্রীয় জলবায়ু পরিবর্তন প্যানেল (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) এই উষ্ণতা বৃদ্ধির পিছনে মানুষের কর্মকাণ্ডকে মূলত দায়ী করেছে যা গ্রিনহাউস গ্যাসের পরিমাণ বৃদ্ধিতে প্রভাব ফেলছে। যদিও পৃথিবীর জলবায়ু পরিবর্তনের পিছনে কিছু প্রাকৃতিক কারণও দায়ী, কিন্তু তার প্রভাব অনেক কম ও অনেক দীর্ঘ প্রকৃতির। অর্থাৎ জলবায়ু পরিবর্তনের কারণগুলো হলো-

- প্রাকৃতিক কারণ
- মানুষের কর্মকাণ্ডজনিত কারণ

প্রাকৃতিক কারণ: আনুমানিক ৩০ লক্ষ বছর ধরে প্রাকৃতিক নিয়মেই বরফ যুগের আবির্ভাব ও পরিসমাপ্তি ঘটেছে। প্রাকৃতিক কারণগুলোর মধ্যে-পৃথিবীর জলবায়ুর উপর সৌরশক্তির (আলো ও তাপ) মাত্রার পরিবর্তন, সূর্যের তুলনায় পৃথিবীর কক্ষপথ ও পৃথিবীর অক্ষরেখার দিক পরিবর্তন, মহাসাগরীয় পরিবর্তন ও আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত মূলত দায়ী। সূর্য থেকে আগত শক্তির (আলো ও তাপ) মাত্রার পরিবর্তন, সৌরবিকিরণের যে অংশ প্রতিফলিত হয় তার পরিবর্তন এবং সূর্যের চারিদিকে পৃথিবীর কক্ষপথের পরিবর্তনের প্রভাব পৃথিবীর জলবায়ুর উপর রয়েছে। আবার বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাব যেমন পৃথিবী পৃষ্ঠে উল্কাপতন, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতে নির্গত উপাদানসমূহের কারণে বায়ুমণ্ডলের উপাদানে তারতম্য জলবায়ু পরিবর্তনে প্রভাব ফেলে।

মানুষের কর্মকাণ্ডজনিত কারণ: বিশেষজ্ঞরা মানুষের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণের পরিমাণ বৃদ্ধিকে বর্তমান কালের উষ্ণতা বৃদ্ধির মূল কারণ হিসেবে অভিহিত করেছেন।

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রমাণ

- পৃথিবীতে জলবায়ু পরিবর্তনের ঘটনাটি সংঘটিত হচ্ছে কারণ বিজ্ঞানীরা পরিমাপ করে দেখতে পেয়েছেন, পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা ধীরে ধীরে বাড়ছে। ফেব্রুয়ারি, ২০০৭ খ্রি. জলবায়ু পরিবর্তনের ইন্টারগভার্নমেন্টাল প্যানেল (IPCC) জাতিসংঘে রিপোর্ট করেন যে, নিঃসন্দেহে পৃথিবীর জলবায়ুর ধরন উষ্ণতর হচ্ছে।
- ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের জলবায়ুর প্রভাব বিষয়ক গবেষণা দলের (Climate Impact Group) তথ্য অনুযায়ী, উত্তর পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরের গড় বার্ষিক তাপমাত্রা বিংশ শতাব্দীতে ১.৫ ডিগ্রি ফারেনহাইট বেড়েছে এবং অনুমান করা হচ্ছে একবিংশ শতাব্দীর প্রথম ৫০ বছর প্রতি দশকে ০.৫ ডিগ্রি ফারেনহাইট করে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাবে।
- ১৯০০ সাল থেকে পৃথিবীর জলবায়ু উত্তপ্ত হচ্ছে। আমরা যদি জলবায়ু পরিবর্তনের ধারা পর্যবেক্ষণ করি, তাহলে এটিই প্রতীয়মান হবে যে জলবায়ু পরিবর্তনের সাধারণ প্রবণতা স্পষ্টভাবে উদ্ভ্রমণীয় অর্থাৎ এটি সাধারণভাবে উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে।

জলবায়ু পরিবর্তন কোন নির্দিষ্ট বা স্বতন্ত্র ঘটনা দিয়ে সরাসরি সম্পৃক্ত করা না গেলেও IPCC বিশ্বের জলবায়ু পরিবর্তনের অনেক প্রভাবের প্রমাণ দিয়েছেন। যেমন-

- সকল মহাদেশের পর্বত হিমবাহসমূহ অপসৃত হচ্ছে;
- আর্কটিক ও এন্টার্কটিক মহাদেশের বরফ খণ্ডসমূহ গলছে;
- বিংশ শতাব্দীতে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়েছে প্রায় ৬-৭ ইঞ্চি;
- অনেক অঞ্চলে ঘন ঘন বৃষ্টিপাত বা বন্যার ঘটনা (বৃষ্টিপাত বা Rainstorms, বন্যা বা Snowstorms) ঘটছে;
- ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় বিস্তৃত এলাকা জুড়ে আরো তীব্র খরার প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব

জলবায়ু পরিবর্তনের অন্যান্য মারাত্মক প্রভাব রয়েছে। ইতোমধ্যেই অনেক দেশ এবং জনগোষ্ঠী এর প্রভাবে দুর্যোগ পোহাচ্ছে।

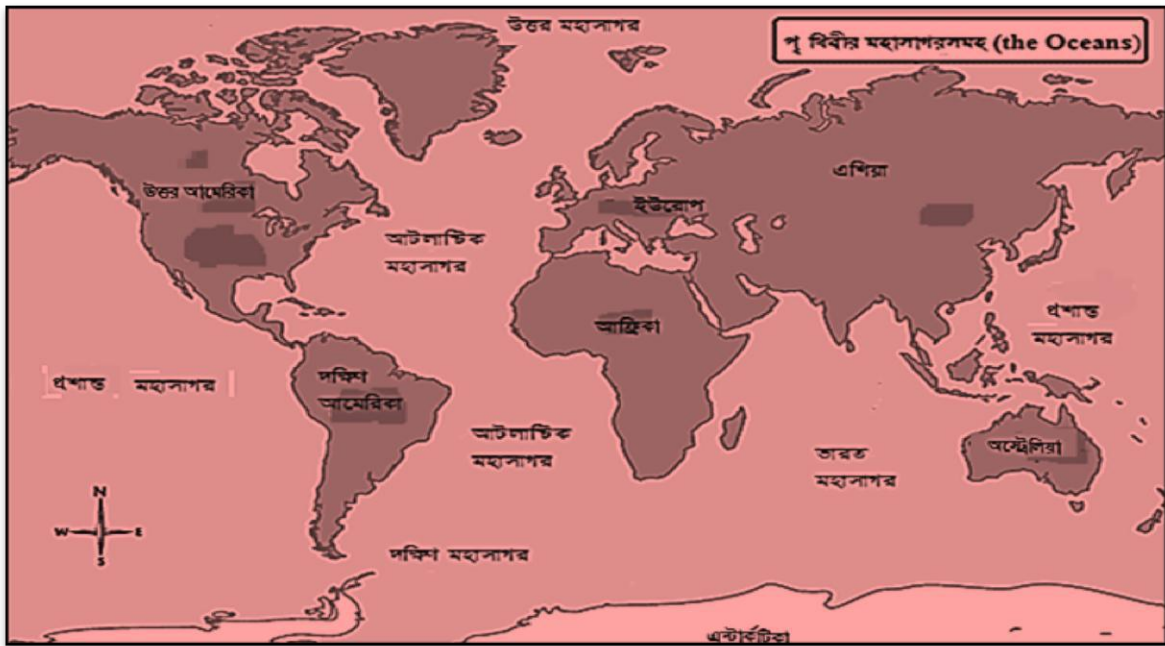
- জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবস্বরূপ কিছু জায়গায় বন্যা, খরা, লবণাক্ততা প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগের ভয়াবহতা অনেকাংশে বেড়ে যাবে;
- তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত, মাটির আর্দ্রতার সামান্য পরিবর্তন গুরুতরভাবে মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাপনকে ব্যাহত করবে;
- ফসলের উৎপাদন বিশেষ করে ধান বা গমজাতীয় খাদ্যের উৎপাদন মারাত্মকভাবে ব্যাহত হবে;
- পানি, স্বাস্থ্য, খাদ্য সবই আজ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে হুমকির সম্মুখীন;
- সর্বোপরি জলবায়ু পরিবর্তন মানুষের চারপাশের পরিবেশকে চরমভাবে বিপন্ন করে তুলতে পারে। অনেক বাস্তুতন্ত্র, জীব বৈচিত্র্য, প্রজাতি, সংস্কৃতি, সম্পদ হারিয়ে যেতে পারে।

জলবায়ু প্রকৃতি ও পরিবেশের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। কেননা জলবায়ুর উপর নির্ভর করে একটি অঞ্চল বা দেশের মানুষ ও অন্যান্য প্রাণির বেঁচে থাকা এবং খাদ্য উৎপাদন থেকে শুরু করে বনাঞ্চল, বাস্তুসংস্থান ইত্যাদি সকল ব্যবস্থাদি। আর তাই দীর্ঘমেয়াদি জলবায়ু পরিবর্তন দেশটির সামগ্রিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশের পরিবর্তন সাধন করে।

৩.৭ বারিমণ্ডল : মহাসাগর, সাগর ও উপসাগর

মহাসাগর (Oceans)

ভূপৃষ্ঠের বিশাল, বিস্তৃত, সুগভীর ও লবণাক্ত জলরাশিকে মহাসাগর বলে। পৃথিবীর প্রায় ৭১% জায়গা জুড়ে রয়েছে এ মহাসাগর। পৃথিবীর মহাসাগরসমূহের জলরাশির আয়তন প্রায় ১.৩৩২ বিলিয়ন কিউবিক কিলোমিটার। প্রতিটি মহাসাগরের তলে (ocean floor) রয়েছে বিশাল বিশাল পর্বতমালা, বিস্তীর্ণ অববাহিকা (পরিবাহক্ষত্র) এবং উপত্যকা। মহাসাগর শব্দটি এসেছে গ্রীক ‘ওকিয়ানোজ’ শব্দ থেকে। মানচিত্রে ভালোভাবে লক্ষ্যকরলে দেখা যায় মহাসাগরগুলোকে একটি থেকে অপরটিকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না, এজন্য মহাসাগরগুলোকে একত্রে অনেক সময় world ocean, or global ocean (বৈশ্বিক মহাসাগর) বলা হয়। জলভাগের মোট আয়তন ৩৬১,৪১৯,০০০ বর্গ কিলোমিটার (৭০.৯%) এবং মহাসাগরসমূহের আয়তন ৩৩৫,২৫৮,০০০ বর্গ কিলোমিটার।

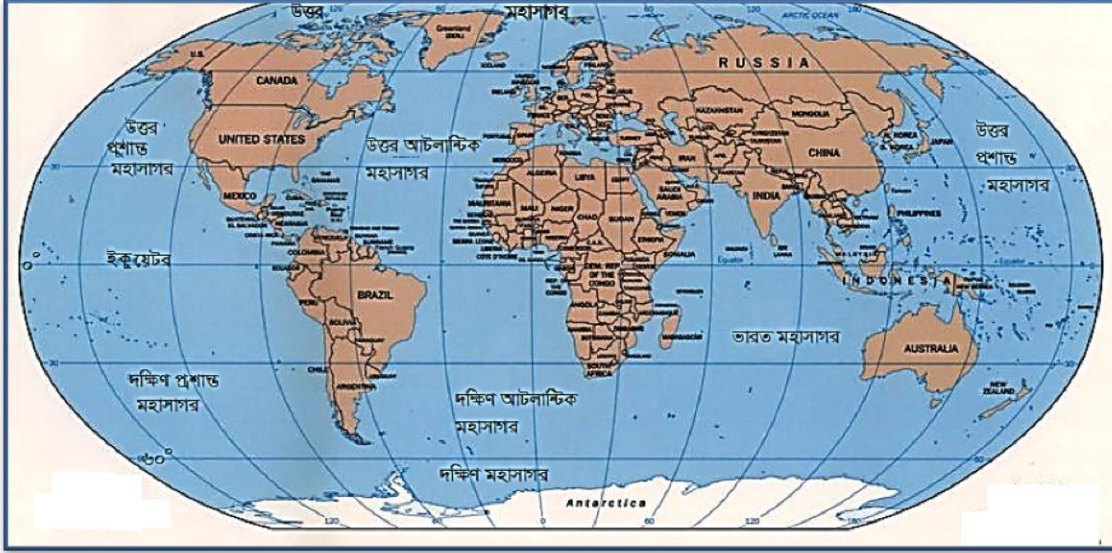


চিত্র-৩.৩৩: পৃথিবীর মহাদেশ ও মহাসাগরসমূহ

পৃথিবীর মহাসাগরসমূহ

পৃথিবীতে ৫টি মহাসাগর রয়েছে-

১. প্রশান্ত মহাসাগর (Pacific Ocean)
২. আটলান্টিক মহাসাগর (Atlantic Ocean)
৩. ভারত মহাসাগর (Indian Ocean)
৪. দক্ষিণ মহাসাগর (Southern Ocean)
৫. উত্তর মহাসাগর (Arctic Ocean)



চিত্র-৩.৩৪: পৃথিবীর মহাদেশ ও মহাসাগরসমূহ

১. প্রশান্ত মহাসাগর (Pacific Ocean)

এশিয়া মহাদেশকে উত্তর এবং দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশ হতে বিচ্ছিন্ন করেছে প্রশান্ত মহাসাগর। এর পূর্ব দিকে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা এবং পশ্চিমে এশিয়া ও অস্ট্রেলিয়া এবং দক্ষিণে এন্টার্কটিকা মহাদেশ। প্রশান্ত মহাসাগর উত্তরের আর্কটিক থেকে দক্ষিণে দক্ষিণ মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। বিষুবরেখা প্রশান্ত মহাসাগরকে দুইটি ভাগে ভাগ করেছে- উত্তর প্রশান্ত মহাসাগর এবং দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগর। প্রশান্ত মহাসাগরের আয়তন প্রায় ১৫ কোটি ৫৬ লক্ষ বর্গ কি. মি. এবং গড় গভীরতা প্রায় ৪,০২৮ মিটার। এটি পৃথিবীর বৃহত্তম মহাসাগর।



চিত্র-৩.৩৫: প্রশান্ত মহাসাগর এবং এর সাগরসমূহ

প্রশান্ত মহাসাগর সম্পর্কিত কিছু মৌলিক তথ্য

- ইংরেজি "প্যাসিফিক" মানে "শান্তিপূর্ণ"। কিন্তু পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি বড় বড় এবং শক্তিশালী ঝড় এ মহাসাগরের মাধ্যমে সৃষ্ট। এর সমুদ্রতলে হাজার হাজার আগ্নেয়গিরি আছে, প্রায়ই বড় বড় ভূমিকম্প ঘটে।
- পৃথিবীর প্রায় এক-তৃতীয়াংশ জুড়ে এ মহাসাগর অবস্থিত।
- সাতটি মহাদেশের একত্রিত ভাবে যে আয়তন তার থেকে এ মহাসাগরের আয়তন বেশি।
- এটি পৃথিবীর জলভাগের প্রায় ৪৬% এলাকা জুড়ে অবস্থিত।
- প্রশান্ত মহাসাগরের উত্তর-পশ্চিমে মারিয়ানা ট্রেঞ্চ (Mariana Trench) পৃথিবীর গভীরতম সমুদ্রখাত যার গভীরতা প্রায় ১১,০৩৩ মিটার।

২. আটলান্টিক মহাসাগর (Atlantic Ocean)

আটলান্টিক মহাসাগর উত্তর এবং দক্ষিণ আমেরিকাকে ইউরোপ এবং আফ্রিকা মহাদেশ হতে বিচ্ছিন্ন করেছে। এটি আফ্রিকা এবং ইউরোপ-এর পশ্চিমে এবং উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার পূর্ব পাশে অবস্থিত। আটলান্টিক মহাসাগরের উত্তর উত্তর-মহাসাগরের সাথে, দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত-মহাসাগরের সাথে, দক্ষিণ-পূর্ব ভারত-মহাসাগর এবং একবারে দক্ষিণ দক্ষিণ-মহাসাগরের সাথে যুক্ত। বিষুবরেখা এ মহাসাগরকে দুইটি ভাগে ভাগ করেছে- উত্তর আটলান্টিক মহাসাগর এবং দক্ষিণ আটলান্টিক মহাসাগর। আটলান্টিক মহাসাগরের আয়তন ৭ কোটি ৬৮ লক্ষ বর্গ কি. মি. এবং গড় গভীরতা প্রায় ৩,৯২৬ মিটার। এটি দ্বিতীয় বৃহত্তম মহাসাগর। আটলান্টিক মহাসাগর-এর নামের প্রথম অংশ গ্রিক পুরাণ অ্যাটলাস বোঝায়। এটি পৃথিবীর জলভাগের প্রায় ২৯% এলাকা জুড়ে অবস্থিত যা পৃথিবীর মোট জলভাগের প্রায় ছয় ভাগের একভাগ। আটলান্টিক মহাসাগর অনেকটা ইংরেজি S এর মত। পুয়ের্তোরিকো ট্রেঞ্চ (Puerto Rico Trench) আটলান্টিক মহাসাগরের গভীরতম খাত যার গড় গভীরতা প্রায় ৯,২১৯ মিটার। এ মহাসাগরের তলদেশের মধ্যভাগে শৈলশিরা (Mid-Atlantic Ridge) রয়েছে।

আটলান্টিক মহাসাগরের সাগর এবং উপসাগরসমূহ: বাল্টিকসাগর, কৃষ্ণ সাগর, ক্যারিবিয়ান সাগর, ভূমধ্যসাগর, উত্তরসাগর, লাব্রাডর সাগর, মেক্সিকো উপসাগর।

আটলান্টিক মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জসমূহ: আইসল্যান্ড, ফকল্যান্ড, জর্জিয়া, সেন্ট হেলেনস, বারমুডা (প্রবাল দ্বীপপুঞ্জ), ব্রিনিদাদ ও টোবাগো, কিউবা, বাহামা, জ্যামাইকা, হাইতি, কেপভার্ডি, পুয়ের্তোরিকো, ম্যাডিরা (আগ্নেয়গিরি দ্বারা গঠিত দ্বীপ) ইত্যাদি।



চিত্র-৩.৩৬: আটলান্টিক মহাসাগর

ভারত মহাসাগর (Indian Ocean)

ভারত মহাসাগর এশিয়ার দক্ষিণ অংশকে ঘিরে অবস্থিত এবং আফ্রিকা মহাদেশকে অস্ট্রেলিয়া হতে বিচ্ছিন্ন করেছে। ভারত মহাসাগর আয়তনে মহাসাগরগুলোর মধ্যে তৃতীয়। এর আয়তন প্রায় ৬ কোটি ৮৬ লক্ষ বর্গ কি. মি. এবং গড় গভীরতা প্রায় ৩,৯৬৩ মিটার। ভারত মহাসাগর পৃথিবীর জলভাগের প্রায় ২০% এলাকা জুড়ে অবস্থিত। সুন্ডাখাদ (৭,৭২৫ মিটার) এর গভীরতম সমুদ্রখাত।

ভারত মহাসাগরের সাগর এবং উপসাগরসমূহ: আরবসাগর, লোহিতসাগর, আন্দামানসাগর, জাভাসাগর, টাইমুরসাগর, বঙ্গোপসাগর, পারস্য উপসাগর, ওমানউপসাগর, এডেন উপসাগর।

ভারত মহাসাগরের দ্বীপসমূহ: আন্দামান এবং নিকোবর, মাদাগাস্কার (পৃথিবীর চতুর্থ বৃহত্তম দ্বীপ), মালদ্বীপ ও লাক্ষা (প্রবালদ্বীপ), শ্রীলংকা, মরিশাস, মোরতানিয়া, ভিক্টোরিয়া।



চিত্র-৩.৩৭: ভারত মহাসাগর

৪. দক্ষিণ মহাসাগর (Southern Ocean)

অনেক ক্ষেত্রে দক্ষিণ মহাসাগরকে প্রশান্ত মহাসাগর, আটলান্টিক মহাসাগর এবং ভারত মহাসাগরের বর্ধিত অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এটি এন্টার্কটিকা মহাদেশকে ঘিরে রেখেছে। দক্ষিণ মহাসাগর দক্ষিণ মেরু অঞ্চলে এন্টার্কটিকা মহাদেশকে ঘিরে অবস্থিত পৃথিবীর সর্বদক্ষিণস্থ জলরাশি। দক্ষিণ মহাসাগর এন্টার্কটিক মহাসাগর, দক্ষিণ মেরু মহাসাগর বা অস্ট্রাল মহাসাগর নামেও পরিচিত। এটি এন্টার্কটিকা উপকূল থেকে ৬০ ডিগ্রি দক্ষিণ অক্ষাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত। আয়তনে এটি পাঁচটি মহাসাগরের মধ্যে চতুর্থ। দক্ষিণ মহাসাগরের আয়তন প্রায় ২ কোটি ৩ লক্ষ বর্গ কি. মি. এবং গড় গভীরতা প্রায় ৪,০০০-৫,০০০ মিটার। দক্ষিণ মহাসাগর সারা বছর বরফে আচ্ছাদিত থাকে। অসংখ্য বড় বড় আইসবার্গ এবং প্রবল বাতাস এবং বিশাল বড় বড় ঢেউ প্রায় সব সময় দেখা যায়। দক্ষিণে স্যাণ্ডউইচ ট্রেঞ্চ এ মহাসাগরের সবচেয়ে গভীরতম খাত এবং গড় গভীরতা প্রায় ৭,২৩৫ মিটার।

দক্ষিণ মহাসাগরের সাগরসমূহ: আমুন্ডসেন সাগর, বেলিংহাউস সাগর, রস সাগর, স্কটিয়া সাগর, Weddell সাগর, কিং হ্যাকোন সাগর, Lazarev সাগর, ডেভিস সাগর ইত্যাদি।

দক্ষিণ মহাসাগরের দ্বীপসমূহ: কোলম্যান, প্রিন্স এডওয়ার্ড, রুজভেল্ট ইত্যাদি।



চিত্র-৩.৩৮: দক্ষিণ মহাসাগর

৫. উত্তর মহাসাগর (Arctic Ocean)

উত্তর মহাসাগরকে অনেক ক্ষেত্রে আটলান্টিক মহাসাগরের একটি সাগর হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। উত্তর মহাসাগর উত্তর মেয়ুর বেশির ভাগ অংশকে আচ্ছাদিত করে রেখেছে। উত্তর আমেরিকা, ইউরোপ এবং এশিয়া এ তিনটি মহাদেশের উত্তর দিকে অবস্থিত উত্তর মহাসাগর যা উত্তর মেরু অঞ্চল নামে পরিচিত। উত্তর মহাসাগর বা আর্কটিক মহাসাগর প্রায় সারা বছর ধরে বরফ দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে। এটি বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম মহাসাগর। উত্তর মহাসাগরের আয়তন প্রায় ১ কোটি ৪১ লক্ষ বর্গ কি. মি. এবং গড় গভীরতা প্রায় ৯৩০ মিটার।

উত্তর মহাসাগরের সাগরসমূহ: ব্যারেন্টস সাগর, বিউফোর্টসাগর, Chukchi সাগর, পূর্ব সাইবেরিয়ান সাগর, কারা সাগর, গ্রিনল্যান্ড সাগর, লেপটেভ সাগর, বাফিন উপসাগর, হাডসন উপসাগর ইত্যাদি।

উত্তর মহাসাগর দ্বীপসমূহ: প্যারাডীপ, ব্যাক্স দ্বীপ ইত্যাদি।



চিত্র-৩.৩৯: উত্তর মহাসাগর
পাঁচটি মহাসাগরের সর্বোচ্চ গভীরতম স্থান ও গভীরতা

ক্রমিক নং	মহাসাগরের নাম	সর্বোচ্চ গভীরতম স্থান	গভীরতা
১.	প্রশান্ত মহাসাগর	মারিয়ানা ট্রেঞ্চ (Mariana Trench)	প্রায় ১১,০৩৩ মিটার
২.	আটলান্টিক মহাসাগর	পুয়ের্তো রিকো ট্রেঞ্চ (Puerto Rico Trench)	প্রায় ৯,২১৯ মিটার
৩.	ভারত মহাসাগর	সুন্ডাখাদ/জাভাখাদ (Sunda Trench)	প্রায় ৭,৭২৫ মিটার
৪.	দক্ষিণ মহাসাগর	স্যান্ডউইচ ট্রেঞ্চ (Sandwich trench)	প্রায় ৭,২৩৫ মিটার
৫.	উত্তর মহাসাগর	ইউরেশিয়ান/আর্কটিক বেসিন (Arctic Basin)	প্রায় ৫,৪৫০ মিটার

সাগর (Seas) এবং উপসাগর (Bays and Gulfs)

পৃথিবীতে ৫টি মহাসাগর ছাড়াও আছে অসংখ্য সাগর (Seas) এবং উপসাগর (Bays and Gulfs)। সাধারণত সাগর বলতে বোঝায় মহাসাগরের সাথে যুক্ত লবণাক্ত জলের বৃহৎ জলরাশি। প্রতিটি মহাসাগরের সাথে অনেক সাগর এবং উপসাগর, উপত্যকা এবং প্রণালিযুক্ত থাকে।



চিত্র-৩.৪০: পৃথিবীর মহাদেশ, মহাসাগর ও সাগরসমূহ

সাগর এবং মহাসাগর-এর পার্থক্য

A sea is part of an ocean that is partially surrounded by land. An ocean is a body of salt water with no boundaries and limitless volume. It's limitless because with no boundaries, definitive quantity cannot be deduced. Between the two, the ocean is the larger of the two. Oceans are enormous when compared to any sea.

উপসাগর (Bay/Gulf)

উপসাগর হলো সাধারণত তিনদিকে স্থল দ্বারা বেষ্টিত এবং একদিকে সাগর বা মহাসাগরের সাথে সংযুক্ত লবণাক্ত জলভাগ। স্থলভাগের অভ্যন্তরে ব্যাপক অনুপ্রবেশের কারণে উপসাগরের পানি সাধারণত সাগর বা মহাসাগরের তুলনায় শান্ত হয়। আবার উপসাগরগুলো অন্য কোন উপসাগরের সঙ্গেও সংযুক্ত হয়। উদাহরণস্বরূপ জেমস উপসাগর হাডসন উপসাগরের সঙ্গে সংযুক্ত। অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত এবং অধিকতর গভীর উপসাগরগুলোকে ইংরেজিতে গালফ (gulf) বলা হয়। যেমন-পারস্য উপসাগর (Persian Gulf)। আবার অপেক্ষাকৃত ছোটো আকারের খাড়া পাড় বিশিষ্ট উপসাগরগুলো ইংরেজিতে জর্ড নামে পরিচিত। বাংলাদেশের দক্ষিণে অবস্থিত বঙ্গোপসাগর ভারত মহাসাগরের একটি উপসাগর (Bay)।

সারণি-২: এক নজরে মহাসাগর, সাগর এবং উপসাগর সম্পর্কিত কিছু মৌলিক তথ্য

মহাসাগর ও সাগরসমূহ	আয়তন	গড় গভীরতা	সর্বোচ্চ গভীরতম স্থান	
	বর্গ কি. মি.	মিটার	নাম	গড় গভীরতা (মিটার)
প্রশান্ত মহাসাগর Pacific Ocean	১৫৫,৫৫৭,০০০	৪,০২৮	মারিয়ানা ট্রেঞ্চ (Mariana Trench)	১১,০৩৩
আটলান্টিক মহাসাগর Atlantic Ocean	৭৬,৭৬২,০০০	৩,৯২৬	পুয়ের্তো রিকো ট্রেঞ্চ (Puerto Rico Trench)	৯,২১৯
ভারত মহাসাগর Indian Ocean	৬৮,৫৫৬,০০০	৩,৯৬৩	সুন্ডাখাদ Sunda Trench	৭,৪৫৫
দক্ষিণ মহাসাগর Southern Ocean	২০,৩২৭,০০০	৪,০০০-৫০০০	দক্ষিণ স্যান্ডউইচ ট্রেঞ্চ (South Sandwich Trench)	৭,২৩৫
উত্তর মহাসাগর Arctic Ocean	১৪,০৫৬,০০০	১,২০৫	৭৭°৪৫' উত্তর; ১৭৫° পশ্চিম	৫,৬২৫
ভূমধ্যসাগর Mediterranean Sea *	২,৯৬৫,৮০০	১,৪২৯	Off Cape Matapan, গ্রীস	৪,৬৩২
ক্যারিবিয়ান সাগর Caribbean Sea	২,৭১৮,২০০	২,৬৪৭	অফ কেম্যান দ্বীপপুঞ্জ	৬,৯৪৬
দক্ষিণ চীন সাগর South China Sea	২,৩১৯,০০০	১,৬৫২	পশ্চিম Luzon	৫,০১৬
বেরিংসাগর Bering Sea	২,২৯১,৯০০	১,৫৪৭	Off Buldir দ্বীপ	৪,৭৭৩
মেক্সিকো উপসাগর Gulf of Mexico	১,৫৯২,৮০০	১,৪৮৬	Sigsbee Deep	৩,৭৮৭
ওখটস্ক সাগর Okhotsk Sea	১,৫৮৯,৭০০	৮৩৮	১৪৬°১০'পূর্ব ৪৬°৫০' উত্তর	৩,৬৫৮
পূর্বচীনসাগর East China Sea	১,২৪৯,২০০	১৮৮	২৫°১৬' উত্তর; ১২৫° পূর্ব	২,৭৮২
হাডসন বে Hudson Bay	১,২৩২,৩০০	১২৮	প্রবেশ মুখ	১৮৩
জাপান সাগর Japan Sea	১,০০৭,৮০০	১,৩৫০	মধ্য বেসিন	৩,৭৪২
আন্দামান সাগর Andaman Sea	৭৯৭,৭০০	৮৭০	Off Car Nicobar Island	৩,৭৭৭
উত্তরসাগর North Sea	৫৭৫,২০০	৯৪	Skagerrak	৬৬০
লোহিতসাগর Red Sea	৪৩৮,০০০	৪৯১	Off Port Sudan	২২১১
বাল্টিকসাগর Baltic Sea	৪২২,২০০	৫৫	Off Gotland	৪২১

উৎস: <http://www.infoplease.com/ipa/A0001773.html#ixzz2HHnVGdxf>

৩.৮ সমুদ্র শ্রোত ও জোয়ার ভাঁটা

সমুদ্র শ্রোত

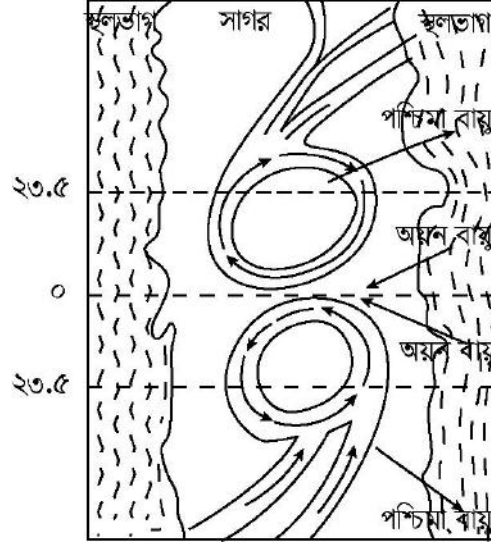
সমুদ্রের পানি কখনও এক স্থানে স্থির থাকে না, সর্বদা সমুদ্রের মধ্যে চলাচল করছে। বায়ু যেমন সর্বদা এক স্থান হতে অন্য স্থানে যায়, সমুদ্রের পানিও সমুদ্রের মধ্যে সর্বদা এক স্থান হতে অন্য স্থানে প্রবাহিত হয়। সমুদ্রের এক স্থান হতে অন্য স্থানে পানির নির্দিষ্ট ও নিয়মিত প্রবাহকে সমুদ্র-শ্রোত বলে। উদ্ভাপের তারতম্য অনুসারে শ্রোত দুপ্রকার। যেমন- উষ্ণশ্রোত ও শীতল শ্রোত।

An ocean current is any more or less permanent or continuous, directed movement of ocean water that flows in one of the Earth's oceans. The currents are generated from the force acting upon the water like the earth rotation, the wind, the temperature, and salinity differences and the gravitation of the moon.

সমুদ্র শ্রোতের কারণ

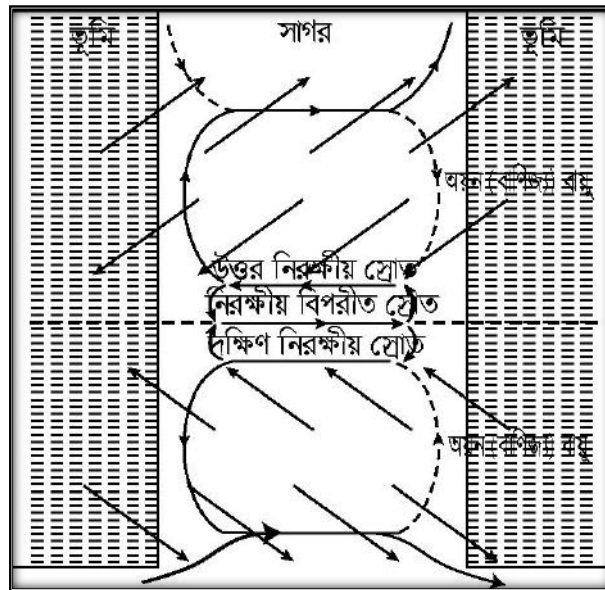
পানির স্বাভাবিক ধর্মই হচ্ছে তার উপরিভাগের সমতা রক্ষা করা। বিভিন্ন কারণে সমুদ্রের উপরিভাগের পানিরশির সমতার ব্যতিক্রম ঘটে। তখন পানির স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে সমুদ্রের এক স্থানের পানি অন্য স্থানে প্রবাহিত হয়। যেসব কারণে সমুদ্র শ্রোতের উৎপত্তি হয়, তাদের বিবরণ নিম্নে দেয়া হলো-

১.বায়ু প্রবাহ: সমুদ্র শ্রোতের উৎপত্তির প্রধান কারণ বায়ুপ্রবাহ। প্রধান প্রধান শ্রোতগুলোকে ভূপৃষ্ঠের প্রধান প্রধান বায়ু প্রবাহগুলোর পথ অনুসরণ করতে দেখা যায়। আয়ন বা বাণিজ্য বায়ু প্রবাহিত অঞ্চলে সমুদ্র শ্রোত পূর্ব হতে পশ্চিম দিকে এবং প্রত্যায়ন বা পশ্চিমা বায়ু প্রবাহিত অঞ্চলে পশ্চিম হতে পূর্বদিকে প্রবাহিত হয়। যেমন- উত্তর-পূর্ব আয়নবায়ু ও দক্ষিণ-পূর্ব আয়ন বায়ুর প্রবাহের প্রভাবে নিরক্ষীয় অঞ্চলে যথাক্রমে উত্তর নিরক্ষীয় শ্রোত এবং দক্ষিণ নিরক্ষীয় শ্রোতের উৎপত্তি হয়। আবার দক্ষিণ-পশ্চিম প্রত্যায়ন বায়ুর প্রভাবে উত্তর আটলান্টিক মহাসাগরের উপসাগরীয় শ্রোত এবং প্রশান্ত মহাসাগরের কুরোশিও শ্রোতদ্বয় উত্তর-পূর্বদিকে প্রবাহিত হয়। অনুরূপভাবে, উত্তর-পশ্চিম প্রত্যায়ন বায়ুর প্রভাবে ব্রাজিল, নিউসাউথ ওয়েলস শ্রোত দক্ষিণ-পূর্বদিকে বেকে কুমেৰু শ্রোতের সাথে মিলিত হয়।



চিত্র-৩.৪১: বায়ুপ্রবাহ দ্বারা সমুদ্রশ্রোতের উৎপত্তি হয়

২.পৃথিবীর আবর্তন: পৃথিবীর আবর্তনের ফলেও সমুদ্রশ্রোতের উৎপত্তি হয়। আর্হিক গতির জন্য সমুদ্রের উপরিভাগের তরল পানি পশ্চিম হতে পূর্বদিকে অগ্রসর হয়ে সমুদ্র শ্রোতের সৃষ্টি করে। এ কারণেই পৃথিবীর আবর্তনে সমুদ্র শ্রোত উত্তর গোলার্ধে ডানদিকে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে বামদিকে বেকে যায়।

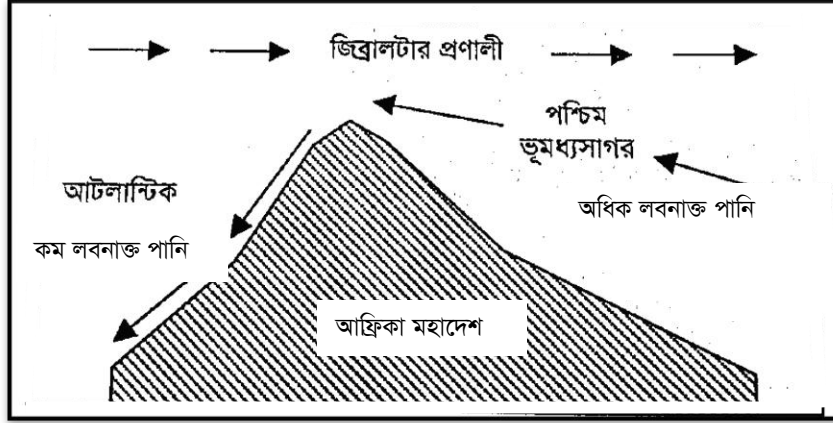


চিত্র-৩.৪২: পৃথিবীর আবর্তনের ফলে সমুদ্রশ্রোতের উৎপত্তি হয়

ফেরেল সূত্র অনুসারে সমুদ্র-শ্রোত উত্তর গোলাৰ্ধে ডান দিকে এবং দক্ষিণ গোলাৰ্ধে বাম দিকে বেঁকে প্রবাহিত হয়।

৩.উষ্ণতার তারতম্য: সমুদ্রের বিভিন্ন স্থানে উত্তাপের তারতম্যের দরুণও সমুদ্রশ্রোতের উৎপত্তি হয়। নিরক্ষীয় অঞ্চলে সূর্য লম্বভাবে কিরণ দেয় বলে সে স্থানের পানি উত্তপ্ত হয়। কিন্তু মেরু প্রদেশে সূর্যরশ্মি তির্যকভাবে পড়ে বলে ঐ স্থানের পানি শীতল থাকে। নিরক্ষীয় অঞ্চলে উষ্ণ পানি আয়তনে বৃদ্ধি পেয়ে হালকা হয় এবং সমুদ্রের উপরিভাগ দিয়ে উত্তর ও দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হতে থাকে। পক্ষান্তরে পানির সমতা রক্ষার্থে মেরু অঞ্চলের শীতল ও ভারী পানি সমুদ্রের তলদেশ দিয়ে নিরক্ষীয় প্রদেশে আসতে থাকে। এ ভাবে এ শ্রোতচক্রের উৎপত্তি হয়।

৪.লবণাক্ততার তারতম্য: সমুদ্রের পানি লবণাক্ত। কিন্তু এ লবণাক্ততার পরিমাণ সাগর-মহাসাগরের সর্বত্র সমান নহে। বৃষ্টিপাত, বাষ্পীভবন, নদ-নদী, বরফ-গলা পানি প্রভৃতি প্রাকৃতিক কারণে সমুদ্রের সর্বত্র লবণাক্ততার পরিমাণ সমান থাকে না। যেমন- নিরক্ষীয় অঞ্চলে অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত, অপেক্ষাকৃত স্থির বায়ুস্তর প্রভৃতি কারণে লবণাক্ততা কম। আবার মেরু অঞ্চলের দিকেও লবণাক্ততা হ্রাস পায়।



চিত্র-৩.৪৩: লবণাক্ততার তারতম্য

৫.স্থলভাগের অবস্থান: সমুদ্র শ্রোত প্রবাহিত হওয়ায় সময় তার সম্মুখে কোন স্থলভাগের অবস্থান থাকলে শ্রোতের দিক পরিবর্তিত হয়ে নতুন শ্রোতের উৎপত্তি হয়। আটলান্টিক মহাসাগরের দক্ষিণ শ্রোতটি দক্ষিণ আমেরিকার সেন্ট রক অন্তরীপে বাধা পেয়ে তা দুটি নতুন শ্রোতের সৃষ্টি করে।



চিত্র-৩.৪৪: স্থলভাগের অবস্থান

পশ্চিমা বায়ুর প্রভাবে কুমেরু শ্রোতের একটি শাখা আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে বাধা পাওয়ায় বেঙ্গুয়েলা শ্রোতের উৎপত্তি হয়েছে। অনুরূপভাবে স্থলভাগের অবস্থানের দরুন দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে পেরু এবং ভারত মহাসাগরে পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া শ্রোতের সৃষ্টি হয়েছে।

৬. অসমান বাষ্পীভবন: উষ্ণমণ্ডলে সূর্যের তাপ অধিক বলে তথায় সমুদ্রের পানি প্রচুর পরিমাণে বাষ্প হয়। কিন্তু শীতল বা নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে তাপ কম বলে সেখানে সমুদ্রের পানি খুব কমই বাষ্প হয়ে যায়। সূর্য তাপের পার্থক্যের জন্য সমুদ্রের বিভিন্ন অংশের মধ্যে বাষ্পীভবনের পার্থক্য হয়ে থাকে। যেমন- ভূমধ্যসাগরে অধিক বাষ্পীভবনের ফলে পানি কমে যায় এবং আটলান্টিক মহাসাগর হতে পানিশ্রোত এসে পানি রাশির সমতা রক্ষা করে।

৭. সমুদ্রের গভীরতা: সমুদ্রের গভীরতার জন্যও সমুদ্রশ্রোতের সৃষ্টি হয়। সমুদ্রের গভীরতার পার্থক্যের জন্য উষ্ণতার তারতম্য ঘটে। সমুদ্র যদি অগভীর হয় তবে তার পানি দ্রুত উত্তপ্ত হয়ে উপরে উঠে এবং শীতল পানি নিচে নেমে যায়। এতে উর্ধ্বগামী ও নিম্নগামী সমুদ্রশ্রোতের সৃষ্টি হয়। আবার গভীর সমুদ্রে সূর্যের কিরণ সমুদ্রের ২১০ মিটারের অধিক গভীরে প্রবেশ করতে পারে না। ফলে উক্ত গভীরতার পর সমুদ্রের পানির উষ্ণতা ক্রমশ কম হতে থাকে। এতে গভীর সমুদ্রের উপবিভাগ দিয়ে পৃষ্ঠশ্রোত এবং তলদেশ দিয়ে অন্তঃশ্রোত প্রবাহিত হয়।

প্রধান প্রধান সমুদ্রশ্রোত

পৃথিবীর প্রধান সমুদ্রশ্রোত ৩টি। এগুলো সমুদ্রশ্রোত হচ্ছে-

১. আটলান্টিক মহাসাগরীয় শ্রোত
২. প্রশান্ত মহাসাগরীয় শ্রোত
৩. ভারত মহাসাগরীয় শ্রোত



চিত্র-৩.৪৫: পৃথিবীর প্রধান সমুদ্রশ্রোত

১. আটলান্টিক মহাসাগরীয় শ্রোত

আটলান্টিক মহাসাগরে প্রধান দুটি শ্রোত দেখা যায়। যেমন- নিরক্ষরেখার দক্ষিণে ও উত্তরে অবস্থিত শ্রোতগুলোকে যথাক্রমে দক্ষিণ ও উত্তর আটলান্টিক মহাসাগরীয় শ্রোতের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

ক. দক্ষিণ আটলান্টিক মহাসাগরীয় শ্রোত

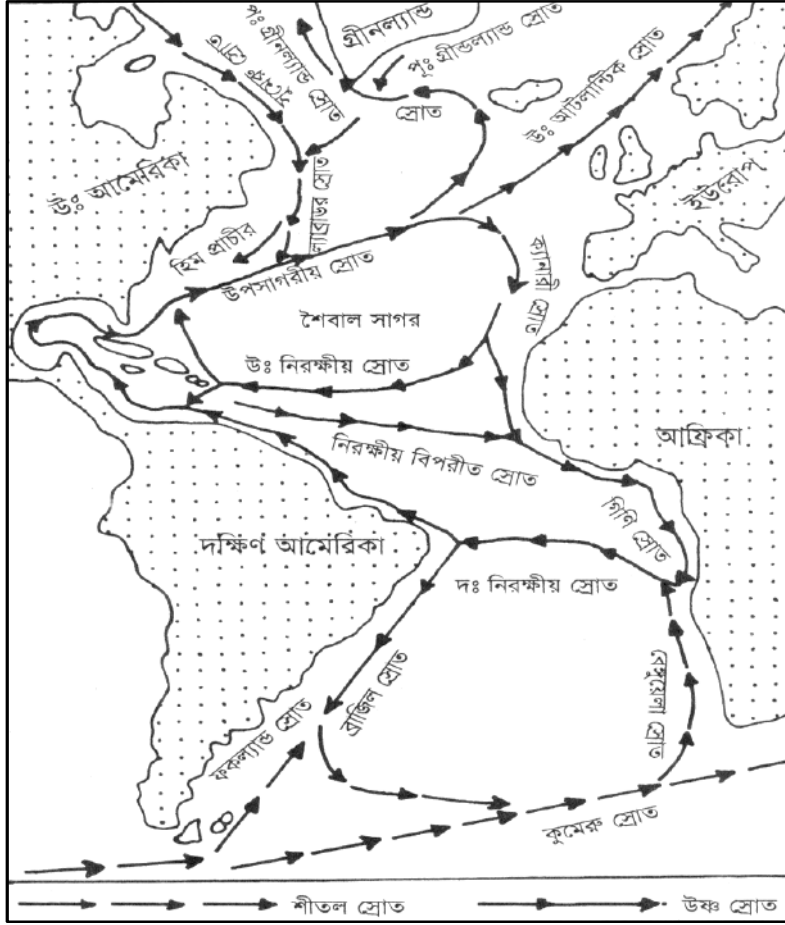
দক্ষিণ আটলান্টিক মহাসাগরীয় শ্রোতগুলোর বিবরণ নিম্নরূপ-

১. কুমেরু শ্রোত: প্রত্যাগন বায়ু বা পশ্চিমা বায়ুর প্রভাবে কুমেরু মহাসাগরে একটি শীতল শ্রোতের উৎপত্তি হয়। কুমেরু মহাসাগর হতে উৎপত্তি হয় বলে এটি কুমেরু শ্রোত নামে পরিচিত। একে পশ্চিমা শ্রোতও বলা হয়। কুমেরু মহাসাগরে উৎপত্তি হয় বলে এ শ্রোত অত্যন্ত শীতল।

২. বেঙ্গুয়েলা শ্রোত: কুমেরু শ্রোতের যে শাখাটি আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল বরাবর বেঙ্গুয়েলার নিকট দিয়ে সোজা উত্তর দিকে প্রবাহিত হয় তাকে বেঙ্গুয়েলা শ্রোত বলে। কুমেরু শ্রোত হতে উৎপত্তি হয় বলে এটি একটি শীতল শ্রোত।

৩. দক্ষিণ নিরক্ষীয় শ্রোত: বেঙ্গুয়েলা শ্রোত যখন নিরক্ষরেখার দক্ষিণ দিক দিয়ে সোজা পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয় তখন তাকে নিরক্ষীয় শ্রোত বলে। দক্ষিণ-পূর্ব আয়ন বায়ুর প্রভাবে এ শ্রোতের গতি বেশ বৃদ্ধি পায়। মহাসাগরের সবচেয়ে উষ্ণতম অঞ্চলের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয় বলে এটি একটি উষ্ণ শ্রোত।

৪.ব্রাজিল শ্রোত: দক্ষিণ নিরক্ষীয় শ্রোতের দ্বিতীয় শাখা ব্রাজিল শ্রোত নামে ব্রাজিলের পূর্ব উপকূল দিয়ে দক্ষিণ পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়। দক্ষিণে অগ্রসর হতে হতে এটি ক্রমশ শীতল হতে থাকে। শেষের দিকে এটি সম্পূর্ণরূপে একটি শীতল শ্রোতে রূপান্তরিত হয়।



চিত্র-৩.৪৬: আটলান্টিক মহাসাগরীয় শ্রোত

৫.ফকল্যান্ড শ্রোত: কুমেরু শীতল শ্রোতের একটি ক্ষুদ্র শাখা দক্ষিণ আমেরিকার পূর্ব উপকূল ফকল্যান্ড দ্বীপের নিকট উত্তর দিকে প্রবাহিত হয়। একে ফকল্যান্ড শ্রোত বলা হয়। এটি উত্তর দিকে অগ্রসর হয়ে অধিক শক্তিশালী ও বিপরীতমুখী ব্রাজিল শ্রোতের প্রভাবে তার মধ্যে বিলীন হয়ে যায়।

খ. উত্তর আটলান্টিক মহাসাগরীয় শ্রোত

দক্ষিণ আটলান্টিক অপেক্ষা উত্তর আটলান্টিক শ্রোতের সংখ্যা বেশি। নিচে এসব শ্রোতের বিবরণ দেয়া হলো-

১.উপসাগরীয় শ্রোত: দক্ষিণ নিরক্ষীয় শ্রোতের প্রধান শাখাটি নিরক্ষরেখা অতিক্রম করে দক্ষিণ আমেরিকার উত্তর উপকূল দিয়ে অগ্রসর হয়ে ক্যারিবিয়ান সাগরে প্রবেশ করে; যেখানে পূর্বদিক হতে আগত উত্তর নিরক্ষীয় শ্রোতের একটি শাখা শ্রোত এর সাথে মিলিত হয়। এ মিলিত শ্রোতটি কেইয়েন শ্রোত নামে তথা হতে আরও উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে মেক্সিকো উপসাগরে প্রবেশ করে। মেক্সিকো উপসাগরে উৎপত্তি হয় বলে এ শ্রোতের নাম উপসাগরীয় শ্রোত। এ শাখা শ্রোতগুলোর বিবরণ নিম্নরূপ-

i.উত্তর আটলান্টিক শ্রোত: উষ্ণ মহাসাগরীয় শ্রোতের যে শাখাটি পশ্চিমা বয়ুর দ্বারা তাড়িত হয়ে ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ এবং নরওয়ের পশ্চিম উপকূল দিয়ে উত্তর মহাসাগরে শেষ হয় তাকে উত্তর আটলান্টিক শ্রোত বলে।

ii.ক্যানারি শ্রোত: উষ্ণ উপসাগরীয় শ্রোতের দ্বিতীয় শাখাটি প্রথমে পূর্বদিকে অগ্রসর হয়ে পর্তুগালের উপকূলে পৌঁছে। সেখান হতে এ শ্রোত ফেরেলের সূত্র অনুসারে দক্ষিণ দিকে বেঁকে ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জের পার্শ্ব দিয়ে আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল হয়ে প্রবাহিত হয়। ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জের নিকট দিয়ে আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল হয়ে প্রবাহিত হয়। ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জের নিকট দিয়ে প্রবাহিত হয় বলে একে ক্যানারি শ্রোত বলে।

iii. **পশ্চিম গ্রিনল্যান্ড শ্রোত:** উষ্ণ উপসাগরীয় শ্রোতের উত্তরের শাখাটি আইসল্যান্ডের পশ্চিম পার্শ্বে পশ্চিম দিকে বেকে গ্রিনল্যান্ডের দক্ষিণে ফেয়ারওয়েল অন্তরীপ অতিক্রম করে এবং পরে বেফিন দ্বীপ ও গ্রিনল্যান্ডের মধ্যবর্তী ডেভিস প্রণালির মধ্য দিয়ে সোজা সাগরে গিয়ে শেষ হয়। এ শ্রোতটি গ্রিনল্যান্ডের পশ্চিম দিয়ে প্রবাহিত হয় বলে একে পশ্চিম গ্রিনল্যান্ড শ্রোত বলে।

২. **উত্তর নিরক্ষীয় শ্রোত:** নিরক্ষরেখার উত্তরে যে উষ্ণ শ্রোতটি পূর্ব হতে সোজা পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয় তাকে উত্তর নিরক্ষীয় শ্রোত বলে। মূলত এটি ক্যানারি শ্রোতের বর্ধিত অংশ। ক্যানারি শ্রোত দক্ষিণভিমুখী হলেই উত্তর পূর্ব আয়ন বায়ু এবং পৃথিবীর আবর্তনের প্রভাবে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে বেকে উত্তর নিরক্ষীয় শ্রোতে পরিণত হয়।

৩. **সুমেরু শ্রোত:** উত্তর মহাসাগর হতে গ্রিনল্যান্ডের দুটি দিক দিয়ে যে দুটি শীতল শ্রোত দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয় তাদের সুমেরু শ্রোত বলে। তবে গ্রিনল্যান্ডের পূর্ব উপকূলের শ্রোতটিকে পূর্ব গ্রিনল্যান্ড শ্রোতও বলা হয়।

৪. **ল্যাব্রাডার শ্রোত:** উত্তর মহাসাগর হতে আগত সুমেরু শীতল শ্রোত দুটি গ্রিনল্যান্ডের পূর্ব ও পশ্চিম পার্শ্ব দিয়ে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়ে ল্যাব্রাডার উপদ্বীপের নিকট মিলিত হয়। এ মিলিত শ্রোত শীতল ল্যাব্রাডার শ্রোত নামে পরিচিত।

৫. **গিনি শ্রোত:** নিরক্ষীয় বিপরীত শ্রোতটি আফ্রিকার পশ্চিমে এসে উত্তর হতে আগত ক্যানারি শ্রোতের একটি ক্ষুদ্র শাখা-শ্রোতের সাথে মিলিত হয় এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে বেকে গিনি উপসাগরে প্রবেশ করে। একে গিনি শ্রোত বলা হয়। এটি একটি উষ্ণ শ্রোত।

৬. **নিরক্ষীয় বিপরীত শ্রোত:** উত্তর ও দক্ষিণ নিরক্ষীয় শ্রোতের মধ্য দিয়ে যে উষ্ণ শ্রোতটি নিরক্ষরেখার উত্তর দিয়ে সোজা পশ্চিম হতে পূর্ব-দিকে প্রবাহিত হয় তাকে নিরক্ষীয় বিপরীত শ্রোত বলে।

২. প্রশান্ত মহাসাগরীয় শ্রোত

এ মহাসাগরের মধ্যে দিয়ে পূর্ব-পশ্চিমে নিরক্ষরেখা অবস্থান করায় এটি তিনটি অংশে বিভক্ত।

ক. দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় শ্রোত

খ. উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরীয় শ্রোত

গ. নিরক্ষীয় বিপরীত শ্রোত

ক. দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় শ্রোত

দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের শ্রোতগুলোর নিম্নরূপ-

১. **কুমেরু শ্রোত:** পশ্চিমা বায়ুর প্রভাবে কুমেরু মহাসাগরে একটি শীতল শ্রোতের সৃষ্টি হয়ে পশ্চিম হতে পূর্বদিকে প্রবাহিত হয়। এটি কুমেরু বা পশ্চিমা শ্রোত নামে পরিচিত।



চিত্র-৩.৪৭: প্রশান্ত মহাসাগরীয় শ্রোত

২. পেরু শ্রোত: কুমেরু শ্রোতের যে শাখাটি দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম উপকূল দিয়ে উত্তর দিকে প্রবাহিত হয় তাকে পেরু বা হামবোল্ড শ্রোত বলে। শীতল কুমেরু শ্রোত হতে উৎপন্ন হওয়ায় এটি একটি শীতল শ্রোত।

৩. দক্ষিণ নিরক্ষীয় শ্রোত: পেরু শ্রোত উত্তর দিকে প্রবাহিত হয়ে নিরক্ষরেখার নিকটবর্তী হলে দক্ষিণ-পূর্ব আয়ন বায়ু ও পৃথিবীর আবর্তন গতির প্রভাবে উত্তর-পশ্চিম দিকে বেঁকে যায়। পরে দক্ষিণ নিরক্ষীয় শ্রোত নামে নিরক্ষরেখার দক্ষিণ দিয়ে সোজা পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়। এটি একটি উষ্ণ শ্রোত।

৪. নিউ সাউথ ওয়েলস শ্রোত: দক্ষিণ নিরক্ষীয় শ্রোতের যে শাখাটি দক্ষিণে বেঁকে অস্ট্রেলিয়ার পূর্ব উপকূল দিয়ে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হয় তাকে নিউ সাউথ ওয়েলস শ্রোত বলে। একে পূর্ব অস্ট্রেলিয়া শ্রোতও বলা হয়। এ শ্রোতটিকে আটলান্টিক মহাসাগরের ব্রাজিল শ্রোতের সাথে তুলনা করা চলে। এটি একটি উষ্ণ শ্রোত।

খ. উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরীয় শ্রোত

নিরক্ষরেখার উত্তর দিয়ে যেসব শ্রোত প্রবাহিত হয় তারা সাধারণত উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরীয় শ্রোতের অন্তর্ভুক্ত। যথা-

১. উত্তর নিরক্ষীয় শ্রোত: নিরক্ষরেখার উত্তর দিয়ে যে শ্রোতটি প্রশান্ত মহাসাগরের পূর্ব হতে সোজাসুজি পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয় তাকে উত্তর নিরক্ষীয় শ্রোত বলে। বস্তুত এটা ক্যালিফোর্নিয়া শ্রোতের বর্ধিত অংশ।

২. কুরোশিও বা জাপান শ্রোত: দক্ষিণ নিরক্ষীয় শ্রোতের তৃতীয় শাখা নিরক্ষরেখা অতিক্রম করে উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হওয়ার সময় উত্তর নিরক্ষীয় শ্রোতের সাথে মিলিত হয়। এ মিলিত শ্রোত এশিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে জাপানের পার্শ্ব দিয়ে জাপান বা কুরোশিও শ্রোত নামে উত্তর-পূর্ব দিকে অগ্রসর হয়।

৩. পশ্চিমা শ্রোত: দক্ষিণ-পশ্চিম প্রত্যায়ন বায়ু বা পশ্চিমা বায়ু দ্বারা তড়িত হয়ে কুরোশিও শ্রোত জাপানের পূর্ব উপকূল হতে উত্তর-পূর্ব দিকে অগ্রসর হয়। অতঃপর এটি পূর্বদিকে বেঁকে প্রশান্ত মহাসাগর অতিক্রম করে কানাডার পশ্চিম উপকূলে উপনীত হয়। উত্তর মহাসাগরের এ শ্রোতটিকে পশ্চিমা শ্রোত বা উত্তর প্রশান্ত শ্রোত বলা হয়। এটি একটি উষ্ণ শ্রোত।

৪. আলাস্কা শ্রোত: পশ্চিমা যে শাখাটি উত্তর দিকে বেঁকে আলাস্কা উপসাগরে প্রবেশ করে তাকে আলাস্কা শ্রোত বলা হয়। এ শ্রোতটি পরে আলাস্কা উপকূল দিয়ে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয় এবং অ্যালিউসিয়ান দ্বীপপুঞ্জের দক্ষিণে দক্ষিণ দিকে বেঁকে একটি চক্রাকার শ্রোতরূপে পশ্চিমা শ্রোতের সাথে মিলিত হয়। এটি একটি উষ্ণ শ্রোত।

৫. ক্যালিফোর্নিয়া শ্রোত: পশ্চিমা শ্রোতের যে শাখাটি উত্তর আমেরিকার পশ্চিম উপকূল বেয়ে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয় তাই ক্যালিফোর্নিয়া শ্রোত। পৃথিবীর আবর্তন গতি ও উত্তর-পূর্বে আয়ন বায়ুর প্রভাবে এ শ্রোতটি ডানদিকে আবর্তনকালে পশ্চিম দিকে যেতে থাকে এবং শেষে উত্তর নিরক্ষীয় শ্রোতের সাথে মিলিত হয়।

৬. কামচাটকা বা সুমেরু শ্রোত: মেরুদেশীয় বায়ু, পানির উষ্ণতা ও লবণাক্ততার পার্থক্যের জন্য উত্তর মহাসাগরে একটি শীতল সুমেরু শ্রোতের সৃষ্টি হয়। এ শ্রোতটি বেরিং শ্রোত নামে বেরিং প্রণালির মধ্য দিয়ে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হয়। এর পর কামচাটকা শ্রোত নামে কামচাটকার পার্শ্ব দিয়ে ওখটস্ক সাগরে প্রবেশ করে। সেখান হতে বের হয়ে এটি সাখালীন ও হোঙ্কাইডো দ্বীপদ্বয়ের পূর্ব পার্শ্ব দিয়ে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়। হোঙ্কাইডোর পূর্ব পার্শ্বে এটা ওয়াশিও শ্রোত নামে পরিচিত।

৭. সুশিমা শ্রোত: এ শ্রোতটি কুরোশিও শ্রোতের একটি ক্ষুদ্র শাখা। এটি জাপানের দক্ষিণে কুরোশিও শ্রোত হতে উৎপন্ন হয়ে জাপানের পশ্চিম পার্শ্ব দিয়ে উত্তর দিকে অগ্রসর হয়। পরে এটি হনসু ও হোঙ্কাইডোর মাঝখান দিয়ে পূর্বদিকে কুরোশিও শ্রোতের সাথে মিলিত হয়। উষ্ণ কুরোশিও শ্রোতের শাখা বলে এটিও একটি উষ্ণ শ্রোত।

গ. নিরক্ষীয় বিপরীত শ্রোত

উত্তর ও দক্ষিণ নিরক্ষীয় শ্রোতের মধ্য দিয়ে যে উষ্ণ শ্রোতটি পশ্চিম হতে পূর্বদিকে প্রবাহিত হয়, তাকে নিরক্ষীয় বিপরীত শ্রোত বলে। প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যে এটি দীর্ঘতম শ্রোত। ফিলিপাইনের পূর্ব উপকূল হতে সুদীর্ঘ ১২,৮০০ কি. মি. (৮,০০০ মাইল) পথ অতিক্রম করে মধ্য আমেরিকার পশ্চিম উপকূল পর্যন্ত প্রবাহিত হয়। এটি প্রায় ৫° উত্তর অক্ষাংশের উপর অবস্থান করে। এ শ্রোতটি আটলান্টিকের নিরক্ষীয় বিপরীত শ্রোত অপেক্ষা অধিক শক্তিসম্পন্ন। কারণ প্রশান্ত মহাসাগর আটলান্টিক মহাসাগর হতে অধিক প্রশস্ত।

৩. ভারত মহাসাগরীয় শ্রোত

নিচে ভারত মহাসাগরীয় শ্রোতগুলোর বর্ণনা দেয়া হলো-

ক. দক্ষিণ ভারত মহাসাগরীয় শ্রোত

১. কুমেরু বা পশ্চিমা শ্রোত: প্রবল পশ্চিমা বায়ুর তাড়নায় কুমেরু মহাসাগরের একটি শীতল শ্রোত পশ্চিম হতে পূর্বদিকে প্রবাহিত হয়। এ শ্রোতটি কুমেরু বা পশ্চিমা শ্রোত নামে পরিচিত। এটি পশ্চিমা বায়ুর প্রভাবে সমগ্র দক্ষিণ ভারত মহাসাগর অতিক্রম করে অস্ট্রেলিয়ার উপকূলে উপনীত হয়ে দুটি শাখায় বিভক্ত হয়।

২. পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া শ্রোত: কুমেরু শ্রোতের যে শাখাটি অস্ট্রেলিয়ার পশ্চিম উপকূল দিয়ে উত্তর দিকে প্রবাহিত হয় তা পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া শ্রোত নামে পরিচিত। এটি আটলান্টিক মহাসাগরের বেসুয়েলা এবং প্রশান্ত মহাসাগরের পেরু শ্রোতের অনুরূপ।

৩. দক্ষিণ নিরক্ষীয় শ্রোত: দক্ষিণ-পূর্ব আয়ন বায়ু এবং পৃথিবীর আবর্তন গতির প্রভাবে পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া শ্রোতটি পশ্চিম দিকে বেকে প্রবাহিত হতে থাকে। ঐ সময় অস্ট্রেলিয়ার নিউগিনির নিকটবর্তী টরেন্স প্রণালির মধ্য দিয়ে প্রশান্ত মহাসাগরের দক্ষিণ নিরক্ষীয় শ্রোতের একটি শাখা এসে এর সাথে মিলিত হয়। পরে এ মিলিত শ্রোত দক্ষিণ নিরক্ষীয় শ্রোত নামে সোজা পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়।



চিত্র-৩.৪৮: ভারত মহাসাগরীয় শ্রোত (গ্রীষ্মকালীন)

৪ মোজাম্বিক ও মাদাগাস্কার শ্রোত: দক্ষিণ নিরক্ষীয় শ্রোতের যে শাখাটি মাদাগাস্কার (বা মালাগাছি) দ্বীপের পূর্ব পার্শ্ব দিয়ে দক্ষিণে প্রবাহিত হয় তাকে মাদাগাস্কার শ্রোত (বা মালাগাছি শ্রোত) বলা হয়। অপরদিকে মালাগাছি ও আফ্রিকার মধ্যবর্তী মোজাম্বিক প্রণালির মধ্য দিয়ে যে শাখাটি দক্ষিণে প্রবাহিত তাকে মোজাম্বিক শ্রোত বলে। এরাও উষ্ণ শ্রোত।

৫. আণ্ডলহাস শ্রোত: মালাগাসি দ্বীপের দক্ষিণে মোজাম্বিক এবং মাদাগাস্কার (বা মালাগাছি) শ্রোত মিলিত হয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়। এ মিলিত শ্রোতটিকে আণ্ডলহাস শ্রোত বলা হয়। এটি একটি উষ্ণ শ্রোত।

খ. উত্তর ভারত মহাসাগরীয় শ্রোত

১. সোমালী শ্রোত: ভারত মহাসাগরের দক্ষিণ নিরক্ষীয় শ্রোতের যে শাখাটি মালাগাছি দ্বীপের উত্তর হতে পশ্চিম দিকে বেকে আফ্রিকার পূর্ব উপকূলে সোমালিয়ার পার্শ্ব দিয়ে সোজা উত্তর দিকে প্রবাহিত হয় তাই সোমালী শ্রোত নামে পরিচিত। এটি একটি উষ্ণ শ্রোত।

২. মৌসুমী শ্রোত: মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে উত্তর ভারত মহাসাগরের উত্তর উপকূল বরাবর যে শ্রোত প্রবাহিত হয় তাই মৌসুমি শ্রোত। গ্রীষ্মকালে এটি পশ্চিম হতে পূর্বদিকে এবং শীতকালে একই পথে বিপরীত দিকে প্রবাহিত হয়। তাই মৌসুমি শ্রোত দুপ্রকার-

i. গ্রীষ্মের মৌসুমি শ্রোত: গ্রীষ্মকালে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে সোমালী শ্রোত আফ্রিকার পূর্ব উপকূল হতে প্রথমে আরব সাগরে প্রবেশ করে। সেখান হতে এ শ্রোত ভারতের পশ্চিম উপকূল দিয়ে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হয় এবং শ্রীলংকার দক্ষিণ-পূর্বদিক ঘুরে ভারতের পূর্ব উপকূল দিয়ে বঙ্গোপসাগরে প্রবেশ করে। এটাই গ্রীষ্মের মৌসুমি শ্রোত নামে পরিচিত। একে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি শ্রোতও বলা হয়।



চিত্র-৩.৪৯: ভারত মহাসাগরীয় শ্রোত (শীতকালীন)

ii. শীতকালীন মৌসুমি শ্রোত: শীতকালে উত্তর-পূর্ব মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে গ্রীষ্মকালীন মৌসুমি শ্রোতটি আর থাকে না। এরপথ ধরে একটি বিপরীতমুখী শ্রোতের সৃষ্টি হয়। এটাই শীতকালীন মৌসুমি শ্রোত বা উত্তর পূর্ব মৌসুমি শ্রোত।

iii. ভারত মহাসাগরীয় বিপরীত শ্রোত: শীতকালীন মৌসুমি শ্রোতটি আফ্রিকার সোমালিয়ার দক্ষিণে পৌঁছে পূর্বদিকে বেঁকে যায় এবং নিরক্ষরেখা বরাবর সোজা পূর্বদিকে প্রবাহিত হয়। পরিশেষে এ শ্রোতটি ভারত মহাসাগরের পূর্ব উপকূলে অবস্থিত সুমাত্রা দ্বীপের নিকট পর্যন্ত অগ্রসর হয় এবং দক্ষিণে বেঁকে দক্ষিণ নিরক্ষীয় শ্রোতের সাথে মিলিত হয়। এটাই ভারত মহাসাগরীয় বিপরীত শ্রোত।

সমুদ্র শ্রোতের প্রভাব বা ফলাফল

সমুদ্র-শ্রোতের প্রভাব বিভিন্নরূপে দেখা যায়। পৃথিবীর নানা স্থানে উষ্ণ ও শীতল শ্রোতের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়। সমুদ্র শ্রোতকে মানুষ বিভিন্নভাবে ব্যবহার করেছে। দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ও জলবায়ু ইত্যাদির উপর সমুদ্র-শ্রোতের ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। যেমন-

ক.বাণিজ্যের উপর প্রভাব: ব্যবসা-বাণিজ্যের ওপর সমুদ্র শ্রোতের প্রভাব নিচে আলোচিত হলো-

১.নাতিশীতোষ্ণ এবং হিমমণ্ডলের অনেক সমুদ্রে শীতকালে পানি জমে বরফ হয়ে যায়। এরূপ অঞ্চলে উষ্ণ শ্রোত প্রবাহিত হলে সমুদ্রের পানি বরফে পরিণত হতে পারে না। উপসাগরীয় উষ্ণ শ্রোতের প্রভাবে নরওয়ের উত্তর উপকূলে শীতকালের বরফ জমে না, তাই বন্দরগুলোর পথ বন্ধ হতে পারে না।

২. সামুদ্রিক জাহাজ চলাচলের উপর সমুদ্র শ্রোতের যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। শ্রোতের অনুকূলে জাহাজ চালিয়ে অতি শীঘ্রই গন্তব্য স্থানে যাওয়া যায়। এতে সুলভে মালপত্র রপ্তানি ও আমদানি করা সহজ হয়। কিন্তু প্রতিকূলে জাহাজ চালনা করলে অধিক সময় লাগে।

৩.উষ্ণ শ্রোতের অনুকূলে জাহাজ চালনা নিরাপদ। কিন্তু শীতল শ্রোতের গতিপথে হিমশৈল প্রভৃতির জন্য জাহাজ চালনায় অসুবিধা হয়; এজন্য আটলান্টিকের উষ্ণ শ্রোতের অনুকূলে সর্বাপেক্ষা অধিক জাহাজ যাতায়াত করে।

৪.হিমশৈল উষ্ণ শ্রোতের সংস্পর্শে আসলে গলে যায় এবং তার সাথে প্রবাহিত মাটি, কাদা, উদ্ভিদ প্রভৃতি পানির তলদেশে সঞ্চিত হয়ে চড়াভূমির সৃষ্টি করে। নিউফাউন্ডল্যান্ডের নিকটে এরূপ এক বিরাট চড়ার সৃষ্টি হয়ে মৎস্যক্ষেত্র গড়ে উঠেছে।

৫. মগ্নচড়ার নিকট উষ্ণ ও শীতল শ্রোতের মিলন হলে মাছের প্রিয় খাদ্য প্ল্যাঙ্কটন বেশি পরিমাণে পাওয়া যায়। এ কারণে এরূপ মগ্ন চড়ায় প্রচুর মৎস্য পাওয়া যায় এবং সহজেই মৎস্য ব্যবসা গড়ে উঠে।

খ.জলবায়ুর উপর প্রভাব: জলবায়ুর উপর সমুদ্র-শ্রোতের প্রভাব নিচে বর্ণনা করা হলো:

- সমুদ্র তীরবর্তী দেশসমূহের জলবায়ুর উপর সমুদ্র শ্রোতের প্রত্যক্ষ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। যেসব দেশের নিকট দিয়ে উষ্ণ শ্রোত প্রবাহিত হয় সেসব দেশের উত্তাপ বৃদ্ধি পায় কিন্তু শীতল সমুদ্রশ্রোত প্রবাহিত হলে জলবায়ু অপেক্ষাকৃত শীতল হয়।

- উষ্ণ শ্রোতের উপর দিয়ে প্রবাহিত বায়ুতে অধিক জলীয় বাষ্প থাকে বলে তা স্থলভাগের উপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার সময় বৃষ্টিপাত ঘটায়। অন্যদিকে শীতল শ্রোতের উপর দিয়ে প্রবাহিত বায়ু শুষ্ক হয় এবং তা স্থলভাগে পৌঁছে বৃষ্টিপাত ঘটাতে পারে না।
- ঝড়, কুয়াশা ইত্যাদি প্রাকৃতিক বিপর্যয় অনেক সময় সমুদ্র শ্রোতের প্রভাবেও সংঘটিত হয়ে থাকে। উষ্ণ ও শীতল সমুদ্র শ্রোতের মিলন স্থানে উষ্ণতার পার্থক্যের দরুন ঘন কুয়াশা এবং ঝড়ের সৃষ্টি হয়। এজন্য নিউফাউন্ডল্যান্ড ও জাপানের পূর্ব উপকূলে কুয়াশা এবং ঝড়-বৃষ্টির সৃষ্টি হয়।

গ. অন্যান্য প্রভাব

- সমুদ্রশ্রোত নিম্ন অক্ষাংশগুলোর সাথে উচ্চ অক্ষাংশের তাপ বিনিময় করে পৃথিবীর তাপের সমতা রক্ষা করে।
- সমুদ্রশ্রোত চালিত টারবাইনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে। কুরোশিও এবং উপসাগরীয় শ্রোতকে এ কাজে সাফল্যের সাথে ব্যবহার করা হচ্ছে।

জোয়ার-ভাটা

চন্দ্র-সূর্যের আকর্ষণ শক্তি এবং পৃথিবীর কেন্দ্রাতিগ শক্তি প্রভৃতি কারণে সমুদ্রের পানি নির্দিষ্ট সময় অন্তর এক জায়গায় ফুলে ওঠে, আবার অন্য জায়গায় নেমে যায়। সমুদ্র পানির এভাবে ফুলে ওঠাকে জোয়ার এবং নেমে যাওয়া কে ভাটা বলে। সমুদ্রের একই জায়গায় প্রতিদিন দুবার জোয়ার ও দুবার ভাটা।

জোয়ার ভাটা সমুদ্রপৃষ্ঠে ও সমুদ্রের মোহনা হতে নদীপথে অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়। সমুদ্রের মধ্যভাগে পানি সাধারণ ৩০ সে.মি. হতে ৯০ সে.মি (১-৩ ফুট পর্যন্ত) উঠা-নামা করে, কিন্তু উপকূলের নিকট সাগর উপসাগরের গভীরতা কম বলে সেখানে পানিরাশি অনেক বেশি উঠা-নামা করে। এ কারণেই সমুদ্রের মোহনা হতে নদীসমূহের গতিপথে কয়েক কি. মি. পর্যন্ত জোয়ার-ভাটা হয়ে থাকে।

জোয়ার-ভাটার কারণ

প্রাচীনকালে মানুষের ধারণা ছিল যে, পৃথিবীর শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য জোয়ার-ভাটা হয়। পৃথিবীর শ্বাস গ্রহণের সময় পানি ফুলে উঠে বলে জোয়ার হয় এবং শ্বাস ত্যাগ করার সময় পানি নেমে গিয়ে ভাটা হয়। কিন্তু পরবর্তীকালে এ ধারণা মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়। বর্তমানে বিজ্ঞানীগণ মনে করেন যে, পৃথিবীর উপর চন্দ্র ও সূর্যের আকর্ষণ এবং পৃথিবীর আবর্তনের দরুন সৃষ্ট কেন্দ্রাতিগ শক্তিই জোয়ার-ভাটার জন্য দায়ী। নিচে জোয়ার-ভাটার কারণ আলোচনা করা হলো-

ক. মহাকর্ষণ শক্তির প্রভাব: পৃথিবীর সকল পদার্থের আকর্ষণ শক্তি আছে এবং একটি অপরটিকে আকর্ষণ করছে। এ আকর্ষণকে মহাকর্ষ বলে। এ আকর্ষণের ফলে পৃথিবী সর্বদা সূর্যের চারদিকে এবং চন্দ্র সর্বদা পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে। এ কারণের ফলেই ভূপৃষ্ঠে পানিরাশি পৃথিবী হতে বিচ্ছিন্ন হতে পারে না।

পৃথিবীর সব পদার্থের আকর্ষণ শক্তি একরূপ নয়। পদার্থ যত বড়, তার আকর্ষণ করার শক্তিও তত বেশি। কিন্তু দূরত্ব বৃদ্ধি পেলে আকর্ষণ শক্তি কমে যায়। সূর্য ও চন্দ্র পৃথিবীকে এবং পৃথিবীর প্রতিটি পদার্থকে সর্বদাই আকর্ষণ করছে। চন্দ্র পৃথিবীর নিকটতম জ্যোতিষ্ক। এজন্য পৃথিবীর উপর এর আকর্ষণ সবচেয়ে বেশি। সূর্য চন্দ্র অপেক্ষা ২ কোটি ৬০ লক্ষ গুণ বড় এবং পৃথিবী অপেক্ষা অনেকগুণ বড় হলেও পৃথিবী সূর্য হতে গড়ে ১৫ কোটি কিলোমিটার (৯.৩ কোটি মাইল) দূরে অবস্থিত। কিন্তু পৃথিবী হতে চন্দ্রের গড় দূরত্ব মাত্র ৩.৮ লক্ষ কিলোমিটার। এ কারণেই পৃথিবীর উপর সূর্যের আকর্ষণ শক্তি চন্দ্র অপেক্ষা অনেক কম। ফলে জোয়ার-ভাটার ব্যাপারেও সূর্য অপেক্ষা চন্দ্রের প্রভাব বেশি। হিসেব করে দেখা গেছে যে, জোয়ার উৎপাদনে সূর্যের ক্ষমতা চন্দ্রের ৪/৯ ভাগ। অতএব এটা স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে যে, জোয়ার-ভাটার ব্যাপারেও চন্দ্র ও সূর্য উভয়েই পৃথিবীর উপর নিজ নিজ শক্তি প্রয়োগ করলেও চন্দ্রের শক্তিই অধিক কার্যকরী। চন্দ্র ও সূর্যের আকর্ষণ শক্তি স্থলভাগের কেন্দ্রস্থলে ও ভূপৃষ্ঠের পানিরাশির উপর অধিক কার্যকরী হয়। স্থলভাগের উপর দিকে চন্দ্র-সূর্যের আকর্ষণশক্তি নেই বললেই চলে। এ কারণে পৃথিবীর কেন্দ্র ও পানির উপরিভাগের উপর চন্দ্র ও সূর্যের আকর্ষণের পার্থক্যের দরুন জোয়ার-ভাটাসংঘটিত হয়।

খ. কেন্দ্রাতিগ শক্তির প্রভাব: কেবল মহাকর্ষ শক্তির প্রভাবে চন্দ্র ও সূর্যই জোয়ারের জন্য দায়ী নয়। ঘূর্ণনশীল পৃথিবীর পৃষ্ঠের যে কেন্দ্রাতিগ শক্তি উৎপন্ন হয়, জোয়ারের জন্য সেটাও দায়ী। কাদা-পানিযুক্ত কোন রাস্তা দিয়ে যখন কোন গাড়ি দ্রুতবেগে অগ্রসর হয় তখন তার চাকা হতে কাদাপানি চারদিকে ছিটকে যায়। অনুরূপভাবে পৃথিবী নিজ মেরুদণ্ডের উপর থেকে দ্রুত ঘুরছে বলে তার পৃষ্ঠ হতে তরল পানিরাশিও চারদিকে ছিটকে যাওয়ার প্রবণতা লাভ করছে। এটাই কেন্দ্রাতিগ শক্তি বা অপকেন্দ্র শক্তি। এটাও জোয়ারের অন্যতম কারণ। তবে কেন্দ্রাতিগ শক্তি অপেক্ষা চন্দ্রের আকর্ষণশক্তি জোয়ারের জন্য বেশি দায়ী। কারণ কেন্দ্রাতিগ শক্তি ভূপৃষ্ঠের চারপাশে কার্যকর কিন্তু চন্দ্রের আকর্ষণ শক্তি প্রধানত একদিকে অধিক কার্যকর।

জোয়ার ভাটার শ্রেণিবিভাগ

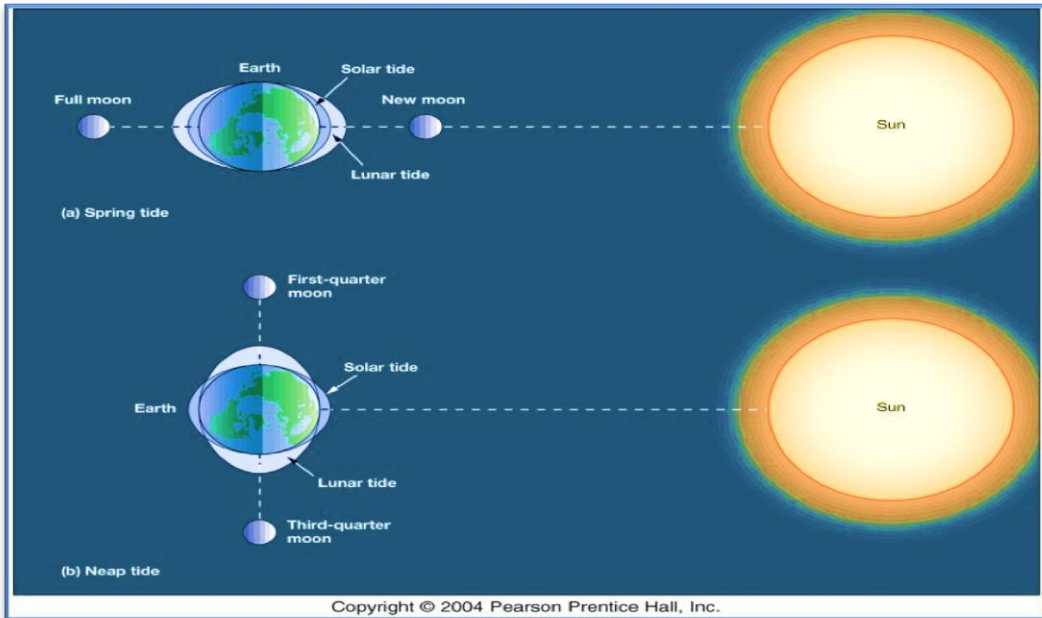
জোয়ার-ভাটাকে ৪টি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়েছে। যেমন-

- ক) মুখ্য জোয়ার
- খ) গৌণ জোয়ার
- গ) ভরা কটাল
- ঘ) মরা কটাল

ক) মুখ্য জোয়ার (Primary Tide): প্রধানত চন্দ্রের আকর্ষণেই জোয়ার-ভাটা সংঘটিত হয়। কিন্তু চন্দ্র এক স্থানে স্থির থাকে না, তা পৃথিবীর চারদিকে সর্বদা ঘুরছে। আবর্তনকালে পৃথিবীর যে অংশ চন্দ্রের নিকটবর্তী হয়, সেখানে চন্দ্রের আকর্ষণ সর্বাপেক্ষা বেশি হয়। এ আকর্ষণে চারদিক হতে পানি এসে চন্দ্রের ঠিক নিচে ফুলে উঠে এবং জোয়ার হয়। এভাবে সৃষ্ট জোয়ারকে মুখ্য জোয়ার বা প্রত্যক্ষ জোয়ার বলা হয়।

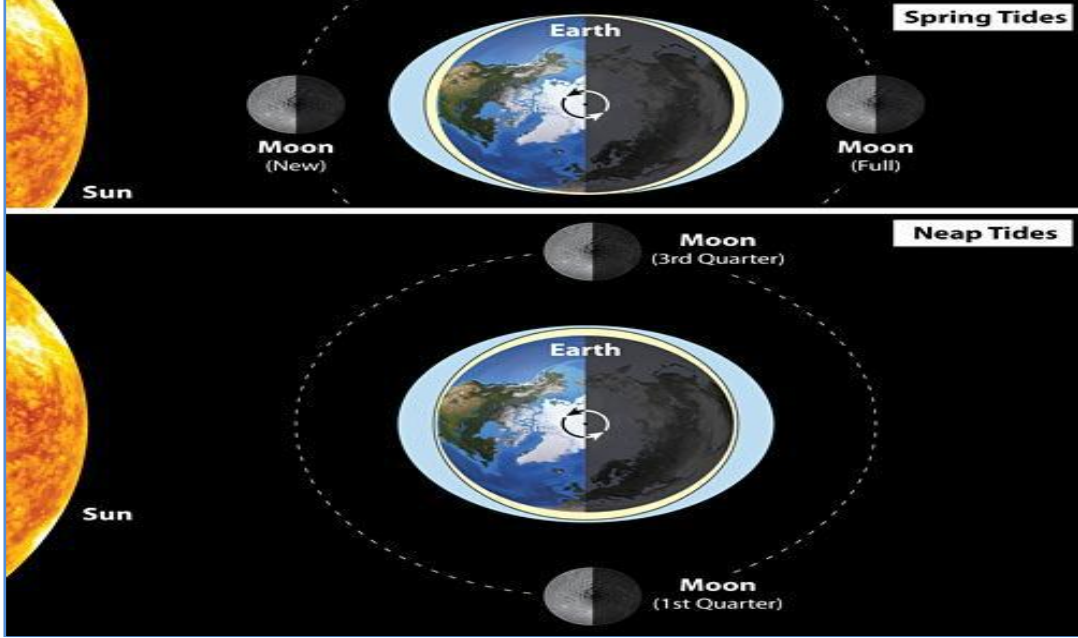
খ) গৌণ জোয়ার (Secondary Tide): চন্দ্র পৃথিবীর যে পার্শ্বে আকর্ষণ করে তার বিপরীত দিকে পৃথিবীর মহাকর্ষ শক্তির প্রভাব অপেক্ষাকৃত কম। আবার পানির নিচে যে কঠিন স্থলভাগ রয়েছে তা পৃথিবীর সঙ্গে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ। কাজেই তার উপর চন্দ্রের আকর্ষণ কেন্দ্র স্থলের আকর্ষণেরই সমান। ফলে বিপরীত দিকেও পানিরাশি অপেক্ষা স্থলভাগ চন্দ্রের দিকে আকৃষ্ট হয়। এ সময় চন্দ্রের বিপরীত দিকের পানিরাশির উপর মহাকর্ষ শক্তির প্রভাব কমে যায় এবং কেন্দ্রাতীক শক্তির সৃষ্টি হয়। এতে চারপার্শ্বের পানি ঐ স্থানে এসে জোয়ারের সৃষ্টি করে। এভাবে চন্দ্রের বিপরীত দিকে যে জোয়ার হয় তাকে গৌণ জোয়ার বা পরোক্ষ জোয়ার বলে।

গ) ভরা কটাল বা তেজ কাঁল (Spring Tide): পূর্ণিমা ও অমাবস্যা তিথিতে পৃথিবী, চন্দ্র ও সূর্য প্রায় একই সরলরেখায় অবস্থান করে বলে সূর্যের আকর্ষণ চন্দ্রের আকর্ষণকে সাহায্য করে। ফলে এ দুসময়ে জোয়ারের পানি খুব বেশি ফুলে উঠে। একে ভরা কটাল বা তেজ কটাল বলা হয়। যেমন- অমাবস্যায় চন্দ্র ও সূর্য পৃথিবীর একই দিকে এর সমসূত্রে থাকে। এর ফলে চন্দ্র ও সূর্যের আকর্ষণ শক্তি একই দিক হতে একই সঙ্গে কার্যকর হয়। সূর্যের আকর্ষণ চন্দ্রের কম হলেও এ সময় উভয়ের মিলিত শক্তিতে আকর্ষণ আরও প্রবল হয়। অতএব ঐ দিন চন্দ্র ও সূর্যের দিকে পূর্ণিমার দিন অপেক্ষাও পানি বেশি ফুলে উঠে অর্থাৎ জোয়ার বেশি হয়। এ জাতীয় জোয়ারকে ভরা কটাল বা তেজ কটাল বলা হয়। আবার পূর্ণিমা তিথিতে পৃথিবীর একদিকে চন্দ্র ও অন্যদিকে সূর্য একই সরলরেখায় অবস্থান করে। চন্দ্রের আকর্ষণে যেখানে মুখ্য জোয়ার হয়, সেখানেই সূর্যের আকর্ষণে মুখ্য জোয়ার হয়। এজন্য পূর্ণিমার দিন উক্ত দুবিপরীত স্থানেই জোয়ারের বেগ সর্বাধিক হয় এবং পানি বেশি ফুলে উঠে। তাই পূর্ণিমার দিনের এ জোয়ারকেও ভরা কটাল বা তেজ কটাল বলা হয়।



চিত্র-৩.৫০: জোয়ার-ভাটার বিভিন্ন অবস্থা

ঘ) **মরা কটাল (Neap Tide):** অষ্টমী তিথিতে চন্দ্র ও সূর্য একই সরলরেখায় না থেকে উভয়ই পৃথিবীর সাথে এক সমকোণে থেকে পৃথিবীকে আকর্ষণ করে। ঐ দিন তারা পৃথিবীকে আড়াআড়িভাবে আকর্ষণ করে বলে আকর্ষণের বেগ অনেক কম হয়। তখন চন্দ্রের আকর্ষণে যেখানে জোয়ার হয় সূর্যের আকর্ষণে সেখানে ভাটা হয়। চন্দ্র পৃথিবীর নিকট থাকায় তার কার্যকরী শক্তি সূর্য অপেক্ষা বেশি। তাই ঐ সময়ে চন্দ্রের দিকে জোয়ার ও সূর্যের দিকে ভাটা হয়।



চিত্র-৩.৫১: ভরা কটাল ও মরা কটাল

সূর্যের বিরোধিতার কারণে চন্দ্রের দিকে পানি বেশি স্ফীত হতে পারেনা বলে এ জাতীয় জোয়ারকে মরা জোয়ার বা মরা কটাল বলে। তাই একমাসে দুবার ভরা কটাল বা তেজ কটাল এবং দুবার মরা কটাল হয়ে থাকে।

জোয়ার ও ভাটার সময়

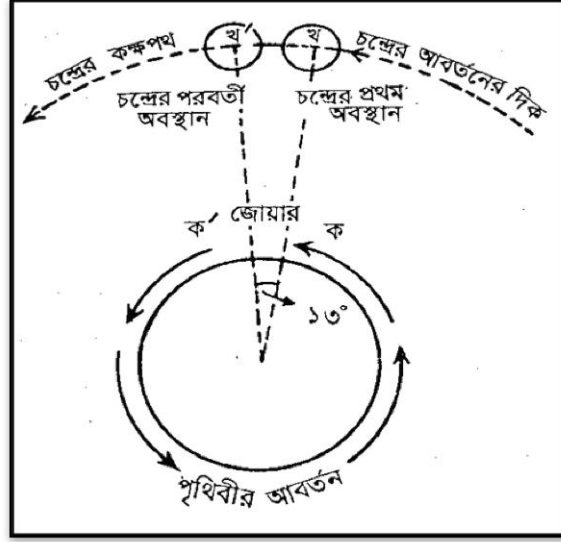
পৃথিবীর আর্হিক গতির দরুন পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে প্রতিদিন দুবার করে ভাটা হয়ে থাকে। তবে জোয়ার ভাটা ঠিক ৬ ঘণ্টা ১৩ মিনিট পরে হয়। এর কারণ হলো পৃথিবী যেমন নিজ মেরুদণ্ডের উপর পশ্চিম হতে পূর্বদিকে ঘুরছে চন্দ্রও তেমনি নিজ কক্ষপথে পৃথিবীর চারদিকে পশ্চিম হতে পূর্বদিকে ঘুরছে। কিন্তু সম্পূর্ণরূপে একবার ঘুরে আসার পর ভূপৃষ্ঠের কোন মধ্যরেখা পুনরায় চন্দ্রের ঠিক নিচে আসতে প্রায় ৫২ মিনিট সময় বেশি লাগে। কাজেই জোয়ার-ভাটার ৩.৫২ নং চিত্র অনুযায়ী ক-স্থানে একবার মুখ্য জোয়ার হওয়ার পর ২৪ ঘণ্টা ৫২ মিনিট অতিক্রম করলে পুনরায় সেখানে মুখ্য জোয়ার সৃষ্টি হয়। ক-স্থান ১২ ঘণ্টা ২৬ মিনিট পর খ- স্থানের অবস্থানে গিয়ে পৌঁছলে সেখানে একই দিনে দ্বিতীয় বার জোয়ার সংঘটিত হয়। এটি উক্ত স্থানের গৌণ জোয়ার। কোন স্থানে ক অথবা খ- স্থান হতে গ অথবা ঘ- স্থানে পৌঁছতে ৬ ঘণ্টা ১৩ মিনিট সময় লাগে। এ কারণেই জোয়ারের প্রায় ৬ ঘণ্টা ১৩ মিনিট পরে ভাটা সংঘটিত হয়। মোট কথা প্রতি ৬ ঘণ্টা ১৩ মিনিট অন্তর প্রত্যেক স্থানে পালাক্রমে জোয়ার ও ভাটা হয়ে থাকে।

জোয়ার-ভাটার ব্যবধান

চন্দ্র পৃথিবীর চতুর্দিকে ২৭ দিনে একবার ঘুরে আসে অর্থাৎ ২৪ ঘণ্টায় এটি কমপক্ষে $(৩৬০ \div ২৭)$ বা ১৩° পথ অতিক্রম করে। পৃথিবীর এ ১৩° পথ অগ্রসর হতে আরও $(১৩ \times ৪ = ৫২)$ ৫২ মিনিট সময় লাগে। কারণ ১° অতিক্রম করতে সময় লাগে ৪ মিনিট। কাজেই একবার মুখ্য জোয়ার হওয়ার পর পুনরায় ২৪ ঘণ্টা ৫২ মিনিট পর সে স্থানে মুখ্য জোয়ার হয়।

চিত্রে দেখানো হচ্ছে কেন পৃথিবীতে মুখ্য জোয়ারের সময়ের পরিবর্তন হয়। কোন দিন চন্দ্রের $\times$ অবস্থানে পৃথিবীর ক স্থানে মুখ্য জোয়ার হচ্ছে। এর ২৪ ঘণ্টা পরে চন্দ্র নিজের আবর্তনের দরুন প্রায় 13° স্থান সরে গিয়ে $\times$ অবস্থানে যায়। এ 13° পথ অতিক্রম করে পৃথিবীর ক স্থানে যেতে ৫২ মিনিট সময় লাগে বলে পৃথিবীর ক' স্থানে মুখ্য জোয়ারের (২৪ ঘণ্টা+৫২ মিনিট) ২৪ ঘণ্টা ৫২ মিনিট পরে আবার সেখানে মুখ্য জোয়ার হয়।

[বি.দ্র: চন্দ্র ও সূর্য ব্যতীত অন্য সব জ্যোতিষ্ক পৃথিবী হতে বহু দূরে অবস্থান করায় তাদের আকর্ষণে জোয়ার হয় না]



চিত্র-৩.৫২: জোয়ার-ভাটার সময়ের ব্যবধান

৩.৫২ নং চিত্রে চন্দ্র চস্থানে থাকায় পৃথিবীর ক স্থানে যদি জোয়ার হয়, তবে ঠিক ২৪ ঘণ্টা পরেও চন্দ্র চ স্থানে আসলেই ক স্থানে মুখ্য জোয়ার হবে না, এর প্রায় ৫২ মিনিট পরে ক বিন্দু যখন ক' স্থানে পৌঁছবে তখনই সেখানে মুখ্য জোয়ার হবে।

জোয়ারের পানির গতি

পৃথিবী পশ্চিম হতে পূর্বদিকে আবর্তন করে বলে জোয়ারের স্থান পশ্চিম হতে পূর্বদিকে চলে থাকে। এজন্য চন্দ্র যখন কোন মধ্যরেখা অতিক্রম করে তখন সে স্থান এবং উক্ত মধ্যরেখার উপর সকল স্থানে একই সঙ্গে জোয়ার হওয়ার কথা। কিন্তু তা কখনও হয় না। সমুদ্রের গভীরতা, বায়ুর বেগ, তলদেশের সাথে ঘর্ষণ ইত্যাদি নানা কারণে তার ব্যতিক্রম হয়। এ কারণে একই মধ্যরেখায় অবস্থিত স্থানগুলোতে একই সময়ে জোয়ার হয় না। পৃথিবী যদি সম্পূর্ণভাবে পানি দ্বারা আবৃত হত এবং কোন প্রকার স্থলভাগ না থাকত, তবে জোয়ারের ঢেউ সোজাসুজি চন্দ্রের দিকে চলত এবং কোন স্থান চন্দ্রের বরাবর পৌঁছলে সেখানে ও তার বিপরীত দিকে জোয়ার হত। কিন্তু পৃথিবীর প্রায় $1/4$ ভাগ স্থল এবং বাকি অংশ পানি। এ কারণে জোয়ারের ঢেউ স্থলভাগে বাধাপ্রাপ্ত হয়। যেমন- অস্ট্রেলিয়ার পশ্চিম উপকূলে জোয়ার দেখা দিলে তার অনেক পরে বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলে জোয়ার হয়। কিন্তু ভারত মহাসাগর দক্ষিণে খোলা থাকায় ঐ মহাসাগর দক্ষিণ হতে জোয়ারের ঢেউ ক্রমশ উত্তর দিকে অগ্রসর হতে পারে। তা হলেও সমুদ্রের অনেক স্থানে একই সময় জোয়ার আসতে পারে। পৃথিবী যে সব স্থানে একই সময় জোয়ার হয় মানচিত্রে সে সব স্থানকে এক প্রকার রেখা দ্বারা যুক্ত করা হয়। এ রেখাগুলোকে সহ-জোয়ারী রেখা বলে। নাবিকদের জন্য এ মানচিত্র বিশেষ প্রয়োজনীয়।

জোয়ার-ভাটার টান: জোয়ারের পানি গভীর সমুদ্রে ৯০ সে. মি. হতে ১২০ সে. মি. এর বেশি উচু হয় না। কিন্তু উপকূলের নিকটে নদীর খাঁড়ি, মোহনা প্রভৃতি স্থানে ৩ মিটার হতে ১২ মিটার পর্যন্ত উঁচু হয়ে থাকে। ভূমধ্যসাগর, লোহিত সাগর, বাল্টিক সাগর ও কৃষ্ণসাগর প্রায় চারদিকে স্থল দ্বারা বেষ্টিত বলে তথায় জোয়ার দেখা যায় না। পৃথিবী পশ্চিম হতে পূর্বদিকে আবর্তন করে, সুতরাং জোয়ারের শ্রোত পূর্ব হতে পশ্চিমে যায়। এ শ্রোতকে জোয়ার-ভাটার টান বলে।

বান: অগভীর মহীসোপান, সংকীর্ণ নদীর মুখ, নদীর মুখে চড়া বা বালির বাঁধ, নদীর খরশ্রোত প্রবাহ জোয়ারের পানিকে নদীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে বাধার সৃষ্টি করে। ফলে জোয়ারের পানি নদীমুখে প্রবেশ করার সময় খুব উঁচু হয়ে প্রবল বেগে অগ্রসর হয়। একে বান বলে।

ইয়াং-সি-কিয়াং, সেন, সালউইন, গারন, সেভার্ন এবং আমাজান নদীর বান অতিশয় প্রবল। ভাগীরথী নদীতে বানের ফলে পানি গড়ে প্রায় ৪/৫ মিটার উঁচু হয়ে থাকে। বানের সম্মুখে পড়লে নৌকা, স্টিমার প্রভৃতি ডুবে যায়। সাধারণত জুলাই হতে সেপ্টেম্বর মাসে ভাগীরথী নদীর প্রবল বানে পানি প্রায় ৭/৬ মিটার উঁচু হয়।

জোয়ার ভাটার প্রভাব বা ফলাফল

মানুষের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের উপর জোয়ার-ভাটার যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। এর উল্লেখযোগ্য প্রভাব নিচে আলোচিত হলো-

- **বন্দরের সুবিধা:** জোয়ারের সময় পানি বৃদ্ধি পায় বলে সমুদ্রগামী জাহাজের পক্ষে নদী-বন্দরে প্রবেশে সুবিধা হয়। আবার ভাটার শ্রোতের সঙ্গে ঐ জাহাজ অনায়াসে সমুদ্রে এসে পরে। চট্টগ্রাম, চালনা, কলকাতা, লন্ডন, প্রভৃতি বন্দরে জোয়ারের সময় জাহাজ বন্দরে প্রবেশ করে এবং ভাটার সময় সমুদ্রে বের হয়ে আসে।
- **নদীর পানি নির্মল থাকা:** জোয়ার-ভাটার ফলে নদীর পানি নির্মল থাকে। দৈনিক দুবার করে জোয়ার-ভাটা হওয়ার ফলে নদীতে সঞ্চিত সব আবর্জনা ধুয়ে মুছে যায়।
- **নদী মুখ নৌ চলাচলের যোগ্য থাকা:** জোয়ার-ভাটার জন্য পলিমাটি পড়ে নদীর মুখ বন্ধ হয়ে যেতে পারে না। ফলে নৌ চলাচলের যোগ্য হয়। ইংল্যান্ডের টেমস নদীতে জোয়ার-ভাটার দরুন পলি জমতে পারে না বলে সর্বদা নাব্য থাকে।
- **নদীবন্দর বরফমুক্ত থাকা:** জোয়ার-ভাটার ফলে নদীর পানি স্বল্প পরিমাণে লবণাক্ত হওয়ায় শীতে সহজে জমে যায় না। ফলে নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের নদীর পানি জমে না এবং নৌ-চলাচলের যোগ্য থাকে। এ কারণেই ইংল্যান্ডের অনেক নদীবন্দর বার মাস বরফমুক্ত থাকে।
- **পানি বিদ্যুৎ উৎপাদন করা:** জোয়ার শক্তি হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। পৃথিবীর অনেক অংশে বিরাট আকারের জলাধার নির্মাণ করে জোয়ারের সময় পানিতে ভর্তি করে রাখা হয়। ভাটার সময় ঐ পানি সরু পথে নির্গত করে টারবাইনের সাহায্যে পানি বিদ্যুৎ করা হয়। ১৯৬৬ খ্রিষ্টাব্দে ফ্রান্সের লা-রাস কাঁড়িতে প্রথম জোয়ার-ভাটার বৈদ্যুতিক শক্তি কেন্দ্র স্থাপিত হয়, যার প্রাথমিক উৎপাদন ক্ষমতা ছিল ১০ হাজার কিলোওয়াট। বর্তমানে এখান থেকে বার্ষিক ৮০ লাখ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়। রাশিয়ার হোয়াইট সী এবং কানাডার ফুন্ডি বে অঞ্চলে জোয়ার-ভাটার শক্তিকে ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হচ্ছে। চীনেও জোয়ার-ভাটা থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হচ্ছে। ভারতের কাডালা বন্দরেও অনুরূপভাবে একটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়ে তোলা হচ্ছে। বাংলাদেশের সুন্দরবন অঞ্চলে খাঁড়িগুলোতে জোয়ার-ভাটার সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদনের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে।
- **লবণ উৎপাদন কেন্দ্র:** জোয়ার-ভাটার উপর নির্ভর করে সমুদ্র উপকূলে লবণ তৈরির কারখানা গড়ে উঠে। জোয়ারের সময় সমুদ্রের পানি লবণ উৎপাদন কেন্দ্রের অগভীর চওড়া জলাশয়ে প্রবেশ করে। পরে ঐ আবদ্ধ পানিরাসিকে শুকিয়ে লবণ তৈরি করা হয়।
- **ক্ষতিকর প্রভাব:** উপরিউক্ত অনুকূল দিক ছাড়াও জোয়ার-ভাটার কিছু ক্ষতিকর প্রভাবও আছে। মাঝে মাঝে জোয়ারে উপকূলের ক্ষতি হয়, লঞ্চ ও নৌকাডুবি হয় এবং জীবনহানি ঘটে।

৩.৯ পরিবেশের উপাদান, পরিবেশ দূষণের কারণ ও পরিবেশ সংরক্ষণ

পরিবেশ (Environment)

সহজ কথায় পরিবেশ বলতে পারিপার্শ্বিকতাকে বোঝায়। মানুষ যে পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে বসবাস করে জীবনযাত্রা নির্বাহ করে, তাই তার পরিবেশ। কোনো এলাকায় পরিবেশ বলতে ঐ এলাকার ঘর-বাড়ি, প্রসিদ্ধস্থান, রাস্তাঘাট, মানুষ, তাদের জীবনযাত্রার মান, কৃষ্টি, আচার-আচরণ সব কিছুকে বোঝায়।

মাসটন বেটস-এর মতে, পরিবেশ হলো সেই সব বাহ্যিক অবস্থার সমষ্টি যা জীবনের বৃদ্ধি ও সমৃদ্ধিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে।

ভারতের National Council of Educational Research and Training (NCERT) পরিবেশ বলতে বুঝিয়েছে- The environment of an individual comprises all the physical and social factors known and unknown which directly or indirectly affect his living and condition.

The Environment Pollution Control Ordinance of Bangladesh ১৯৭৭- এ পরিবেশের ধারণা নিম্নোক্ত ভাবে দেওয়া আছে- Environment means the surroundings consist of air, water, soil, food and shelter which can support or influence the growth of life of an individual or group of individuals including all kinds of flora and fauna.

মনোবিজ্ঞানের ভাষায়- পরিবেশ হলো অনির্দিষ্ট প্রকৃতির ভৌত সীমানার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ঘটনা, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড যা কোনো ব্যক্তির উপর প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তার করে এবং ব্যক্তির আচরণে কিছু পরিবর্তন ঘটায়।

পরিবেশের উপাদান

পরিবেশ একটি ব্যাপক বিষয়। যে সকল প্রাকৃতিক, ভৌত, সামাজিক-সাংস্কৃতিক উপাদান নিয়ে পরিবেশ গঠিত সেগুলোই পরিবেশের উপাদান। তবে পরিবেশের উপাদান বলতে প্রাকৃতিক উপাদানকেই বুঝায়। বিশেষজ্ঞগণ পরিবেশের ১৬টি উপাদান চিহ্নিত করেছেন। যথা- আবহওয়া ও জলবায়ু, ভূমিরূপ, খনিজ ও শিলা, মৃত্তিকা, স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ, স্থানীয় প্রাণীর জীবন, ক্ষুদ্র প্রাণীর ক্ষেত্র, ভূপৃষ্ঠের পানি, ভূগর্ভস্থ পানি, মহাসাগর, উপকূলীয় এলাকা, জিওমেট্রিক্যাল পজিশন, প্রাকৃতিক অবস্থা, ভৌগোলিক অবস্থান, আঞ্চলিক কাঠামো/আকৃতি ও এরিয়াল স্পেস অথবা সাইজ।

পরিবেশ দূষণের কারণ

দূষণ শব্দের সাধারণ অর্থ অশুচি বা অপবিত্রকরণ বা নষ্ট হয়ে যাওয়া। ১৯৬০ খ্রি. নাগাদ বিজ্ঞানীরা দূষণের একটি চমৎকার সংজ্ঞা নির্ধারণ করেন-

‘Pollution in its broadest sense is an impairment of the environmental components, natural resources as well as the living world.’ অর্থাৎ দূষণ বলতে আমরা পরিবেশের উপাদান, প্রাকৃতিক সম্পদ এবং জীবজগতের স্বাভাবিকতা হারানোকেই বুঝি।

Colin Waker (১৯৭১) বলেন- রাসায়নিক, ভৌত অথবা জৈবিক কারণে পরিবেশের প্রাকৃতিক বিধিসম্মত অবস্থার যেকোনো পরিবর্তনই হলো দূষণ।

পরিবেশ দূষণ হচ্ছে স্বাভাবিক পরিবেশের উপাদানসমূহের ভারসাম্য নষ্ট হওয়া। প্রকৃতি এমনই ভারসাম্যমূলক উপাদানে গঠিত যা বাইরের কোন প্রভাব না পড়লে নিজেই ভারসাম্য রক্ষা করে চলে। মানুষের নানারকম কর্মকাণ্ড বিস্তৃতির ফলে এসব প্রয়োজনীয় ভারসাম্যমূলক উপাদানের হ্রাস/ বৃদ্ধির ফলে পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। সাধারণত বায়ু, পানি, মৃত্তিকাসহ পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান যখন কোনো ভৌত বা রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জীবজগতের উপর ক্ষতিকর বা নেতিবাচক প্রভাব ফেলে তখন এ অবস্থার পরিবেশকে পরিবেশ দূষণ বলে। পরিবেশ দূষণ হচ্ছে পরিবেশের যেকোনো সমষ্টিতে যদি কোনো অবক্ষয় হয় এবং সেই অবক্ষয়ের ফলে মানবজাতির জন্য যদি কোনো হুমকির সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ পরিবেশে যদি কোনো ক্ষতিকর কিংবা অপ্রয়োজনীয় পদার্থ থাকে তাহলে পরিবেশকে দূষিত বলা হয়। আর পরিবেশ দূষণের প্রধানতম কারণ হচ্ছে বিশ্বব্যাপি অত্যধিক জনসংখ্যার চাপ, পরিকল্পনাহীন শিল্পায়ন এবং দূষণ সম্পর্কে অজ্ঞতা।

পরিবেশ দূষণের ক্ষেত্র ও কারণ

মোটামুটিভাবে পরিবেশের পাঁচটি ক্ষেত্রের উপাদান দূষিত হওয়ায় পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। এগুলো হলো-

১. বায়ু দূষণ
২. পানি দূষণ
৩. মাটি দূষণ
৪. শব্দ দূষণ ও
৫. তেজস্ক্রিয় পদার্থের বিকিরণজনিত দূষণ

১.বায়ু দূষণ: পরিবেশ দূষণে সবচেয়ে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে বায়ু দূষণ। বায়ুমণ্ডলে নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, কার্বন ডাইঅক্সাইড, আর্গন হলো প্রধান উপাদান। এছাড়া আছে নিওন, জেনন, হিলিয়াম, ক্রিপটন, র্যাডন, ওজোন, হাইড্রোজেন, মিথেন ইত্যাদি গ্যাস এবং ধূলিকণা, জলীয়বাষ্প ইত্যাদি। মনে রাখা প্রয়োজন একজন মানুষ প্রতিদিন 14-18 kg বায়ু, 1.5--2.0 kg পানি ও 0.70 kg খাদ্য গ্রহণ করে। মানব সৃষ্ট কারণে বায়ুমণ্ডলে জীবদেহে ক্ষতিকর উপাদানগুলো বৃদ্ধি পাচ্ছে। বায়ুমণ্ডলের উপাদানগুলো বিশেষ করে মূল উপাদানগুলোর ভারসাম্য নষ্ট হওয়াতেই বায়ু দূষণ বলে। বায়ু দূষণ অধিকাংশই ঘটছে শিল্প-কারখানা, বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, রেলগাড়ি, মোটর গাড়ি, উড়োজাহাজ, জলযান, ইটের ভাটা, রাস্তাঘাট মেরামতে পিচ গলানো, রান্না-বান্না ও ধূমপানের জন্য। এসব উৎস থেকে CO₂, N₂O, CO, SO₂, H₂, CH₄, H₂S র্যাডন প্রভৃতি গ্যাস বায়ুমণ্ডলকে

বিষাক্ত করেছে। বায়ুদূষণে মারাত্মক ভূমিকা রাখছে CO₂-এর পরিমাণ বেড়ে যাওয়া। ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দে বায়ুতে CO₂ ছিল ২৮৫ PPM, ১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দে তা হয়েছে ৩৩৫ PPM, এবং ২০০০ খ্রিষ্টাব্দে ৩৬০ PPM (PPM = Parts Per Million)।

বায়ু দূষণের কারণ: পরিবেশ বিজ্ঞানীগণ ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে বায়ু দূষণের জন্য নিম্নোক্ত বিষয়সমূহকে দায়ী করেছেন। যথা-

- ১) কার্বন ডাইঅক্সাইড
- ২) কার্বন মনোঅক্সাইড
- ৩) হাইড্রোজেন সালফাইড
- ৪) হাইড্রোকার্বনসমূহ
- ৫) নাইট্রোজেনের অক্সাইডসমূহ
- ৬) সালফারের অক্সাইডসমূহ
- ৭) ভারী বস্তুকণাসমূহ (গ্যাসীয়)
- ৮) ধূলিবালির কণাসমূহ
- ৯) ভাসমান রোগজীবাণু
- ১০) তেজস্ক্রিয় রশ্মিসমূহ
- ১১) ধোঁয়া ও কুয়াশা
- ১২) ভূপৃষ্ঠস্থ ওজোন গ্যাস (O₃)

২. পানি দূষণ: পানি দূষণ বিশেষ একটি মারাত্মক সমস্যা। শিল্প-কারখানার বর্জ্য পদার্থ, শহরের ময়লা-আবর্জনা, জমিতে ব্যবহৃত কীটনাশক ঔষধ, সার ইত্যাদি এ জন্য দায়ী। এছাড়া পানিতে মল-মূত্র ত্যাগ, জলযান থেকে নির্গত ডিজেল, মাছ ও প্রাণীর মৃত দেহ ইত্যাদি পানি দূষণের জন্য দায়ী। যেমন- ঘোড়াশাল সার কারখানা থেকে H₂, NH₄, পটাসিয়াম, ক্রোমেট, ফ্লোরিন প্রভৃতি মিশ্রিত বর্জ্য শীতলক্ষ্যায় পতিত হয়ে তার পানি দূষিত করেছে।

৩. মাটি দূষণ: মাটি দূষণের মাত্রা ইদানীং ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। মাটিতে পরিশোধন ছাড়া কলকারখানার বর্জ্য, রং ফেলা, কৃষিকাজে ব্যাপকভাবে সার, কীটনাশক ব্যবহার, মলমূত্র ত্যাগ, মৃত প্রাণীর দেহ ফেলে রাখা, পলিথিন ও আবর্জনা ফেলা ইত্যাদি বহুবিধ কারণে মাটি দূষিত হচ্ছে।

৪. শব্দ দূষণ: কলাকারখানার শব্দ, মাইক বাজানো, গাড়ির উচ্চ স্বরে হর্ন বাজানো, নির্মাণ কাজের শব্দ, বহু লোকের কোলাহল ইত্যাদিরফলে শব্দ দূষিত হচ্ছে। যেমন- ঢাকায় শব্দ দূষণের মাত্রা পঞ্চাশ ডেসিবলের উপর। শব্দ দূষণ ২০/২৫ ডেসিবল মানুষের জন্য সহনীয়। এর বেশি হলে তা ক্ষতিকর।

৫. তেজস্ক্রিয় পদার্থের বিকিরণজনিত দূষণ: বিশ্বে পারমাণবিক অস্ত্রের প্রতিযোগিতা বেড়ে যাওয়ায় তেজস্ক্রিয় পদার্থের বিকিরণজনিত পরিবেশ দূষণের ভীতি বেড়ে গেছে। হিরোশিমা-নাগাসাকিতে পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণের ফলে পরিবেশ দূষিত হয়েছে ফলে শিশুদের মানসিক বিকৃতি, বিকলাঙ্গ ও মৃত্যু ঝুঁকিতে রয়েছে।

উল্লিখিত কারণ ছাড়াও পরিবেশ দূষণের কারণগুলোকে নিম্নোক্তভাবেও চিহ্নিত করা যায়-

- অপরিকল্পিত নগরায়ণ;
- পরিকল্পনাহীন উন্নয়ন;
- জমিতে অধিক পরিমাণ সার, কীটনাশক ব্যবহার;
- শিল্প-কারখানার অপরিশোধিত বর্জ্য;
- অবাধে বৃক্ষ নিধন;
- আবাসিক এলাকায় শিল্প স্থাপন;
- অধিক জনসংখ্যা;
- দারিদ্র্য;
- নিরক্ষরতা;
- কুসংস্কার;
- যানবাহনের কালো ধোঁয়া ও জোরালো হর্ন;
- পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার অভাব;
- জলাবদ্ধতা;

- প্রাকৃতিক সম্পদের অধিক পরিমাণে ব্যবহার;
- সমুদ্রে অবাধে বর্জ্য নিক্ষেপ;
- পারমাণবিক বিস্ফোরণ;
- সমুদ্রগামী জাহাজ ও অয়েল ট্যাংকার থেকে তেল নিঃসরণ;
- পুরাতন জাহাজ ভাঙ্গা;
- ইটের ভাটা, ট্রেন ও জলযানের ধোঁয়া;
- যত্রতত্র অবাধে পলিথিন ফেলা।

পরিবেশ দূষণের ফলাফল

পরিবেশ দূষণের ফলাফল অত্যন্ত মারাত্মক। এর ফলে পরিবেশে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হচ্ছে। বর্তমানে বিশ্বব্যাপি যে ভয়াবহ বন্যা, খরা, সামুদ্রিক ঝড় সংঘটিত হচ্ছে তার প্রধানতম কারণ হচ্ছে পরিবেশ দূষণের কুফল। পরিবেশ দূষিত হতে হতে বর্তমানে এমন অবস্থায় উপনীত হয়েছে যে, প্রকৃতি সহসাই বৈরী আচরণ করছে। মেক্সিকো, ঢাকা, কলকাতা প্রভৃতি বড়বড় শহরগুলোতে অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে, স্বাভাবিক জীবনধারণই সেখানে কষ্টকর। বায়ুমণ্ডলে তাপমাত্রা বেড়ে যাচ্ছে, ক্ষয় হচ্ছে ওজোন (O₃) স্তর, বাড়ছে ত্বকের অসুখ এবং সর্বোপরি দেখা দিচ্ছে গ্রিনহাউজ প্রতিক্রিয়া। এর ফলে জলবায়ু পরিবর্তন হচ্ছে যা জীবনধারণের জন্য খুবই ক্ষতিকর।

পরিবেশ দূষণের ফলে যেসব প্রতিক্রিয়া দেখা দিচ্ছে তা হলো—

- মানুষের নানা ধরনের নতুন রোগ হচ্ছে এবং পর্যায়ক্রমে স্বাস্থ্যহানি ঘটছে;
- মানুষের ব্যবহার্য সম্পদ নষ্ট হচ্ছে;
- দেশের অর্থনীতির উপর মারাত্মক নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে;
- শব্দ দূষণের ফলে মানুষের শারীরিক ও মানসিক বিপত্তি ঘটেতে পারে এবং বিশেষ করে হার্টের রোগীও মাতৃগর্ভস্থ সন্তানের ক্ষতি হতে পারে;
- মাটি ও পানি দূষণের ফলে কৃষিকাজে অচলাবস্থা দেখা দিতে পারে;
- বনাঞ্চলের অভাবে বন্যপ্রাণী বিলুপ্ত হতে পারে এবং ইতোমধ্যে অনেক প্রজাতির বন্যপ্রাণী বিলুপ্ত হয়ে গেছে;
- ভূগর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিকের পরিমাণ বেড়ে যাবে। ফলে বিপুল খাবার পানির অভাব দেখা দিতে পারে;
- ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে মেরু অঞ্চল ও পর্বত শিখরের বরফ গলতে শুরু করবে এবং জলভাগ ও জলভাগের উচ্চতা বৃদ্ধি পাবে। ফলে—
ক.বিশ্বের বিভিন্ন নিচু এলাকা সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হবে।
খ.উপকূলীয় নিম্নাঞ্চলে বসবাসরত দুকোটি লোক গৃহহারা হবে।
গ.সুস্বাদু পানির এলাকায় লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশ ঘটবে। ফলে লবণাক্ততা বেড়ে যাবে।
ঘ.বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, সাইক্লোন/জলোচ্ছাস, খরা, নদী ভাঙ্গন ইত্যাদি বেড়ে যাবে।
- সর্বোপরি শব্দ, মাটি, পানি ও বায়ু দূষণের ফলে বিশ্ব পরিবেশ মানুষের বসবাসের অযোগ্য হতে পারে।

পরিবেশ সংরক্ষণের উপায়

‘দূষিও না প্রকৃতিকে,

সে সেধেছে তার ভূমিকা

পালন কর তুমি দায়িত্ব তোমার।’ -জনমিল্টন (১৬০৮-১৬৭৪)

পৃথিবীর বুক জুড়ে জীব এবং জড়কে ঘিরে বিরাজিত সামগ্রিক বাহ্যিক পরিস্থিতি বিশ্ব পরিবেশ। এটা হচ্ছে অশ্মা, বায়ু, বারি, এবং জীব-এ চারটি মণ্ডলের সমন্বয়ে গঠিত। আর বাস্তুসংস্থান হচ্ছে উদ্ভিদ ও প্রাণিজগত নিয়ে গঠিত একটি আবাসস্থল, যেখানে আত্মনির্ভরশীলতার ভিত্তিতে পারস্পারিক মিথস্ক্রিয়ায় চলে জীবনপ্রবাহ। আর তাই জড় এবং জীব পরিবেশ বিপন্ন হলে অন্যগুলোতে তার প্রতিক্রিয়া ঘটে অনিবার্যভাবে। এ প্রক্রিয়া হচ্ছে পরিবেশিক বিপর্যয়। এ বিপর্যয় থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য দরকার পরিবেশ সংরক্ষণ।

এটা লক্ষণীয় যে বর্তমান শতাব্দীতে এসে প্রাকৃতিক দুর্যোগ চরম আকার ধারণ করেছে। প্রতি বছরই বিশ্বের কোনা না কোন দেশে চলছে বন্যা, খরা, সাইক্লোন, টর্নেডো। ক্ষতি হচ্ছে শত শত কোটি টাকার সম্পদ, আর অমূল্য জীবনের। পরিবেশের এ বৈরী আচরণের জন্য দায়ী মানুষ। মানুষই তিলে তিলে নষ্ট করেছে পরিবেশ। তাই পরিস্থিতিজনিত কারণেই পরিবেশ সংরক্ষণ খুবই জরুরি।

পরিবেশ সংরক্ষণ নিয়ে বিশ্বব্যাপি প্রথম প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে গ্রিন পিস (Green Peace)। ১৬ জুন ১৯৭২ সুইডেনের রাজধানী স্টকহোমে মানব পরিবেশ সম্পর্কিত সম্মেলনে পরিবেশ নিয়ে প্রথম আলোচনা করা হয়। এর বিশ বছর পর ১৯৯২ খ্রি:৩-১৪ জুন ব্রাজিলের রিও-ডি-জেনিরোতে জাতিসংঘ তত্ত্বাবধানে বিশ্ব পরিবেশ ও উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় যা ধরিত্রী সম্মেলনবা **Earth Summit** নামে পরিচিত। এতে বিশ্বের ১৮৫টি দেশের সরকার প্রধানরা বা তাদের প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করে এবং পরিবেশ সংরক্ষণ সম্পর্কিত ঘোষণায় স্বাক্ষর করে। এতে জোরদিয়ে বলা হয় যে, **শান্তি, উন্নয়ন এবং পরিবেশ সংরক্ষণ হচ্ছে পরস্পর নির্ভরশীল এবং অবিচ্ছেদ্য** (অনুচ্ছেদ-২৫)। পরিবেশ সংরক্ষণ কোন একক দেশ বা জাতি গোষ্ঠীর পক্ষে সম্ভব নয়। এজন্য দরকার বিশ্বব্যাপি পরিবেশ সচেতনতা।

বিশ্ব আজ তিনটি সমস্যা দ্বারা ভারাক্রান্ত। জনসংখ্যা, দূষণ এবং দারিদ্র। এর থেকে মুক্তি পেতে হলে পরিবেশ সংরক্ষণ অপরিহার্য। এ জন্য নিম্নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে-

১. জাতীয় পরিবেশ নীতি প্রণয়ন করা;
২. যত্রতত্র কলকারখানার অপরিশোধিত বর্জ্য, ময়লা-আবর্জনা, মলমূত্র, মৃতপ্রাণী ফেলা বন্ধ করা;
৩. কলকারখানা ও যানবাহন থেকে নির্গত ধোঁয়া পরিশোধনের ব্যবস্থা করা;
৪. পারমাণবিক অস্ত্র, জীবাণু ও রাসায়নিক অস্ত্রের ব্যবহার নিষিদ্ধ করা;
৫. ব্যাপকভাবে গাছ-পালা কর্তন বন্ধ করা ও গাছপালা রোপণ করা;
৬. বন্য প্রাণীনিধন বন্ধ করা ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা;
৭. রাসায়নিক সার, কীটনাশক ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত করা;
৮. বাড়ি-ঘর ও আশেপাশের পরিবেশ পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা হবে এবং গৃহস্থালির আবর্জনা নিরাপদ স্থানে রাখা;
৯. নালা-নর্দমা পরিস্কার এবং নদী, পুকুর, খাল খনন করা;
১০. যত্রতত্র ধূমপান বন্ধ করা এবং ধূমপানের কুফল সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করা;
১১. জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ করে সম্পদের উপর চাপ কমানো;
১২. পরিবেশ সংক্রান্ত সামাজিক শিক্ষাক্রম গ্রহণ ও পরিচালনা করা;
১৩. গাছ লাগান, পরিবেশ বাঁচান এ নীতি অবলম্বন করা;
১৪. সমন্বিত ও সুপারিকল্পিতভাবে দেশের সামগ্রিক ভূমি ব্যবহার পরিবেশসম্মত করা;
১৫. পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য রাজনৈতিক অঙ্গীকার সুনিশ্চিত করা;
১৬. কাঠের বিকল্প ও নবায়নযোগ্য জ্বালানী ব্যবহার করা;
১৭. উপকূলীয় বনভূমির পরিমাণ বাড়ানো;
১৮. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিবেশ শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা;
১৯. বিশ্ব খাদ্য ও নিরাপদ খাবার পানি সরবরাহ এবং স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা;
২০. বাণিজ্যিক ও গৃহস্থালির ময়লা-আবর্জনা নিরাপদ অপসারণ এবং সুব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা;
২১. যানবাহনের কালো ধোঁয়া নির্গমন ও উচ্চ শব্দযুক্ত হাইড্রোলিক হর্নের ব্যবহার রোধ করা;
২২. পরিবেশ দূষণের কারণ হতে পারে এমন প্রকল্প অনুমোদন থেকে বিরত থাকা;
২৩. প্রাকৃতিক সম্পদের অপচয় রোধ করে তার সর্বোত্তম ব্যবহার করা;
২৪. পরিবেশ বা জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর দ্রব্য উৎপাদন বন্ধে সকল দেশের সহযোগিতা করা;
২৫. জাতিসংঘের সনদ অনুসারে সকল রাষ্ট্র তাদের পরিবেশগত বিবাদ শান্তিপূর্ণভাবে মীমাংসা করা;
২৬. যে সব যানবাহন কম দূষণ করে এবং যেকুলোর পরিবেশগত প্রতিক্রিয়া নেই সেগুলোর প্রসার ঘটানো;
২৭. জ্বালানী সাশ্রয়ের যথাসাধ্য চেষ্টা করা;
২৮. জীবনের সকলক্ষেত্রে 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle)- এর ব্যবহার নিশ্চিত করা;
২৯. গ্রিনহাউজ গ্যাসের নির্গমন হ্রাস ও কার্বন ডাইঅক্সাইড শোষণে বৃক্ষাচ্ছাদন বাড়ানো।

মানুষ ও প্রাণীর বসবাসের জন্য চাই সুস্থ, সুন্দর, নির্মল পরিবেশ। যে পরিবেশে পাখি গাইবে, ফুল ফুটবে, নদীতে বইবে কলকল বিস্কন্দ জল, যে পরিবেশ বায়ু সেবন করে মানুষের আয়ু বাড়বে, স্বাস্থ্য থাকবে অটুট, মন থাকবে ফুরফুরে। তেমনি সুন্দর পরিবেশের জন্য সবাইকে সচেতন থাকতে হবে, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করে ভোগ-বিলাস কমাতে হবে। যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা বন্ধ করে বন্যপ্রাণী বাঁচাতে হবে, বাড়তে হবে গাছপালা। বর্তমানের মানুষ তাহলেই ভালো থাকবে, বসবাসের সুযোগ পাবে আগামী প্রজন্ম। রিও-ডি-জেনিরোর ঘোষণার কথাই সবার কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হতে হবে **One earth, One Hope** আমাদের একটাই পৃথিবী, একে নিয়েই যত আশা।

প্রশ্নমালা

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. অক্ষাংশ বলতে কী বুঝায়?
২. দ্রাঘিমা কী?
৩. আন্তর্জাতিক তারিখরেখার প্রয়োজন কেন?
৪. পৃথিবীর আকার কিরূপ?
৫. আর্হিক গতি কী?
৬. বার্ষিক গতির কারণ কী?
৭. পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ গঠন কেমন?
৮. ভূমিকম্প কী?
৯. ভূমিকম্পের কারণ কী?
১০. ভূমিকম্প হলে কী করণীয় ?
১১. আগ্নেয়গিরি কী?
১২. আগ্নেয়গিরি বলয় বলতে কী বুঝায়?
১৩. বিচূর্ণীভবন কী?
১৪. জৈবিক বিচূর্ণীভবন বলতে কী বুঝায় ?
১৫. বায়ুমণ্ডল বলতে কী বুঝায়?
১৬. বায়ুমণ্ডলের প্রধান উপাদান কীকী?
১৭. আবহাওয়া কী?
১৮. জলবায়ু বলতে কী বুঝায়?
১৯. কেন জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটে?
২০. বারিমণ্ডল কী?
২১. মহাসাগর বলতে কী বুঝায়?
২২. পৃথিবীর মহাসাগরগুলোর নাম লিখুন।
২৩. সাগর কী?
২৪. উপসাগর বলতে কী বুঝায়?
২৫. সাগর ও উপসাগরের মধ্যে পার্থক্য কী?
২৬. সমুদ্রশ্রোত কী?
২৭. প্রধান কয়েকটি সমুদ্রশ্রোতের নাম লিখুন।
২৮. জোয়ার-ভাটা কী?
২৯. জোয়ার-ভাটা হয় কেন?
৩০. পরিবেশের উপাদান কী?
৩১. পরিবেশের উপাদানগুলোর নাম লিখুন।
৩২. পরিবেশ দূষণের কারণ কী?
৩৩. কীভাবে পরিবেশ দূষণ রোধ করা যায়?
৩৪. পরিবেশ সংরক্ষণ কেন প্রয়োজন ?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমা কাকে বলে? এদের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা লিখুন।
২. আন্তর্জাতিক তারিখ রেখার প্রয়োজনীয়তা ও ব্যবহার লিখুন।
৩. পৃথিবীর আকার কীরূপ? পৃথিবীর আকারের স্বপক্ষে যৌক্তিক প্রমাণ দিন।
৪. আর্হিক ও বার্ষিক গতির কারণ ও ফলাফল লিখুন।
৫. পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ গঠনের সচিত্র বিবরণ দিন।
৬. ভূমিকম্পের কারণ ও ফলাফল লিখুন।
৭. আগ্নেয়গিরির শ্রেণিবিভাগ করে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন।
৮. বিচূর্ণীভবনের শ্রেণিবিভাগ করে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন।
৯. বায়ুমণ্ডলের উপাদানগুলোর তালিকা করে এর স্তরসমূহের বর্ণনা দিন।
১০. আবহাওয়া ও জলবায়ুর মধ্যে পার্থক্য করুন। জলবায়ুর পরিবর্তনের কারণ ব্যাখ্যা করুন।
১১. বারিমণ্ডল কী? পৃথিবীর মহাসাগরগুলোর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন।
১২. আটলান্টিক মহাসাগরের শ্রোতগুলোর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন।
১৩. ভারত মহাসাগরের শ্রোতগুলোর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন।
১৪. প্রশান্ত মহাসাগরের শ্রোতগুলোর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন।
১৫. জোয়ার ভাটার কারণ ও ফলাফল লিখুন।
১৬. পরিবেশের উপাদান কী কী? পরিবেশ দূষণের কারণ ও প্রতিকার লিখুন।
১৭. পরিবেশ সংরক্ষণ বলতে কী বুঝায়? পরিবেশ সংরক্ষণের উপায়গুলো লিখুন।

ইউনিট ৪ : ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ক বিষয়বস্তু শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কলাকৌশল এবং কার্যকর পাঠের পরিকল্পনা

ভূগোল ও পরিবেশ বিষয় শিক্ষণের বিভিন্ন শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কলাকৌশল এবং এর প্রয়োগ সম্পর্কে একজন শিক্ষকের জানা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একজন দক্ষ শিক্ষক সবসময় শিক্ষার্থীদের কার্যকর (Dynamic) শিখনের উপর গুরুত্ব দেন। আর এ কার্যকর শিখন কেবল একটি বা দুটি শিক্ষাদান পদ্ধতি-কৌশল দিয়ে অর্জন করা সম্ভব নয়। অন্যদিকে যেকোন কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য একটি সঠিক পরিকল্পনার প্রয়োজন। শ্রেণি পাঠদানের মত একটি জটিল কাজ সুন্দর ও কার্যকরভাবে সম্পাদন করার জন্য তাই পাঠপরিকল্পনা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়। আলোচ্য ইউনিটে ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ের বিভিন্ন শিখন-শেখানো পদ্ধতি-কৌশল, ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ক শিখন সম্পর্কিত খেলা, পাঠপরিকল্পনা, ইউনিট পরিকল্পনা অনুশিক্ষণ, ছদ্মশিক্ষণ ও ফলাবর্তন, সামাজিক সচেতন মেলা, ফিল্ডট্রিপ পরিকল্পনা বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

- ৪.১ ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ে বিভিন্ন শিখন-শেখানো ধারা, পদ্ধতি ও কলা কৌশলের ধারণা ও প্রয়োগ
- ৪.২ ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ক শিখনকে আকর্ষণীয় করা, শিখনে ভূগোল সম্পর্কিত খেলা ও ভিডিও ব্যবহার
- ৪.৩ পাঠপরিকল্পনা ও ইউনিট পরিকল্পনা এবং ভূগোল ও পরিবেশ শিক্ষা পাঠের জন্য একটি পরিকল্পনা কাঠামো/ ছক
- ৪.৪ অনুশিক্ষণ, ছদ্মশিক্ষণ ও ফলাবর্তনে ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ের বিষয়বস্তু ব্যবহার
- ৪.৫ ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ক একটি সামাজিক সচেতন মেলার আয়োজন পরিকল্পনা এবং ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ক একটি ফিল্ডট্রিপ পরিকল্পনা

৪.১ : ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ে বিভিন্ন শিখন-শেখানো ধারা, পদ্ধতি ও কলা-কৌশলের ধারণা ও প্রয়োগ

ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ের জ্ঞান, দক্ষতা অর্জন প্রক্রিয়া দুভাবে সাধিত হয়। এর একটি হলো- তাত্ত্বিক জ্ঞান অর্জন এবং অন্যটি হলো- ব্যবহারিক কাজের মাধ্যমে এ বিষয়ের উপর দক্ষতা অর্জন। এ কারণে ভূগোল ও পরিবেশ শিক্ষাদানের জন্য অনেকগুলো বিশেষ ধারা, পদ্ধতি ও কৌশল সুনির্দিষ্ট রয়েছে। এগুলো হলো-

- বক্তৃতা পদ্ধতি
- প্রশ্ন-উত্তর পদ্ধতি
- আলোচনা পদ্ধতি
- আঞ্চলিক পদ্ধতি
- প্রদর্শন পদ্ধতি
- পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি
- শিক্ষাসফর
- প্রজেক্ট পদ্ধতি
- টিউটোরিয়াল পদ্ধতি
- সেমিনার
- অনুশিক্ষণ
- অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি
- অনুসন্ধানমূলক পদ্ধতি
- ভূগোল ও পরিবেশ মেলা
- ব্যবহারিক কাজ

বক্তৃতা পদ্ধতি

শিক্ষক কোন বিষয়বস্তু যখন মৌখিক বিবৃতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সামনে উপস্থাপন করেন তখন তাকে বক্তৃতা পদ্ধতি বলে। শিক্ষাদানে বক্তৃতা পদ্ধতির ব্যবহার প্রাচীনকালে শুরু হয়ে বর্তমানেও প্রচলিত রয়েছে। স্বল্প সময়ে কোন বিষয় সম্পর্কে অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থীদের ধারণা প্রদানের জন্য বক্তৃতা পদ্ধতির তুলনা নাই। শিক্ষকের বিষয় সম্পর্ক সুস্পষ্ট ধারণা থাকলে এবং শিক্ষকের বাচনভঙ্গি আকর্ষণীয় হলে এ পদ্ধতির উপস্থাপন শিক্ষার্থীদের মধ্যে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে। শিক্ষকের বিষয়বস্তুর বর্ণনা, তথ্য-উপাত্ত প্রদান, ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ শিক্ষার্থীদের চাহিদা পূরণে যত বেশি সক্ষম হয়; এ পদ্ধতির সফলতার মাত্রা তত বেশি হয়ে থাকে। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে এখন পর্যন্ত বক্তৃতা পদ্ধতি শিক্ষাদানের জনপ্রিয় মাধ্যম। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষাদানের জন্য এ পদ্ধতির ব্যবহার এখন প্রায় নেই বললেই চলে। কারণ এ স্তরের শিক্ষার্থীদের মনোযোগের সময়কাল সাধারণত ৫ থেকে সর্বোচ্চ ১০ মিনিট। অন্যদিকে বাংলাদেশের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে পাঠদানের সময় সীমা ৩০ মিনিট থেকে ৫০ মিনিট বা তারও বেশি। ফলে শিক্ষার্থীরা এতটা দীর্ঘ সময় মনোযোগ ধরে রাখতে পারে না বলে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য এ পদ্ধতি খুব বেশি কার্যকর নয়। তাই ৫ থেকে ৭ মিনিটের সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা বা মিনি লেকচার হিসেবে অন্যান্য পদ্ধতির সাথে এর প্রয়োগ রয়েছে। ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ের বিভিন্ন বিষয়বস্তুর তাত্ত্বিক ধারণা প্রদানের জন্য বক্তৃতা পদ্ধতি ব্যবহার করা যায়। বক্তৃতা পদ্ধতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো এটি শিক্ষককেন্দ্রিক পাঠদান পদ্ধতি।

প্রশ্ন-উত্তর পদ্ধতি

প্রশ্ন-উত্তর শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক শিখন-শেখানো পদ্ধতি। শ্রেণিতে শেখানোর সময় শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠ সংশ্লিষ্ট অনেক বিষয়ে প্রশ্ন করে থাকেন যার বেশিরভাগ মৌখিক প্রশ্ন। যেমন-সৌর জগৎ কী? বৃষ্টিপাত কাকে বলে? নদীভাঙ্গন কেন হয়? বাংলাদেশের কোন অঞ্চলে কী ধরনের প্রকৃতিক দুর্যোগ হয়ে থাকে? বাংলাদেশের কোথায় সবচেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত হয়? ইত্যাদি। প্রশ্ন-উত্তর পদ্ধতির ব্যবহার শিক্ষার্থীর জ্ঞান স্তরের শিখন যাচাইয়ের পাশাপাশি অনুধাবন, প্রয়োগ এবং উচ্চতর চিন্তন দক্ষতার অনুশীলন করতেও সাহায্য করে। তবে শিক্ষকের প্রশ্ন-উত্তর পদ্ধতি ব্যবহারের ক্ষেত্রে জ্ঞান, অনুধাবন, প্রয়োগ এবং উচ্চতর চিন্তন দক্ষতা- এ চারটি স্তরের মধ্যে একটা ভারসাম্য থাকা দরকার, যাতে শিক্ষার্থীর শিখন বহুমুখী হয়। প্রশ্ন-উত্তর পদ্ধতির একটি ভাল দিক হলো ইহা শিক্ষার্থীদের মনোযোগী রাখে। তবে কোন বিষয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ধারণা না থাকলে শিক্ষক যদি সে বিষয়ে কেবল প্রশ্ন করতে থাকেন তাহলে শিক্ষার্থীরা বিরক্ত বোধ করে এবং পাঠদান অকার্যকর হয়ে পড়ে। তাই প্রশ্ন-উত্তর পদ্ধতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর বিষয়বস্তু সম্পর্কে পূর্ব অভিজ্ঞতা থাকা খুবই জরুরি।

আলোচনা পদ্ধতি

আলোচনা পদ্ধতি এক ধরনের শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শিখন-শেখানো পদ্ধতি যেখানে শিক্ষক একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে শিক্ষার্থীদের মতামত বা শিক্ষার্থীরা এ বিষয়ে কী ভাবছে তা জানতে চান। আলোচনা পদ্ধতিতে শিক্ষক পাঠ সংশ্লিষ্ট কোন বিষয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সাথে মত বিনিময় করেন। এ মত বিনিময়ের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শিখনের অগ্রগতি এবং শিখন সম্পন্ন হয়। শিক্ষার্থী কোন বিষয়ে যখন আলোচনায় অংশগ্রহণ করে তখন সে সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে তথ্য-উপাত্ত, যুক্তি প্রদর্শন করে। এতে শিক্ষার্থীর বিষয় জ্ঞান, দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটে। এ পদ্ধতিতে বিভিন্ন শিক্ষার্থীর আলোচনায় অংশগ্রহণে ও শিখন সম্বলনে শিক্ষক সমন্বয়কারী বা সাহায্যকারীর ভূমিকা পালন করেন। আলোচনা পদ্ধতি শিক্ষার্থীর চিন্তাশক্তিকে জাগিয়ে তুলতে সাহায্য করে। আলোচনা পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের বক্তব্য উপস্থাপন দক্ষতার উন্নয়ন ঘটায় এবং তাদের সৃজনশীল করে। শিক্ষার্থীর বাচনভঙ্গিকে উন্নত করে। আলোচনা পদ্ধতি প্রয়োগের একটি পূর্ব শর্ত হলো- যে বিষয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা আলোচনায় অংশগ্রহণ করবে সে বিষয়ে শিক্ষার্থীদের পূর্বপ্রস্তুতি থাকতে হবে।

আঞ্চলিক পদ্ধতি

ভূগোল শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য পদ্ধতি হলো আঞ্চলিক পদ্ধতি। ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতেই পাঠদানের ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপি বিদ্যালয়ে ভূগোল শিক্ষাদানে আঞ্চলিক পদ্ধতি একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে আসছে। আঞ্চলিক পদ্ধতিতে পাঠদানের ক্ষেত্রে ভূগোলের আলোচ্য বিষয়কে অঞ্চলভিত্তিক আলোচনা করা হয়। ভূগোলের আলোচ্য বিষয়কে অঞ্চলভিত্তিক ভাগ করে নিখুঁতভাবে পর্যবেক্ষণ করে আলোচনা করার নামই আঞ্চলিক পদ্ধতি। ভৌগোলিক বিষয়াবলিকে যখন বিভিন্ন অঞ্চলে শ্রেণিকরণ করে শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন করা হয় তখন সে পদ্ধতিকে বলা হয় আঞ্চলিক পদ্ধতি। ভৌগোলিক বিষয়বস্তু হিসেবে রাজনৈতিক সীমানা, ভূপ্রকৃতি, জলবায়ু, নদ-নদী, কৃষি, বনাঞ্চল, খনিজ, শিল্প, বাণিজ্য, যোগাযোগ, দুর্যোগ, জনবসতি, সংস্কৃতি ইত্যাদির আলোচনায় আঞ্চলিক পদ্ধতি অনেক বছর ধরেই ভূগোলশিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। আঞ্চলিক পদ্ধতিতে পাঠদানের সবচেয়ে বড় প্রায়োগিক দিক হলো এতে শিক্ষার্থীদের বিষয়বস্তু সম্পর্কে বিশ্লেষণ এবং সংশ্লেষণমূলক ধারণা ভালভাবে জন্মে।

প্রদর্শন পদ্ধতি

প্রদর্শন পদ্ধতি শিক্ষাদানের জন্য একটি আকর্ষণীয় পাঠদান পদ্ধতি। বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার করে প্রদর্শন পদ্ধতি পদ্ধতি কার্যকর করা হয়। এ সকল উপকরণ হলো ছবি, চার্ট, সারণি, পোস্টার, মডেল, বাস্তব উপকরণ ইত্যাদি। ভূগোল ও পরিবেশ শিক্ষাদানে সৌরজগতের মডেল, আগ্নেয়গিরি, মালভূমি, পাহাড়-পর্বতের মডেল, নদ-নদীর মডেল/চিত্র ইত্যাদি ব্যবহার করে প্রদর্শন পদ্ধতির মাধ্যমে পাঠদান করা যায়। শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে এ ধরনের বাস্তব উপকরণের ব্যবহার শিখনকে কার্যকর ও স্থায়ী করে। প্রদর্শন পদ্ধতিতে পাঠদানের জন্য শিক্ষক যে উপকরণ ব্যবহার করবেন তা শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে তৈরি করিয়ে নিলে শিক্ষার্থীদের জন্য শিখন প্রক্রিয়া আরও কার্যকর হয়। এক্ষেত্রে শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ উপকরণ প্রদর্শনের উপযোগী থাকা দরকার।

পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি

প্রতিটি শিক্ষার্থীর মধ্যে নতুন কিছু দেখা এবং তা থেকে শেখার অদম্য কৌতূহল রয়েছে। এ কৌতূহল শিক্ষার্থীকে শিখতে অনুপ্রাণিত করে। পর্যবেক্ষণকৃত বস্তু থেকে শিক্ষার্থী নতুন নতুন তথ্য আবিষ্কার করে। পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীর শিখন তিনটি ধাপে সম্পন্ন হয়। এগুলো হলো-

১. বস্তুকে মনোযোগের সাথে দেখা;
২. তথ্য সংগ্রহ ;
৩. সংগ্রহকৃত তথ্য বিশদীকরণ।

ভৌগোলিক পর্যবেক্ষণে ব্যবহৃত উপকরণসমূহের তালিকা হলো- গ্লোব, সৌরজগৎ, পাহাড়, মালভূমির মডেল ইত্যাদি। ভূগোল শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে গ্লোব হলো একটি শক্তিশালী শিক্ষা উপকরণ। এ সকল শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার করে শিক্ষার্থীরা অক্ষাংশ, দ্রাঘিমা, আন্তর্জাতিক তারিখরেখা, সাগর-মহাসাগর, দেশ মহাদেশ, জলবায়ু অঞ্চল ইত্যাদি সম্পর্কে শিখতে পারে।

শিক্ষাসফর

শিক্ষাসফর পাঠ্যপুস্তকের অর্জিত জ্ঞানকে বাস্তব জীবনের সাথে সম্পর্কিত করার সুযোগ করে দেয়। ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ে অনেক বিষয়বস্তু রয়েছে যা শিক্ষাসফরের মাধ্যমে অনেক সফলভাবে শেখা যায়। যেমন-পাহাড়, টিলা, নদ-নদী, সমভূমি, চাবাগান, বনাঞ্চল, শিল্প-কারখানা, খনিজ সম্পদ সমৃদ্ধ এলাকা, সমুদ্র সৈকত, দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা, বিমানবন্দর, সেতু, কৃষিজ সম্পদ উৎপাদনকারী অঞ্চল, মেলা, ভৌগোলিক স্থাপনা ইত্যাদি। শিক্ষাসফর শিক্ষার্থীর শিখনকে সহজ এবং আনন্দময় করে তোলে। শিক্ষাসফর শিক্ষার্থীর দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটায়। ইহা শিক্ষার্থীদের শিখনের একঘেয়েমী অবস্থা দূর করে। কিছু শিক্ষাসফর শিক্ষার্থীদের হাতে কলমে কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি করে যা শিক্ষার্থীদের কর্মসংস্থানের গাইড লাইন হিসেবে কাজ করে। উন্নত বিশ্বে ভূগোল শিক্ষাদানের পদ্ধতি হিসেবে শিক্ষাসফর খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। বাংলাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক দুর্বলতার কারণে ভূগোল শিক্ষাদানে শিক্ষাসফর পদ্ধতি হিসেবে খুব বেশি ভূমিকা রাখতে পারছে না।

প্রজেক্ট পদ্ধতি

প্রজেক্ট পদ্ধতি একটি উল্লেখযোগ্য শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক পদ্ধতি যেখানে শিক্ষার্থীরা পূর্ব থেকে নির্ধারিত কর্মসম্পাদনের মাধ্যমে শিখনফল অর্জন করেন। জন ডিউই প্রবর্তিত সমস্যা সমাধান পদ্ধতির ধারাবাহিকতায় তাঁর অনুসারী কিলপ্যাট্রিক প্রজেক্ট পদ্ধতির উদ্ভাবন করেন। স্বাভাবিক পরিবেশে কর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে শিখনফল অর্জন এ পদ্ধতির মূল লক্ষ্য। প্রজেক্ট পদ্ধতিকে স্টিভেনসন "Whole hearted purposeful activity proceeding in social environment" হিসেবে উল্লেখ করেছেন। প্রজেক্টকে তিনি স্বাভাবিক পরিবেশে কর্ম সম্পাদনের প্রক্রিয়া হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, "প্রজেক্ট হলো একটি সমস্যামূলক কর্ম, যা স্বাভাবিক পরিবেশে সম্পন্ন হয়" (A project is a problematic act, carried to completion in its natural setting). ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ের শিক্ষার্থীরা বসতির ধরন, ভূমি ব্যবহার জরিপ (Survey), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়বস্তুর প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করে শিক্ষালাভ করে। এ পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের কর্মের মাধ্যমে শিখনের সুযোগ সৃষ্টি করে দেয় এবং শিক্ষার্থীরা মূখস্থবিদ্যার পরিবর্তে সৃজনশীল শিখন প্রক্রিয়ায় শিক্ষালাভ করে। প্রজেক্ট পদ্ধতির আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো- এতে শিক্ষার্থীরা স্বাধীনভাবে কাজ করতে শেখে।

টিউটোরিয়াল শিক্ষাদান পদ্ধতি

ইংরেজি æTutorial” শব্দের আভিধানিক অর্থ আলোচনা ও গবেষণার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি ছোট ক্লাশ। টিউটোরিয়াল শিক্ষাদান পদ্ধতি বলতে বুঝায়, যেখানে শিক্ষার্থীর সংখ্যা সীমিত থাকে এবং শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে ব্যক্তিগতভাবে পাঠ্যবিষয় শিখতে সাহায্য-সহযোগিতা করেন। শিক্ষার্থীর শিখনের অগ্রগতি যাচাই করার জন্য ধারাবাহিক মূল্যায়নের জন্য বাংলাদেশে মাধ্যমিক স্তর এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষকের একক তত্ত্বাবধানে ৫ থেকে ১০ নম্বরের টিউটোরিয়াল পরীক্ষা নেওয়া হয়। আবার টিউটোরিয়াল ক্লাশ নেওয়ার রীতিও রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স এবং মাস্টার্স পর্যায়ে। বাংলাদেশে ব্যক্তিগত পর্যায়ে টিউটোরিয়াল সার্ভিস নামে গৃহশিক্ষকতার প্রচলন রয়েছে। টিউটোরিয়াল পদ্ধতির উল্লেখযোগ্য দিক হলো সীমিত সংখ্যক শিক্ষার্থীদের নিয়ে বিশেষ তত্ত্বাবধানে এ পদ্ধতিতে পাঠদান করা হয় এবং শিক্ষার্থীর কোন বিষয়ে বুঝতে অসুবিধা হলে শিক্ষক তাৎক্ষণিক সহায়তা দিতে পারেন।

সেমিনার

Wikipedia-তে উল্লিখিত সংজ্ঞা অনুযায়ী- A seminar is a form of academic instruction, either at an academic institution or offered by a commercial or professional organization. সেমিনারে প্রধানত সমস্যা মূলক এবং ইস্যুভিত্তিক বিষয় নিয়ে গবেষণাধর্মী উপস্থাপন করা হয়। সুতরাং সেমিনার পদ্ধতি সাধারণত বয়স্ক ও পরিণত বুদ্ধিসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জন্যই অধিকতর কার্যকরী। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরাই সাধারণত আলোচনার জন্য সেমিনারের আয়োজন করেন। মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থী ও বি.এড প্রশিক্ষণার্থীদের শিখন কার্যক্রমে সেমিনার পদ্ধতি অনুসরণ করা যেতে পারে। সেমিনার শিক্ষার্থীদের স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে শেখায় এবং নিজে নিজে শিখতে পারে। সেমিনারে প্রবন্ধ লেখা ও তা উপস্থানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শিখন প্রক্রিয়ায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হয়। আমাদের দেশের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষাদান সময়সূচি যদিও সেমিনার পদ্ধতি ব্যবহারের উপযোগী নয় তবুও শিক্ষক-শিক্ষার্থীর আলোচনার ভিত্তিতে এটা মাঝে মাঝে করা যেতে পারে।

অনুশিক্ষণ

শিক্ষাদান মূলত কতগুলো দক্ষতার অনুশীলন। একজন প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকের পক্ষে শিক্ষাদানের সকল দক্ষতা একই সময়ে নির্ভুলভাবে অনুশীলন করে পাঠদান করা সম্ভব হয় না। এ কারণে একটি সামগ্রিক শিখন-শেখানো কার্যক্রমের সকল দক্ষতার তালিকা তৈরি করে তা থেকে একটি বা দুটি দক্ষতা নির্বাচন করে স্বল্প সময়ের মধ্যে পুনঃপুনঃ অনুশীলনের মাধ্যমে একটি বা দুটি দক্ষতার উৎকর্ষ সাধনের প্রক্রিয়াকে বলা হয় অনুশিক্ষণ। অনুশিক্ষণে বারবার প্রচেষ্টার ফলে প্রশিক্ষণার্থী-শিক্ষকের ভুলের পরিমাণ কমে আসে এবং প্রশিক্ষণার্থী-শিক্ষক নির্বাচিত দক্ষতা আয়ত্ত্ব করতে সক্ষম হন। ১৯৬৩ খ্রিষ্টাব্দে আমেরিকার স্টানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল দক্ষ শিক্ষক অনুশিক্ষণ পদ্ধতির উদ্ভাবন করেন। পরবর্তীতে ১৯৬৮ খ্রিষ্টাব্দে একই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে এর প্রয়োগ শুরু হয়।

অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি

যে শিক্ষণ-শিখন কৌশলে শিক্ষার্থীরা প্রয়োজনীয় শিখন সামগ্রীর সহায়তায় তাদের মনস্তাত্ত্বিক ধারণ ক্ষমতা, আগ্রহ, প্রবণতা ইত্যাদি অনুযায়ী সক্রিয়তা, স্বাধীনতা, সৃজনশীলতা এবং মিথস্ক্রিয়তার মাধ্যমে কার্যক্রম সম্পন্ন করে তাদের শিখন অর্জন করে তাকে অংশগ্রহণমূলক শিক্ষণ-শিখন কৌশল বলা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে শিক্ষক বক্তার ভূমিকায় অবতীর্ণ না হয়ে পরিচালক বা সহায়তাকারীর ভূমিকা পালন করে থাকেন। শিক্ষক যখন শ্রেণিকক্ষে সহায়তাকারীর ভূমিকা পালন করেন তখন নানা ধরনের শিক্ষণ-শিখন কৌশল ব্যবহার করেন। অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি মূলত, অনেকগুলো কৌশলের সমন্বিত রূপ। অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি শ্রেণিকক্ষে ব্যবহার করার জন্য নানারকম কৌশল রয়েছে। এর মধ্যে কয়েকটি অংশগ্রহণমূলক শিক্ষণ-শিখন কৌশল সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হলো-

- **সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা:** এ কৌশলে পাঠদানের বিষয়বস্তুকে দীর্ঘ বক্তৃতার মাধ্যমে উপস্থাপন না করে ৫/৬ মিনিট সময়ের মধ্যে সংক্ষিপ্ত বক্তৃতার মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়। পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তু দীর্ঘ হলে একসাথে বক্তৃতা না দিয়ে খণ্ড খণ্ড করে সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা দেয়া হয়। সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা কৌশলের সাথে পাঠদানের আরও অন্যান্য কৌশলও এর সাথে ব্যবহার করা হয়। এর ফলে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ ধরে রাখা সম্ভব হয়।

- **একক কাজ:** একক কাজ বলতে বুঝায় শ্রেণিতে পাঠদান কার্যক্রম চলাকালে একজন শিক্ষার্থীদ্বারা এককভাবে সম্পাদিত যেকোন কাজ। যেমন- শিক্ষক কর্তৃক প্রদত্ত লিখিত বা মৌখিক কাজ, পড়া ইত্যাদি।
- **জোড়ায় কাজ:** পাশাপাশি বসা দুজন শিক্ষার্থীকে একটি সমস্যা নিয়ে যখন কোন কাজ করতে দেয়া হয় তখন সে কৌশলকে জোড়ায় কাজ বলে। পাঠের বিষয় বস্তু খুব কঠিন নয় এমন বিষয়বস্তু বা সমস্যাই কেবল জোড়ায় কাজে দেওয়া হয়।
- **দলগত কাজ:** দলগত কাজের জন্য শিক্ষার্থীদের প্রতিদলে ৫/৬ জন শিক্ষার্থী নিয়ে বিভিন্ন দলে ভাগ করা হয়। কোন সুনির্দিষ্ট বিষয়বস্তুর উপর প্রত্যেক দলকে একই ধরনের অথবা ভিন্ন রকম কাজ দেয়া হয়। উক্ত কাজ দলের প্রত্যেক সদস্যের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়।
- **মাথা খাটানো:** মাথাখাটানো বা Brain Storming- এ শিক্ষক শিক্ষার্থীদের চিন্তা-ভাবনা প্রকাশের সুযোগ সৃষ্টি করে দেন। একাজের সময় সাধারণত খুবই সংক্ষিপ্ত যা ৫ থেকে ৬ মিনিট হয়। শিখন ক্ষেত্রের অনুধাবন, প্রয়োগ এবং উচ্চতর চিন্তন দক্ষতার স্তরের অনুশীলনের জন্য মাথা খাটানো কৌশল ব্যবহার করা হয়। শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শিখন-শেখানো কার্যক্রমে এ কৌশলটির ব্যবহার ব্যাপক।
- **মৌখিক প্রশ্নকরণ:** শ্রেণিক্ষে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবিষয় নিয়ে মৌখিক প্রশ্ন করণের মাধ্যমে উপস্থাপন করেন। শিক্ষার্থীরাও শিক্ষককে বিষয়বস্তু সম্পর্কে প্রশ্ন করে। আবার দলগত বা জোড়ায় আলোচনার সময় নিজেরাও মৌখিক প্রশ্ন করার মাধ্যমে বিষয়বস্তু সম্পর্কে শেখে।
- **মাইন্ড ম্যাপিং বা মানসিক মানচিত্র:** মাইন্ড ম্যাপিং হলো একটি বিষয়বস্তুর বিভিন্ন তথ্য পয়েন্ট আকারে বা বিশেষ ছকের মাধ্যমে উপস্থাপন করা। প্রশিক্ষণার্থীদের একনজরে ধারণা দেয়া ও বোধগম্য করে তোলার জন্য এ কৌশল ব্যবহার করা হয়। এতে শিক্ষার্থী তার বিষয়বস্তু স্মরণ রাখার জন্য সংক্ষিপ্ত চিত্র, রেখা, নক্সা তৈরি করে।
- **কার্যকরী দল পুনর্বিন্যাস:** প্রথমে পাঠ্যবিষয়কে ৩-৫টি পর্বে ভাগ করা হয়। সে অনুযায়ী শ্রেণিকক্ষের শিক্ষার্থীদেরকে সমান সংখ্যক দলে ভাগ করা হয়। প্রত্যেক দলকে পাঠের একটি করে পর্ব দেয়া হয়। একই দলের শিক্ষার্থীরা পর্বটি নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে। দলের প্রত্যেকেই আলোচ্যপর্ব বা বিষয় সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা অর্জন করে যা তাকে আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ করে তোলে। আলোচনা শেষে নতুন দল গঠন করা হয় যেখানে পূর্বের বা মূল দলের একজন প্রতিনিধি থাকে যে শিক্ষার্থীটি, বিষয়-বিশেষজ্ঞ হিসেবে নতুন দলের অন্য সদস্যদের নিজের শেখা বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করে শিখতে সহায়তা করে। এভাবে দলের সকল সদস্য একইভাবে তার পূর্বে শেখা বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করে। এ আলোচনা করার মাধ্যমে দলের সবাই একই সাথে একাধিক বিষয় সম্পর্কে শিখতে পারে। এ কৌশল প্রয়োগের শর্ত হলো- শ্রেণির সকল শিক্ষার্থী যথেষ্ট মেধাবী, সক্রিয় এবং শিক্ষাদানে দক্ষ হতে হয়।
- **পোস্টবক্স:** এতে শিক্ষার্থীদের ছোট ছোট দলে ভাগ করা হয়। প্রত্যেক দলের জন্য ডাকবাক্সের ন্যায় কাগজের তৈরি বাক্স, প্রশ্নপত্র এবং সাদা কাগজ সরবরাহ করা হয়। বিভিন্ন দলের শিক্ষার্থীরা আলাদা আলাদাভাবে তাদের মতামত সাদা কাগজে লিখে এবং সরবরাহকৃত ডাকবাক্সে ফেলে। সকল দলের উত্তর লেখা শেষে নির্দিষ্ট বক্সে ফেলা হলে, প্রত্যেকটি দল তাদের প্রথম পোস্টবক্সের কাছে ফিরে যায় এবং বাক্স খুলে বিভিন্ন দলের মতামত একত্রিত করে পুরো ক্লাশের জন্য উপস্থাপন করে। ফলে সকল শিক্ষার্থী শেখার সুযোগ পায়।
- **অর্পিত কাজ:** শিক্ষক শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনাসহ বিষয়বস্তু সংশ্লিষ্ট কাজ দেন। শিক্ষার্থীরা সংশ্লিষ্টবিষয়ে রেফারেন্স পুস্তক, জার্নাল বা অন্য কোন সূত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ করে নির্দেশনা মোতাবেক কাজটি করে শিক্ষকের কাছে জমা দেন।
- **ভূমিকাভিনয়:** শিক্ষক/শিক্ষার্থী (একক বা দলগতভাবে) কোন ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে বা কোন বিশেষ চরিত্রে অভিনয় করে কিংবা বিষয় অনুকরণের মাধ্যমে কোন পরিস্থিতি/বক্তব্য ফুটিয়ে তুলতে পারেন। পাঠ্য বইয়ের কোন বিষয় ভূমিকাভিনয়ের মাধ্যমেফুটিয়ে তোলার শিক্ষাদান পদ্ধতিকে বলা হয় ভূমিকাভিনয় পদ্ধতি। কাজটি একক বা দলগতভাবে হতে পারে। ভূমিকাভিনয় চলাকালে অন্যান্য শিক্ষার্থীরা তা পর্যবেক্ষণ করে। ভূমিকাভিনয় দেখার পর শিক্ষার্থীরা দলগত আলোচনা, মাথাখাটানো ইত্যাদি শ্রেণি কার্যক্রমের মাধ্যমে বিষয়বস্তু সম্পর্কে শেখার সুযোগ পায়। শিক্ষার্থীদের পূর্ব অভিজ্ঞতা রয়েছে এমন বিষয় নিয়ে ভূমিকাভিনয় করলে শিক্ষাদান কার্যক্রম অধিক ফলপ্রসূ হয়। শিক্ষার্থীর আবেগিক ও আচরণ বিষয়ক শিখনের ক্ষেত্রে এ শিখন-শেখানো কৌশলটি অধিক কার্যকর। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, জনসংখ্যা ইত্যাদি পাঠদানে ভূমিকাভিনয় পাঠদান কৌশলটি সফলতার সাথে প্রয়োগ করা যায়। ভূমিকাভিনয়ের মাধ্যমে পাঠদানের ফলে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতার প্রকাশ ঘটে এবং অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের মনোযোগ বৃদ্ধি পায়। ভূমিকাভিনয়ের মাধ্যমে পাঠদান করলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে পর্যবেক্ষণ দক্ষতার উন্নয়ন ঘটে।

অনুসন্ধানমূলক পদ্ধতি

সাধারণভাবে অনুসন্ধান বলতে বোঝায় নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে কোনো ঘটনার কারণ ও ফলাফল উদ্ঘাটন করা। বিদ্যালয়ের শিখন-শেখানো কার্যক্রমের অংশ হিসেবে অনুসন্ধানমূলক কাজ হলো পাঠ্যসংশ্লিষ্ট কোন বিষয়, সমস্যা বা কোন ঘটনার কারণ ও ফলাফল খুঁজে বের করা। এ কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থী কোনো বিষয়ের অস্পষ্ট ধারণাকে স্পষ্ট করে তুলতে পারে। আবার যে বিষয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীর স্বল্প ধারণা রয়েছে কিন্তু বিষয়টি সম্পর্কে শিক্ষার্থী আরো গভীরভাবে জানতে আগ্রহী তা এই পদ্ধতির মাধ্যমে জানতে পারে। এটিকে স্বল্প পরিসরের গবেষণাধর্মী কাজও বলা যায়। এ কার্যক্রমে অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রধানত শিক্ষার্থীর সমস্যা সমাধান করার দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।

অনুসন্ধানমূলক কাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে- কোন সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ এবং তা বিশ্লেষণ করা। তথ্যের উৎস দুধরনের। যথা-

১. প্রাথমিক উৎস: যা পরীক্ষণ, পর্যবেক্ষণ বা সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে পাওয়া যায়।

২. সেকেন্ডারি উৎস: যা প্রকাশিত পত্র-পত্রিকা, জার্নাল, গবেষণা রিপোর্ট, বই-পুস্তক ইত্যাদি পর্যালোচনার মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়। এটি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমেও হতে পারে।

সুনির্দিষ্ট কয়েকটি ধাপ অনুসরণের মাধ্যমে অনুসন্ধানমূলক কাজ সম্পন্ন করা হয়। অনুসন্ধানমূলক কাজে অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু সংশ্লিষ্ট বাস্তবজীবনের বিভিন্ন সমস্যার সঠিক কারণ অনুসন্ধান করতে পারে। সমস্যাটি সমাধানের সম্ভাব্য উপায় সম্পর্কে সুপারিশ করতে বা মতামত দিতে পারে। সম্ভাব্য ক্ষেত্রে সমস্যাটি সমাধানের উদ্যোগও নিতে পারে। সর্বোপরি শিক্ষার্থীরা বাস্তবজীবনে বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে বিজ্ঞানভিত্তিক প্রক্রিয়া অনুসরণে সচেষ্ট হয়ে ওঠে।

অনুসন্ধানমূলক কাজ সম্পন্ন করার ধাপসমূহ

সমস্যা নির্বাচন: সমস্যা নির্বাচন বা সমস্যা চিহ্নিতকরণই হচ্ছে অনুসন্ধানমূলক কাজের প্রথম ধাপ। শিখনফল ও বিষয়বস্তুর আলোকে বাস্তব জীবনের সাথে সম্পর্কিত কোনো বিষয়কে সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করতে হয়।

উদ্দেশ্য নির্ধারণ: সমস্যা নির্বাচন করার পর অনুসন্ধানমূলক কাজের উদ্দেশ্য নির্ধারণ করতে হয়। এটি অনুসন্ধানমূলক কাজের দ্বিতীয় ধাপ। একাজ শুরু করার পূর্বে কাজটি কেন করা হবে এবং কাজের ফলাফল থেকে কী জানা যাবে তা নির্বাচন করাই হচ্ছে উদ্দেশ্য নির্ধারণ। কোনো গবেষণা শুরু করার পূর্বে উদ্দেশ্য নির্ধারণ করতে হয়। উদ্দেশ্য এক বা একাধিক হতে পারে। সমস্যার প্রকৃতির উপর এটি নির্ভর করে।

অনুমিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ: অনুমিত সিদ্ধান্ত হলো সমস্যা সমাধান বিষয়ে অনুমাননির্ভর ধারণা বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ। এটিও গবেষণা শুরু করার পূর্বে নির্ধারণ করতে হয় এবং এ ধারণা প্রমাণ করার লক্ষ্যে পরবর্তী কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

পরিকল্পনা প্রণয়ন: অনুসন্ধানমূলক কাজের উদ্দেশ্য নির্ধারণের পরবর্তী ধাপ হচ্ছে একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা প্রণয়ন করা। পরিকল্পনায় থাকবে কাজটি কীভাবে সম্পন্ন হবে এ সম্পর্কিত বর্ণনা।

- তথ্য সংগ্রহ করার পদ্ধতি
- পরীক্ষণ, পর্যবেক্ষণ, সাক্ষাৎকার গ্রহণ বা প্রকাশিত দলিলপত্র কীভাবে সংগ্রহ করা হবে তার বর্ণনা। যেমন: তথ্য সংগ্রহ কিংবা সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য প্রশ্নমালা প্রণয়ন ইত্যাদি।
- তথ্য সংগ্রহের পরিধি
- কোথায়, কত জনের সাক্ষাৎকার নিতে হবে কিংবা কোন কোন দলিলপত্র পরীক্ষণ করতে হবে ইত্যাদি।
- কাজটি সম্পন্ন করতে কত সময় প্রয়োজন হবে।
- কী কী উপকরণ ব্যবহার করা হবে।
- প্রতিবেদনটি কীভাবে রচনা করা হবে ইত্যাদি।

Instruments/Tools তৈরি: অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহের জন্য প্রশ্নমালা, চেকলিস্ট, পর্যবেক্ষণ সিডিউল ইত্যাদি তৈরি করতে হয়। এ ধরনের Instruments /Tools এমনভাবে তৈরি করতে হয় যাতে;

- প্রয়োজনীয় তথ্য বাদ না পড়ে
- অপ্রয়োজনীয় তথ্য সংগৃহীত না হয়
- সকলের নিকট বোধগম্য হয়

তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ: সাধারণত প্রশ্নমালার ভিত্তিতে তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করা যেতে পারে। তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর বয়স, শ্রেণি ও নিরাপত্তার বিষয়টি সতর্কতার সাথে বিবেচনায় নিতে হবে।

তথ্য ও উপাত্ত শ্রেণিবদ্ধকরণ: বৈশিষ্ট্য, প্রকারভেদ এবং চাহিদা অনুসারে সংগৃহীত তথ্য ও উপাত্ত শ্রেণিবদ্ধ করতে হয়। অর্থাৎ সংগৃহীত তথ্যাবলি প্রয়োজন অনুযায়ী গণসংখ্যা সারণি, গ্রাফ এবং চার্টে সাজাতে হবে।

তথ্য ও উপাত্ত বিশ্লেষণ এবং ফলাফল প্রস্তুত: অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যের আলোকে প্রাপ্ত তথ্যের (শ্রেণিবদ্ধকৃত) উপর মন্তব্যই হচ্ছে বিশ্লেষণ। গড়, শতকরা হার, তুলনা, আকার, আকৃতি, গন্ধ, স্বাদ ইত্যাদির সাহায্যে মন্তব্য করতে হয়। এর মাধ্যমেই অনুসন্ধান কাজের ফলাফল পাওয়া যায়। প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে ফলাফল প্রস্তুত করতে হয়।

সুপারিশ প্রণয়ন: তথ্য বিশ্লেষণের পর প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে বিষয় ও উদ্দেশ্যের আলোকে সুপারিশ প্রণয়ন করতে হয়। এছাড়াও পরবর্তীতে এ জাতীয় কাজ আরো ব্যাপক আকারে করার জন্য সুপারিশ করা হয়।

প্রতিবেদন প্রণয়ন: অনুসন্ধানমূলক কাজে সংগঠিত সকল কার্যক্রমের আলোকে একটি লিখিত প্রতিবেদন তৈরি করতে হয়। প্রতিবেদনের শুরুতে অনুসন্ধানমূলক কাজের শিরোনাম, কাজে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীর নাম, শ্রেণি ও রোল নম্বর, তত্ত্বাবধানকারী শিক্ষক ও বিদ্যালয়ের নাম উল্লেখ করতে হবে। পাশাপাশি ভূমিকা, উদ্দেশ্য, পদ্ধতি, তথ্য ও উপাত্ত বিশ্লেষণ, ফলাফল ও সুপারিশমালা বিন্যস্ত করে প্রতিবেদন তৈরি করতে হবে। সাধারণত ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে অনুসন্ধানমূলক কাজের পরিসর ছোট হওয়া বাঞ্ছনীয়। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের সহযোগিতা নিয়ে সমস্যা নির্বাচন বা চিহ্নিতকরণ, উদ্দেশ্য নির্ধারণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং Instruments/Tools তৈরি করবে। শিক্ষক Instruments/ Tools তৈরির নিয়মাবলি হাতে কলমে শিখিয়ে দেবেন। অনুসন্ধান কাজে সংগৃহীত তথ্য কীভাবে শ্রেণিবদ্ধ করতে হয় বা সাজাতে হয় শিক্ষক এ বিষয়েও শিক্ষার্থীদের পরিপূর্ণ ধারণা দেবেন। তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ, ফলাফল উপস্থাপন ও সুপারিশ প্রদানপূর্বক শিক্ষার্থীরা নিজেরাই প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে পারবে। আশা করা যায়, নবম ও দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের ন্যূনতম সহযোগিতা নিয়ে অনুসন্ধানমূলক কাজ সম্পন্ন করবে। অনুসন্ধানের কাজটি সাধারণত কয়েকটি দিবসের মধ্যে শ্রেণিতে ও বাড়িতে সম্পন্ন করতে হয়।

ভূগোল ও পরিবেশ মেলা

ব্যক্তির শিক্ষা কেবল শ্রেণিকক্ষের পাঠদানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; তা হতে পারে কোন দর্শনীয় স্থান পরিদর্শন করে, আবার হতে পারে পাঠ্যবইয়ের বিষয় সংশ্লিষ্ট কোন মেলা বা প্রদর্শনী থেকে। এজন্য বিজ্ঞান মেলা, কৃষি মেলা, আইসিটি মেলা, ভূগোল মেলা, শিক্ষা মেলা অনুষ্ঠিত হয় বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে। ভূগোল মেলা শিক্ষার্থীর জ্ঞানের পরিধিকে যেমন বিকশিত করে তেমনি এসব মেলা থেকে অর্জিত জ্ঞান শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত জীবনেরও অনেক সমস্যা সমাধানের পথ দেখিয়ে দেয়। ভূগোল মেলা শিক্ষার্থীদের সচেতন করার পাশাপাশি তার জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গিরও উন্নয়ন ঘটায়। ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ে শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞানের পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনে ভূগোল মেলা আয়োজন শিক্ষার্থীর মধ্যে আগ্রহ ও প্রেষণা সৃষ্টি, দৃষ্টিভঙ্গির প্রসার, মননশীলতার বিকাশ, দক্ষতা বৃদ্ধি, নেতৃত্বের গুণাবলীর বিকাশ, সহযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি, সৌন্দর্যবোধ, নান্দনিক দৃষ্টিভঙ্গি, গোষ্ঠীচেতনা, অনুসন্ধানী দৃষ্টি, মনোবল গঠন, “আমরা করব জয়” ইত্যাদি গুণাবলীর বিকাশ ঘটায়।

ব্যবহারিক কাজ

ভূগোল ও পরিবেশ শিক্ষায় তত্ত্বীয় জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি বিভিন্ন ব্যবহারিক কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা এ বিষয়ের উপর দক্ষতা লাভ করে। আবার ভূগোলের তথ্য উপাত্ত উপস্থাপনের জন্য বিভিন্ন ব্যবহারিক কাজ শিক্ষার্থীদের করতে হয়। মানচিত্রের স্কেল, মানচিত্রের সম্প্রসারণ-সংকোচন, মানচিত্রে ভূমির বন্ধুরতা প্রদর্শন, লেখচিত্র, ছায়াপাত ইত্যাদি ভূগোলের ব্যবহারিক কাজ। এ ছাড়া ভূমি জরিপ, ভূমির উচ্চতা নিরূপণ ইত্যাদি কাজও ভূগোলের ব্যবহারিক কাজের অন্তর্গত। ব্যবহারিক কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর জ্ঞানলাভের পাশাপাশি দক্ষতার উৎকর্ষ সাধিত হয় এবং দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হয়।

ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ে বিভিন্ন শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কলা-কৌশলের প্রয়োগ

নবম-দশম শ্রেণির ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ের পাঠ্যবিষয়বস্তু বাংলাদেশের বনাঞ্চল শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রম পরিচালনায় যে সকল পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগ করা যেতে পারে তা হচ্ছে- আঞ্চলিক পদ্ধতি, সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা, প্রশ্নকরণ, দলগত আলোচনা, জোড়ায় কাজ, কার্যকরী দল পুনর্বিন্যাস ইত্যাদি।

শিখনফল	শিখন-শেখানো কার্যাবলি	শিখন অর্জন যাচাই	শিক্ষা উপকরণ
বনজ সম্পদ কী তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।	পদ্ধতি ও কৌশল: সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা ও প্রশ্নকরণ শিক্ষক কুশল বিনিময়, পাঠের উপযোগী শ্রেণিবিন্যাস ও মানসিক পরিবেশ গঠন করে নিচের প্রশ্নটি শিক্ষার্থীদের জোড়ায় আলোচনা করে লিখতে বলবেন। প্রশ্ন: বনজ সম্পদ কাকে বলে এবং বনভূমির গুরুত্ব কী? লেখার জন্য নির্ধারিত সময় শেষে কয়েক জোড়াকে তা বোর্ডে লিখে উপস্থাপন করতে বলবেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উপস্থাপন করা হলে প্রয়োজনে তা সংশোধনসহ ব্যাখ্যা করবেন।	বনাঞ্চল কাকে বলে?	বনভূমির ছবি
বাংলাদেশের বনাঞ্চলের শ্রেণিবিভাগ ও এর বর্ণনা দিতে পারবে।	পদ্ধতি ও কৌশল: আঞ্চলিক পদ্ধতি, দলগত আলোচনা ও উপস্থাপন শিক্ষক আঞ্চলিক পদ্ধতির মাধ্যমে বাংলাদেশের বনাঞ্চলের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা করবেন এবং মূল তথ্যগুলো বোর্ডে লিখে দিবেন।	ক্রান্তীয় পাতাঝরা গাছের বৈশিষ্ট্য কী?	বাংলাদেশের বনাঞ্চলের মানচিত্র
বনজ সম্পদের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে।	পদ্ধতি ও কৌশল: কার্যকরী দল পুনর্বিন্যাস প্রতিদলে ৫/৬ জন শিক্ষার্থী নিয়ে সকল শিক্ষার্থীদের কয়েকটি দলে বিভক্ত করে বনাঞ্চলের গুরুত্ব দলের মধ্যে আলোচনা করতে বলবেন এবং প্রত্যেককে সুস্পষ্ট ধারণা নিতে বলবেন। এবার প্রত্যেক দল থেকে একজন করে সদস্য নিয়ে নতুন দল গঠন করবেন এ নতুন দলের প্রত্যেক সদস্য তাদের নিজ দলে (পূর্বের যে দলে কাজ করেছে) সম্পন্ন কাজ থেকে প্রাপ্ত ধারণা অন্যান্য সদস্যদের বুঝিয়ে দেবেন। এতে দলের প্রতিটি সদস্য/শিক্ষার্থী দলগত আলোচনা ও মতামত বিনিময়ের মাধ্যমে বিষয়বস্তু সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করবে।	বনজ সম্পদের পরিবেশগত গুরুত্ব কী ?	বনজ সম্পদ থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন দ্রব্য-সামগ্রী, ছবি, ভিডিও

৪.২ ভূগোল ও পরিবেশ শিখনকে আকর্ষণীয় করা, শিখনে ভূগোল সম্পর্কিত খেলা ও ভিডিও ব্যবহার

খেলার ছলে ভূগোল শেখা ভূগোল ও পরিবেশ শিক্ষাদানের একটি আকর্ষণীয় শিক্ষাদান কৌশল। ভূগোল শিক্ষা গ্রহণে শিক্ষার্থীদেরকে আগ্রহী করার জন্য অনেক আকর্ষণীয় খেলা ভূগোলবিদগণ আবিষ্কার করেছেন। এ খেলাগুলো একদিকে যেমন শিক্ষার্থীদেরকে ভূগোল শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী করে তোলে অন্যদিকে তেমনি এসব খেলা শিক্ষার্থীদের ভূগোল বিষয়ের জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করে। নিচে এ ধরনের কয়েকটি খেলার বর্ণনা দেয়া হলো-

ওয়ার্ল্ড ভিশন খেলা

ওয়ার্ল্ড ভিশন খেলায় বিভিন্ন ভৌগোলিক তথ্য সমৃদ্ধ একটি বিশ্বমানচিত্রের উপর একটি ঘূর্ণায়মান চাকতি লাগানো থাকে। শিক্ষার্থীকে যে কোন একটি দেশের নাম উল্লেখ করে চাকতিটিকে ঘুরিয়ে সে দেশের মানচিত্রের উপর রাখতে বলা হয়। এখানে মানচিত্রের সাথে সে দেশের অনেক ভৌগোলিক তথ্য যেমন- জনসংখ্যা, আয়তন, পতাকা, রাজধানী, মহাদেশ ইত্যাদি তথ্য থাকে। বিশেষভাবে নির্মিত চাকতিটিতে কতগুলো ছিদ্র থাকে যা কোন দেশের মানচিত্রের উপর বসানো হলে অন্যান্য ভৌগোলিক তথ্যের উপর চাকতির ছিদ্রগুলো প্রতিস্থাপিত হয় এবং শিক্ষার্থীকে তথ্যগুলো পড়তে বলা হয়। ফলে শিক্ষার্থী নিজে শেখে এবং অন্যান্য শিক্ষার্থীরা শুনে শেখে। এভাবে একাধিক শিক্ষার্থী বিভিন্ন দেশ সম্পর্কে পর্যায়ক্রমে পড়ে এবং সমগ্র ক্লাশের শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন ভৌগোলিক তথ্য সম্পর্কে শিখতে পারে।

বিশ্বযোগাযোগ খেলা

বিশ্বযোগাযোগ খেলায় একটি বিশ্ব রাজনৈতিক মানচিত্র ব্যবহার করা হয়। এরপর শিক্ষার্থীদেরকে একদেশ থেকে অন্য দেশে যাবার সামুদ্রিক, রেল, আকাশ, সড়ক পথ বের করতে বলা হয়। যেমন বাংলাদেশ থেকে কোন শিক্ষার্থী যদি জাপান যেতে চায় তাহলে কোন পথে কীভাবে যাবে তা দেখাতে বলা হয়। এভাবে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন দেশের মধ্যে আন্তর্জাতিক যোগাযোগের পথ সম্পর্কে শিখতে পারে।

কার্ড প্রশ্ন-উত্তর খেলা

কার্ড প্রশ্ন-উত্তর খেলায় শিক্ষার্থীদের মধ্যে কার্ড বিতরণ করা হয়। কার্ডের এক পাশে প্রশ্ন থাকে এবং অন্য পাশে শিক্ষার্থীদের উত্তর লিখতে বলা হয়। উত্তর লেখার নির্ধারিত সময় শেষে জমা নিয়ে শ্রেষ্ঠ উত্তর দাতা নির্বাচন করা হয়। কার্ড প্রশ্ন-উত্তর খেলাটি একক বা দলে হতে পারে।

দেশ-মহাদেশ খেলা

দেশ-মহাদেশ খেলার জন্য একটি বিশ্ব রাজনৈতিক মানচিত্র বা ভূগোলক নেওয়া হয়। এরপর শিক্ষার্থীকে ডেকে যে কোন একটি দেশ বা মহাদেশ খুঁজে বের করতে বলা হয় এবং এর ভৌগোলিক অবস্থানের বর্ণনা দিতে বলা হয়। যে শিক্ষার্থী যত বেশি নির্ভুল তথ্য দিতে পারে সে তত বেশি স্কোর পায়। পরে প্রাপ্ত স্কোরের ভিত্তিতে বিজয়ী নির্ধারণ করা হয়।

সাগর-মহাসাগর খেলা

সাগর-মহাসাগর খেলাটি দেশ-মহাদেশ খেলার মত। সাগর-মহাসাগর খেলার জন্য একটি বিশ্ব রাজনৈতিক মানচিত্র বা ভূগোলক নেওয়া হয়। এরপর শিক্ষার্থীকে ডেকে যে কোন একটি সাগর বা মহাসাগর খুঁজে বের করতে বলা হয় এবং এর ভৌগোলিক অবস্থান ও এর সমুদ্র পথের বর্ণনা দিতে বলা হয়। যে শিক্ষার্থী যত বেশি নির্ভুল তথ্য দিতে পারে সে তত বেশি স্কোর পায়। পরে প্রাপ্ত স্কোরের ভিত্তিতে বিজয়ী নির্ধারণ করা হয়।

ভূগোল কুইজ খেলা

ভূগোল কুইজ খেলা খুবই জনপ্রিয়। এ খেলার জন্য শিক্ষার্থীদেরকে দুটি প্রধান দলে বিভক্ত করে দলের দুটি সুন্দর নাম দেওয়া হয়। এর পর ভূগোলের বিষয়বস্তু নির্বাচন করে একদলকে নির্বাচিত বিষয়ের উপর কুইজ টাইপের অর্থাৎ এককথায় উত্তর দেওয়া যায় এমন প্রশ্ন করতে বলা হয়। অন্য দলকে এর উত্তর দিতে বলা হয়। শিক্ষক সঠিক প্রশ্ন এবং এর সঠিক উত্তরের ভিত্তিতে স্কোর দেন। একটি দল কতগুলো প্রশ্ন করতে পারবে তা আগেই নির্ধারণ করা হয়। নির্ধারিত দলের প্রশ্ন শেষে দুটি দলের ভূমিকার পরিবর্তন করা হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে, প্রথম রাউন্ডে যারা উত্তর দিয়েছিল পরের রাউন্ডে তারা সমসংখ্যক প্রশ্ন করার সুযোগ পায় এবং প্রথম রাউন্ডে যারা প্রশ্ন করে ছিল এবার তারা উত্তর দাতার ভূমিকা পালন করে। এ ভাবে দুদলের প্রশ্নের মান ও উত্তরের ভিত্তিতে দলভিত্তিক মেধা তালিকা তৈরি করে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। শিক্ষার্থীদের ভৌগোলিক জ্ঞান অর্জনে এ খেলাটি খুবই আকর্ষণীয়।

বৈশ্বিক উষ্ণায়ণ ও এর প্রতিরোধ বিষয়ে খেলা

সূর্য থেকে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে যে তাপ প্রবেশ করে তা স্বাভাবিক নিয়মে বিকিরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পুনরায় মহাশূন্যে ফিরে যাওয়ার কথা। কিন্তু পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে কতগুলো ক্ষতিকর গ্যাস যথা: কার্বন ডাইঅক্সাইড, নাইট্রাস অক্সাইড, মিথেন, ক্লোরোফ্লোরো কার্বন ইত্যাদি রয়েছে। এ সকল গ্যাস সূর্য থেকে আগত তাপের কিছুটা শোষণ করে বিধায় সূর্য থেকে আগত সকল তাপ মহাশূন্যে ফিরে যেতে পারে না। বায়ুমণ্ডলের এধরনের ক্ষতিকর গ্যাস প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে, ফলে আমাদের পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বায়ুমণ্ডলে এভাবে তাপমাত্রা আটকে যাওয়ার ঘটনাকে আমরা গ্রিনহাউস প্রতিক্রিয়া বলি। গাছ বায়ুমণ্ডলের কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস সহ অন্যান্য কয়েকটি গ্যাস খাদ্য তৈরির কাজে ব্যবহার করে। এ কারণে পৃথিবীতে বেশি বেশি গাছ লাগানো হলে বায়ুমণ্ডলের ক্ষতিকর গ্যাসের পরিমাণ কমে যাবে এবং সূর্য থেকে আগত তাপ সহজেই মহাশূন্যে ফিরে যেতে পারবে। বিশ্ব উষ্ণায়নের ধারণাপ্রদান এবং এর প্রতিরোধ করার জন্য একটি খেলা আয়োজন করা যেতে পারে যারপর্যায়সমূহ নিম্নরূপ।

বৈশ্বিক উষ্ণায়ণ প্রক্রিয়া বিষয়ে খেলা

- সাত-আট জন শিক্ষার্থী পৃথিবীর মত গোলাকার হয়ে বৃত্তের বাইরের দিকে মুখ করে দাঁড়াবে (এসকল শিক্ষার্থী হলো সূর্য থেকে আগত তাপ যারা কোন বাধা না পেলে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল অতিক্রম করে মহাশূন্যে ফিরে যাবে। শক্ত কাগজে তাপ লিখে এ সকল শিক্ষার্থীর শার্টের সামনে লাগিয়ে দেওয়া যেতে পারে)।
- প্রথম বৃত্তের ১০/১২ হাত দূরে গিয়ে চার-পাঁচজন শিক্ষার্থী বৃত্তাকারভাবে বৃত্তের ভেতরের দিকে মুখ করে এমনভাবে দাঁড়াবে যেন দুটি বৃত্তের শিক্ষার্থীদের অবস্থান মুখোমুখি হয় (এ বৃত্তের শিক্ষার্থীরা ক্ষতিকর গ্যাসের ভূমিকায় থাকবে, শক্ত কাগজে কার্বন ডাইঅক্সাইড, নাইট্রাস অক্সাইড, মিথেন, ক্লোরো ফ্লোরো কার্বন ইত্যাদি লিখে এ সকল শিক্ষার্থীর শার্টের সামনে লাগিয়ে দেওয়া যেতে পারে)।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের প্রস্তুত হওয়ার পর বাঁশি বাজাবেন।
- প্রথম বৃত্তের শিক্ষার্থীরা দৌড়ে দ্বিতীয় বৃত্তের শিক্ষার্থীদের অতিক্রম করে বাইরে যেতে চাইবে এবং দ্বিতীয় বৃত্তের শিক্ষার্থীরা তাদের ধরে আটকে রাখতে চাইবে।

ফলাফল

ফলাফলে দেখা যাবে, দ্বিতীয় বৃত্তের শিক্ষার্থীরা প্রথম বৃত্ত থেকে দৌড়ে যাওয়া কয়েকজন শিক্ষার্থীকে ধরে ফেলবে ফলে তারা বাইরে যেতে পারবে না।

সিদ্ধান্ত

দ্বিতীয় বৃত্তের শিক্ষার্থীরা যেমন প্রথম বৃত্তের কয়েকজন শিক্ষার্থীকে আটকে রেখেছে তেমনি বায়ুমণ্ডলের ক্ষতিকর গ্যাসসমূহ সূর্য থেকে আসা সম্পূর্ণ তাপকে বায়ুমণ্ডলের বাইরে অর্থাৎ মহাশূন্যে ফিরে যেতে দেয় না, কিছু তাপকে আটকে রাখে। ফলে পৃথিবীর তাপমাত্রা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বৈশ্বিক উষ্ণায়ণ প্রতিরোধ বিষয়ে খেলা

- সাত-আট জন শিক্ষার্থী পৃথিবীর মত গোলাকার হয়ে বৃত্তের বাইরের দিকে মুখ করে দাঁড়াবে (এ সকল শিক্ষার্থী হলো সূর্য থেকে আগত তাপ; যারা কোন বাধা না পেলে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল অতিক্রম করে মহাশূন্যে ফিরে যাবে। শক্ত কাগজে তাপ লিখে এ সকল শিক্ষার্থীর শার্টের সামনে লাগিয়ে দেওয়া যেতে পারে)।
- প্রথম বৃত্তের ১০/১২ হাত দূরে (দ্বিতীয় বৃত্তে) গিয়ে চার-পাঁচজন শিক্ষার্থী বৃত্তাকার ভাবে বৃত্তের ভেতরের দিকে মুখ করে এমনভাবে দাঁড়াবে দুটি বৃত্তের শিক্ষার্থীদের অবস্থান মুখোমুখি হয় (এ বৃত্তের শিক্ষার্থীরা ক্ষতিকর গ্যাসের ভূমিকায় থাকবে, শক্ত কাগজে কার্বন ডাইঅক্সাইড, নাইট্রাস অক্সাইড, মিথেন, ক্লোরোফ্লোরো কার্বন লিখে এ সকল শিক্ষার্থীর শার্টের সামনে লাগিয়ে লাগিয়ে দেওয়া যেতে পারে)।
- দ্বিতীয় বৃত্তে এবার আরও ২/৩ জন নতুন শিক্ষার্থী থাকবে যারা গাছের ভূমিকা পালন করবে (শক্ত কাগজে গাছ লিখে এদের শার্টের সামনে লাগিয়ে দিতে হবে)।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের প্রস্তুত হওয়ার পর বাঁশি বাজাবেন।
- প্রথম বৃত্তের শিক্ষার্থীরা দৌড়ে দ্বিতীয় বৃত্তের শিক্ষার্থীদের অতিক্রম করে বাইরে যেতে চাইবে এবং দ্বিতীয় বৃত্তের শিক্ষার্থীরা তাদের ধরে আটকে রাখতে চাইবে।

ফলাফল

প্রথম বৃত্তের শিক্ষার্থীরা দ্বিতীয় বৃত্তের শিক্ষার্থীদের অতিক্রম করে যেতে চাইবে। ক্ষতিকর গ্যাসের ভূমিকার যারা রয়েছে তারা আগের মতই প্রথম বৃত্তের শিক্ষার্থীদের ধরতে গেলে গাছের ভূমিকায় থাকা শিক্ষার্থীরা ক্ষতিকর গ্যাসের ভূমিকায় যারা রয়েছে তাদের ধরে রাখবে, ফলে তাপের ভূমিকায়রত শিক্ষার্থীদের কয়েকজন বিনা বাধায় দ্বিতীয় বৃত্ত অতিক্রম করে বাইরে চলে যেতে পারবে।

সিদ্ধান্ত

গাছের ভূমিকায় থাকা শিক্ষার্থীরা এবার ক্ষতিকর গ্যাসের ভূমিকায় থাকা শিক্ষার্থীদের আটকে রাখার কারণে তাপের ভূমিকায় থাকা কয়েকজন শিক্ষার্থী বিনা বাধায় দ্বিতীয় বৃত্ত অতিক্রম করে বাইরে চলে যাবে। যেমনভাবে বায়ুমণ্ডলে ক্ষতিকর গ্যাস কম থাকলে সূর্য থেকে আগত তাপ বিনা বাধায় মহাশূন্যে ফিরে যেতে পারত। তাই বৈশ্বিক উষ্ণায়ন বৃদ্ধি প্রতিরোধ করার জন্য আমাদের বেশি বেশি গাছ লাগাতে হবে।

ভূগোল ও পরিবেশ শিখনে ভিডিও ব্যবহার

অধ্যায়	বিষয়বস্তু	ভিডিও সমূহের তালিকা	ভিডিওর উৎস
প্রথম অধ্যায়	ভূগোল ও পরিবেশ		www.youtube.com
দ্বিতীয় অধ্যায়	মহাবিশ্ব ও আমাদের পৃথিবী	• মহাকাশ ও মহাবিশ্ব • সৌরজগৎ • অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমা • আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা • আর্থিক গতি, বার্ষিক গতি, ঋতু পরিবর্তন	
তৃতীয় অধ্যায়	মানচিত্র পঠন ও ব্যবহার	জিপিএস এর কার্যনীতি	
চতুর্থ অধ্যায়	পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ গঠন ও বাহ্যিক গঠন	• পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ গঠন • শিলা • আগ্নেয়গিরি • নদী ও নদীদ্বারা সৃষ্ট ভূমিরূপ	
পঞ্চম অধ্যায়	বায়ুমণ্ডল	• বায়ুমণ্ডল • পানিচক্র • বৃষ্টিপাত • বায়ুপ্রবাহ • গ্রিনহাউস	
ষষ্ঠ অধ্যায়	বারিমণ্ডল	সমুদ্র স্রোত জোয়ার-ভাটা	
সপ্তম অধ্যায়	জনসংখ্যা		
অষ্টম অধ্যায়	মানব বসতি		
নবম অধ্যায়	সম্পদ ও অর্থনৈতিক কার্যাবলি	বাংলাদেশের শিল্প	

দশম অধ্যায়	বাংলাদেশের ভৌগোলিক বিবরণ	- বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতি - কৃষিজ, বনজ, খনিজ	
একাদশ অধ্যায়	বাংলাদেশের সম্পদ ও শিল্প	বাংলাদেশের পর্যটন শিল্প	
দ্বাদশ অধ্যায়	বাংলাদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা ও বাণিজ্য	বাংলাদেশের সড়ক - রেলপথ - নৌপথ - আকাশপথ	
ত্রয়োদশ অধ্যায়	বাংলাদেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ও পরিবেশগত ভারসম্য	বাংলাদেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ও পরিবেশগত ভারসম্য	
চতুর্দশ অধ্যায়	বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগ	- বাংলাদেশের বন্যা - খরা - নদীভাঙন - সুনামি, ঘূর্ণিঝড় - ভূমিকম্প - কালবৈশাখী - টর্নেডো - সুনামি - অগ্নিকাণ্ড, দাবানল - দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা চক্র	

৪.৩ পাঠপরিকল্পনা ও ইউনিট পরিকল্পনা এবং ভূগোল ও পরিবেশ শিক্ষা পাঠের জন্য একটি পরিকল্পনা কাঠামো/ ছক

পাঠপরিকল্পনা

পাঠদানের উদ্দেশ্য কী, পাঠশেষে কী কী শিখনফল অর্জিত হবে, শিখন-শেখানো কাজে শিক্ষার্থী কখন, কোথায়, কীভাবে অংশগ্রহণ করবে, শিক্ষক কী কী উপকরণ ব্যবহার করবেন, শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্য কী ধরনের প্রশ্ন করবেন, কী ধরনের উদাহরণ, উপমা ব্যবহার করবেন এবং পাঠ শেষে শিখনফলের উপর ভিত্তিকরে শিক্ষার্থীদের অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতা কীভাবে মূল্যায়ন করবেন এসব বিষয়াদি শিক্ষক শ্রেণিতে পাঠদানের পূর্বেই পরিকল্পনা প্রণয়ন করে ঠিক করে নেবেন। পাঠদানের পূর্বে শিক্ষক কর্তৃক এ ধরনের পরিকল্পনাকে বলা হয় পাঠপরিকল্পনা। মূলত একজন শিক্ষকের দৈনন্দিন কোন পাঠের শ্রেণি কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য পূর্বপ্রস্তুতিমূলক ও লিখিত পরিকল্পনাই হলো পাঠপরিকল্পনা। অন্যভাবে বলা যায়, সুনির্দিষ্ট বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে কোন পাঠের শিখনফল অর্জনের জন্য পাঠদান শুরুর পূর্বে প্রণীত কার্যকর পরিকল্পনাই হলো পাঠপরিকল্পনা।

Wikipedia-তে উল্লিখিত সংজ্ঞা অনুযায়ী- A lesson plan is a teacher's detailed description of the course of instruction or "learning trajectory" for a lesson.

Collins English Dictionary-তে উল্লিখিত সংজ্ঞা অনুযায়ী- Aplan, used by teachers in a school, detailing the structure and format of lessons.

পাঠপরিকল্পনা প্রণয়নের বিবেচ্য বিষয়সমূহ

- শিক্ষার্থীর জ্ঞান, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা, ধারণ ক্ষমতা, আগ্রহ এবং চাহিদা শনাক্তকরণ;
- পাঠের উদ্দেশ্য/আচরণিক উদ্দেশ্য বা শিখনফল নির্ধারণ;
- শিখনফলের সাথে সঙ্গতি রেখে পাঠপরিকল্পনা প্রণয়ন;
- বিষয়বস্তু অনুযায়ী শিক্ষা উপকরণ নির্বাচন;
- শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতার বিনিময় এবং শ্রেণিকার্যক্রম পরিচালনার জন্য উপযুক্ত পদ্ধতি কৌশল নির্বাচন;
- পাঠের শিখনফল অর্জিত হয়েছে কিনা তা নিরূপণের জন্য পাঠ মূল্যায়ন;
- নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ।

পাঠপরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা

- নির্ধারিত সময়ে পাঠদান সমাপ্ত করা যায়;
- পাঠদান নিয়ন্ত্রিত, সুসংগঠিত ও ধারাবাহিকভাবে সম্পাদন করা যায়;
- পাঠের জন্য যথাযথ প্রস্তুতি নেয়া যায়;
- উপকরণের সঠিক প্রয়োগ করা সম্ভব হয়;
- পাঠদানকে আকর্ষণীয় করা যায়;
- পাঠদান কার্যকর বা ফলপ্রসূ হয়;
- শিক্ষকের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়;
- পূর্ববর্তী ও পরবর্তী পাঠের মধ্যে ধারাবাহিকতা তৈরি হয়;
- শিক্ষকের মধ্যে আত্মবিশ্বাস তৈরি হয়।

পাঠপরিকল্পনার ধাপসমূহ

শিক্ষার্থীরা কীভাবে শেখে শিক্ষাবিদ John Fedrick Herbert (১৭৭৬-১৮৪১) এবং তাঁর অনুসারীরা তা দেখিয়েছেন কয়েকটি স্তর বা সোপানের মাধ্যমে। এ সোপানসমূহ-ই পাঠপরিকল্পনার ধাপ বা পর্যায় হিসেবে শিক্ষাবিদদের নিকট গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে যা হার্বার্টের পঞ্চ সোপান নামে পরিচিত। এ সোপানসমূহ হলো-

১. প্রস্তুতি (Preparation)
২. উপস্থাপন (Presentation)
৩. অনুসঙ্গ স্থাপন/তুলনা (Comparison and association)
৪. সামান্যীকরণ (Generalization)
৫. অভিযোজন বা প্রয়োগ (Application)

পরবর্তীতে হার্বার্টের অনুগামী রেন ও জিলার এ পঞ্চ সোপান নীতির আরও একবার সংস্কার করেন। এ নতুন সংস্করণে তিনটি সোপান রাখা হয়। এগুলো হলো-

১. প্রস্তুতি (Preparation)
২. উপস্থাপন (Presentation)
৩. অভিযোজন বা প্রয়োগ (Application)

প্রস্তুতি

এ সোপানের উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার্থীদের নতুন পাঠের জন্য উপযোগী করে তোলা। নতুন পাঠের জন্য শিক্ষার্থীর মনোযোগ ও আগ্রহ সৃষ্টি করা। এখানে শিক্ষক শিক্ষার্থীর প্রয়োজনীয় প্রশ্ন ও আলোচনার মাধ্যমে পাঠ সংশ্লিষ্ট পূর্বজ্ঞান ও অভিজ্ঞতা যাচাই করবেন। এজন্য শিক্ষক বাস্তব উপকরণ, মডেল, চার্ট, গ্লোব উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করবেন। অনেক সময় শিক্ষক গল্পের মাধ্যমেও শিক্ষার্থীর পূর্বজ্ঞান যাচাই করে পাঠের উপযোগী পরিবেশ তৈরি করবেন। প্রস্তুতির চূড়ান্ত পর্যায়ে শিক্ষক শিক্ষণীয় বিষয়টিকে একটি সমস্যা আকারে তুলে ধরে তা শেখার বিষয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রশ্নোত্তর সৃষ্টি করবেন।

উপস্থাপন

পাঠ ঘোষণার মাধ্যমে পাঠের প্রস্তুতি পর্বের সমাপ্তি হয়। পাঠ ঘোষণার পর পাঠের উপস্থাপন পর্ব শুরু হয়। এ স্তরে শিক্ষক শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুকে শিখনফলের ধারাবাহিকতা অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে উপস্থাপন করবেন। আমরা জানি শিক্ষক শিক্ষার্থীর সক্রিয় সহযোগিতায় শিখন-শেখানো কার্যক্রম গতিশীল হয়। এজন্য শিক্ষক প্রয়োজনীয় উপকরণ ব্যবহার করবেন এবং সংক্ষিপ্ত বক্তৃতার পাশাপাশি বোর্ডের ব্যবহার করবেন। প্রশ্নের মাধ্যমে বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যা করবেন। জীবন ও অভিজ্ঞতা ভিত্তিক প্রশ্ন ও আলোচনার মাধ্যমে বিষয়বস্তুকে সহজ, সরল এবং প্রাঞ্জল ভাষায় উপস্থাপন করবেন। শিক্ষার্থীদের সাথে বিষয়বস্তুর আলোচনার পাশাপাশি শিক্ষক পাঠ্যবিষয় নিয়ে শিক্ষার্থীদের পারস্পরিক অভিজ্ঞতা বিনিময়ের সুযোগ তৈরি করে দিবেন। এজন্য শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক একক, জোড়ায়, দলগত কাজের সুযোগ তৈরি করে দেবেন। এভাবে পাঠ ঘোষণার সময় যে সমস্যা বা বিষয়বস্তু নিয়ে পাঠ আলোচনা শিক্ষক শুরু করেছিলেন সে সম্পর্কে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মধ্যে জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির উন্নয়ন ঘটাতে সক্ষম হবেন।

প্রয়োগ

এ স্তরে শিক্ষার্থীকে যাচাই করে দেখা হয় যে নতুনভাবে অর্জিত জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি সে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে সক্ষম কি না? সাধারণত শিখনফল অনুযায়ী শিখনের বিভিন্ন স্তর থেকে প্রশ্ন করে শিক্ষার্থীর প্রয়োগ দক্ষতা যাচাই করা হয়। শিক্ষার্থী যদি নতুন পরিস্থিতিতে অর্জিত জ্ঞানের প্রয়োগ করতে সক্ষম না হয় তা হলে বুঝতে হবে শিক্ষকের শিক্ষাদান কার্যক্রম সফল হয়নি এবং এক্ষেত্রে পাঠপরিকল্পনায় পরিবর্তন আনতে হবে।

একক পরিকল্পনা

মাধ্যমিক পর্যায়ের একজন শিক্ষককে প্রতি দিন গড়ে চার-পাঁচটি ক্লাশ নিতে হয়। একজন শিক্ষকের পক্ষে এ চার-পাঁচটি বিষয়ের উপর পূর্ণাঙ্গ পাঠপরিকল্পনা তৈরি করে পাঠদান দেয়া সম্ভব হয়ে ওঠে না। এক্ষেত্রে পাঠদানের সোপানসমূহ অপরিবর্তিত রেখে সংক্ষিপ্ত আকারে পাঠপরিকল্পনা প্রণয়ন বা পাঠপরিকল্পনা লেখার জন্য শিক্ষকগণ গুরুত্ব দেন। অধ্যয়নভিত্তিক সংক্ষিপ্ত আকারে প্রণয়নকৃত এ পাঠপরিকল্পনাকে বলা হয় একক পরিকল্পনা।

একক পরিকল্পনার ছক

বিদ্যালয়ের নাম:

শ্রেণি: শিক্ষার্থীর সংখ্যা: শিক্ষকের নাম:

বিষয়: অধ্যায়ের নাম: সময়: ৫০ মিনিট (প্রতিটি সেশন বা ক্লাশ)

তারিখ	বিষয়বস্তু	শিখনফল	শিখন-শেখানো কার্যাবলি	শিখন অর্জন যাচাই	শিক্ষা উপকরণ

একক পরিকল্পনা তৈরির ধাপসমূহ

- শিখনফল নির্ধারণ: পাঠ্য বইয়ের প্রতিটি অধ্যায়ের শুরুতে শিখনফল দেয়া রয়েছে। শিক্ষক এসকল মূল শিখনফল ভেঙ্গে প্রয়োজনে কয়েকটি শিখনফল তৈরি করবেন। এ শিখনফল হবে মূল শিখনফলের বিভাজিত শিখনফল;
- শিক্ষা উপকরণ: পাঠদানের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণের তালিকা প্রণয়ন করবেন এবং তা সংগ্রহ করবেন;
- বিষয়বস্তু বিভাজন: প্রথমে অধ্যায়ের সকল বিষয়বস্তুকে সময় অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক পাঠে বিভক্ত করবেন। শিক্ষক তাঁর অভিজ্ঞতার আলোকে এ বিভাজন করবেন;
- শিখন-শেখানো কার্যাবলি নির্ধারণ: শিক্ষার্থীর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আলোকে শিক্ষক শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক পদ্ধতি ও কৌশল নির্বাচন করবেন। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক অভিজ্ঞতার বিনিময় করবে;
- শিখন অর্জন যাচাই: শিখন-শেখানো কার্যাবলির মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থী পাঠ কতটা অর্জন করতে পেরেছে তা শিক্ষক বিভিন্ন স্তরের প্রশ্ন বা কাজের মাধ্যমে যাচাই করবেন।

একক পরিকল্পনার একটি নমুনা

বিদ্যালয়ের নাম:

শ্রেণি: দশম শিক্ষার্থীর সংখ্যা:

শিক্ষকের নাম:

বিষয়: ভূগোল ও পরিবেশ অধ্যায়ের নাম: বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগ সময়: ৫০ মিনিট

তারিখ	শিখনফল	শিক্ষা উপকরণ	বিষয়বস্তু	শিখন-শেখানো কার্যাবলি	শিখন অর্জন যাচাই
১.০৩.১৮	১.দুর্যোগ ও বিপর্যয় ব্যাখ্যা করতে পারবে; ২.বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগ হিসেবে বন্যা ও খরার বর্ণনা দিতে পারবে।	বন্যা ও খরার ছবি	দুর্যোগ ও বিপর্যয়, বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগ (বন্যা, খরা)	সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা, প্রশ্ন-উত্তর, আলোচনা, জোড়ায় কাজ, মাথাখাটানো	১.দুর্যোগ ও বিপর্যয়ের পার্থক্য কী? ২.বন্যার মাববসৃষ্ট কারণসমূহ কী?- ব্যাখ্যা কর।
৪.০৩.১৮	বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগ হিসেবে ঘূর্ণিঝড়, নদীভাঙ্গনের বর্ণনা দিতে পারবে।	ঘূর্ণিঝড়, নদীভাঙ্গনের ছবি	বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগ (ঘূর্ণিঝড়, নদীভাঙ্গন)	সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা, প্রশ্ন-উত্তর, জোড়ায় কাজ, মাথাখাটানো	১.ঘূর্ণিঝড়, নদীভাঙ্গনের মাববসৃষ্ট কারণসমূহ কী?- ব্যাখ্যা কর।
৭.০৩.১৮	১.ভূমিকম্প ও সুনামি দুর্যোগের ব্যাখ্যা করতে পারবে; ২.দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা চক্র ব্যাখ্যা করতে পারবে; ৩.দুর্যোগ মোকাবেলার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপসমূহ নির্ধারণ করতে পারবে।	ভূমিকম্প ও সুনামি সংক্রান্ত ভিডিও, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার চার্ট	বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগ (ভূমিকম্প ও সুনামি)	সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা, প্রশ্ন-উত্তর, জোড়ায় কাজ, মাথা খাটানো	১. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা চক্র ব্যাখ্যা কর।

ভূগোল ও পরিবেশ শিক্ষা পাঠের জন্য একটি পরিকল্পনা কাঠামো/ ছক

বিদ্যালয়ের নাম: সারদা সুন্দরী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ফরিদপুর।			
শ্রেণি: নবম শিক্ষার্থীর সংখ্যা: ৪০ শিক্ষার্থীদের বয়সের গড়: ১৪ বছর প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকের নাম: মৌসুমি প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকের শ্রেণি রোল: ০৭ রেজিস্ট্রেশন নম্বর: ১৮০০০৯ শিক্ষাবর্ষ: ২০১৮		বিষয়: ভূগোল ও পরিবেশ অধ্যায়ের নাম: বায়ুমণ্ডল পাঠ: বিশ্ব উষ্ণায়ন ও জলবায়ুর পরিবর্তন সময়: ৫০ মিনিট তারিখ: ০২-০৬-২০১৮	
শিখনফল	শিখন-শেখানো কার্যাবলি	শিখন অর্জন যাচাই	শিক্ষা উপকরণ

	প্রস্তুতি পর্ব: সময়: ০৭ মিনিট - শ্রেণিকক্ষে প্রবেশকরে শিক্ষার্থীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করব - প্রয়োজনীয় আসন বিন্যাস করব - শিক্ষার্থীদের মানসিক পরিবেশ গঠন করব এর পর শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করব- - উষ্ণায়ন কী? - জলবায়ু কাকে বলে? - জলবায়ুর উপাদানসমূহ কী কী? - জলবায়ুর পরিবর্তন বলতে কী বুঝায়? - বিশ্বব্যাপী তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে জলবায়ু পরিবর্তনের কী সম্পর্ক রয়েছে? এভাবে প্রশ্ন-উত্তর ও আলোচনার মাধ্যমে পাঠশিরোনাম "বিশ্ব উষ্ণায়ন ও জলবায়ুর পরিবর্তন, এর প্রভাব: বিশ্ব ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত" ঘোষণা করব (মুখে বলব এবং বোর্ডে লিখে দিব)												
১.বিশ্ব উষ্ণায়ন ও জলবায়ুর পরিবর্তনের পারস্পরিক সম্পর্ক বর্ণনাকরতে পারবে।	সংক্ষিপ্ত আলোচনা, প্রশ্ন-উত্তর ও জোড়ায় কাজ সময়: ১০ মিনিট বিশ্বব্যাপী তাপমাত্রা বৃদ্ধির পরিসংখ্যান নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব। শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করব- গ্রিনহাউস কী? গ্রিনহাউসের সাহায্যে কী করা হয়? পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে গ্রিনহাউস গ্যাসসমূহ কীভাবে তাপ আটকে রেখে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি করছে তা ছবি এবং ভিডিও ব্যবহার করে আলোচনা করব। জোড়ায় কাজ: আমাদের পৃথিবীটাই একটি গ্রিনহাউস- ব্যাখ্যা কর।	১.বিশ্ব উষ্ণায়নের জন্য দায়ী গ্যাস গুলোর নাম কী কী? ২.বিশ্বে তাপমাত্রা কীভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে?	১.শীতপ্রধান দেশের কাঁচদ্বারা নির্মিত গ্রিনহাউসের ছবি ২.বায়ুমণ্ডলে গ্রিনহাউস গ্যাস বৃদ্ধিরকারণ সম্বলিত ভিডিও										
২.বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে সম্ভাব্য যে প্রভাব পড়বে তা ব্যাখ্যা করতে পারবে।	সংক্ষিপ্ত আলোচনা ও একক কাজ সময়: ১২মিনিট ছবি এবং ভিডিও ব্যবহার করে বিশ্বব্যাপী তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে জলবায়ুর যে পরিবর্তন হচ্ছে এবং এর ফলে বিশ্বের মানুষের জন্য যে দুর্ভোগ সৃষ্টি হচ্ছে- এ বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব। এর পর সকল শিক্ষার্থীদের দিয়ে এককভাবে "পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে কী কী দুর্ভোগ সৃষ্টি হচ্ছে"- কর্মপত্র-১ দিয়ে তার একটি তালিকা তৈরি করতে বলব। কর্মপত্র-১ <table><tr><td>জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট দুর্ভোগসমূহ</td><td>প্রভাব</td></tr><tr><td>পরিবেশগত</td><td></td></tr><tr><td>সামাজিক</td><td></td></tr><tr><td>অর্থনৈতিক</td><td></td></tr><tr><td>রাজনৈতিক</td><td></td></tr></table>	জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট দুর্ভোগসমূহ	প্রভাব	পরিবেশগত		সামাজিক		অর্থনৈতিক		রাজনৈতিক		গ্রিনহাউস প্রতিক্রিয়া বিশ্বব্যাপী কী ধরনের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যা তৈরি হবে?	
জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট দুর্ভোগসমূহ	প্রভাব												
পরিবেশগত													
সামাজিক													
অর্থনৈতিক													
রাজনৈতিক													

৩.জলবায়ু পরিবর্তনে বাংলাদেশের মানুষের বাসস্থান, জীবন-জীবিকা ও পরিবেশের উপর সম্ভাব্য প্রভাব বিশ্লেষণ করতে পারবে।	সংক্ষিপ্ত আলোচনা ও দলগত কাজ সময়: ১৫ মিনিট বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশের জন্য কী ধরনের ঝুঁকি তৈরি হচ্ছে তা চার্ট, ছবি এবং ভিডিও ব্যবহার করে আলোচনা করব। এর পর প্রতি দলে ৫/৬ জন শিক্ষার্থী নিয়ে সকল শিক্ষার্থীদের দিয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক দল গঠন করে দলগতভাবে “বিশ্বব্যাপী বৈশ্বিক উষ্ণায়নের ঝুঁকিতে থাকা পাঁচটি ক্যাটাগরিতে ১২টি করে দেশের তালিকায় এশিয়ার অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশ কতটুকু ঝুঁকিতে রয়েছে”- তা বিশ্লেষণ করতে বলব।	বৈশ্বিক উষ্ণায়নের ফলে বাংলাদেশ কীভাবে প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার হচ্ছে?	
	মূল্যায়ন সময়: ০৪ মিনিট পাঠের মূল্যায়নের পূর্বে পাঠের সারসংক্ষেপ আলোচনা করব। এর পর কয়েকটি প্রশ্নের মাধ্যমে সামগ্রিক পাঠের মূল্যায়ন করব- ○ বিশ্ব উষ্ণায়নের সাথে জলবায়ু পরিবর্তনের সম্পর্ক কী? ○ বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তনের পরিবেশগত প্রভাবসমূহ কী কী? ○ জলবায়ু পরিবর্তনে বাংলাদেশের মানুষের জীবন-জীবিকার উপর সম্ভাব্য প্রভাবসমূহ কী?		
	বাড়ির কাজ সময়: ০২মিনিট ○ জলবায়ুর পরিবর্তন সারা বিশ্বেই দুর্যোগ কবলিত করবে- ০৫টি যুক্তি দাও। ○ বাড়ির কাজ প্রদান শেষে বোর্ড পরিষ্কার করে এবং সকল শিক্ষার্থীকে ধন্যবাদ জানিয়ে শ্রেণিকক্ষ ত্যাগ করব।		
পাঠের অন্যান্য বিবেচ্য বিষয়সমূহ:	শিক্ষকের আত্মপ্রতিফল: তারিখ:		

৪.৪ অনুশিক্ষণ, ছদ্মশিক্ষণ ও ফলাবর্তনে ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ের বিষয়বস্তু ব্যবহার

অনুশিক্ষণ

শিখন-শেখানো কার্যাবলি মূলত কতগুলো দক্ষতার অনুশীলন। একজন প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকের পক্ষে শিক্ষাদানের সকল দক্ষতা একই সময়ে নির্ভুলভাবে অনুশীলন করে পাঠদান করা সম্ভব হয় না। এ কারণে একটি সামগ্রিক শিখন-শেখানো কার্যক্রমের সকল দক্ষতার তালিকা তৈরি করে তা থেকে একটি বা দুটি দক্ষতা নির্বাচন করে স্বল্প সময়ের মধ্যে পুনঃপুনঃ অনুশীলনের মাধ্যমে একটি বা দুটি দক্ষতার উৎকর্ষ সাধনের প্রক্রিয়াকে বলা হয় অনুশিক্ষণ। অনুশিক্ষণে বারবার প্রচেষ্টার ফলে প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকের ভুলের পরিমাণ কমে আসে এবং শিক্ষক নির্বাচিত দক্ষতা আয়ত্ত্ব করতে সক্ষম হন। ১৯৬৩ খ্রিষ্টাব্দে আমেরিকার স্টানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় অনুশিক্ষণ পদ্ধতির উদ্ভাবন করেন। পরবর্তীতে ১৯৬৮ খ্রিষ্টাব্দে একই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে এর প্রয়োগ শুরু হয়। অনুশিক্ষণ শিক্ষাবিজ্ঞানের একটি উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার। প্রশিক্ষণরত শিক্ষকদের শ্রেণি শিক্ষাদানে দক্ষ করে তোলার জন্য এটা একটি সফল উপায়।

অনুশিক্ষণের ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো Micro-teaching শব্দটি এসেছে গ্রিক শব্দ Mikros থেকে। এর অর্থ হলো ক্ষুদ্র এবং teaching অর্থ শিক্ষাদান। পাঠের ক্ষুদ্র অংশ নিয়ে অনুশীলনের নামই Micro-teaching.

Mc. Knight এর মতে, অনুশিক্ষণ এমন একশিক্ষণ কৌশল যার মাধ্যমে বারবার অনুশীলনের দ্বারা নতুন শিক্ষণ দক্ষতা আয়ত্ত্ব করা এবং পুরাতন দক্ষতার উন্নয়ন সাধন (Micro-teaching is a scaled down teaching encounter designed to develop new skills and refine old ones).

Allen and Eve-এর মতে, নির্দিষ্ট কোন শিক্ষামূলক আচরণের মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করে নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে পাঠদানের কৌশলকে অনুশিক্ষণ বলে (Micro-teaching is a system of controlled practice that makes to concentrate on specific behavior to practice teaching under controlled condition).

Oxford dictionary-তে উল্লিখিত সংজ্ঞা অনুযায়ী-A method of teacher training, designed to develop specific skills, which involves the teaching of a small class for a short time followed by analysis of (usually a film recording of) the session.

Wikipedia-তে উল্লিখিত সংজ্ঞা অনুযায়ী-Micro-teaching is a teacher training and faculty development technique whereby the teacher reviews a recording of a teaching session, in order to get constructive feedback from peers and/or students about what has worked and what improvements can be made to their teaching technique.

Micro-teaching was invented in the mid-1960s at Stanford University by Dwight W. Allen, and has subsequently been used to develop educators in all forms of education.

সুতরাং অনুশিক্ষণে শিক্ষণের সবগুলো কৌশল একবারে আয়ত্ত্ব না করে অনুশীলনের মাধ্যমে একবারে একটি বা দুটি কৌশল বা দক্ষতাকে আয়ত্ত্ব করা হয়। তাই সমগ্র শিক্ষাদানকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করে প্রত্যেকটিকে পৃথক পৃথকভাবে অনুশীলন করাই অনুশিক্ষণ।

অনুশিক্ষণ কৌশল

স্টানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় তালিকাভুক্ত ১৪টি কৌশল-

১. পাঠ প্রস্তুতি
২. উদ্দীপনার তারতম্য
৩. সূক্ষ্ম উদ্দেশ্য প্রণোদিত প্রশ্ন
৪. বলবৃদ্ধিকরণ
৫. প্রশ্নকরণের দ্রুততা
৬. উচ্চমানের প্রশ্নের ব্যবহার
৭. বিভিন্নমুখী প্রশ্ন
৮. সমাপ্তিকরণ পদ্ধতি
৯. শিক্ষকের নিরবতা ও ভাষাহীন ইঙ্গিত
১০. মনোযোগী আচরণের স্বীকৃতি

১১. বিশদকরণ ও উদাহরণের ব্যবহার
১২. বক্তৃতাকরণ বা বাচনভঙ্গি
১৩. পরিকল্পিত পুনরুজ্জী
১৪. সংযোগের পূর্ণতা সাধন

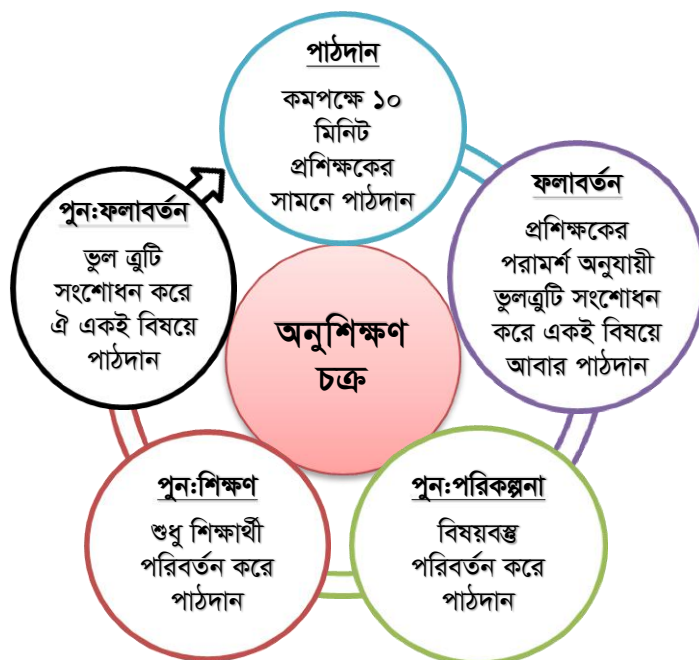
ক্যালিফোর্নিয়ার ফার ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয় পরবর্তীতে আরও ৪টি দক্ষতা যুক্ত করেন। এগুলো হলো-

১৫. শ্রবণ-দর্শন উপকরণের ব্যবহার
১৬. শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের প্রাণবন্ততা
১৭. দলগত আলোচনায় উৎসাহ ব্যাপ্তক ইঙ্গিত
১৮. শিক্ষকের ব্যাখ্যা

অনুশিক্ষণ দক্ষতা আয়ত্ত করার কৌশল

- সাধারণত ৫-৭ মিনিটের উপযোগী পাঠপরিকল্পনা তৈরি করা হয়;
- সমগ্র পাঠটি ভিডিও করা হয়;
- সতীর্থদের দিয়ে পাঠ পর্যবেক্ষণ করানো এবং পর্যালোচনা করা হয়;
- বিশেষজ্ঞগণ পাঁচ থেকে সাত পয়েন্ট স্কেলের একটি মূল্যায়ন শিটের মাধ্যমে মূল্যায়ন করেন;
- শিক্ষণ শেষে বিশেষজ্ঞগণ তাদের পূরণকৃত মূল্যায়ন শীট নিয়ে আলোচনা করে প্রশিক্ষণার্থীকে অবহিত করেন এবং উন্নয়নের জন্য পরামর্শ দেন;
- প্রথম পাঠদানের স্বল্প বিরতি পরে প্রশিক্ষণার্থী পুনঃপরিকল্পনা করে পুনরায় অন্য একদল শিক্ষার্থীর সামনে আবার পাঠদান করেন;
- দ্বিতীয় বারে আবার পাঠের পূর্বের নিয়মে প্রশিক্ষণার্থীর ভুলত্রুটি নিয়ে পর্যালোচনা করে উন্নয়নের জন্য পরামর্শ প্রাদান কর হয়;
- যতক্ষণ পর্যন্ত প্রশিক্ষণার্থীর ভুলত্রুটি পুরোপুরি সংশোধিত না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত এ প্রক্রিয়া চক্রাকারে চলতে থাকে (চিত্র ৪.১)।

অনুশিক্ষণ চক্র



চিত্র-৪.১: অনুশিক্ষণ চক্র

ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ের বিষয়বস্তু ব্যবহার করে অনুশিক্ষণ দক্ষতা অনুশীলন

স্টানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় তালিকাভুক্ত ২টি কৌশল-

১.বিভিন্নমুখী প্রশ্ন

২.বিশদকরণ ও উদাহরণের ব্যবহার

একটি নমুনা পাঠপরিকল্পনা

বিদ্যালয়ের নাম: সারদা সুন্দরী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ফরিদপুর।			
শ্রেণি: নবম শিক্ষার্থীর সংখ্যা: ৪০ শিক্ষার্থীদের বয়সের গড়: ১৪ বছর শিক্ষকের নাম: মৌসুমি শিক্ষকের শ্রেণি রোল: ০৭	বিষয়: ভূগোল ও পরিবেশ অধ্যায়ের নাম: বায়ুমণ্ডল পাঠ: বিশ্ব উষ্ণায়ন ও জলবায়ুর পরিবর্তন সময়: ১০ মিনিট তারিখ: ০২.০৬.২০১৮		
শিখনফল	শিখন-শেখানো কার্যাবলি	শিখনঅর্জন যাচাই	শিক্ষা উপকরণ
১.বিশ্ব উষ্ণায়ন ও জলবায়ুর পরিবর্তনের পারস্পরিক সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবে।	১.বিভিন্নমুখী প্রশ্ন ২.বিশদকরণ ও উদাহরণের ব্যবহার	১.বিভিন্নমুখী প্রশ্ন	১.শীতপ্রধান দেশের কাঁচদ্বারা নির্মিত গ্রিনহাউসের ছবি ২.বায়ুমণ্ডলে গ্রিনহাউস গ্যাস বৃদ্ধির কারণ সম্বলিত ভিডিও
	শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করব- - গ্রিনহাউস কী? - গ্রিন হাউসের সাহায্যে কী করা হয়? পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে গ্রিনহাউস গ্যাসসমূহ কীভাবে তাপ আটকে রেখে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি করেছে তা ছবি এবং ভিডিও ব্যবহার করে আলোচনা করব।	১.বিশ্ব উষ্ণায়নের জন্য দায়ী গ্যাস গুলোর নাম কী কী? ২.বিশ্বে তাপমাত্রা কীভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে?	

অনুশিক্ষণ কার্যক্রম মূল্যায়ন ছক (নমুনা)

প্রশিক্ষণার্থীর নাম:	
নির্দেশনা: এ ছকটি পাঠ চলাকালে পর্যবেক্ষক ব্যবহার করবেন। প্রত্যেক আইটেমে পৃথকভাবে মূল্যায়ন করতে হবে। ১ নিম্নমান এবং ৭ উচ্চমান জ্ঞাপক। শিক্ষণ দক্ষতা ভিন্ন হলে মূল্যায়ন ছকের আইটেমসমূহ আলাদা হবে যা খালি ঘরে লিখে ব্যবহার করবেন।	
অনুশিক্ষণ দক্ষতার আইটেম/উপাদানসমূহ	মূল্যায়ন স্কেল
শিক্ষার্থীর শিখন-ক্ষেত্রের বিভিন্নস্তর থেকে (জ্ঞান, অনুধাবন, প্রয়োগ, উচ্চতর দক্ষতা, উন্মুক্ত, বদ্ধ, সমকেন্দ্রিক, কেন্দ্রচ্যুতি, অনুসন্ধানমূলক ইত্যাদি) প্রশ্নের ব্যবহার কতটা যথাযথভাবে করা হয়েছে?	১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭
বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যা কতটা সহজ ও বোধগম্য করা হয়েছে?	১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭
উদাহরণসমূহ কতটা জীবন ও অভিজ্ঞতাভিত্তিক ছিল?	১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭
শিক্ষার্থীর শিখনফল অর্জন কতটা সফল হয়েছে?	১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭
সামগ্রিক মন্তব্য নির্দেশনা: সমালোচনা ও মতামতের প্রেক্ষিতে পাঠটি নতুন করে পরিকল্পনা করবেন এবং অনুশিক্ষণ দক্ষতা/কৌশল আয়ত্ত না হওয়া পর্যন্ত এ প্রক্রিয়া চলতে থাকবে।	

ছদ্মশিক্ষণ বা সিমুলেশন

অনেক সময় কোন একটি বিষয়সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ধারণা প্রদানের জন্য বাস্তব অবস্থা সৃষ্টি করে শিক্ষণ-শিখন কাজ পরিচালনা সম্ভব হয় না। এসব ক্ষেত্রে ঐ বাস্তব অবস্থার কাছাকাছি একটি কৃত্রিম অবস্থা, পরিবেশ, প্রতিকৃতির মাধ্যমে বিষয়টি সম্বন্ধে প্রকৃত ধারণা চিত্রায়ণের চেষ্টা করা হয়। শিক্ষণ শিখনের এ কৌশলকে ছদ্মশিক্ষণ বা সিমুলেশন বলে। এটি একটি সরলীকৃত মডেল যার মাধ্যমে জ্ঞান, দক্ষতা, যোগ্যতা ও আচরণিক পরিবর্তন সাধিত হয়।

Wikipedia-তে উল্লিখিতসংজ্ঞা অনুযায়ী, “Simulation is the imitation of the operation of a real-world process or system over time. The act of simulating something first requires that a model be developed; this model represents the key characteristics, behaviors and functions of the selected physical or abstract system or process. The model represents the system itself, whereas the simulation represents the operation of the system over time”.

ছদ্মশিক্ষণ কার্যক্রম মূল্যায়ন নমুনা ছক

প্রশিক্ষণার্থীর নাম:

শ্রেণি:

বিষয়:

পাঠের শিরোনাম:

প্রয়োজনীয় ঘরে টিক চিহ্ন দিন [১=দুর্বল, ২=মোটামুটি, ৩=ভাল, ৪=খুব ভাল, ৫=চমৎকার]

পর্ব/পর্যায়	বৈশিষ্ট্য	সময়	১	২	৩	৪	৫
প্রস্তুতি	পূর্বজ্ঞান যাচাই						
	মনোযোগ আকর্ষণ						
	শ্রেণি সংগঠন						
	পাঠ ঘোষণা						
	বোর্ডের পাঠ শিরোনাম লিখন						
	প্রস্তুতির পর্বের মন্তব্য						
উপস্থাপন	বিষয় জ্ঞান						
	তথ্য প্রদান						
	পূর্বের পাঠের সাথে অনুযুক্ত স্থাপন						
	বাচনভঙ্গি						
	প্রশ্ন করার কৌশল						
	উপকরণের যথাযথ ব্যবহার						
	বোর্ডের ব্যবহার						
	সুস্পষ্ট নির্দেশনা						
	দৈহিক ভাষা ও চোখের ব্যবহার						
	শ্রেণি তদারকি						
	সকল শিক্ষার্থীকে পাঠে সম্পৃক্তকরণ						
	উৎসাহ প্রদান						
	উপস্থাপনপর্বের মন্তব্য						
শিক্ষার্থীর কর্মের তৎপরতা	শিক্ষার্থীর বোধগম্যতা						
	শিক্ষার্থীর প্রতিক্রিয়া/জিজ্ঞাসা						
	বিভিন্ন অংশগ্রহণমূলক কৌশলের ব্যবহার						
	শিক্ষার্থীর বোর্ডের কাজ						
	বিভিন্ন অংশগ্রহণমূলক কাজের মৌখিক উপস্থাপনা						
	শিক্ষার্থীর কর্মের তৎপরতা-পর্বের মন্তব্য						

মূল্যায়ন	উপযুক্ত প্রশ্নের সুসম বন্টন						
	উচ্চমানের প্রশ্নকরণ						
	ভিন্নমানের প্রশ্নকরণ						
	প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন						
	অংশগ্রহণমূলক কাজ						
	উৎসাহ প্রদান						
	মূল্যায়ন						
	মূল্যায়ন পর্বের মন্তব্য						
বিশেষ মন্তব্য							

ফলাবর্তন

ফলাবর্তন বা Feedback হচ্ছে একটি সম্পাদিত কাজের সম্পাদন প্রক্রিয়া এবং সম্পাদিত কাজের মান সম্পর্কে উক্ত কাজের বিষয়ে পারদর্শী কোন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির মন্তব্য, মতামত, গঠনমূলক সমালোচনা বা পরামর্শ প্রদানকে বুঝায়। এ মন্তব্য, মতামত, গঠনমূলক সমালোচনা বা পরামর্শ ব্যক্তি দ্বারা সম্পাদিত কাজের মানকে উন্নত করে। একজন প্রশিক্ষণার্থীর কাজের মানের উন্নয়ন ঘটানোর জন্য তার দ্বারা সম্পাদিত কাজের সবল ও দুর্বল দিক চিহ্নিত করে এবং দুর্বল দিকসমূহ কীভাবে দূর করা যায় তার জন্য প্রশিক্ষক ফলাবর্তন বা Feedback প্রদান করেন।

৪.৫ ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ক একটি সামাজিক সচেতন মেলার আয়োজন পরিকল্পনা

শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো মানুষের মনোজগতের ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটিয়ে ব্যক্তির সর্বাঙ্গীন বিকাশ সাধন। শিক্ষাবিদ মোতাহের হোসেন চৌধুরী শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেছেন, “শিক্ষার উদ্দেশ্য ফল চাওয়া নয়, ফলতে চাওয়া”। শিক্ষাবিজ্ঞানে তাই শিখন বলতে বলা হয়েছে, শিখন হলো আচরণের প্রত্যাশিত বা ইতিবাচক পরিবর্তন। ব্যক্তির এ আচরণের পরিবর্তন বা তার মনোজগতের পরিবর্তন বিভিন্ন মাধ্যমের দ্বারা হয়ে থাকে। কারণ ব্যক্তির শিক্ষা কেবল শ্রেণিকক্ষের পাঠদানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; তা হতে পারে কোন দর্শনীয় স্থান পরিদর্শন করে, আবার হতে পারে পাঠ্য বইয়ের বিষয় সংশ্লিষ্ট কোন মেলা বা প্রদর্শনী থেকে। এজন্য বিজ্ঞান মেলা, কৃষি মেলা, আইসিটি মেলা, ভূগোল মেলা, শিক্ষা মেলা বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অনুষ্ঠিত হয়। এধরনের মেলা শিক্ষার্থীর জ্ঞানের পরিধিকে যেমন বিকশিত করে তেমনি এসব মেলা থেকে অর্জিত জ্ঞান শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত জীবনেও অনেক সমস্যা সমাধানের পথ দেখিয়ে দেয়। এ ধরনের মেলা শিক্ষার্থীদের সচেতন করার পাশাপাশি তার জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গিও উন্নয়ন ঘটায়। অন্য দিকে শিক্ষা সংক্রান্ত যে কোন মেলা শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবকদের মধ্যে একটি চমৎকার সম্পর্ক গড়ে তোলে।

ভূগোল ও পরিবেশ মেলার উদ্দেশ্য

- ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ে শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞানের পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন;
- শিক্ষার্থীর মধ্যে আগ্রহ ও প্রেষণা সৃষ্টি;
- শিক্ষার্থীর দৃষ্টিভঙ্গির প্রসার ঘটানো;
- শিক্ষার্থীর মননশীলতার বিকাশ ঘটানো;
- শিক্ষার্থীর দক্ষতা বৃদ্ধি;
- শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যকার সম্পর্কের উন্নয়ন;
- শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ বৃদ্ধি;
- শিক্ষার্থীদের মধ্যে আগ্রহ তৈরি;
- শিক্ষার্থীদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলীর বিকাশ, সহযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি, সৌন্দর্যবোধ, নান্দনিক দৃষ্টিভঙ্গি, গোষ্ঠীচেতনা, অনুসন্ধানী দৃষ্টি, মনোবল গঠন, আমরা করব জয় ইত্যাদি গুণাবলির বিকাশ।

মেলা পরিকল্পনার উপাদান

- মেলার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ;
- দল গঠন ও কর্ম বণ্টন;
- স্থান ও তারিখ নির্ধারণ;
- বাজেট প্রণয়ন;
- অর্থ সংগ্রহ;
- প্রদর্শনীর জন্য বস্তুসামগ্রী সংগ্রহ;
- কার্য সম্পাদন ও তত্ত্বাবধায়ন;
- স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন;
- মন্তব্য বই সংরক্ষণ;
- তথ্য সরবরাহমূলক ব্যানার, পোস্টার, ফেস্টুন, লিফলেট তৈরি ও বিতরণ।

মেলায় প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে সংগ্রহকৃত সামগ্রীর তালিকা

ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ক একটি সামাজিক সচেতন মেলায় যে সমস্ত প্রদর্শনী সামগ্রী স্থান পাবে তার একটি তালিকা-

- সৌর জগতের মডেল, পোস্টার, ভিডিও;
- বিভিন্ন ধরনের ভূগোলক, অক্ষাংশ-দ্রাঘিমা পোস্টার, মডেল, ভিডিও;
- আন্তর্জাতিক তারিখ রেখার মানচিত্র;
- দিবারাত্রির ত্রাস-বৃদ্ধি ও ঋতু পরিবর্তনের চিত্র, ভিডিও;
- বাংলাদেশ, মহাদেশ ভিত্তিক ও বিশ্বের প্রশাসনিক, ভূপ্রাকৃতিক, নদনদী, তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত, কৃষিজ, বনজ, খনিজ, শিল্প-বাণিজ্য, পর্যটন, সড়ক, রেলপথ, নৌপথ, আকাশপথ, পরিবহণ ও যোগাযোগ, জনসংখ্যা, মানচিত্রে প্রচলিত আন্তর্জাতিক সাংকেতিক চিহ্নসম্বলিত বিভিন্ন মানচিত্র ও চিত্র;
- জিপিএস মেশিন (ডিভাইস);
- ব্যবহারিক ভূগোলের যন্ত্রপাতি;
- বিভিন্ন ধরনের শিলার নমুনা;
- আগ্নেয়গিরির মডেল, ভিডিও;
- পর্বত, মালভূমি, নদী, ভূমিরূপ সৃষ্টির পোস্টার, ভিডিও;
- বায়ুমণ্ডলের স্তর বিন্যাস, পানিচক্র, বৃষ্টিপাত, নিয়ত বায়ু প্রবাহের চিত্র;
- গ্রিনহাউজের মডেল, ভিডিও;
- সমুদ্র স্রোতের মানচিত্র, জোয়ার-ভাটার চিত্র, ভিডিও;
- জনসংখ্যা পিরামিড, বসতির ধরন সম্বলিত পোস্টার;
- বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন- বন্যা, খরা, নদীভাঙন, সুনামি, ঘূর্ণিঝড়, ভূমিকম্প, কালবৈশাখী, টর্নেডো, অগ্নিকাণ্ড, দাবানল, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা চক্র ইত্যাদির ছবি/ পোস্টার, ভিডিও;
- বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার রিপোর্ট, সাময়িকী, ছবি;
- এছাড়া এ মেলায় খাবার ও খেলনা সামগ্রীর দোকান বসার ব্যবস্থা।

ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ক একটি ফিল্ডট্রিপ পরিকল্পনা

ভৌগোলিক পরিবেশ সম্বন্ধে বাস্তব জ্ঞানলাভের জন্য শিক্ষামূলক ভ্রমণ গুরুত্বপূর্ণ। ভ্রমণের মাধ্যমে কোন বিষয় প্রত্যক্ষভাবে দেখা সম্ভব হয় ফলে শিক্ষামূলক ভ্রমণ শ্রেণিকক্ষের পাঠদানকে পরিপূর্ণ করে তোলে। ভ্রমণের মাধ্যমে শুধু পাঠসংশ্লিষ্ট বিষয়ের জ্ঞান অর্জন হয় না বরং শিক্ষার্থীদের সক্রিয়তা প্রকাশ পায়, উপলব্ধি শক্তি জাগ্রত হয় এবং একঘেয়েমী দূর হয়ে পরবর্তী পাঠে আগ্রহ সৃষ্টি হয়।

পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ধাপসমূহ

- শিক্ষার্থীদের শিক্ষা ভ্রমণের গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত করানো;
- আলোচনার ভিত্তিতে শিক্ষাভ্রমণের স্থান নির্বাচন;
- ভ্রমণের জন্য নির্বাচিত স্থানের ভৌগোলিক গুরুত্ব নিরূপণ;
- শিক্ষকের নেতৃত্বে কর্মবন্টনের জন্য কয়েকটি দল গঠন ও দলনেতা নির্বাচন;
- ভ্রমণের ব্যয় বিবরণী প্রস্তুত করে অর্থ নির্ধারণ;
- শিক্ষাভ্রমণ সংক্রান্ত তথ্য লিপিবদ্ধ করার জন্য প্রতিবেদন শিট তৈরি;

ভৌগোলিক শিক্ষাসফর প্রতিবেদন লেখার নিয়ম

সাধারণত A4 সাইজের কাগজে বাম দিকে ১.২৫ ইঞ্চি এবং উপরে, নিচে ও ডানে ১ইঞ্চি পরিমাণ মার্জিন রেখে কম্পিউটারে কম্পোজ করে বাঁধাই করে প্রতিবেদন জমা দিতে হয়। প্রতিবেদনের কেমন হবে তার একটি নমুনা হলো-

প্রথম পৃষ্ঠা:

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম:

ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ

শিক্ষাসফর প্রতিবেদন

শিক্ষার্থীর নাম:

রোল নং

শিক্ষাবর্ষ:

দ্বিতীয় পৃষ্ঠা:

প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা

তত্ত্বাবধায়ক শিক্ষকের নাম ও পদবী

বিভাগীয় প্রধানের নাম ও পদবী

তৃতীয় পৃষ্ঠা:

শিক্ষাসফরের স্থান

দলনেতা শিক্ষকের নাম

প্রতিবেদন প্রণয়নকারীর নাম

রোল শিক্ষাবর্ষ

চতুর্থ পৃষ্ঠা:

সূচিপত্র

পঞ্চম পৃষ্ঠা:

ভূমিকা: শিক্ষাসফরের গুরুত্বের বর্ণনা থাকবে

ভ্রমণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

স্থানের বর্ণনা

যাত্রার বর্ণনা

পরিচালনার বর্ণনা

শিক্ষাপ্রমণের তথ্য সংগ্রহ কৌশল:

- ক. সাক্ষাৎকার
- খ. ডকুমেন্ট সংগ্রহ
- গ. পর্যবেক্ষণ
- ঘ. আলোক চিত্র নেওয়া
- ঙ. ভিডিও ধারণ

স্থানের বিবরণ:

- প্রত্যাবর্তন
- প্রাপ্ত তথ্যের যাচাইকরণ
- সুবিধা-অসুবিধা
- মূল্যায়ন
- উপসংহার:

প্রশ্নমালা

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. পাঠদানের জন্য পদ্ধতি কৌশলের প্রয়োজনীয়তা কী?
২. ভূগোল ও পরিবেশ শিক্ষাদানে আঞ্চলিক পদ্ধতির প্রয়োগ কীভাবে করা হয়?
৩. ভূগোল ও পরিবেশ শিক্ষাদানে শিক্ষাসফরের গুরুত্ব কী?
৪. প্রজেক্ট পদ্ধতিকী?
৫. ওয়ার্ল্ড ভিশন খেলা কী?
৬. দেশ-মহাদেশ খেলা কী?
৭. বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগ পাঠদানে প্রয়োজনীয় ভিডিও সমূহের তালিকা লিখুন।
৮. পাঠপরিকল্পনা কাকে বলে?
৯. পাঠপরিকল্পনা প্রণয়নে বিবেচ্য বিষয়সমূহ কী কী?
১০. একজন শিক্ষকের জন্য পাঠপরিকল্পনা কেন প্রয়োজন?
১১. শিখন-শেখানো কার্যাবলি ও শিখন অর্জন যাচাইয়ের মধ্যে পার্থক্য কী- ব্যখ্যা করুন।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি কী? অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতির পাঁচটি কৌশলের আলোচনা করুন।
২. অনুসন্ধানমূলক পদ্ধতি কী? এর ধাপগুলোর বর্ণনা দিন।
৩. ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ের বৃষ্টিপাত শিক্ষাদানে বিভিন্ন পদ্ধতি-কৌশলের প্রয়োগ দেখিয়ে-একটি পাঠপরিকল্পনা তৈরি করুন।
৪. বৈশ্বিক উষ্ণায়ন ও এর প্রতিরোধ বিষয়ে খেলার প্রক্রিয়া, ফলাফল ও সিদ্ধান্তের বর্ণনা দিন।
৫. পাঠপরিকল্পনা প্রণয়নে হার্বার্টের পঞ্চসোপান এবং ত্রি-সোপানসমূহ আলোচনা করুন।
৬. একক পরিকল্পনা কাকে বলে? এর প্রয়োজনীয়তা কী? একটি নমুনা একক পরিকল্পনা প্রণয়ন করুন।
৭. ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ের যে কোন একটি বিষয়বস্তু নিয়ে ৫০ মিনিটের উপযোগী একটি পাঠপরিকল্পনা প্রণয়ন করুন।
৮. অনুশিক্ষণ কাকে বলে? অনুশিক্ষণের কৌশলসমূহের তালিকা দিন। অনুশিক্ষণ চক্রটি ব্যখ্যা করুন।
৯. ছদ্মশিক্ষণ ও ফলাবর্তন বলতে কী বুঝায়? এদের পার্থক্য কী?
১০. ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ের বিষয়বস্তু ব্যবহার করে অনুশিক্ষণের যেকোন ৩টি কৌশলের প্রয়োগ দেখিয়ে একটি পাঠপরিকল্পনা তৈরি করুন।
১১. সামাজিক সচেতন মেলা কী? এ মেলার উদ্দেশ্যসমূহ কী? মেলা পরিকল্পনার উপাদানসমূহ কী কী?
১২. মেলায় প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে সংগ্রহকৃত সামগ্রীর তালিকা প্রণয়ন করুন।
১৩. ভৌগোলিক শিক্ষাসফর প্রতিবেদন লেখার ধাপসমূহ লিখুন।

ইউনিট ৫ : শিক্ষা উপকরণ তৈরি, সংগ্রহ ও উন্নয়ন, শিখন-শেখানো পরিবেশ তৈরিকরণ ও শিক্ষকদের পেশাগত উন্নয়ন

যে কোন স্তরের কোন নির্দিষ্ট শ্রেণির যে কোন বিষয়ের শিখন-শেখানো কার্যক্রমের রূপরেখা পাওয়া যায় সেই স্তরের শিক্ষাক্রমে। প্রকৃত পক্ষে শিক্ষাক্রমের বিস্তার বা পরিসর বা উপাদানের প্রসঙ্গ আসলেই প্রধান ৬টি ক্ষেত্রের কথা চলে আসে। ক্ষেত্র ৬টি হচ্ছে: শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, শিখনফল, বিষয় ও বিষয়বস্তুর তালিকা, শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল, শিখন সামগ্রী ও শিক্ষা উপকরণ এবং মূল্যায়ন পদ্ধতি ও কৌশল। শ্রেণিকক্ষে একজন শিক্ষকের কাজ হলো জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনে শিক্ষার্থীকে সহায়তা করা। আর এ সহায়তার কাজটি তখনই কার্যকর হয় যখন শিক্ষক বিষয়বস্তু সংশ্লিষ্ট সহায়ক সামগ্রী বা কিছু উপকরণ ব্যবহার করেন। এ উপকরণসমূহ হচ্ছে এক ধরনের শিক্ষামূলক হাতিয়ার বা টুল যা শিক্ষার্থীদের জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি উন্নয়নে এবং শিক্ষার্থীদের তথ্যের সমন্বয় করতে ও সার্বিক উন্নয়নে সহায়তা করে। ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ের একজন শিক্ষককে শিক্ষা উপকরণসমূহ শিক্ষার্থীদের শিখনে সহায়তা করা তথা শিক্ষার্থীদের জ্ঞান, ধারণা ও দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করার জন্যই ব্যবহার করতে হয়। একজন ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ের শিক্ষক তার পাঠ্যপরিদর্শন প্রণয়ন ও প্রস্তুতের সময়ই নিজেকে জিজ্ঞাসা করবেন যে, পাঠের শিখনফল অর্জনের জন্য তার কোন ধরনের শিক্ষা উপকরণ প্রয়োজন। প্রয়োজনীয় সকল ধরনের উপকরণ হাতের কাছে বা প্রস্তুতকৃত অবস্থায় পাওয়া যায় না। তাই শিক্ষককে জানতে হবে উপকরণ তৈরি, ব্যবহৃত উপকরণ সংরক্ষণ ও টেকসই উন্নয়ন প্রক্রিয়া। এ সকল উপকরণ যথাযথভাবে ব্যবহার করে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা। উপকরণ তৈরি, সংগ্রহ ও টেকসই উন্নয়নসহ উপযুক্ত শিখন-শেখানো পরিবেশ তৈরি করে ফলপ্রসূ ও কার্যকর শিখনের জন্য প্রয়োজন শিক্ষকদের পেশাগত উন্নয়ন। এ পেশাগত উন্নয়নের অন্তর্ভুক্ত থাকবে একজন ভূগোল ও পরিবেশ শিক্ষকের শিখন-শেখানোর সকল প্রকার দক্ষতা ও কৌশলসমূহ। উল্লিখিত বিষয়সমূহের কথা চিন্তা করে এ ইউনিটকে নিম্নোক্ত ৬টি পাঠে সাজানো হয়েছে।

৫.১ : শিক্ষা উপকরণ তৈরি, সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও 3Rs এর ব্যবহার;

৫.২ : যন্ত্রপাতিসহ দুর্লভ সামগ্রী ও অপ্রতুল উপকরণ ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ, স্বল্পমূল্যে, বিনামূল্যে শিখন-শেখানো উপকরণ তৈরি, সংগ্রহ ও সংরক্ষণ

৫.৩ : মানচিত্র ও ভূগোলক ব্যবহারের নিয়মাবলি

৫.৪ : মাধ্যমিক স্তরের ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ের ডিজিটাল কন্টেন্ট প্রণয়ন ও ব্যবহার

৫.৫ : ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ের আদর্শ শ্রেণিকক্ষ: পরিকল্পনা ও সজ্জিতকরণ

৫.৬ : ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ের শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় শিক্ষক যোগ্যতাসমূহ এবং এ সকল যোগ্যতা অর্জনে শিক্ষক প্রশিক্ষণের ভূমিকা

৫.১ শিক্ষা উপকরণ তৈরি, সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও 3Rs এর ব্যবহার

বর্তমান সময়ে শিখন-শেখানো কাজে উপকরণ ব্যবহার ব্যতীত কার্যকর শিখন নিশ্চিত করা অনেক কঠিন হয়ে পড়েছে। শিখন-শেখানো কার্যক্রমে বর্তমানে শিক্ষককেন্দ্রিক পদ্ধতির চেয়ে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক পদ্ধতি ও কৌশলের ব্যবহারকে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে। শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক পদ্ধতিতে পাঠদানকে ফলপ্রসূ করতে হলে শিক্ষা উপকরণের ব্যবহার অপরিহার্য। কেননা আধুনিক শিক্ষণ পদ্ধতির মূল কথাই হচ্ছে পাঠের বিষয়বস্তুকে শিক্ষার্থীদের নিকট গ্রহণযোগ্য, সহজবোধ্য ও বাস্তবভিত্তিক করে উপস্থাপন করা। ভূগোল শিক্ষণ পদ্ধতির আধুনিকায়নের উপায়ই হচ্ছে শিক্ষা উপকরণের ব্যবহার। শিক্ষা উপকরণের অনুপস্থিতিতে ভূগোল শিক্ষণ গুরু ও অকার্যকর হয়ে পড়ে। আর এ জন্য প্রয়োজন শিক্ষা উপকরণের যথাযথ ব্যবহার জানা, স্বল্পমূল্যের উপকরণ তৈরি করতে পারা, বিনামূল্যের উপকরণ সহজভাবে সংগ্রহ করতে পারা, অপেক্ষাকৃত অধিকমূল্যের উপকরণ ক্রয় বা সংগ্রহ করার কৌশল বা দক্ষতা অর্জন করা এবং টেকসই উন্নয়নের জন্য তৈরি, সংগ্রহ ও ব্যবহারের পর তা যথাযথভাবে সংরক্ষণের প্রক্রিয়া জানা ও দক্ষতা অর্জন করা। উপকরণ তৈরি, সংগ্রহ ও সংরক্ষণের ক্ষেত্রে 3Rs (Reduce, Reuse and Recycle) এর বিষয়টি বিবেচনায় রাখা। ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ের জন্য নির্বাচিত উপকরণসমূহ শিক্ষক নিজে তৈরি অথবা সংগ্রহ করতে পারেন। মনে রাখা প্রয়োজন, উপকরণসমূহ স্থানীয় পরিবেশ থেকে সংগ্রহ করাটাই সর্বোত্তম। উপকরণ তৈরি, সংগ্রহ, ব্যবহার ও সংরক্ষণ সবক্ষেত্রেই শিক্ষকের উদ্যোগ, পরিকল্পনা এবং চিন্তাভাবনার ছাপ থাকা প্রয়োজন।

শিক্ষা উপকরণের ধারণা

শিখন-শিখানো কার্যক্রমকে বাস্তবভিত্তিক, সহজবোধ্য, স্বতঃস্ফূর্ত ও প্রাণবন্ত করে তোলার জন্য শিক্ষক বা সহায়ক ও অংশগ্রহণকারীগণ যা কিছু ব্যবহার করেন সেগুলোকে শিক্ষা উপকরণ বলে।

যে সব সরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি বা জিনিসপত্র ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের কল্পনা শক্তি জাগিয়ে তোলা যায় এবং শিখনের বিষয়বস্তু তাদের কাছে সহজ, আকর্ষণীয়, বোধগম্য ও দীর্ঘস্থায়ী করে তোলা যায় তাকে শিক্ষা উপকরণ বলে।

ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ের বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের শিখানোর জন্য বিষয়বস্তুকে আকর্ষণীয়, সহজ, বোধগম্য, ফলপ্রসূ ও স্থায়ী করার ক্ষেত্রে যে সকল দ্রব্যসামগ্রী বা সরঞ্জাম বা যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয় তাকে ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ের শিক্ষা উপকরণ বলে।

শিক্ষা উপকরণ ব্যবহারের প্রধান ক্ষেত্রসমূহ-

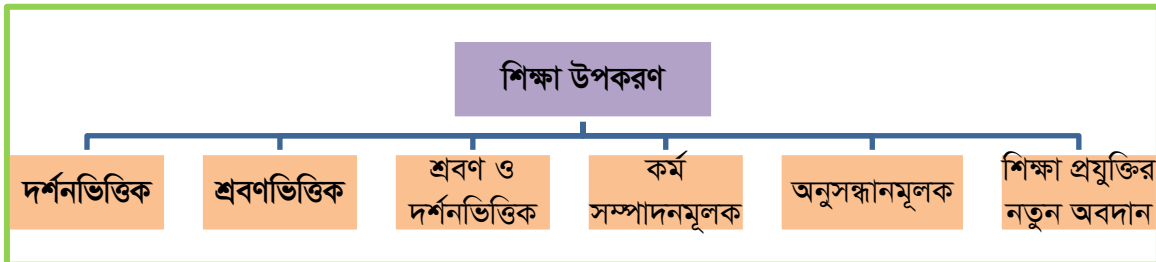
- বড় জিনিসকে ছোট করে দেখার জন্য, ছোট জিনিসকে বড় করে দেখার জন্য;
- দ্রুত প্রক্রিয়া ধীর গতিতে দেখার জন্য, ধীর প্রক্রিয়া দ্রুত দেখার জন্য;
- দূরের বস্তু সম্পর্কে ধারণা দেওয়ার জন্য;
- কদাচিৎ দেখা যায় এমন বস্তুর সঙ্গে পরিচিত করানোর জন্য;
- বিপদজনক পরিস্থিতি সম্পর্কে ধারণা প্রদানের জন্য;
- যে সব জিনিস দেখা যায় না, সেগুলো সম্পর্কে ধারণা দেবার জন্য

শিক্ষা উপকরণের প্রয়োজনীয়তা

শিক্ষা উপকরণ ব্যতীত শিখন-শেখানো কার্যক্রম যান্ত্রিক ও একমুখী প্রক্রিয়ায় পরিণত হয়। শিক্ষণ কার্যক্রমকে সক্রিয় অংশগ্রহণমূলক ও বাস্তবভিত্তিক করার জন্য উপকরণ ব্যবহার অপরিহার্য। শ্রেণিতে শিক্ষার্থীদেরকে সক্রিয় রাখার জন্য এবং জটিল বিষয়বস্তুকে সহজ করার জন্য উপকরণ ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। উপকরণ ব্যবহারের মাধ্যমে শ্রেণিতে বিষয়বস্তুকে উপস্থাপন করলে বিষয়বস্তু সহজেই শিক্ষার্থীদের মনে ছাপ ফেলে এবং শিক্ষার্থীরা তা মনে রাখতে পারে। বিশেষভাবে বলা যায় যে, উপকরণ ব্যবহার করে শিক্ষণের আধুনিক পদ্ধতি ও কৌশলগুলো শ্রেণিকক্ষে প্রয়োগ করলে তা অধিকতর কার্যকর হয়। উপকরণ ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা, কল্পনাশক্তি ও চিন্তাশক্তির বিকাশ হয়। শিক্ষা উপকরণ বিমূর্ত ধারণাকে মূর্ত করে তোলে। উপকরণ ব্যবহারের ফলে শেখানো প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের শিখন সহজ ও স্বতঃস্ফূর্ত হয়। স্বল্প সময়ে শিখতে পারে। শিখন আনন্দদায়ক, আকর্ষণীয় ও দীর্ঘস্থায়ী হয়। পাঠ গ্রহণে অংশগ্রহণকারীগণ সক্রিয় থাকে। পাঠের অনেক বিষয়বস্তু স্বল্প সময়ে শেখার সুযোগ সৃষ্টি হয়। শ্রেণি কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের একঘেয়েমি দূরীভূত হয়। শিক্ষার্থীদের চিন্তা শক্তি ও কল্পনা শক্তির বিকাশ ঘটে এবং সৃজনশীল দক্ষতার উন্নয়ন ঘটে। উপকরণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা ‘হাতে-কলমে’ শেখার সুযোগ পায়। কাজেই ফলপ্রসূ শিখন-শেখানোর জন্য উপকরণ ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

শিক্ষা উপকরণের শ্রেণিবিন্যাস

শিক্ষা উপকরণকে নানা ভিত্তিতে শ্রেণিবিন্যাস করা যায়। শিক্ষা উপকরণকে ব্যবহারের গুণাগুণ থেকে নিম্নলিখিতভাবে শ্রেণিবিন্যাস করা যায়:



মূল্যের ভিত্তিতে শিক্ষা উপকরণের শ্রেণিবিন্যাস নিম্নরূপ-



প্রাপ্যতার ভিত্তিতে শিক্ষা উপকরণ আবার তিন প্রকার।

১. সহজে প্রাপ্য শিক্ষা উপকরণ
২. স্বল্পপ্রাপ্য শিক্ষা উপকরণ
৩. দূর্প্রাপ্য শিক্ষা উপকরণ

সংগ্রহের উৎস হিসেবে শিক্ষা উপকরণ দুই ধরনের-

১. বাণিজ্যিক উপকরণ (শিল্প কারখানায় তৈরি এবং দোকান থেকে ক্রয় করতে হয়)
২. সহজলভ্য উপকরণ (পরিবেশ থেকে সংগ্রহ করা যায় এবং শিক্ষক বা শিক্ষার্থী কর্তৃক স্বল্প খরচে তৈরি যায়)

শিক্ষা উপকরণ তৈরি ও সংগ্রহ

শিখন-শিখানো কার্যক্রমে যে সকল উপকরণ ব্যবহার করা হয় তার মধ্যে স্বল্পমূল্যের উপকরণসমূহ শিক্ষক নিজেই তৈরি ও সংগ্রহ করতে পারেন। আবার শিক্ষার্থী বা প্রশিক্ষার্থীর মাধ্যমেও তৈরি ও সংগ্রহ করতে পারেন। শিক্ষা উপকরণ তৈরি ও সংগ্রহের পূর্বে শিক্ষককে যে সকল বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত তা হচ্ছে, উপকরণ ব্যবহারকারী শিক্ষার্থীদের সৃজনী প্রতিভা, পাঠের বিষয়বস্তুর সাথে উপকরণের সংশ্লিষ্টতা, উপকরণ ব্যবহারকারী শিক্ষার্থীদের বয়স, সামর্থ্য, আগ্রহ, রুচিবোধ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা, উপকরণ তৈরির উপাদানগুলোর সহজলভ্যতা, স্থানীয় কাঁচামালের প্রাপ্যতা, প্রস্তুতকৃত উপকরণের উপযোগিতা, সর্বোত্তম ব্যবহার যোগ্যতা, উপকরণ ব্যবহারের বহুমাত্রিকতা, সময় ও অর্থের পরিমিততা, উপকরণের স্থায়িত্ব ও সংরক্ষণ যোগ্যতা, শ্রেণিতে ব্যবহারের উপযোগিতা, বহনের সুবিধা, কৌতূহল উদ্দীপক ক্ষমতা, বৈচিত্র্যময়তা এবং উপকরণের শৈল্পিক মান ইত্যাদি।

ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ে স্থানীয় সম্পদ ব্যবহার করে তৈরিকৃত উপকরণসমূহ

ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ের শিক্ষক সহজলভ্য দ্রব্যাদির সাহায্যে যে সকল শিক্ষা উপকরণ প্রস্তুত করতে পারেন তার কিছু উদাহরণ দেওয়া হলো-

- কাগজ বা বোর্ডের উপর বিভিন্ন ছবি, মানচিত্র, নকশা অঙ্কন করতে পারেন;
- কাগজ, বোর্ড, কাঠ ইত্যাদির দ্বারা আসবাবপত্র, রাস্তাঘাট, সৌরজগত পাহাড়-পর্বত ইত্যাদির মডেল তৈরি করতে পারেন;
- প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করে বিভিন্ন ঋতুতে সূর্যের অবস্থান, বাতাসের আর্দ্রতা, তাপমাত্রা এবং প্রকৃতি পরিবর্তনের বিবরণী চার্ট তৈরি করতে পারেন;
- শিক্ষার্থীরা কাদামাটি ব্যবহার করে পাহাড়, পর্বত, নদী, উপত্যকা ইত্যাদির মডেল তৈরি করতে পারেন;
- বৈদ্যুতিক তার, ব্যাটারী, তামারপাত ইত্যাদি ব্যবহার করে ছোট ছোট বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি তৈরি করতে পারেন;
- বৃষ্টিমাপক যন্ত্রপাতি তৈরি করে দৈনন্দিন বৃষ্টিপাত পরিমাপ করে গ্রাফের মাধ্যমে তা প্রকাশ করতে পারেন;
- বাংলাদেশের বিভিন্ন বিভাগ, জেলা, উপজেলা এবং এসব এলাকার উৎপন্ন ফসল ও অন্যান্য সম্পদের চার্ট তৈরি করতে পারেন;

- মাটির কলস, কাগজ, বোর্ড ইত্যাদি দিয়ে গ্লোব তৈরি করতে পারেন;
- বয়ামে বা অনুরূপ কোন পাত্রে রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করে প্রকৃত বস্তু সংরক্ষণ করা যেতে পারেন;
- বাঁশ দিয়ে কম্পাস তৈরি করতে পারেন;
- পুরানো খবরের কাগজ দিয়ে ভূগঠনের মডেল তৈরি করতে পারেন;
- নরম আঠালো মাটি, হার্ডবোর্ড ও এমোনিয়া ডাইক্রোমেট পাউডার দিয়ে সক্রিয় আগ্নেয়গিরির মডেল তৈরি করতে পারেন।

নিজ উদ্যোগে শিক্ষা উপকরণ তৈরি ও সংগ্রহ করার জন্য নিচের পদ্ধতিগুলো অনুসরণ করতে পারেন-

- বিষয় সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় উপকরণের একটি তালিকা তৈরি করা;
- তালিকায় বর্ণিত উপকরণ বা এর উপাদান আশেপাশের পরিবেশ থেকে সংগ্রহ করা যায় কি না অর্থাৎ সহজলভ্য কি না তা বিবেচনা করা;
- বিনামূল্যে উপকরণের উপাদানসমূহ সংগ্রহ করার বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা;
- সংগৃহীত উপকরণটি দীর্ঘদিন ব্যবহার করা যায় কি না তা বিবেচনা করা;
- শিক্ষার্থীর বয়স, আগ্রহ, সামর্থ্য ও রুচির প্রতি খেয়াল রেখে শিক্ষা উপকরণ সংগ্রহ ও তৈরি করার পরিকল্পনা করা;
- সম্ভাব্য উপকরণটি শিক্ষার্থীর পাঠ গ্রহণে আগ্রহ সৃষ্টির জন্য যথেষ্ট সহায়ক কি না তা বিবেচনা করা;
- প্রয়োজনে একই উপকরণ বিভিন্ন বিষয়বস্তু ও বিভিন্ন বিষয়ে ব্যবহার করা যায় কি না তা খেয়াল রাখা;
- শিক্ষা উপকরণের আকার ও আকৃতি শ্রেণি উপযোগী কি না তা বিবেচনা করা।

শিক্ষা উপকরণের যথাযথ ব্যবহার

যেকোনো স্তরের যেকোন শ্রেণিতে শিখন-শেখানো কার্যক্রমে বিষয়বস্তু সংশ্লিষ্ট উপকরণ ব্যবহার করা অপরিহার্য। উপকরণ ব্যবহার করে শিক্ষণ যেমন শিক্ষার্থীদের নিকট হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠে, তেমনি পাঠের বিষয়বস্তু স্পষ্ট, সহজ ও মূর্ত হয়। উপকরণ ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা পাঠের বিষয়বস্তু সহজে অনুধাবন করতে ও তথ্য সমন্বয় করতে সক্ষম হয়। উপকরণ যতই মূল্যবান বা স্বল্পমূল্যের হোক না কেনো এবং উপকরণের পর্যাণ্ডতা যতই থাকুক না কেনো উপকরণ ব্যবহারের সঠিক নিয়ম অনুসরণ না করলে তা পাঠদানে বিঘ্ন ঘটায়। নিচে উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহারের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার বিধি তুলে ধরা হলো-

- পাঠের বিষয়বস্তুর সাথে সামঞ্জস্য রেখে উপকরণ নির্বাচন করতে হবে;
- উপকরণ শ্রেণি ও শিক্ষার্থী উপযোগী হতে হবে;
- উপকরণ এমন হতে হবে যাতে এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদেরকে চিন্তাশীল করে তোলা যায়;
- পাঠ সংশ্লিষ্ট নমুনা, মডেল, চার্ট, দ্রব্য ইত্যাদি ব্যবহার করতে হবে;
- উপকরণে ব্যবহৃত ভাষা ও লেখা সহজ, স্পষ্ট ও শ্রেণির সকল শিক্ষার্থী দেখতে পায় এমন আকারের হতে হবে;
- উপকরণ ব্যবহারের পূর্বে শিক্ষককে তার ব্যবহার কৌশল রপ্ত করতে হবে;
- উপকরণ ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় পূর্ব পরিকল্পনা করতে হবে;
- পাঠের সাথে সঙ্গতি রেখে উপকরণ ধারাবাহিকভাবে ব্যবহার করতে হবে;
- উপকরণ যথাসম্ভব বাস্তব ও ত্রুটিহীন হতে হবে;
- উপকরণ এমনভাবে ব্যবহার করতে হবে যাতে শ্রেণির সকল শিক্ষার্থী তা দেখতে পারে;
- ব্যবহৃত উপকরণের যথার্থতা ও কার্যকারিতা যাচাই করতে হবে;
- শিক্ষা প্রযুক্তির নতুন অবদানসমূহ ব্যবহারের পূর্বে শিক্ষককে তার যথাযথ ব্যবহার রপ্ত করতে হবে;
- প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ডিজিটাল উপকরণ ব্যবহার করতে হবে।

শিক্ষা উপকরণ ব্যবহারে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়কেই আগ্রহী, দক্ষ ও যত্নশীল হতে হবে। কেবল উপকরণ ব্যবহারের রীতি-নীতি জানলেই চলবে না এগুলো যথাযথভাবে অনুশীলন ও প্রয়োগ করার মধ্য দিয়েই শিখন-শেখানো কার্যকর ও সফল করা সম্ভব। শিক্ষকের প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা ও কর্মতৎপরতার মাধ্যমেই শিক্ষা উপকরণের ফলপ্রসূ ও কার্যকর ব্যবহার সম্ভব। এজন্য শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়কেই আন্তরিক ও উদ্যোগী হতে হবে।

শিক্ষা উপকরণ সংরক্ষণ

শিখন-শেখানো কাজের জন্য প্রতিনিয়ত শিক্ষা উপকরণ তৈরি করা সম্ভব হয় না। এছাড়া সব সময় সংগ্রহ করার মত পর্যাপ্ত সময়ও পাওয়া যায় না। আবার বার বার তৈরি করতে অর্থ, শ্রম ও সময়ের অপচয় হয়। এসকল কারণে এবং উপকরণের টেকসই ব্যবহার নিশ্চিতকরণে উপকরণ সংগঠন ও সংরক্ষণ করা একান্ত প্রয়োজন। সংরক্ষণ করার কিছু নিয়ম রয়েছে যা অনুসরণ করলে দীর্ঘ দিন একই উপকরণ ব্যবহার করা সম্ভব হয়।

- উপকরণ সংরক্ষণের জন্য একটি নির্দিষ্ট কক্ষ নির্ধারণ করতে হবে বা বিষয়ভিত্তিক আদর্শ শ্রেণিকক্ষের ব্যবস্থা করতে হবে;
- রাসায়নিক সরঞ্জাম ও বিভিন্ন প্রকার বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি সংরক্ষণের জন্য ল্যাবরেটরি কক্ষের নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে;
- শিক্ষা উপকরণ সংগঠনের জন্য কক্ষটি অবশ্যই জীবাণুমুক্ত ও কীট-পতঙ্গমুক্ত হতে হবে;
- দামি ও দুর্লভ উপকরণের ক্ষেত্রে নিরাপত্তার বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে;
- বিষয়ভিত্তিক উপকরণ ধরন অনুযায়ী আলাদাভাবে রাখতে হবে;
- রাসায়নিক দ্রব্যাদি আলাদা তাকে (অবশ্যই নিচের তাকে) সম্ভব হলে আলাদা আলমারিতে সংরক্ষণ করতে হবে;
- উপকরণগুলো ব্যবহার শেষে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে নির্ধারিত জায়গায় সাজিয়ে রাখতে হবে;
- পচনশীল উপকরণ সংরক্ষণের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ পানি, ফরমালিন ইত্যাদি মিশিয়ে রাখতে হবে;
- যন্ত্রপাতি শ্রেণিকক্ষে ব্যবহার করার পূর্বেই তা পরীক্ষা করতে হবে এবং অতি সাবধানতার সাথে ব্যবহার করতে হবে;
- প্রতিটি শিক্ষা উপকরণের নাম, সংগ্রহের তারিখ, স্থান, সংগ্রহকারীর নাম ইত্যাদির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণযুক্ত লেবেল লাগিয়ে রাখলে ভালো হয়;
- উপকরণের হিসাব সংরক্ষণের জন্য একটি স্টক রেজিস্টার চালু করতে হবে এবং রেজিস্টারটি নিয়মিত চেক করতে হবে;
- উপকরণ সংরক্ষণের জন্য নির্ধারিত কক্ষের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট বিষয় শিক্ষককে প্রদান করলে ভালো হয়;
- যেসব উপকরণ শ্রেণিকক্ষে ঘনঘন ব্যবহার প্রয়োজন হয় সেসব উপকরণ একটি নির্দিষ্ট স্থানে এবং যেসব উপকরণ কম ব্যবহার হয় সেসব উপকরণ পৃথক স্থানে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।

শিক্ষা উপকরণ তৈরি, সংগ্রহ, ব্যবহার ও সংরক্ষণের ক্ষেত্রে 3-Rs এর ব্যবহার

বৈশ্বিক উষ্ণায়ন ও জলবায়ুর পরিবর্তনের প্রভাবকে কমিয়ে আনতে আমাদের দৈনন্দিন রুটিন কার্যক্রমে 3-Rs এর ব্যবহার সহায়তা করতে পারে। সে কারণে শিক্ষা উপকরণ তৈরি, সংগ্রহ, ব্যবহার ও সংরক্ষণের ক্ষেত্রে এ তিনটি বিষয় (Reduce, Reuse and Recycle) বিবেচনা করতে হবে। প্রথম R-এর পিছনের ধারণা হচ্ছে Reduce বা কমানো। শিক্ষা উপকরণের ক্ষেত্রে কমানো বলতে যে সকল উপকরণ ব্যবহারে পরিবেশের ক্ষতি হতে পারে সে সব উপকরণের অপব্যবহার না করা। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, যে কয়টি কম্পিউটার হলে কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে চলে তার বেশি না কেনা বা সংগ্রহ না করা। অল্প সময় ব্যবহার করে কেবল মডেল পরিবর্তনের জন্য নতুন করে কম্পিউটার বা মোবাইল ক্রয় না করা এবং নষ্ট বা অকেজো ইলেক্ট্রনিক ডিভাইসসমূহের যথাযথ ব্যবস্থাপনা করা।

দ্বিতীয় R-এর পিছনের ধারণা হচ্ছে Reuse বা পুনঃব্যবহার। শিক্ষা উপকরণের ক্ষেত্রে পুনঃব্যবহার বলতে যে সব পরিস্থিতিতে সম্ভব সেখানে একই উপকরণের পুনরায় বা বার বার ব্যবহার। অন্যকথায় নতুন করে ক্রয় না করে অর্থাৎ পুনঃস্থাপন না করে তা পুনরায় ব্যবহার করা পরিবেশের জন্য উত্তম। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, নতুন একটি কম্পিউটার ক্রয় করার চেয়ে বিদ্যমান কম্পিউটারকে আপডেট করে নিলে তা পুনঃব্যবহার করা যাবে। যা পরিবেশ সহায়ক। যদি নতুন ক্রয় করতেই হয়, তবে নিশ্চিত করতে হবে যে, কম্পিউটারটি বা তার যন্ত্রাংশ পুনঃব্যবহার হবে। অনেক দাতব্য সংস্থা সেকেন্ডহ্যান্ড কম্পিউটারকে স্বাগত জানায়। এভাবে আমরা শিক্ষা উপকরণের পুনঃব্যবহার নিশ্চিত করতে পারি।

তৃতীয় R-এর পিছনের ধারণা হচ্ছে Recycle। শিক্ষা উপকরণের ক্ষেত্রে রিসাইকেল বলতে যে সব পরিস্থিতিতে সম্ভব সেখানে একই উপকরণ বা তার অংশ বিশেষকে ভিন্নউদ্দেশ্যে ব্যবহার নিশ্চিত করা। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যদি কোন কম্পিউটার পুনঃব্যবহারের অনুপযোগী হয় সেক্ষেত্রে এমন কোন প্রতিষ্ঠানকে দান করা যে প্রতিষ্ঠান রিসাইকেল করবে। আবার ব্যবহৃত পোস্টার বা কাগজ রিসাইকেল করে নতুনভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। ব্যবহৃত সংবাদপত্রকে চাহিদা অনুযায়ী উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

৫.২ যন্ত্রপাতিসহ দুর্লভ সামগ্রী ও অপ্রতুল উপকরণ ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ, স্বল্পমূল্যে, বিনামূল্যে শিখন-শেখানো উপকরণ তৈরি, সংগ্রহ ও সংরক্ষণ

ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ের শিখন-শেখানো কার্যক্রমে প্রয়োজন হয় নানা রকম উপকরণ ও যন্ত্রপাতি। এসকল উপকরণ ও যন্ত্রপাতির মধ্যে কিছু আছে সাধারণ যা সহজে ও সুলভে পাওয়া যায়। কিছু আছে দুর্লভ সামগ্রী আবার কিছু আছে অপ্রতুল। দুর্লভ ও অপ্রতুল উপকরণগুলো একদিকে খুব দামি আবার অন্যদিকে দুস্থাপ্য। এসব দুর্লভ সামগ্রী ও অপ্রতুল উপকরণ ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কাজেই এসকল উপকরণের ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণের দিকে নজর দেওয়া জরুরি। দুর্লভ ও অপ্রতুল উপকরণকে আলাদা করা অনেকসময় বেশ কঠিন হয়ে পড়ে। বিদ্যালয়ভিত্তিক বিবেচনায় কোন কোন বিদ্যালয়ের জন্য যেটা দুর্লভ অন্য বিদ্যালয়ের জন্য একই উপকরণ অপ্রতুল কিন্তু তা দুর্লভ নয়। যেমন- কোন কোন বিদ্যালয়ের জন্য ইন্টার-একটিভ বোর্ড ও ডকুমেন্ট ক্যামেরা দুর্লভ উপকরণ হিসেবে বিবেচিত। আবার কমসংখ্যক বিদ্যালয়ে এসকল উপকরণ আছে; তবে সংখ্যায় খুবই কম। এরূপ ক্ষেত্রে এ দুই ধরনের উপকরণ অপ্রতুল, দুর্লভ নয়। নিম্নে বাংলাদেশের মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের সাধারণভাবে বিবেচ্য যন্ত্রপাতিসহ দুর্লভ ও অপ্রতুল উপকরণের একটি তালিকা দেওয়া হলো-

যন্ত্রপাতিসহ দুর্লভ সামগ্রীসমূহ হচ্ছে যথাক্রমে-স্লাইড ও স্লাইড প্রজেক্টর, ইলেক্ট্রনিক নোট বুকস, ই-রিডার্স, কম্পিউটার এডুকেশনাল গেমস, অনলাইন এনসাইক্লোপেডিয়া, পিকচার ডিকশনারি, টকিং ডিকশনারি, অনলাইন ই-বুক, অডিও-ভিডিও শিক্ষণ উপকরণ, পাঠসংশ্লিষ্ট টিভি চ্যানেল, শিক্ষামূলক সিডি ও ডিভিডি, ইন্টার-একটিভ হোয়াইট বোর্ড, ভিডিও কনফারেন্সিং যন্ত্র, বিষয়বস্তু সংশ্লিষ্ট চলচ্চিত্র, ওএইচপি, এপিডায়াক্সোপ, ডকুমেন্ট ক্যামেরা, দূরবীক্ষণ যন্ত্র, সেক্সট্যান্ট যন্ত্র, বিভিন্ন নদীর উৎপত্তিস্থল ও গতিপথের ভিডিও, আগ্নেয়গিরির মডেল, বিভিন্ন প্রকার বৃষ্টিপাতের ও নিয়ত বায়ু প্রবাহের এনিমেটেড ভিডিও ইত্যাদি।

আবার অপ্রতুল উপকরণের মধ্যে আছে যথাক্রমে- কম্পিউটার বা ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, ইলেক্ট্রনিক অডিও-ভিডিও, বিষয়বস্তুভিত্তিক মানচিত্র, গ্লোব, মডেল, নকশা, ড্রইং যন্ত্রপাতি, রেডিও, টেলিভিশন, বিভিন্ন ধরনের চার্ট, পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন, ডায়াগনাল স্কেল, দিবারাত্রির সংঘটনের মডেল, জিপিএস যন্ত্র ইত্যাদি।

যন্ত্রপাতিসহ দুর্লভ ও অপ্রতুল উপকরণের ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ

এখানে ব্যবস্থাপনা বলতে শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার জন্য যে সকল যন্ত্রপাতিসহ দুর্লভ ও অপ্রতুল উপকরণ দরকার এগুলোর সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য যা কিছু করা হয় তাকে বুঝায়। শিক্ষাকে প্রয়োগমুখী ও বাস্তবভিত্তিক করে তোলার জন্য ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব অপরিসীম। উপকরণের অপ্রতুলতা, ত্রুটি বিচ্যুতি, বিশৃঙ্খল অবস্থান, অযত্ন শিক্ষা কার্যক্রমে নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে। বলা যায় শিক্ষণ কার্যক্রমকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে যন্ত্রপাতিসহ দুর্লভ ও অপ্রতুল উপকরণের ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত প্রয়োজন।

দুর্লভ যন্ত্রপাতি ও অপ্রতুল উপকরণ ব্যবস্থাপনার আবশ্যিকীয় উপাদান

যথোপযুক্ত শ্রেণিকক্ষ: শ্রেণি কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ের একটি পৃথক ও উপযুক্ত শ্রেণিকক্ষ থাকতে হবে। শ্রেণিকক্ষটি আয়তকার এবং কমপক্ষে ৪০ ফুট X ২৫ ফুট সাইজের হবে। দরজা জানালা বড় হবে। পর্যাপ্ত আলো বাতাস প্রবেশের ব্যবস্থা থাকতে হবে। শ্রেণিকক্ষে নিরাপত্তার সাথে যন্ত্রপাতিসহ দুর্লভ ও অপ্রতুল উপকরণসমূহ রাখার ব্যবস্থা থাকতে হবে। বিদ্যালয়ের সক্ষমতা বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে শীতাতাপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা হলে ভালো হয়।

উপকরণ নির্বাচন: শ্রেণিতে শিখন-শেখানো কাজের জন্য নির্বাচিত উপকরণটি অবশ্যই যথাযথ ও আকর্ষণীয় হবে। বাস্তবের সাথে মিল রেখে উপকরণ নির্বাচন করতে হবে। উপকরণের নতুনত্ব ও চাকচিক্য বিবেচনা করে অপ্রয়োজনে উপকরণ ব্যবহার করা উচিত নয়।

শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ: ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ের শ্রেণিকক্ষটি বিষয় সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন উপকরণ দিয়ে সুন্দরভাবে সজ্জিত থাকতে হবে। শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করলেই যেন বিষয়টির একটি সুন্দর ও মনোরম পরিবেশ শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর নিকট ফুটে উঠে। দুর্লভ ও অপ্রতুল উপকরণগুলো যেন শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন অনুযায়ী ও দৃষ্টিগ্রাহ্যভাবে প্রদর্শন/ব্যবহার করা যায় এমনভাবে স্থাপন করতে হবে।

শিক্ষকের প্রস্তুতি: শিক্ষকের প্রস্তুতি কার্যকর ও ফলপ্রসূ শিখনের পূর্বশর্ত। শিক্ষক প্রস্তুতিবিহীন শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করলে কার্যকরভাবে শিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে না এবং শ্রেণি ব্যবস্থাপনায় বিঘ্ন ঘটে। শিক্ষকের শ্রেণিকক্ষে প্রবেশের পূর্বে বিষয়বস্তু ও উপকরণের ব্যবহার সম্পর্কে প্রস্তুতি নেওয়া দরকার। দুর্লভ ও অপ্রতুল উপকরণসমূহ সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য শিক্ষককে অবশ্যই পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ করে শ্রেণিতে আসতে হবে। বেশি সংখ্যক শিক্ষার্থীকে কীভাবে অপ্রতুল উপকরণের সহায়তায় কাজে লাগাতে হবে তারও পূর্ব প্রস্তুতি থাকতে হবে।

যন্ত্রপাতিসহ দুর্লভ ও অপ্রতুল উপকরণের ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণের নীতিমালা

ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ের দুর্লভ যন্ত্রপাতি ও অপ্রতুল উপকরণ একটি নির্দিষ্ট শ্রেণিকক্ষে সংরক্ষণের যথাযথ ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। কারণ সংরক্ষণের ব্যবস্থা না নিলে উপকরণ যতই স্বল্পমূল্য, মূল্যবান বা অপ্রতুল হোক তা অচিরেই নষ্ট হয়ে যাবে। পাঠদানকালে তা আর ব্যবহার করা যাবে না। উপকরণের অপূর্ণতা, ত্রুটি বিচ্যুতি, বিশৃঙ্খল অবস্থান শিক্ষা কার্যক্রমে নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে। শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ের জন্য একটি পৃথক এবং আয়তকার শ্রেণিকক্ষ থাকতে হবে। দরজা ও জানালা বড় হবে। পর্যাপ্ত আলো বাতাস প্রবেশের ব্যবস্থা থাকতে হবে। উপকরণ সজ্জিত ও সংরক্ষণের জন্য কক্ষে আলমারি, গ্লাস বক্স, স্ট্যান্ড, ড্রয়ার, র‍্যাক, বুলেটিন বোর্ড ইত্যাদি থাকতে হবে। উপকরণগুলো এমনভাবে সংরক্ষণ ও সজ্জিত করতে হবে যাতে প্রয়োজনের সময় সহজে ব্যবহার করা যায়।

পাঠ সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় উপকরণ যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে। শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানো প্রক্রিয়াকে কার্যকরী, ফলপ্রসূ ও আকর্ষণীয় করে শিক্ষার্থীদের পাঠদানের ক্ষেত্রে যেমন শিক্ষা উপকরণের প্রয়োজন তেমনি উপকরণের যথার্থ ভবিষ্যত ব্যবহার নিশ্চিতকরণের জন্য তা সংরক্ষণ আবশ্যিক। ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ের দুর্লভ ও অপ্রতুল উপকরণ রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে-

- শ্রেণিকক্ষে দুর্লভ যন্ত্রপাতি ও অপ্রতুল উপকরণের ফলপ্রসূ ব্যবহারের পর নির্ধারিত কক্ষে নির্ধারিত স্থানে উপকরণের প্রকৃতি অনুযায়ী সংরক্ষণ করতে হবে;
- কক্ষটি পরিচ্ছন্ন হতে হবে এবং শিক্ষা উপকরণের সংরক্ষণ কক্ষ শীতাতাপ নিয়ন্ত্রিত হলে ভাল হয়;
- শিক্ষা উপকরণ কক্ষটি অবশ্যই কীটপতঙ্গ এবং জীবাণু মুক্ত হতে হবে;
- অত্যাধুনিক মূল্যবান শিক্ষা উপকরণসমূহ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে অবশ্যই নিরাপত্তার বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে;
- শিক্ষা উপকরণ সংরক্ষণাগারে নির্ধারিত ব্যক্তিবর্গের যাতায়াত সুনিশ্চিত করতে হবে;
- শিক্ষা উপকরণ সংরক্ষণের জন্য নির্ধারিত সংরক্ষণ কক্ষে প্রয়োজনীয় সংখ্যক আসবাবপত্র বিন্যস্ত থাকতে হবে;
- ভঙ্গুর ও পচনশীল শিক্ষা উপকরণ আলাদাভাবে রাখতে হবে;
- যে সকল শিক্ষা উপকরণ পচনশীল সেগুলো প্রয়োজনীয় পরিমাণ পানি ও ফরমালিন দিয়ে সংরক্ষণ করতে হবে;
- সংরক্ষণ কক্ষে উপকরণসমূহকে ক্যাটালগভিত্তিক আলাদাভাবে সংরক্ষণ করতে হবে;
- প্রত্যেকটি শিক্ষা উপকরণের উপরে নাম, সংগ্রহের স্থান, তারিখ ও সংরক্ষকের নামসহ একটি সংক্ষিপ্ত তথ্যযুক্ত লেবেল লাগিয়ে দিতে হবে;
- প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ইন্টারনেট কানেকশন থাকতে হবে;
- বিদ্যুৎনির্ভর উপকরণসমূহ ব্যবহার শেষে যথাযথ নিয়ম অনুসরণ করে অফ করতে হবে।

শুধু শিক্ষা উপকরণ সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং ব্যবহার নীতি জানা থাকলেই চলবে না বরং তার যথার্থ প্রয়োগ করতে হবে। সাধারণত আদর্শ শিক্ষকের সঠিক কর্মতৎপরতার মাধ্যমেই শিক্ষা উপকরণের ফলপ্রসূ ব্যবহার সুনিশ্চিত করা যায়।

স্বল্পমূল্যে, বিনামূল্যে শিখন-শেখানো উপকরণ তৈরি, সংগ্রহ ও সংরক্ষণ

স্বল্পমূল্য ও বিনামূল্যে উপকরণের ধারণা

যে সকল উপকরণ নামমাত্র মূল্যে কেনা যায় বা তৈরি করা যায় তাকে স্বল্প মূল্যের শিখন-শেখানো উপকরণ বলে। আবার শ্রেণি শিক্ষণের জন্য যে সকল উপকরণ বিনা ব্যয়ে তৈরি করা যায় বা প্রকৃতি থেকে সংগ্রহ করা যায় তাকে বিনামূল্যের শিখন-শেখানো উপকরণ বলে। স্বল্পমূল্যের এবং বিনামূল্যের শিখন-শেখানো উপকরণ তৈরি ও সংগ্রহের জন্য শিক্ষকের আন্তরিকতা, পরিকল্পনা এবং প্রচেষ্টার গুরুত্ব অপরিসীম। শিক্ষার্থীরা এসব উপকরণ তৈরিতে অংশগ্রহণ করে বাস্তব জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জনে সমর্থ হয়।

ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ের স্বল্পমূল্যের উপকরণ তৈরি

ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ের স্বল্পমূল্যে যে সকল উপকরণ তৈরি করা যায় তার কিছু উদাহরণ দেওয়া হলো- সৌর জগতের মডেল, মানচিত্র, নকশা, সূর্যের অবস্থানের চিত্র, কলসের উপরে অঙ্কিত বিশ্বমানচিত্র, লোহার তার দ্বারা গ্লোব ও অক্ষাংশ-দ্রাঘিমাংশের মডেল, বিভিন্ন প্রকার চার্ট, গ্রাফ, ট্রে, স্পিরিট ল্যাম্প, বরফের টুকরা, ফিউজ বাল্ব দিয়ে তৈরি বৃষ্টি পর্যাযচক্র, স্বচ্ছ প্লাস্টিকের বোতল ও ফানেল দিয়ে তৈরি বৃষ্টি মাপক যন্ত্র, সেলোফেন, আঠা, ম্যাচের কাঠি, কাঠ, সূতা ও একখণ্ড ভারী বস্ত্র দিয়ে তৈরি হাইড্রোমিটার, হার্ডবোর্ডের চাকতি, ফ্লু, বাশ বা কাঠের দণ্ড দিয়ে তৈরি দেশ ও রাজধানী নিয়ে খেলার যন্ত্র, বিভিন্ন রংয়ের কার্ড, রঙিন কলম বা রং পেন্সিল ও কাচি দিয়ে পৃথিবীর আগ্নেয়গিরি সম্বন্ধে প্রতিযোগিতামূলক খেলা, আর্ট পেপার, রং, কম্পাস ও বাঁশের টুকরা দিয়ে প্রধান প্রধান বায়ুপ্রবাহ ও ঘূর্ণিঝড় অঞ্চল প্রদর্শনমূলক চার্ট ইত্যাদি।

স্বল্পমূল্যের এবং বিনামূল্যের শিখন-শেখানো উপকরণ তৈরির বিবেচ্য দিক

শিখন-শেখানো উপকরণগুলো শিক্ষাকে বাস্তব, বিষয়বস্তুকে জীবন্ত ও জীবনের সাথে সম্পৃক্ত করে তোলে। তাই ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ের পাঠদানের সময় শিক্ষককে নানা ধরনের শিক্ষা উপকরণ তৈরি ও ব্যবহার করতে হয়। স্বল্পমূল্যের এবং বিনামূল্যের শিখন-শেখানো উপকরণ তৈরির সময় তাই শিক্ষককে যে বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হবে তা হলো-

- শিক্ষার্থীর বয়স, সামর্থ্য, আগ্রহ, রুচি এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা;
- নির্বাচিত ও পরিকল্পিত উপকরণ তৈরির উপাদানগুলো সহজে পাওয়া যায় কি না;
- যে উপকরণটি তৈরি করা হবে তা শিক্ষার্থীর পাঠ গ্রহণে কতটা সহায়ক;
- কোন প্রক্রিয়ায় তৈরি করলে উপকরণটি সর্বাধিক উপযোগী হবে;
- কম অর্থ, সময় ও শ্রম ব্যয় করে সহজে তৈরি করা সম্ভব কি না;
- শিখন-শেখানো কাজে সহজে ব্যবহারযোগ্য কি না;
- প্রয়োজন বোধে বিভিন্ন বিষয় ওশ্রেণিতে ব্যবহার করা যাবে কি না;
- তৈরিকৃত উপকরণের স্থায়িত্ব কীভাবে বাড়ানো যায়;
- উপকরণটিকে কীভাবে শিক্ষার্থীদের নিকট আকর্ষণীয় করা যায়।

স্বল্পমূল্যের ও বিনামূল্যের উপকরণ সংগ্রহ ও সংরক্ষণসংগ্রহ

স্বল্পমূল্যের উপকরণসমূহ শিক্ষক ও শিক্ষার্থী মিলে তৈরি করা যায় আবার বিদ্যালয় তহবিল থেকে অর্থ বরাদ্দের মাধ্যমে ক্রয় করা যায়। উপরে উল্লিখিত উপকরণসমূহের প্রতিটি ক্রয়ের মাধ্যমে সংগ্রহ করা যায়। আবার স্বল্পমূল্যের উপকরণসমূহ তৈরিতে যে সকল উপাদান প্রয়োজন হয় তার অনেকগুলোই পরিবেশ থেকে সংগ্রহ করা যায়। তাছাড়া বিনামূল্যের উপকরণসমূহ প্রকৃতি ও পরিবেশ থেকে সংগ্রহ করা যায়। ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ের জন্য বিনামূল্যের যে সকল উপকরণ সংগ্রহ করা যায় তার কিছু উদাহরণ দেওয়া হলো-কাদা মাটি, হার্ডবোর্ড দ্বারা তৈরি পাহাড়-পর্বত, আগ্নেয়গিরির মডেল, শোলা, পাট দিয়ে তৈরি বিভিন্ন উপকরণ, কাদা মাটি দ্বারা তৈরি নদী ও নদীর উৎসের মডেল, পুরানো ক্যালেন্ডারের তৈরি চিত্র, চার্ট ও নকশা, শোলা দিয়ে তৈরি ফুল, ডিমের শক্ত পৃষ্ঠ দিয়ে তৈরি মানচিত্র এবং বিভিন্ন নকশা, বিভিন্ন ডিজাইনের পোস্টার, বিভিন্ন শস্যের নমুনা, বিভিন্ন প্রকার শিলার নমুনা, পুরানো খবরের কাগজের ভূগঠনের মডেল, পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও পরিবেশ বিষয়ক ছবি ও কেইস, বিভিন্ন ক্যালেন্ডারে প্রকাশিত প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি, বিভিন্ন প্রকার মাটি, বিভিন্ন প্রকার বসতির ছবি, বিভিন্ন প্রকার বনাঞ্চলের ছবি, শিক্ষাসফর বা ভ্রমণকালে কয়লার টুকরা সংগ্রহ, ব্যবহৃত পানির বোতল, পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করে এমন ব্যবহৃত দ্রব্যাদি ইত্যাদি।

সংরক্ষণ: স্বল্পমূল্যের বিনামূল্যের উপকরণসমূহ সংগ্রহ ও তৈরি করার পর সেগুলো যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। সংরক্ষণের উপর নির্ভর করে উপকরণের টেকসই ব্যবহার এবং অর্থের পরিমিততা। সংগৃহীত ও তৈরিকৃত উপকরণসমূহ সংরক্ষণের কিছু কৌশল বা উপায় নিচে দেওয়া হলো-

- মানচিত্র, চার্ট, ছবি ও চিত্র ইত্যাদি দেওয়ালে টানিয়ে রাখতে হবে। প্রয়োজনে এগুলোর উপর আবরণ দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে;
- কাঠ বা টিন বা প্লাস্টিকের পাত্রে বিভিন্ন প্রকার শস্যের নমুনা ও বিভিন্ন প্রকার শিলার নমুনা সংরক্ষণ করা যায়। পাত্রের গায়ে উপকরণের নাম লিখে লেবেল লাগিয়ে রাখতে হবে;

- হার্ডবোর্ড বা অন্য কোন কার্টুনে কাঠ ও বাঁশের তৈরি মডেল সংরক্ষণ করা যায়;
- চার্ট, মানচিত্র, বিভিন্ন প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি, বিভিন্ন প্রকার গ্রাফ ইত্যাদি শ্রেণি ও বিষয়বস্তু অনুসারে আলাদাভাবে কাঠের স্ট্যান্ডে সাজিয়ে রাখা যায়;
- যেসব উপকরণ খোলা অবস্থায় রাখলে নষ্ট হওয়া বা অন্য কোন সমস্যা হয় না সেগুলো কাঠের সেলফে রাখা যায়। তবে পলিথিন বা কাগজ বা কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখা যেতে পারে;
- এ সকল উপকরণের জন্য একটি স্টক বই রাখতে হবে, যাতে সকল উপকরণের নামসহ অন্যান্য তথ্য লিখে থাকবে;
- বিষয়বস্তুর ধরন অনুযায়ী অথবা যন্ত্রপাতি ও উপকরণসমূহের নামের আদ্যক্ষরের ক্রম অনুযায়ী সাজাতে হবে যেন প্রয়োজনের সময় এখানে ওখানে খুঁজতে না হয়;
- লোহার তৈরি উপকরণগুলোতে যাতে মরিচা না পড়ে সেরকম ব্যবস্থা করতে হবে। মাঝে মাঝে ভেসলিন লাগিয়ে রাখা যায়;
- ব্যবহারের পর উপকরণসমূহ পরিষ্কার করে সংরক্ষণ করা প্রয়োজন।

৫.৩ মানচিত্র ও ভূগোলক ব্যবহারের নিয়মাবলি

ভূগোল বিষয়ের বিষয়বস্তু উপস্থাপনের জন্য অতি প্রয়োজনীয় উপকরণ হচ্ছে মানচিত্র ও ভূগোলক। মানচিত্রের সাহায্যে সমগ্র পৃথিবী বা কোনো অঞ্চল সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান লাভ করা যায় ও প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করা যায়। মানচিত্রের মাধ্যমে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রাকৃতিক বা অপ্রাকৃতিক বিষয়বস্তুর অবস্থান ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জ্ঞানদান করা যায়। মানচিত্র কেবল ভূগোলবিদ বা ভূগোল শিক্ষার্থীদের জন্য প্রয়োজন, তা নয়। এটি প্রায় সকল মানুষের বিশেষ করে পর্যটক, প্রশাসক, পরিকল্পনাবিদ, স্থপতি, প্রকৌশলী, কৃষিবিদ, আবহাওয়াবিদ এমনকি সাধারণ মানুষেরও প্রয়োজন হয়। সমগ্র পৃথিবী তথা কোন দেশ কিংবা অঞ্চল বিশেষের আকৃতি, প্রকৃতি, অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমা অনুযায়ী নির্ধারিত স্কেল মোতাবেক অঙ্কন করে অবস্থান নির্ধারণ করলে তখন তাকে মানচিত্র বলা হয়। মানচিত্রের গুরুত্ব অনুধাবনের জন্য জেমস ফেয়ার গ্রীভস এর মন্তব্য উল্লেখযোগ্য। জেমস ফেয়ার গ্রীভস বলেন, “It is probably true to say that 99% of geography can put on a map”। কিন্তু মানচিত্র উপস্থাপন যথাযথভাবে করতে না পারলে বা মানচিত্র পঠন ঠিক না হলে শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানো কার্যক্রম ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে। এজন্য মানচিত্র ও ভূগোলক ব্যবহারের নীতিমালা বা নিয়ম জানা ও সে অনুযায়ী মানচিত্র ও ভূগোলক ব্যবহার করা প্রয়োজন।

মানচিত্র

মানচিত্র হচ্ছে একটি ত্রিমাত্রিক ভূদৃশ্যের প্রতিনিধিত্বকারী সমতল পৃষ্ঠ (দ্বিমাত্রিক)। মানচিত্র বিভিন্ন তথ্য উপস্থাপনের জন্য অনেক প্রতীক ব্যবহার করে। রাস্তার প্রতিনিধিত্ব করে সরলরেখা, নীল ও সবুজ রং ভূমি এবং সমুদ্র প্রদর্শনের জন্য ব্যবহার করা হয়। উচ্চতা, দেশ এবং পরিবেশগত অঞ্চল বুঝানোর জন্যও রং ব্যবহার করা যেতে পারে। রেলওয়ে স্টেশন, গ্রাম বা শহর বুঝানোর জন্য পয়েন্ট ব্যবহার করা যেতে পারে। আবার রেখার মাধ্যমে নদী, খাল, রেললাইন, সীমানা দেখানো যেতে পারে। যে সকল প্রতীক প্রতিনিয়ত মানচিত্রে ব্যবহৃত হয় না তা দক্ষতার সাথে শিক্ষার্থীদের নিকট উপস্থাপন করতে হবে। তা না হলে শিক্ষার্থীদের প্রতীকগুলোর মধ্যে পার্থক্য করা এবং প্রতিটি প্রতীকের অর্থ বা মানে ব্যাখ্যা করতে পারবে না। এতে মানচিত্র থেকে ভুল তথ্য শেখার সুযোগ থাকবে।

যদি একটি মানচিত্র কোন রুট বা পরিবেশগত বৈশিষ্ট্য বুঝার জন্য ব্যবহার করা হয় সেক্ষেত্রে ভূভাগের উপরের বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে সঠিকভাবে সংযোগ স্থাপন করতে হবে। মানচিত্রে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সংযোগ করতে পারা অভিযোজন হিসেবে পরিচিত।

একটি মানচিত্রে বিভিন্ন অবস্থান শনাক্তকরণে কিছু ধরনের গ্রিড সিস্টেম বা সমন্বয়সাধন ব্যবহার করা হয় যা অনুভূমিক এবং উল্লম্ব রেফারেন্স ব্যবহার করে অবস্থানগুলো বর্ণনা করা যায়।

মানচিত্র তৈরি ও ব্যবহার ছাড়াও স্কেল ও দূরত্ব এরসাথে জড়িত। শিক্ষার্থীদের গাণিতিক অনুপাতের ধারণা এবং তা সঠিকভাবে মাপার ক্ষমতার উপর মানচিত্র পঠন নির্ভর করে।

মানচিত্রের বৈশিষ্ট্য

ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ের শিক্ষা উপকরণ হিসেবে মানচিত্রের বিশেষ কিছু প্রকৃতি রয়েছে। মানচিত্রের এসকল বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ করা হলো—

- পৃথিবীর ভূপ্রকৃতি সম্পর্কিত নকশাময় চিত্রই হচ্ছে মানচিত্র;
- ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন স্থানের অঙ্কিত বাস্তব প্রতিচ্ছবি হচ্ছে মানচিত্র;
- মানচিত্র ভূগোল বিষয়ের সংক্ষিপ্ত নোট;
- নির্ধারিত স্কেল অনুযায়ী অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশের ভিত্তিতে মানচিত্র অঙ্কিত হয়;
- মানচিত্রের দিক নির্দেশনা অত্যন্ত স্পষ্ট এবং সঠিক। যেমন- উপরের দিকে উত্তর, নিচের দিকে দক্ষিণ, ডানের দিকে পূর্ব এবং বামের দিকে পশ্চিম নির্দেশিত থাকে;
- মানচিত্র বাস্তবভিত্তিক হয়, এখানে কল্পনা করা বিষয়বস্তু উপস্থাপনের সুযোগ নেই।

মানচিত্রের ব্যবহার

- আপেক্ষিক এবং পরম অর্থে পৃথিবীর কিছু অবস্থান দেখানোর জন্য মানচিত্রে ব্যবহার করা হয়;
- পৃথিবী বা ভূদৃশ্যের উপাদানগুলোর মাপ ও আকার প্রদর্শন করতে মানচিত্র ব্যবহৃত হয়;
- পৃথিবী পৃষ্ঠের বিভিন্ন স্থান এবং পয়েন্টের মধ্যে দূরত্ব এবং তাদের দিক প্রকাশ করতে মানচিত্র ব্যবহার করা হয়;
- উচ্চতা এবং ঢাল বুঝানোর জন্য মানচিত্র ব্যবহার করা হয়;
- প্রাকৃতিক এবং সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের বিস্তরণ দেখানো জন্য মানচিত্র ব্যবহার করা হয়;
- অভিজ্ঞতা, পণ্য ও সেবা বিনিময়, উৎপাদন এর পরিমাণ ও কারখানার বিস্তারের পরিবর্তন প্রদর্শন করার জন্য মানচিত্র ব্যবহার করা হয়।

ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ের শিখন-শেখানো কাজে উপকরণ হিসেবে মানচিত্র ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা

- শিখন-শেখানো কাজে মানচিত্র ব্যবহার করলে তা শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর দৃষ্টিভঙ্গি ও মনের সংযোগ ঘটিয়ে বিষয়বস্তুর প্রতি আগ্রহ, মনোযোগ ও উৎসাহ বৃদ্ধি করে;
- মানচিত্রের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান দান করলে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল কিংবা স্থান ও ভূমিরূপ সম্পর্কে সঠিক ধারণা জন্মে;
- মানচিত্র ব্যবহার করে শিক্ষণ কাজ পরিচালনা করলে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা বাড়ে, বিষয়বস্তুর ধারণা স্পষ্ট হয় এবং অর্জিত জ্ঞান দীর্ঘস্থায়ী হয়;
- শিক্ষার্থীদের নিকট বিষয়বস্তুকে সহজ ও বাস্তব করে তুলতে সহায়তা করে মানচিত্র;
- মানচিত্রের ব্যবহার ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ের জ্ঞানকে পূর্ণতা দান করে এবং বিষয়বস্তুর ধারণা শিক্ষার্থীদের কাছে সুস্পষ্ট করে তোলে;
- রাজনৈতিক মানচিত্রের মাধ্যমে রাজনৈতিক ভূগোলের জ্ঞান দান করলে বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক সীমা এবং পরিবেশ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের স্পষ্ট ধারণা জন্মে;
- মানচিত্রের মাধ্যমে ভূগোল শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন দেশ বা স্থান বা অঞ্চলের মধ্যে দূরত্ব জানতে পারে এবং ভৌগোলিক অবস্থান (অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাভিত্তিক) জানতে পারে;
- মানচিত্রের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা খুব সহজেই বিভিন্ন দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পর্কে সঠিক তথ্য জানতে পারে;
- পৃথিবীর বিভিন্ন বন্দর, শহর, বাণিজ্য ও পর্যটন কেন্দ্রের অবস্থান এর ধারণা পায়;
- প্রাকৃতিক মানচিত্রের মাধ্যমে পৃথিবীর পাহাড়, পর্বত, নদ-নদী, হ্রদ, সাগর, মহাসাগর প্রভৃতির অবস্থান জানতে পারে;
- মানচিত্রের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা সারা বিশ্বের জলবায়ু এলাকা ও জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য জানতে পারে;
- মানচিত্রের মাধ্যমে ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ের বিষয়বস্তু অনেক কার্যকরভাবে শিখানো যায়।

শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক বোর্ডে মানচিত্র অঙ্কন করে শিক্ষার্থীদের পাঠকে অনেক বেশি জীবন্ত ও হৃদয়গ্রাহী করে তুলতে পারেন। শিক্ষার্থীদেরকেও মানচিত্র অঙ্কন করতে দিয়ে তাদের উৎসাহিত করা যায়। শিখন-শেখানোর একটি উপকরণ হিসেবে মানচিত্র পঠন কৌশল যে কোন শিক্ষণ প্রক্রিয়াকে তার উদ্দেশ্য অর্জনে কার্যকরভাবে সহায়তা করে।

শ্রেণিকক্ষে মানচিত্র ব্যবহারের অসুবিধা

- পৃথিবীর আকার গোলাকার কিন্তু মানচিত্র সমতল কাগজে অঙ্কিত। শিক্ষার্থীদের বিষয়টি ভালভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে। অর্থাৎ পৃথিবীর ত্রিমাত্রিক রূপ সমতল কাগজে ছবছ আঁকা সম্ভব নয়;
- মানচিত্রে বিষয়বস্তুর অবস্থান অত্যন্ত ক্ষুদ্র দেখানো হয়ে থাকে যা বাস্তবতার সাথে ছবছ মিল নেই;
- মানচিত্রে দিক নির্দেশনা স্পষ্ট করে বুঝাতে হয়। তা না হলে দিক সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা ভুল ধারণা পেতে পারে;
- মানচিত্রে ভূমিরূপ নির্দেশের জন্য যে সকল রং ব্যবহার করা হয় তা আসলে এমন নয়, তা বুঝিয়ে দিতে হবে; তা না হলে ভূমিরূপের রং সম্পর্কে ভুল ধারণা জন্ম নিতে পারে;
- শ্রেণিকক্ষে নির্ধারিত স্থানে মানচিত্র ঝুলিয়ে রেখে নির্দেশক কাঠি ব্যবহার করে পাঠদান করতে হয় তা না হলে সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে;
- মানচিত্র এবং ভূপ্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে শিক্ষকের সঠিক ও স্পষ্ট ধারণা না থাকলে সমস্যা পড়তে হয়;
- মানচিত্র অঙ্কনের সঠিক নীতিমালা অনুসরণ করতে হয়। নতুবা শিক্ষক ও শিক্ষার্থী মানচিত্র পঠন ও ব্যবহারে সমস্যা পড়তে পারে।

শ্রেণি শিক্ষণে মানচিত্র ব্যবহারের নিয়মাবলি

শ্রেণিকক্ষে মানচিত্র ব্যবহারের সময় শিক্ষকের বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। তা না করলে কতগুলো সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। মানচিত্র ব্যবহারের ক্ষেত্রে যে সকল সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে তা এবং এ সকল জটিলতা মোকাবেলার জন্য মানচিত্র ব্যবহারের নিয়মগুলো নিচে দেয়া হলো-

- মানচিত্র হচ্ছে পৃথিবী বা পৃথিবী পৃষ্ঠের কোন বিশেষ অংশের প্রতিক্রপ বা চিত্র। পৃথিবী গোলাকার কিন্তু মানচিত্র সমতলে অঙ্কিত। এ কারণে পৃথিবীর সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের মনে একটি ভুল ধারণার সৃষ্টি হতে পারে। এক্ষেত্রে শিক্ষক মানচিত্র ব্যবহারের সাথে গ্লোব ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের ভুল ধারণা দূর করতে পারেন;
- কোন দেশ বা অঞ্চলের মানচিত্র দেখানোর ফলে শিক্ষার্থীদের মনে পার্শ্ববর্তী অঞ্চল বা দেশ বা সত্যিকারের অবস্থান সম্পর্কে একটি ভুল ধারণা জন্ম নিতে পারে। যে দেশের মানচিত্র ব্যবহার করা হবে গ্লোবে সে দেশটা দেখিয়ে বিষয়টা ব্যাখ্যা করে বোঝালে শিক্ষার্থীদের ভুল ধারণা দূর হবে;
- মানচিত্রের আকার ও আয়তন অনেক সময় শিশু শিক্ষার্থীদের মনে ভুল ধারণার সৃষ্টি করে। মানচিত্রে দেশটি দেখে তাদের কাছে খুব ছোট বলে মনে হতে পারে। এক্ষেত্রে শিক্ষক শিক্ষার্থীর নিকটবর্তী বা কাছাকাছি কোন একটি ক্ষুদ্র স্থানের নকশা অঙ্কন করে দেখিয়ে দিতে পারেন যে, স্থানটি যদিও ছোট কিন্তু নকশাতে তা আরও অনেক বেশি ছোট। কাজেই এমনভাবে কোন একটি দেশের মানচিত্রও স্কেল অনুসারে ছোট হতে পারে। যার প্রকৃত অবস্থা স্কেলের মাধ্যমে বুঝা সম্ভব। এভাবে আকার ও আয়তন সম্পর্কিত ভুল ধারণা থেকে বের করে আনতে পারেন;
- মানচিত্রে দিক নির্ণয়ের ব্যাপারেও তাদের ভুল ধারণার সৃষ্টি হতে পারে। দেওয়ালে ঝুলানো মানচিত্রের উপরের দিক উত্তর, নিচের দিক দক্ষিণ, ডানের দিক পূর্ব এবং বামের দিক পশ্চিম ধরা হয়। অনেক সময় উপর ও নিচ বলতে বেশি ও কম বা উচ্চ ও নিম্ন বুঝাতে ব্যবহার করা হয়। তাই শিক্ষার্থীদের ভুল ধারণার সৃষ্টি হতে পারে। এজন্য মানচিত্র ব্যবহারের প্রথম অবস্থায় মানচিত্র দেওয়ালে ঝুলানোর আগে মেঝে অথবা বড় টেবিলের উপর মেলে ধরে দেখালে এবং দিক বুঝিয়ে দিলে এ ধরনের অসুবিধা দূর হয়। এক্ষেত্রে মানচিত্রের উপরের দিক উত্তর দিকমুখী এবং নিচের দিক দক্ষিণমুখী করে রাখলে শিক্ষার্থীর বুঝতে সুবিধা হবে;
- কোন দেশের বা অঞ্চলের মানচিত্র সে দেশ বা অঞ্চলের আয়তনের তুলনায় বেশ ছোট। কাজেই উক্ত অঞ্চল বা দেশের সকল ভৌগোলিক তথ্য একই মানচিত্রে প্রদর্শন করলে তা শিক্ষার্থীদের বোধগম্য হবে না বা বুঝতে কষ্ট হবে। এ অসুবিধা দূর করার জন্য ভৌগোলিক বিভিন্ন তথ্যের জন্য আলাদা আলাদা মানচিত্র ব্যবহার করতে হবে;
- মানচিত্র শ্রেণিকক্ষের যেখানে সেখানে ঝুলিয়ে প্রদর্শন করলে নানা রকম অসুবিধা সৃষ্টি হয়। যেমন- বোর্ডের উপর মানচিত্র ঝুলালে বোর্ডে লিখতে অসুবিধা হয়। আবার মানচিত্র ভাঁজ পড়ে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। আবার শ্রেণির শিক্ষার্থীদের দেখতে কষ্ট হয় বা দেখতে পায় না এমন স্থানে মানচিত্র টানালে মানচিত্র প্রদর্শনের আসল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে। সুতরাং মানচিত্র টানানোর জন্য শ্রেণিকক্ষে সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা থাকা উচিত। মানচিত্র এমনভাবে টানাতে হবে যাতে শ্রেণির সকল শিক্ষার্থী যথাযথভাবে দেখতে পারে;

- অনেক সময় কোন কোন শিক্ষক শ্রেণিতে কেবল আলোচ্য দেশ বা স্থানের অংশটুকু একবার দেখিয়ে বা নির্দেশ করেই কাজ শেষ করেন। শিক্ষার্থীদের মানচিত্র পঠনের জন্য প্রয়োজনীয় সময়টুকু দেন না। এ রকম করা উচিত নয়। মানচিত্র পঠন এবং আলোচ্য স্থানের সাথে নিজস্ব অভিজ্ঞতার সংযোগ ঘটিয়ে ধারণা স্পষ্ট করার জন্য প্রয়োজনীয় সময় দিতে হবে;
- কোন কোন সময় শিক্ষকের নিজের মানচিত্র সংক্রান্ত যথাযথ প্রস্তুতি না থাকার কারণে উপস্থাপনের সময় খোঁজাখুঁজি করে সময় নষ্ট করে থাকেন। এটা দেখতে শোভনীয় নয়। শিক্ষার্থীদের সামনে শিক্ষককে অপ্রস্তুত হতে হয়। এজন্য শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানোর আগে ভালভাবে নিজেকে প্রস্তুত করে নিবেন;
- হাত দিয়ে বা আঙ্গুল দিয়ে বা বা হাতের বই দিয়ে মানচিত্রের তথ্য নির্দেশ করা উচিত নয়। এর ফলে মানচিত্র খুব সহজেই ময়লা বা নোংরা হয় এবং অকেজো হয়ে যায়। আবার নির্দেশনাও নির্দিষ্ট হয় না। ভুল নির্দেশনার কারণে শিক্ষার্থীদের মনে ভুল ধারণা জন্মাতে পারে। মানচিত্র বা বোর্ড নির্দেশক কাঠি ব্যবহার করতে হবে। এক থেকে দেড় ফুট লম্বা সরু মসৃণ কাঠিও ব্যবহার করা যায়;
- দেয়াল মানচিত্র ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোন কিছু নির্দেশ করার জন্য শিক্ষার্থীদের মানচিত্রের কাছে এনে সুযোগ করে দেওয়া উচিত। দেয়াল মানচিত্রের সাথে পাঠ্য পুস্তকের মানচিত্রের সম্পর্ক স্থাপন জরুরি। এতে মানচিত্রের তথ্য এবং পাঠ্য বিষয়বস্তুর ধারণা ক্রমেই সুস্পষ্ট হবে;
- ভুলভাবে তৈরি মানচিত্র শিক্ষার্থীদের ভুল ধারণা সরবরাহ করে। শ্রেণিকক্ষে সঠিক ও নির্ভুল মানচিত্র ব্যবহার করতে হবে;
- যে বিষয়বস্তুর জন্য মানচিত্র ব্যবহার করা হবে। মানচিত্রের শিরোনামে তা থাকতে হবে;
- মানচিত্রে ব্যবহৃত তথ্য যথাযথ ও প্রাসঙ্গিক হতে হবে;
- সুনির্দিষ্ট স্কেল অনুসারে মানচিত্র অঙ্কন করতে হবে;
- যথাযথ ও নির্ভুলভাবে বিন্যস্ত অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমা রেখা অঙ্কিত মানচিত্র ব্যবহার করতে হবে।

ভূগোলক

বাস্তব পৃথিবীর একটি ক্ষুদ্রাকৃতি উপস্থাপনা হলো ভূগোলক। ভূগোল শিক্ষকের জন্য ভূগোলক একটি অতি প্রয়োজনীয় উপকরণ। এটি ব্যবহার ব্যতীত পৃথিবীর আকার বুঝানো কঠিন। ভূগোলক ব্যবহারের মাধ্যমে পৃথিবীর অক্ষ, উত্তর ও দক্ষিণ মেরু, নিরক্ষরেখা, অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমা রেখার গ্রিড এবং উভয়ের ছেদ বিন্দুর মাধ্যমে পৃথিবীর যে কোন স্থান শনাক্তকরণে সহায়তা করে। ভূগোলকের সাহায্যে যে কেউ কোন অবস্থানের সঠিক ধারণা পেতে পারে। মহাদেশ ও মহাসাগরের অবস্থান ও আকৃতি সম্পর্কে ধারণা পেতে পারে। পৃথিবীর আবর্তন ও ঘূর্ণনের কারণে দিবা-রাত্রি সংঘটন ও ঋতু পরিবর্তন সম্পর্কে ভূগোলক ধারণা দেয়। নিরক্ষরেখা কীভাবে পৃথিবীকে দুইটি গোলার্ধে ভাগ করেছে তা ভূগোলক দেখে সহজেই বোঝা যায়।

সমগ্র পৃথিবীর একটি ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি হচ্ছে ভূগোলক। ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ের দর্শনমূলক ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি উপকরণ হলো ভূগোলক। পৃথিবীর নির্ধারিত স্থান বা ভূপ্রকৃতি চিহ্নিতকরণে ভূগোলকের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। সারা পৃথিবীর সাগর, মহাসাগর, নদী, হ্রদ, পাহাড়, সমভূমি, মালভূমি, বনভূমি, দেশ, মহাদেশ ইত্যাদি বিষয় সম্বলিত গোলাকার বিশ্বের প্রতিকৃতিস্বরূপ গোলককে ভূগোলক বলা হয়।

ভূগোলকের সহায়তায় শিক্ষণ কাজ পরিচালনা করলে শিক্ষার্থীরা বাস্তব তথ্যের সাথে মিল খুঁজে পায়। কাজেই ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ের বিষয়বস্তু উপস্থাপনে বিষয়বস্তুর চাহিদা অনুযায়ী ভূগোলক ব্যবহার করা অত্যন্ত প্রয়োজন।

ভূগোলকের বৈশিষ্ট্য

ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ের শিক্ষা উপকরণ হিসেবে ভূগোলকের রয়েছে কতগুলো বিশেষ বৈশিষ্ট্য যার মাধ্যমে ভূগোলক অন্যান্য উপকরণ থেকে পৃথক তা বুঝা যায়। ভূগোলকের বৈশিষ্ট্যগুলো নিচে উল্লেখ করা হলো-

- ভূগোলক সারা পৃথিবীর একটি অত্যন্ত ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি;
- ভূগোলকের একটি চাকতিযুক্ত স্ট্যান্ড থাকে;
- স্ট্যান্ডের সাথে ভূগোলকটিকে খুব সহজেই ঘুরানো যায়;
- ভূগোলকের ভিতরের অংশ ফাঁপা এবং বায়বীয় থাকে। বাইরের দিকে লেমিনেটিং করা কাগজ বা প্লাস্টিক থাকে;
- ভূগোলকের পৃষ্ঠ দিকে বা উপরের দিকে বিভিন্ন দেশ, মহাদেশ চিহ্নিত করতে বিভিন্ন প্রকার রং ব্যবহার করা হয়;
- ভূগোলকে সাগর, মহাসাগর, নদী-হ্রদ, পাহাড়, সমভূমি, মালভূমি, বনভূমি, দেশ, মহাদেশ ইত্যাদি বিষয় খুব স্পষ্ট করে উপস্থাপন করা হয়।

ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ের শিখন-শেখানো কার্যক্রমে ভূগোলক ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা

- ভূগোলকের মাধ্যমে অতি সহজেই পৃথিবীর আকৃতি, দ্রাঘিমা, অক্ষাংশ, অক্ষরেখা, দ্রাঘিমা রেখা, আফ্রিক গতি, বার্ষিক গতি ও তার ফলাফল খুব ভালভাবে ব্যাখ্যা করা যায়;
- ভূগোলকের সাহায্যে শিক্ষার্থীদের শিখন দীর্ঘস্থায়ী হয়;
- ভূগোলকের সাহায্যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ও মহাদেশ এবং এদের ভূপ্রকৃতি সম্পর্কে ফলপ্রসূভাবে জ্ঞান, ধারণা ও তথ্য প্রদান করা যায়;
- ঋতু পরিবর্তন, দিন-রাত্রি সংঘটিত হওয়ার কারণ, বিভিন্ন দেশের আবহাওয়া ও জলবায়ুর ভিন্নতা এবং প্রধান প্রধান শহর, বন্দর, বাণিজ্য কেন্দ্র ও রাজধানী শহর প্রদর্শনের জন্য ভূগোলক এক অনন্য উপকরণ;
- পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের সময়ের তারতম্য ও তার কারণ খুব সহজেই ভূগোলকের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায়;
- ভূগোলক পৃথিবীর বাস্তব এবং ক্ষুদ্রতম প্রতিবিন্দু বিধায় খুব সহজেই এর মাধ্যমে পৃথিবীর আকার সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দেওয়া যায়;
- ভূগোলকের সাহায্যে খুব সহজেই পৃথিবীর মহাদেশ, সাগর, মহাসাগর, বন্দর, সমুদ্র পথ প্রদর্শন করা যায়;
- আঞ্চলিক ভূগোলের বিষয়বস্তু উপস্থাপনের জন্য মানচিত্রের পরিপূরক হিসেবে ভূগোলক ব্যবহার করা যায়;
- মহাদেশ ও মহাসাগরগুলোর অবস্থান, পরস্পরের মধ্যে অবস্থানগত সম্পর্ক, পৃথিবীর একস্থান থেকে অন্যস্থানের দিক নির্ণয় ও দূরত্ব ভূগোলকের সাহায্যে বোঝানো যায়।

শ্রেণিকক্ষে ভূগোলক ব্যবহারের অসুবিধা

- ভূগোলকের সাহায্যে পৃথিবীর জনসংখ্যার বণ্টন-বিন্যাস দেখানো যায় না এবং শিল্প-কারখানার বিস্তৃতি প্রদর্শন কঠিন হয়ে পড়ে;
- ভূগোলক সংরক্ষণ করা অনেক সময় অসুবিধাজনক হয়;
- পদ্ধতি ও কৌশল আয়ত্রে না থাকলে ভূগোলক দিয়ে ভূগোল বিষয়ের পরিপূর্ণ জ্ঞান দান করা সম্ভব হয় না;
- শ্রেণিকক্ষে ভূগোলক প্রদর্শনের ফলে কোন কোন সময় বিষয়বস্তুর বর্ণনা গৌণ হয়ে যেতে পারে এবং শিক্ষার্থীরা ভূগোলকের দিকে অধিকতর মনোযোগী হয়ে যেতে পারে।

শ্রেণি শিক্ষণে ভূগোলক ব্যবহারের নিয়মাবলি

ভূগোলক ব্যবহার করার সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিবেচনা করা প্রয়োজন-

- মানচিত্রের মতো ভূগোলক রাজনৈতিক বিভাগ, প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য, ভূদৃশ্য এবং পরিবেশগত বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করতে পারে। কাজেই শিক্ষার্থীদেরকে ভূগোলকে ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রতীক (যেমন- রং ও লাইন) ব্যবহারের সাথে পরিচিত করানো দরকার;
- কিছু ক্ষেত্রে বন্ধুরতা ব্যবহার করে ভূগোলকের পৃষ্ঠকে পর্বতমালা এবং নিম্নভূমির মডেল করা যেতে পারে। পরিবেশগত মানচিত্রের মতো একই রকম সুবিধা পাওয়া যেতে পারে। কাজেই শিক্ষার্থীদেরকে ভূমির বন্ধুরতা প্রদর্শনের সময় প্রতীকসমূহের ব্যাখ্যা প্রদান করা ও বন্ধুরতার প্রতীক ব্যবহারের সাথে পরিচিত করানো দরকার;
- সঠিক ও নির্ভুলভাবে অঙ্কিত ভূগোলক ব্যবহার করতে হবে;
- অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমা রেখা সুস্পষ্টভাবে নির্দেশিত থাকতে হবে;
- যথাযথ আকার ও আকৃতির ভূগোলক ব্যবহার করতে হবে। সাধারণত ১ইঞ্চি = ৫০০ মাইল স্কেলের ভূগোলক ব্যবহার করা হয়;
- কোন ধাতব পদার্থ দিয়ে তৈরি স্ট্যান্ডে ভূগোলক স্থাপন করা ভালো;
- স্ট্যান্ডের সাথে ভূগোলটি এমনভাবে স্থাপিত থাকবে যাতে সঠিক কৌণিক অবস্থানের ধারণা শিক্ষার্থীরা পায়;
- ভূগোলকে নির্দেশিত সকল তথ্য ও বৈশিষ্ট্য সঠিক ও সুস্পষ্ট হতে হবে।

৫.৪ মাধ্যমিক স্তরের ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ের ডিজিটাল কন্টেন্ট প্রণয়ন ও ব্যবহার

ডিজিটাল যুগে শিক্ষায় প্রযুক্তির ব্যবহার বিগত কয়েক বছরে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশকে একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার উপযোগী করে গড়ে তোলার জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন শিক্ষায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার। শিক্ষায় তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারের গুরুত্ব অনুধাবনের জন্য ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দের বিশ্ব সাক্ষরতা দিবসের শ্লোগান উল্লেখ করা যায়। ‘সাক্ষরতা অর্জন করি ডিজিটাল বিশ্ব গড়ি’- এ শ্লোগানকে সামনে রেখে পালিত হচ্ছে এবারের সাক্ষরতা দিবস। সাক্ষরতার সংজ্ঞা, পরিধি ও ব্যাপকতাও দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। একবিংশ শতাব্দীতে সাক্ষরতার ক্ষেত্রে পড়তে পারা, লিখতে পারে ও হিসাব-নিকাশের সাথে যোগাযোগ দক্ষতা, ক্ষমতায়নের দক্ষতাসহ যোগ হয়েছে আরও নানারকম দক্ষতা। ডিজিটাল বিশ্ব গড়তে হলে কাজটি শুরু করতে হবে শিক্ষার্থীদের শিখন-শেখানো কার্যক্রমের মাধ্যমে। ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ের অনেক ধারণা রয়েছে যা শিক্ষার্থীদের নিকট স্পষ্ট করার জন্য তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একসময় শিক্ষায় প্রযুক্তির ব্যবহারের কথা আসলেই যে চিন্তা মাথায় আসতো তা হলো পরীক্ষার ফলাফল প্রণয়ন, প্রশাসনিক কাজ, ভর্তি প্রক্রিয়া, বিভিন্ন প্রকার ফরম পূরণ, শিক্ষার্থীদের কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ে শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা ইত্যাদি। কিন্তু বর্তমান সময়ে শিখন-শেখানো কার্যক্রমে তথ্য প্রযুক্তির নানাবিধ ব্যবহার রয়েছে। যার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ডিজিটাল কন্টেন্ট প্রণয়ন ও তার ব্যবহার। ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ে তথ্যের গতিশীলতা রয়েছে। প্রতিনিয়ত নতুন ধারণার সংযোগ ঘটছে। পুরাতন ধারণাসমূহ শিক্ষার্থীদের নিকট আরো বোধগম্য করার প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। এ সকল প্রয়োজন মেটানোর জন্য ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ে ডিজিটাল কন্টেন্ট প্রণয়ন ও ব্যবহার এখন সময়ের দাবী।

ডিজিটাল কন্টেন্ট এর ধারণা

ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ে ডিজিটাল কন্টেন্ট ব্যবহারের প্রারম্ভে জানা উচিত আসলে ডিজিটাল কন্টেন্ট কী?

“Digital content is any content that exists in the form of digital data. Also known as digital media, digital content is stored on digital or analog storage in specific formats. Forms of digital content include information that is digitally broadcast, streamed, or contained in computer files. Viewed narrowly, digital content includes popular media types, while a broader approach considers any type of digital information (e. g. digitally updated weather forecasts, GPS maps, and so on) as digital content.”-উইকিপিডিয়া।

অন্যভাবে বলা যায়, ডিজিটাল কন্টেন্ট ডিজিটাল মিডিয়া হিসেবেও পরিচিত। সাধারণভাবে ডিজিটাল কন্টেন্ট এর অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে, টেক্সট, অডিও, ভিডিও, ইমেজ, গ্রাফিক্স, এনিমেশন, ইনফোগ্রাফিস, লাইভ ভিডিও, ইবুক, কমিক/ কার্টুন, মানচিত্র ইত্যাদি।

নানারকম ডিজিটাল কন্টেন্ট রয়েছে। কিছু ডিজিটাল কন্টেন্ট আছে যা ক্রয় করতে হয়। আবার কিছু আছে যা ফ্রি পাওয়া যায়। কিছু ডিজিটাল কন্টেন্ট আছে অন্যের তৈরি, আবার কিছু ডিজিটাল কন্টেন্ট আছে ব্যবহারকারী কর্তৃক নির্মিত বা তৈরিকৃত।

ডিজিটাল কন্টেন্ট ব্যবহারের সুবিধা

ডিজিটাল কন্টেন্ট ব্যবহারের ফলে শ্রেণি কার্যক্রমে যে সকল সুবিধা হয় তা নিম্নরূপ-

- বিষয়ের সাথে সংগতিপূর্ণ উপকরণ ও সময়মত তা প্রাপ্তি নিশ্চিত করে যা শিখন-শেখানো কার্যক্রমকে উন্নত করে;
- ডিজিটাল কন্টেন্ট ব্যবহারের মাধ্যমে বর্তমানের সাথে খাপ খাওয়াতে পারে এবং বিশ্বসমাজের উপযোগী করে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী তৈরিতে সহায়ক;
- ডিজিটাল কন্টেন্ট শিখনকে আকর্ষণীয় ও সহজ করে তোলে;
- শিক্ষার্থীদের প্রেষণা বৃদ্ধি করে;
- ডিজিটাল কন্টেন্টের যথাযথ ব্যবহার শিক্ষার্থীদের পাঠে অংশগ্রহণ বাড়ায়;
- শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ের মৌলিক দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করে।

শ্রেণিকক্ষে আইসিটি তথা ডিজিটাল কন্টেন্ট ব্যবহারের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল সমন্বিতকরণ

শ্রেণিতে শিখন-শেখানো কার্যক্রমে যেকোনো বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের জানা থেকে অজানা, সহজ থেকে কঠিন, মূর্ত থেকে বিমূর্ত, দেখা থেকে অদেখা বিষয়ের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে হয়। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে শ্রেণি শিক্ষণে শিক্ষকগণ এ বিষয়গুলো অনেক সময় তেমন গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেন না। যে কোনো বিষয়বস্তুসম্পর্কে শিক্ষার্থীদের পূর্ব অভিজ্ঞতা যাচাই অত্যন্ত জরুরি। যদি কোনো বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের নিকটসম্পূর্ণরূপে নতুন হয় সে বিষয়বস্তু শুরু করার পূর্বে এ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের কল্প ধারণা রয়েছে তা যাচাইকরে নেওয়া প্রয়োজন। আবার পূর্ববর্তী পাঠের সাথে বর্তমান পাঠের যোগসূত্র স্থাপনের জন্য শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান বা পূর্বধারণা যাচাই করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে আইসিটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। যেমন- শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের জন্য পাঠ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ছবি সম্বলিত বা ছোট একটি ভিডিও চিত্র সম্বলিত স্লাইড প্রদর্শনের পর শিক্ষার্থীরা কী দেখতে পাচ্ছে তা তাদের দ্বারা চিহ্নিত করা যায়। চিহ্নিত বিষয়গুলো দিয়ে শিক্ষার্থীদের দ্বারাবোর্ডে মাইন্ড ম্যাপ এবং এককভাবে শিক্ষার্থীদের নোট খাতায় তালিকা বা টেবিল তৈরি করতে বলা যায় বা বিষয়টি সম্পর্কে একটি ধারণা লিপিবদ্ধ করতে বলা যায়। বিষয়বস্তু সংশ্লিষ্ট ধারণা এভাবে শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে বেরকরে আনা যায়। বিষয়সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মানচিত্র স্লাইডে পাশাপাশি প্রদর্শনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের একক বা জোড়ায় কাজ বা দলগত কাজের মাধ্যমে ভূগোলার একাধিক ধারণার মধ্যে তুলনা করা যায় এবং বিভিন্ন তথ্য শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে শনাক্ত করানো যায়। স্লাইডে প্রদর্শিত ছবি বা মানচিত্র বা গ্রাফের বিভিন্ন দিক আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের অনুসন্ধিৎসু করা যায় এবং অনুরূপভাবে শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করা যায়।

বাংলাদেশে শিখন-শেখানো কার্যক্রমে ডিজিটাল কন্টেন্ট

কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তি বিষয় ছাড়া অন্যান্য বিষয়ের শিখন-শেখানো কার্যক্রমে ডিজিটাল কন্টেন্ট এর ব্যবহার খুব পুরানো নয়। ২০১০ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে এবং কোন কোন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে প্রজেক্টরে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনে কিছু টেক্সট দেখানো ছাড়া অন্য মিডিয়াগুলোর (ছবি, অডিও, ভিডিও, এনিমেশন) ব্যবহার খুব একটা চোখে পড়েনি। মাল্টিমিডিয়ার ব্যবহার পরিণত হয় কেবল একটি মিডিয়া তথা টেক্সট উপস্থাপনের মাধ্যম। ২০১০ খ্রিষ্টাব্দের জুন মাসের পর থেকে বাংলাদেশে মাল্টিমিডিয়ার যথাযথ ব্যবহার শুরু হয়। অর্থাৎ বিভিন্ন মিডিয়াকে সমন্বিত করে মাল্টিমিডিয়াতে উপস্থাপন করা আরম্ভ হয়। এক্ষেত্রে একজন শিক্ষক কেবল বক্তৃতার মাধ্যমে পাঠ উপস্থাপন না করে শিখনীয় বিষয়বস্তুকে সকল শিক্ষার্থীর নিকট আকর্ষণীয়, কার্যকর, ফলপ্রসূ ও বোধগম্য করার জন্য বিষয়জ্ঞান, প্রযুক্তি ও শিক্ষাবিজ্ঞানের সমন্বয় করে পাঠ উপস্থাপন করবেন। এ উপস্থাপনায় অন্তর্ভুক্ত থাকবে টেক্সট, ছবি, বিভিন্ন প্রকার চিত্র, মানচিত্র, এনিমেশন, গ্রাফ, চার্ট, ভূগোলক এর ত্রিমাত্রিক উপস্থাপন, ভিডিও ইত্যাদি। যা উপস্থাপিত হবে কম্পিউটার ও মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরের মাধ্যমে। যাতে অন্তর্ভুক্ত থাকবে শিক্ষার্থী, বিষয়বস্তু ও প্রেক্ষিত বিবেচনাপ্রসূত শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশলের ব্যবহার। এক্ষেত্রে প্রেজেন্টেশন সফটওয়্যার হিসেবে ব্যবহার করা হয় মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্ট। শিক্ষক এসকল মিডিয়া প্রাথমিক সূত্র তথা নিজে তৈরি করতে পারেন অথবা প্রয়োজনে অন্য কোন ওয়েবসাইট বা ওয়েববেজড উপকরণের সহায়তা নিতে পারেন। এভাবে শিক্ষকের মাধ্যমে শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুকে চাহিদা মোতাবেক শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল ব্যবহার করে মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরের মাধ্যমে উপস্থাপনকেই বলা হচ্ছে শিক্ষক নির্মিত ডিজিটাল কন্টেন্ট। এখানে উল্লেখ্য যে, কোন অবস্থাতেই শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনায় শিক্ষকের বিকল্প হিসেবে অন্য কোন ব্যক্তির কণ্ঠস্বরকে ব্যবহার করা যাবে না।

ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ে শিক্ষক কর্তৃক ডিজিটাল কন্টেন্ট তৈরি

শিক্ষাবিজ্ঞানের নিয়মানুযায়ী পাঠপরিকল্পনার সোপান ও ছক মোতাবেক শিক্ষককে ডিজিটাল কন্টেন্ট প্রণয়ন করতে হয়। যাতে অন্তর্ভুক্ত থাকবে শিক্ষার্থীর সক্রিয় অংশগ্রহণ উপযোগী কাজ, বোর্ডের ব্যবহার প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বাস্তব উপকরণ ব্যবহার, শিক্ষার্থীদের প্রশ্নকরণ, শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশলের ব্যবহার, শিক্ষার্থীর শিখন যাচাইয়ের বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশল ব্যবহারের সুযোগ। কন্টেন্ট তৈরির পূর্বেই শিক্ষক একটি পরিকল্পনা তৈরি করবেন। পরিকল্পনা প্রণয়নে যে বিষয়গুলোর প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয় তা হলো- পাঠের শিখনফল কী হবে, শিক্ষক কীভাবে পাঠ শুরু করবেন, উপস্থাপনে কী ধরনের ইমেজ, ভিডিও ও এনিমেশন ব্যবহার করবেন, কখন ও কীভাবে শিক্ষার্থীদের শ্রেণির কাজে অংশগ্রহণ করাবেন, কীভাবে শিখন যাচাই করবেন, বাস্তবভিত্তিক বাড়ির কাজ দেবেন এবং সর্বোপরি খেয়াল রাখবেন যাতে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটানো যায়। ডিজিটাল কন্টেন্ট তৈরির ক্ষেত্রে নিম্নের বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হবে-

- ছবি/ভিডিও অবশ্যই বিষয় সংশ্লিষ্ট হবে এবং শিখনফলের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে;
- ছবি/ভিডিওতে শিক্ষার্থীদের জীবন-ঘনিষ্ঠ বিষয় উপস্থাপিত হবে;

- আমাদের দেশীয় ছবি/ভিডিও হতে হবে। তবে একান্ত দেশীয় ছবি পাওয়া না গেলে আমাদের সংস্কৃতির সাথে মোটামুটি মানানসই এমন বিদেশি ছবি নেওয়া যেতে পারে;
- আমাদের সামাজিক মূল্যবোধ, রীতি-নীতি, ধর্মীয়, রাজনৈতিক চেতনার পরিপন্থী নয় এমন ছবি ও ভিডিও ব্যবহার করতে হবে;
- টেক্সট, ইমেজ, ভিডিও ইত্যাদি শিক্ষার্থীদের বয়স উপযোগী হবে;
- বিভিন্ন মিডিয়া অর্থাৎ ইমেজ, ভিডিও, গেইম ইত্যাদি শিক্ষার্থীদের অনুসন্ধিৎসু করার মতো হতে হবে;
- ডিজিটাল কন্টেন্ট এর সকল উপাদান হবে রাষ্ট্রীয় আদর্শ, মূলনীতি এবং বিভিন্ন নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ;
- স্লাইডের ব্যাকগ্রাউন্ড সাদা/হালকা রঙের রাখা ভাল;
- টেক্সট-এর রঙ কালো/গাঢ় নীল রঙের হলে ভাল;
- পেছনের বেধের শিক্ষার্থীরাও যাতে দেখতে পারে এরকম ফন্ট সাইজ নিতে হবে (৩৬+);
- ব্যাকগ্রাউন্ড, ছবি, টেক্সট-এর রঙের মধ্যে সামঞ্জস্য রাখতে হবে;
- অহেতুক চাকচিক্য পরিহার করতে হবে;
- অপ্রয়োজনীয় অ্যানিমেশন ব্যবহার না করাই ভাল;
- একটা স্লাইডে ৬ লাইনের বেশি ব্যবহার করা উচিত নয়;
- অপ্রয়োজনীয় ভিডিও/ছবি ব্যবহার করা উচিত নয়।

টেকসই ডিজিটাল কন্টেন্ট তৈরির শর্তসমূহ

- বিষয়বস্তু ও শিক্ষার্থীদের চাহিদা অনুযায়ী কন্টেন্ট তৈরি করতে হবে;
- কন্টেন্ট এমনভাবে তৈরি করতে হবে যাতে প্রয়োজন মত পরিবর্তন করা যায়;
- বারবার ব্যবহার করার সুযোগ থাকতে হবে;
- কন্টেন্ট তৈরির ক্ষেত্রে সময়ের সঠিক ব্যবহারের প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে;
- শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক পরিবেশ সৃষ্টির উপযোগী করে কন্টেন্ট তৈরি করতে হবে;
- আকর্ষণীয় ও কার্যকর শিখন সহায়ক কন্টেন্ট তৈরি করতে হবে;
- কঠিন বিষয়বস্তু সহজভাবে উপস্থাপনার মাধ্যমে কন্টেন্ট তৈরি করতে হবে।

ডিজিটাল কন্টেন্টের মান যাচাই

ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ের ডিজিটাল কন্টেন্ট কতটা মানসম্পন্ন ও ব্যবহার উপযোগী হয়েছে তা যাচাই করা যায় নিম্নের চেকলিস্ট ব্যবহার করে-

- মূল পাঠের সাথে কন্টেন্টের সামঞ্জস্যপূর্ণতা রয়েছে কিনা?
- ব্যবহৃত উপাদান ও তথ্য ভূগোল বিষয়ের সাথে প্রাসঙ্গিক কিনা?
- উদ্দীপনা সৃষ্টিকারী উপাদান (ছবি, ভিডিও, আওয়াজ, বাক্য) ছিল কিনা?
- ছবি/ভিডিও/তথ্য স্পষ্ট কিনা?
- ছবি ও ভিডিও দেশীয় প্রেক্ষাপটের ছিল কিনা?
- ব্যবহৃত ছবি বা ভিডিও ভূগোলের বিষয়বস্তুর স্পষ্টতা প্রকাশে সহায়তা করে কিনা?
- ব্যবহৃত ছবিতে ক্যাপশন দেওয়া হয়েছে কিনা?
- নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্টিকারী কোন ছবি/ভিডিও/তথ্য আছে কিনা?
- রচনামূলক টেক্সট আছে কিনা? (খুব বেশি থাকবে না)
- ফন্টসাইজ (৩৬-৪০) ও কালার কম্বিনেশন সঠিক কিনা?
- ব্যবহৃত উপাদানসমূহ চিস্তনে সহায়ক কিনা?
- দলগত কাজের জন্য চিন্তামূলক কর্মপত্র ব্যবহৃত হয়েছে কিনা?

হ্যাঁ

না

- অন্যান্য সহায়ক উপকরণ (চক-বোর্ড, পোস্টার পেপার ইত্যাদি) ব্যবহারের সুযোগ আছে কিনা?
- ধারাবাহিকতা বজায় আছে কিনা?
- কন্টেন্ট ব্যবহারের ক্ষেত্রে শিক্ষকের নেতৃত্ব ও ব্যক্তিত্ব বজায় থাকবে কিনা?
- শিখনফল অর্জিতব্য কিনা?
- প্রয়োজনীয় মানচিত্র ও ভূগোলক ব্যবহার করা হয়েছে কিনা?
- ব্যবহৃত মানচিত্র বা ভূগোলক বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যাকরণের জন্য যথাযথ কিনা?

ডিজিটাল কন্টেন্ট পরিকল্পনা

নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করে ডিজিটাল কন্টেন্ট এর পাঠপরিকল্পনা প্রণয়ন করা যেতে পারে-

ডিজিটাল কন্টেন্ট প্রণয়নের ধাপ	
স্লাইডনং	করণীয়
০১	শুভেচ্ছা/স্বাগতম (ফুল বা পাঠসংশ্লিষ্ট ছবি দেওয়া যেতে পারে)
০২	পরিচিতি কথাটি থাকবে না। তবে নিজের নাম/ নিজ ছবি, প্রতিষ্ঠান, পদবী, মোবাইল নং, ই-মেইল ঠিকানা ইত্যাদি থাকবে।
০৩	পাঠ/বিষয় পরিচিতি কথাটি লেখার দরকার নেই। এখানে থাকবে শ্রেণি, বিষয়, অধ্যায়, সময়, পিরিয়ড, তারিখ ইত্যাদি।
০৪	মানসিক পরিবেশ তৈরি/পাঠ শিরোনাম ঘোষণার জন্য ছবি/ভিডিও দেখিয়ে বা প্রশ্ন করে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে পাঠের বিষয়বস্তুর ধারণা পাওয়া।
০৫	পাঠ ঘোষণা কথাটি লেখার দরকার নেই। এখানে পাঠের শিরোনাম লিখে আন্ডারলাইন করতে হবে। যেমন: আবহাওয়া ও জলবায়ু বোর্ডেও পাঠ শিরোনামটি লিখে দিতে হবে এবং ছাত্র-ছাত্রীদের খাতায় লিখে নিতে বলতে হবে।
০৬	শিখনফল: এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা- (বি. দ্র. জ্ঞান, অনুধাবন, প্রয়োগ এবং উচ্চতর চিন্তন দক্ষতামূলক শিখনফল লিখতে যাতে করে পাঠ শেষে সৃজনশীল প্রশ্ন তৈরি করতে সুবিধা হয়)। যেমন- এ পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা - ...বলতে পারবে। ...শনাক্ত করতে পারবে। ...তুলনা করতে পারবে। ...আঁকতে পারবে ইত্যাদি।
০৭	উপস্থাপন (কথাটি লেখার দরকার নেই) ১নং শিখনফলের আলোকে ছাত্র-ছাত্রীদের তথ্য বা কু দিয়ে সাহায্য করা যাতে করে তারা চিন্তা করে পরবর্তী কাজ করতে পারে। পাঠসংশ্লিষ্ট কোনো ছবি/মানচিত্র/ গ্রাফ/ভূগোলক/ভিডিও/তথ্য দিয়ে শিক্ষক পরবর্তী কাজ করার জন্য শিক্ষার্থীদের thought Provoking করে তুলবেন। শিক্ষার্থীদের কাছে বিষয়বস্তু বোধগম্য করে তোলার জন্য একাধিক স্লাইডও তৈরি করা যেতে পারে।
০৮	একক কাজ বা শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক অন্য কোন কৌশলের প্রয়োগ ...কী? ... সংজ্ঞা দিন। ...উল্লেখ করুন। ...কীভাবে হয়? (বি.দ্র. একক কাজ হিসেবে একটি বা সর্বোচ্চ দুটি কাজ দেওয়া যেতে পারে যাতে করে শিক্ষার্থীরা নিজে নিজে চিন্তা করে পূর্বের কু অনুযায়ী লিখতে পারে, এক কথায় উত্তর আসবে এমন প্রশ্ন দেয়া যাবে না। একক কাজে শিক্ষার্থীদের চিন্তার সুযোগ থাকতে হবে)।
০৯	২য় শিখনফল অর্জন করার জন্য কথাটি লেখার দরকার নেই। ২নং শিখনফলের আলোকে শিক্ষার্থীদের তথ্য বা কু দিয়ে সাহায্য করা যাতে করে তারা চিন্তা করে পরবর্তী কাজ করতে পারে। কু দেয়ার জন্য পাঠসংশ্লিষ্ট কোনো ছবি/মানচিত্র/গ্রাফ/ভূগোলক/ভিডিও/তথ্য দিয়ে শিক্ষক পরবর্তী কাজ করার জন্য শিক্ষার্থীদের thought Provoking করে তুলবেন। শিক্ষার্থীদের কাছে বোধগম্য করে তুলবার জন্য একাধিক স্লাইডও তৈরি করা যাবে।

ডিজিটাল কন্টেন্ট প্রণয়নের ধাপ	
স্লাইডনং	করণীয়
১০	জোড়াকাজ বা শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক অন্য কোন কৌশলের ব্যবহার ...ব্যাখ্যা করুন। ... পার্থক্য নির্ণয় করুন। ...কেন? ...সমাধান করুন (ছোট সমস্যার সমাধান)। (বি. দ্র. জোড়াকাজ হিসেবে একটি বা সর্বোচ্চ দুটি কাজ দিন যাতে করে প্রশিক্ষণার্থী চিন্তা করে পূর্বের ক্ল অনুযায়ী লিখতে পারে। তবে তা অবশ্যই একক কাজ থেকে আরেকটু গভীর হবে)।
১১	(৩য়, ৪র্থ শিখনফল অর্জন করার জন্য) ৩ এবং ৪ নং শিখনফলের আলোকে ছাত্র-ছাত্রীদের তথ্য বা ক্ল দিয়ে সাহায্য করা যাতে করে তারা চিন্তা করে পরবর্তী কাজ করতে পারে। ক্ল দেয়ার জন্য পাঠসংশ্লিষ্ট কোনো ছবি/মানচিত্র/ গ্রাফ/ ভূগোলক/ভিডিও/তথ্যদিয়ে শিক্ষক পরবর্তী কাজ করার জন্য শিক্ষার্থীদের thought Provoking করে তুলবেন। শিক্ষার্থীদের কাছে বিষয়বস্তু বোধগম্য করে তোলার জন্য একাধিক স্লাইডও তৈরি করা যাবে।
১২	দলগতকাজ বা অন্য যেকোন শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক কৌশলের ব্যবহার (বিষয়বস্তুর চাহিদা অনুযায়ী) ... যুক্তি সহকারে বুঝিয়েলিখুন। ...রূপরেখা প্রণয়ন করুন। ...চিত্র অঙ্কন করে বুঝিয়ে দিন। ... তালিকা তৈরি করুন। ... পরিকল্পনা প্রণয়ন করুন।
১৩	মূল্যায়ন জ্ঞানমূলক, সমকেন্দ্রিক, কেন্দ্রচ্যুতি ও মূল্যায়নমূলক প্রশ্ন। এখানে উল্লেখ্য যে, প্রতিটি শিখনফলের আলোকে কাজ করানোর সময় গঠনমূলক শিখন যাচাই করতে হবে।
১৪	বাড়ির কাজ উচ্চতর চিন্তনধর্মী কিস্তি স্বল্প সময়ে যাতে করতে পারে এমন কাজ।
১৫	ধন্যবাদ ফুলের বা উদ্দীপনামূলক কোন ছবি দেওয়া যেতে পারে।

ডিজিটাল কন্টেন্ট প্রণয়নে অনুশীলনমূলক কাজ ও দক্ষতা

ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ের ডিজিটাল কন্টেন্ট প্রণয়নের জন্য প্রথমত প্রয়োজন একটি পাঠপরিকল্পনা প্রণয়ন। যা পূর্বের উদাহরণে দেখানো হয়েছে। মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনে ডিজিটাল কন্টেন্ট প্রণয়ন করার জন্য প্রধানত যে বিষয়গুলো অনুশীলন প্রয়োজন তা হচ্ছে- নতুন ফোল্ডার ও ফাইল খোলা, পাওয়ার পয়েন্ট উইন্ডো ও মেন্যুসমূহ ব্যবহার, অত্র কী-বোর্ড ব্যবহার, টেক্সট লেখা, রং করা, ছোট ও বড় করা, টেক্সট লেখার পর তা সেভ করা, সেভকৃত ফাইল পুনরায় চালু করা, শেপ (Shape) চিহ্নিত করা, শেপ (Shape) রং ও অ্যানিমেশন করা ও স্মার্ট আর্ট এর ব্যবহার, ট্রানজিশন ও অ্যানিমেশন ব্যবহার করা, ছবি এডিট করা, ছবিযুক্ত করা, ইন্টারনেটের সাথে সংযুক্ত হতে পারা, ওয়েবপেজ/ ওয়েবসাইট ব্রাউজ করা, সার্চ ইঞ্জিন ব্যবহার করে শিক্ষা বিষয়ক তথ্য ও উপকরণ খুঁজে নিতে পারা, আইসিটি শিক্ষা উপকরণ তৈরির পরিকল্পনা করা, শ্রেণিকক্ষে ব্যবহারের জন্য পাওয়ারপয়েন্ট এবং ইন্টারনেটের মাধ্যমে আইসিটি শিক্ষা উপকরণ তৈরি, আইসিটি উপকরণ ব্যবহার করে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শ্রেণি কার্যক্রম উপস্থাপন করার জন্য প্রস্তুতি, ইউটিউব ব্যবহার করে শিক্ষা বিষয়ক ভিডিও ক্লিপ দেখা ও ডাউনলোড করা, ট্রিগার এনিমেশনের ব্যবহার, সার্চ ইঞ্জিন ব্যবহার করে শিক্ষা বিষয়ক তথ্য ও উপকরণ খোঁজা, প্রয়োজন অনুযায়ী ভিডিও ক্লিপ কাটিং, পাওয়ারপয়েন্ট স্লাইডে বিভিন্ন অডিও, ভিডিও বা অ্যানিমেশন ফাইল যুক্ত করা, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর পরিচালনা কৌশল, কন্টেন্ট ডাউনলোড, ছবি ও ভিডিও আপলোড করার পদ্ধতি, প্রয়োজনীয় সফটওয়্যারসমূহ ইন্টারনেট থেকে ডাউনলোড, বিভিন্ন শিক্ষামূলক ওয়েবসাইট ব্যবহার করা ইত্যাদি।

ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ের ডিজিটাল কন্টেন্ট ব্যবহার

শিক্ষায় প্রযুক্তির ব্যবহার নিয়ে এখন আমাদের দেশে অনেক প্রতিষ্ঠানই কাজ করছে। যেমন-ব্র্যাক কর্তৃক ম্যাক্রোমিডিয়া ফ্ল্যাসে তৈরি করা গণিত ও ইংরেজি বিষয়ের সিডি, ডি-নেটের তৈরি করা বিষয়বস্তু, রহিম আফরোজের ডিজি ক্লাশ ইত্যাদি। কিন্তু এগুলোর সবই কপিরাইট দ্বারা পরিমার্জন ও পরিবর্তন নিষিদ্ধ। শিক্ষকের কাজ কেবল ক্লাশে গিয়ে অনুসরণ করা। কিন্তু শিক্ষক নির্মিত ডিজিটাল কন্টেন্টের ব্যবহারে ব্যতিক্রম রয়েছে। এখানে আছে শিক্ষকের স্বাধীনতা তথা তৈরি এবং পুনঃ তৈরির সুযোগ। এটি তৈরি করা সহজ এবং অন্য শিক্ষকের জন্য সহজলভ্য। ডিজিটাল কন্টেন্ট ব্যবহারের মাধ্যমে কঠিন, দুর্বোধ্য ও বিমূর্ত বিষয়গুলোকে শিক্ষার্থীদের সামনে সহজ ও বোধগম্য ভাবে উপস্থাপন করা যায় এবং মূর্ত করে তোলা যায়। ডিজিটাল কন্টেন্ট কেবল প্রদর্শনের বিষয় নয়, এটি ব্যবহারের সময় কাজভিত্তিক ও সহযোগিতামূলক শিক্ষণ অ্যাপ্রোচকে কাজে লাগাতে হবে। যারফলে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা, বিশ্লেষণমূলক চিন্তন দক্ষতা ও যোগাযোগ দক্ষতা উন্নত হবে এবং শিক্ষার্থীদের চিন্তাশক্তির বিকাশ ঘটবে। ডিজিটাল কন্টেন্ট ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সমসাময়িক জ্ঞান পিপাসার কথা মাথায় রাখতে হবে। ডিজিটাল কন্টেন্টের মাধ্যমে পাঠ পরিচালনার ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে হবে। প্রয়োজনে মাল্টিমিডিয়া সাময়িকভাবে বন্ধ রেখে শিক্ষার্থীদের কাজ করাতে হবে ও বোর্ড ব্যবহার করতে হবে। কেবল বক্তৃতায় সীমাবদ্ধ না থেকে অনলাইন রিসোর্স ব্যবহার করতে হবে। শিক্ষকদের চিন্তা-চেতনা, অভিজ্ঞতা, সৃজনশীলতা এবং তৈরিকৃত ডিজিটাল কন্টেন্ট নিজেদের মধ্যে শেয়ার করার জন্য রয়েছে শিক্ষক বাতায়ন নামক ওয়েবপোর্টাল। যার সদস্য হয়ে শিক্ষকগণ নিজের তৈরিকৃত কন্টেন্ট আপলোড করতে পারেন এবং অন্যের আপলোডকৃত কন্টেন্ট ডাউনলোড করতে পারেন। ডাউনলোডকৃত কন্টেন্ট প্রয়োজন মত পুনঃসৃষ্টি করে ব্যবহার করতে পারেন। ডিজিটাল কন্টেন্ট তৈরি ও ব্যবহারের মাধ্যমে নিজের দক্ষতা বৃদ্ধি করে পর্যায়ক্রমে জেলা থেকে জাতীয় পর্যায়ের ডিজিটাল কন্টেন্ট প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার সুযোগ নিতে পারেন। ডিজিটাল কন্টেন্ট ব্যবহারের সময় খেয়াল রাখতে হবে শিক্ষার্থীদের মাঝে যেন একঘেয়েমী চলে না আসে। ডিজিটাল কন্টেন্ট ব্যবহারের সময় মাঝে মাঝে শিক্ষার্থীদের জ্ঞানমূলক, সমকেন্দ্রিক, কেন্দ্রচ্যুতি ও মূল্যায়নমূলক প্রশ্ন করতে হবে। প্রতিটি ডিজিটাল কন্টেন্টেই যেন একই রকম শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল ব্যবহার করা না হয় সেদিকে গুরুত্ব দিতে হবে। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে বাস্তব উপকরণ ব্যবহার করতে হবে। ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ের বিষয়বস্তুর প্রয়োজনে ডিজিটাল মানচিত্র অথবা দেয়াল মানচিত্র ব্যবহার করে মানচিত্রে সঠিক তথ্য নির্দেশের জন্য শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ করাতে হবে। ডিজিটাল কন্টেন্টের সাথে আলাদাভাবে ভূগোলিক ব্যবহার করতে হবে। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে মাল্টিমিডিয়া সাময়িকভাবে অফ করে শিক্ষার্থীদের দিয়ে বোর্ডে মানচিত্র অঙ্কন করে বা গ্রাফ এঁকে তথ্য সন্নিবেশ করতে হবে ও চিহ্নিত করাতে হবে। ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ের ডিজিটাল কন্টেন্টে ব্যবহৃত মানচিত্র ও ভূগোলকে যেন সঠিক রং ও প্রতীক ব্যবহার করা হয় তা খেয়াল রাখতে হবে।

নির্দেশিত কাজ

প্রশিক্ষার্থীদের প্রতি দুইজনে নবম ও দশম শ্রেণির ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ের বিষয়বস্তুর (প্রশিক্ষক কর্তৃক নির্ধারিত) উপর ভিত্তি করে একটি করে ডিজিটাল কন্টেন্ট প্রণয়নের লিখিত পরিকল্পনাসহ ডিজিটাল কন্টেন্ট তৈরি করবেন। প্রয়োজনীয় ফিডব্যাক গ্রহণ করবেন এবং সে অনুযায়ী সংশোধনপূর্বক নির্ধারিত তারিখে জমা দেবেন এবং ডিজিটাল কন্টেন্ট ব্যবহার করে শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।

৫.৫ ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ের আদর্শ শ্রেণিকক্ষ: পরিকল্পনা ও সজ্জিতকরণ

যে কোন বিষয়ের বিষয়বস্তু শিক্ষার্থীদের সহজভাবে বুঝতে সহায়তা করে এবং শিক্ষার্থীদের জীবনের দৃষ্টিভঙ্গি গঠনে বা বদলাতে সহায়তা করে প্রাকৃতিক বা কাঠামোগত পরিবেশ। যে পরিবেশে শিক্ষার্থীরা তাদের শিক্ষাক্রমের বিষয়গুলোর শিক্ষা গ্রহণ করে। তাই ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ের শিখন-শেখানো কার্যক্রম তথা শিক্ষার্থীদের শিখন সহায়ক একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে প্রাকৃতিক পরিবেশ তথা শিখন পরিবেশ। ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ের একটি নীতিও হচ্ছে, আশেপাশের পরিবেশ থেকে শিক্ষার্থীদের শেখানো। মানবিক ও বিজ্ঞান শাখার মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনকারী বিষয় হচ্ছে ভূগোল ও পরিবেশ। ভূগোলবিদের হাতিয়ার বা উপকরণ কাছাকাছি রাখা জরুরি। একজন ভূগোল বিষয়ের শিক্ষকের প্রয়োজন হয়, দেয়াল মানচিত্র, ভূগোলক, এপিডায়াক্সোপ, ডকুমেন্ট ক্যামেরা, বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক উপকরণ যা এক শ্রেণিকক্ষ থেকে অন্য শ্রেণিকক্ষে বহন করা সহজ কাজ নয়। তাছাড়া ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ের শিখন-শেখানো কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের নিষ্ক্রিয়ভাবে তার ডেস্কে বসে থাকার সুযোগ নেই। এমনকি ভূগোল পাঠে নানা ধরনের বড় আকারের বই ও এটলাস ব্যবহার করতে হয়। ভূগোল শিক্ষার্থীকে মানচিত্র তৈরি করতে হয় ও আঁকতে হয়, মডেল তৈরি করতে হয়, সৌর জগতের বিভিন্ন গ্রহ উপগ্রহ পর্যবেক্ষণ করতে হয়, বিভিন্ন ভৌগোলিক, জৈবিক ও আর্থনীতিক উপাদানসমূহকে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হয়। ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ক পাঠে শিক্ষার্থীদের অনেক বেশি নড়াচড়া করতে হয়। কেননা, তাদেরকে মানচিত্র নিয়ে কাজ করতে হয়, এটলাস নিয়ে কাজ করতে হয়, বৃহৎ ও ক্ষুদ্র ক্ষেত্রের মানচিত্র পাঠ করতে হয়, বিভিন্ন ধরনের ছবি ও পত্রিকার প্রবন্ধ নিয়ে কাজ করতে হয়। আবার ভূগোলের বিভিন্ন বিষয়বস্তু উপস্থাপনের জন্য কক্ষটি অন্ধকার করা প্রয়োজন হয়। এসকল কারণে ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ের শিখন-শেখানো কার্যক্রম যথাযথভাবে পরিচালনার জন্য একটি আলাদা ও আদর্শ শ্রেণিকক্ষ প্রয়োজন।

ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ের আদর্শ শ্রেণিকক্ষের প্রয়োজনীয়তা

- শ্রেণিকক্ষে ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ের শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার সময় নানারকম উপকরণ, যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম অনেক বেশিমাাত্রায় ব্যবহার করতে হয়, যা সাধারণ শ্রেণিকক্ষে সাজিয়ে রাখার ও সংরক্ষণ করা কষ্টকর এমনকি অসম্ভব। এসকল যন্ত্রপাতি বা সরঞ্জাম বা উপকরণ যথাযথভাবে সংরক্ষণ ও ব্যবহারের জন্য একটি আলাদা কক্ষ প্রয়োজন;
- ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ে শিখন-শেখানোর ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম উপকরণ তৈরি করার প্রয়োজন হয়। যেমন- মডেল, চার্ট, গ্লোব, বড় মানচিত্র ইত্যাদি। এসব উপকরণ কোন কোন সময় একটি পিরিয়ডে সমাপ্ত করা সম্ভব হয় না। সুতরাং এ সকল অর্থ সমাপ্ত বা অসমাপ্ত কাজ সংরক্ষণের জন্য একটি আদর্শ ভূগোল কক্ষ দরকার;
- ভূগোলের পাঠ পরিচালনার জন্য ট্রেসিং টেবিল, গ্লোব, ডকুমেন্ট ক্যামেরা, সার্ভে যন্ত্রপাতি ইত্যাদির প্রয়োজন হয়। এসকল যন্ত্রের সমন্বয়ে একটি আদর্শ ভূগোল কক্ষ প্রয়োজন;
- আমাদের প্রচলিত শিক্ষাক্রমে ব্যবহারিক ভূগোলকে আলাদা না রেখে তা তত্ত্বীয় ও ব্যবহারিক একসাথে করার নীতি অনুসরণ করতে বলা হয়েছে। কাজেই তত্ত্বীয় ও ব্যবহারিক কাজের সমন্বয় করে পাঠ পরিচালনার জন্য ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ের আদর্শ কক্ষের প্রয়োজন;
- ভূগোল পাঠের উদ্দেশ্য যথাযথভাবে অর্জনের জন্য ভৌগোলিক পরিবেশ সৃষ্টি করা গুরুত্বপূর্ণ। উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে না পারলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে পাঠের প্রতি আগ্রহ ও মনোযোগ তৈরি হয় না। আদর্শ ভূগোল কক্ষ ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ের শিক্ষার্থীদের বিষয়বস্তুর প্রতি অনুরাগ সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় ভৌগোলিক পরিবেশ সৃষ্টি করতে সহায়তা করে;
- ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ের একটি আদর্শ শ্রেণিকক্ষ সময় ও অর্থের অপচয় রোধ করে;
- ভূগোল কক্ষে এপিডায়াক্সোপ, চলচ্চিত্র, মডেল, ছবি, দিবারাত্রি সংঘটন ও হ্রাস-বৃদ্ধির প্রক্রিয়া প্রদর্শন করতে সুবিধা হয়;
- ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ের আদর্শ শ্রেণিকক্ষে নানাবিধ প্রয়োজনীয় উপকরণ ব্যবহার করে পাঠ পরিচালনা করা সহজ হয় বলে শিখন-শেখানো কাজ সহজ, সাবলীল ও আনন্দদায়ক হয়;
- ভূগোলের বিষয়বস্তুর মধ্যে রয়েছে গতিময়তা। তাই শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সাম্প্রতিক তথ্য জানার জন্য বিভিন্ন পুস্তক, পত্র-পত্রিকা, ম্যাগাজিন, ইন্টারনেট সংযোগসহ কম্পিউটার ইত্যাদি ভূগোল কক্ষে থাকা উচিত। এরফলে একই স্থানে প্রয়োজনীয় উপকরণ ও সহায়ক সামগ্রী সহযোগে নতুন নতুন বিষয়বস্তু সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা সহজ হবে।

ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ের আদর্শ শ্রেণিকক্ষ পরিকল্পনা ও সজ্জিতকরণ

ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ের আদর্শ শ্রেণিকক্ষ প্রতিষ্ঠার জন্য প্রথমেই প্রয়োজন হয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করা। পরিকল্পনার ক্ষেত্রসমূহ নির্ধারণ করতে হবে।

ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ের আদর্শ কক্ষের পরিকল্পনার জন্য প্রধান ক্ষেত্রসমূহ হচ্ছে-

- শিক্ষার্থীদের বসার ক্ষেত্র বা স্থান;
- শিক্ষকের শিখন-শেখানো কাজ পরিচালনার ক্ষেত্র বা স্থান বা ব্যবস্থা;
- শিক্ষার্থীদের হাতে-কলমে কাজ করার ক্ষেত্র বা স্থান বা ব্যবস্থা;
- প্রয়োজনীয় উপকরণ, যন্ত্রপাতি, সহায়ক সামগ্রী রাখার স্থান বা ব্যবস্থা।

পরিকল্পনার ক্ষেত্রে যে সকল বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হয় তা হলো-

- কক্ষের নকশা ও ব্যবস্থাপনা ;
- কক্ষের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, উপকরণ ও সহায়ক সামগ্রী। কক্ষের নকশা ও ব্যবস্থাপনার অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ হচ্ছে- কক্ষের অবস্থান, কক্ষের আকার, বিভিন্ন কাজের জন্য স্থান বণ্টন, আলো ব্যবস্থাপনা, তাপ ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি। কক্ষের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, উপকরণ ও সহায়ক সামগ্রীর অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ের পাঠ কার্যকরভাবে শিক্ষার্থীদের শিখনের জন্য যে সকল সামগ্রী দরকার তার সবই।

ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ের আদর্শ শ্রেণিকক্ষের জন্য প্রয়োজনীয় কিছু যন্ত্রপাতির নাম এখানে উল্লেখ করা হলো- চকবোর্ড বা হোয়াইট বোর্ড, ওয়াল চার্ট, ভূগোলক, বিভিন্ন প্রকার নমুনা, মডেল, চার্ট, ছবি, মানচিত্র, ভূচিত্রাবলি, মানচিত্র রাখার তাক, মানচিত্র রাখার স্ট্যান্ড, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, প্রজেকশনের পর্দা, ফিল্ম ও স্লাইড, ডায়াক্সোপ, এপিডায়াক্সোপ, থার্মোমিটার, ব্যারোমিটার, বৃষ্টি মাপক যন্ত্র, কম্পাস, বায়ুতীর, এনিমোমিটার, সার্ভে যন্ত্রপাতি, ট্রেসিং টেবিল, ডকুমেন্ট ক্যামেরা, ইন্টার একটিভ বোর্ড ইত্যাদি। এছাড়াও বিষয়বস্তুর চাহিদা অনুযায়ী উপকরণ, যন্ত্রপাতি ও সহায়ক সামগ্রীর তালিকা প্রণয়ন করা পরিকল্পনার অংশ। তালিকা অনুযায়ী সকল উপকরণ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করতে হবে।

একটি আদর্শ ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ের কক্ষ সজ্জিতকরণ ও পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় যে ক্ষেত্রগুলো বিবেচনা করা হয়েছিল সে সকল ক্ষেত্রগুলো বিবেচনা করতে হবে। অর্থাৎ সজ্জিতকরণের বিবেচ্য বিষয়সমূহকে নিম্নরূপে উপস্থাপন করা যায়-

- শিক্ষার্থীদের আসন ব্যবস্থা সজ্জিতকরণ;
- শিখন-শেখানো কাজ পরিচালনার স্থান সজ্জিতকরণ;
- শিক্ষার্থীদের হাতে-কলমে কাজ করার ব্যবস্থাকরণ;
- উপকরণ, সহায়ক সামগ্রী ও যন্ত্রপাতি রাখার ব্যবস্থাকরণ।

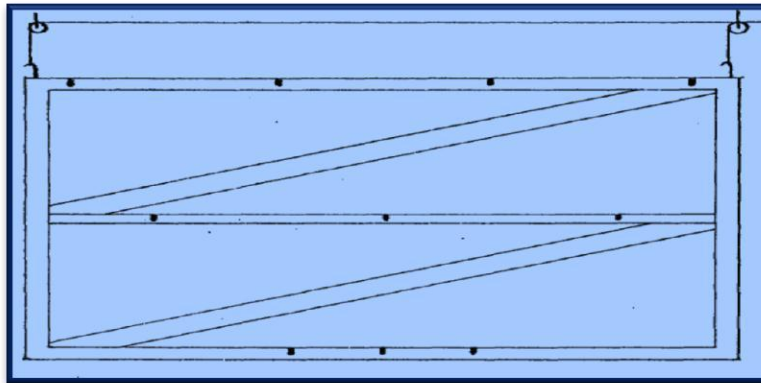
শিক্ষার্থীদের আসনের ব্যবস্থা

একটি আদর্শ কক্ষে শিক্ষার্থীদের বসার ভাল ব্যবস্থা থাকতে হবে। ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ের আদর্শ শ্রেণিকক্ষের পরিধির বিস্তৃতি কত হবে তা নির্ভর করে শিক্ষার্থী সংখ্যার উপর। তবে প্রতিজন শিক্ষার্থীর জন্য এমন জায়গা থাকবে যাতে শিক্ষার্থী তার সামনে একটি এটলাস, একটি নোটখাতা ও প্রয়োজনে ছোট আকারের মানচিত্র রাখতে পারে। আদর্শগতভাবে একজন শিক্ষার্থীর জন্য একটি ৯২ বর্গ সেন্টিমিটার টেবিল রাখা দরকার। যার উচ্চতা ৭৫ থেকে ৯২ সেন্টিমিটার হবে। ৩০ জন শিক্ষার্থী বসার জন্য ৫টি সারি থাকবে এবং প্রতি সারিতে ছয়জনের বসার ব্যবস্থা থাকবে। দুইটি সারির মধ্যে চলাচলের জন্য কমপক্ষে ৪৫ সেন্টিমিটার ফাঁকা জায়গা থাকবে। তবে শিক্ষার্থীদের বসার ব্যবস্থা নির্ভর করবে কক্ষটির আকার ও আকৃতির উপর। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে যাতে ২ জন শিক্ষার্থী জোড়ায় কাজ বা কয়েকজন শিক্ষার্থী মিলে দলগত কাজে অংশগ্রহণ করতে পারে টেবিলগুলো সেভাবে তৈরি করতে হবে। শিক্ষার্থীদের বসার জন্য চেয়ার বা টুল থাকতে পারে। আসন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে বিবেচনায় রাখতে হবে যাতে তত্ত্বীয় ও ব্যবহারিক কাজ সমন্বয় করে করা যায় এমন বিন্যাস ও ব্যবস্থাপনা।

শিক্ষকের শিক্ষণ কাজ পরিচালনার ব্যবস্থা

শিক্ষকের শিক্ষণ কাজ প্রধানত পরিচালিত হয় কক্ষের সামনের দিক থেকে। তবে আধুনিক কালে শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক পদ্ধতিতে শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য শিক্ষক শ্রেণির যে কোন জায়গা ব্যবহার করতে পারেন। শিক্ষকের শিক্ষণ কাজ পরিচালনার জন্য শ্রেণির সামনের সারি থেকে শিক্ষকের পিছনের দেয়াল পর্যন্ত কমপক্ষে ১ মিটার স্থান রাখতে হবে। অন্যথায় সামনের দিকের শিক্ষার্থীদের চকবোর্ড বা হোয়াইট বোর্ড, দেয়াল মানচিত্র ও মাল্টিমিডিয়া প্রজেকশন এর পর্দা বা ডকুমেন্ট ক্যামেরার পর্দার তথ্য, ছবি বা ভিডিও দেখতে অসুবিধা হবে। অন্য যেকোন বিষয়ের তুলনায় বোর্ড ব্যবহার বার বার করতে হয় ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ের শ্রেণি কার্যক্রমে। কোন ডায়াগ্রাম বা মানচিত্র অঙ্কন, চিহ্নিতকরণ বা প্রদর্শনের জন্য বারবার সামনের দিকটা ব্যবহার করতে হয়। আবার একই মানচিত্র বা ডায়াগ্রাম বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন পিরিয়ডে আঁকতে হয় বলে কোন কোন বিদ্যালয়ে আদর্শ ভূগোল কক্ষে সামনের পুরো দেয়ালব্যাপী বোর্ড স্থাপন করা হয়। এটা অনেক ব্যয়বহুল এবং পর্দা ও মানচিত্র স্থাপনে অসুবিধা হতে পারে। এক্ষেত্রে বিকল্প হিসেবে বড় আকারের বোর্ড কিন্তু কম জায়গা দখল করার উপযোগী পদ্ধতি প্রয়োগ করা যেতে পারে। যেমন- রোলার বোর্ড যা কম স্থান দখল করে প্রয়োজনীয় সময়ে বেশি জায়গার ব্যবস্থা করতে পারে। ভাঁজ বোর্ড (Folding Board) যাতে চারটি পৃষ্ঠ ব্যবহারের সুযোগ থাকে। চারটি পৃষ্ঠদেশ বিশিষ্ট ভারসাম্যপূর্ণ বোর্ড ব্যবহার করা যেতে পারে। কয়েকটি (৩/৪ টি) মধ্যম আকারের দেয়ালে সংযুক্ত বোর্ড ব্যবহার করা যেতে পারে। এ ধরনের বোর্ড থাকলে যে সকল পাঠে মহাদেশ বা দেশের মানচিত্র কয়েকবার করতে হয় সে সব পাঠের জন্য প্রয়োজনীয় মানচিত্র অঙ্কন করে রাখা যেতে পারে।

মানচিত্র এবং ছবি প্রদর্শনের ব্যবস্থা



চিত্র-৫.১: মানচিত্র ও ছবি প্রদর্শনের ব্যবস্থা (ডিসপ্লে বোর্ড)

স্বল্পতম সময়ে মানচিত্র এবং ছবি প্রদর্শনের জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা থাকতে হবে। কখনও কখনও একাধিক মানচিত্রও একসাথে প্রদর্শন করতে হয়। একাধিক মানচিত্র প্রদর্শনের ব্যবস্থা আদর্শ ভূগোল কক্ষে থাকবে। খেয়াল রাখতে হবে যাতে মানচিত্র প্রদর্শনের ফলে লেখার বোর্ড ঢেকে না যায়। কেননা একই সাথে মানচিত্র ও বোর্ড ব্যবহারের প্রয়োজন হয়। সেই সাথে খেয়াল রাখতে হবে যেন শ্রেণিকক্ষের পিছনের সারির এবং সামনের সারির শিক্ষার্থীরা স্বাচ্ছন্দে বোর্ড, মানচিত্র এবং ছবি দেখতে পায়। মানচিত্র প্রদর্শনের জন্য স্প্রিং রোলার ব্যবহার করা যায়। এটি ব্যয়বহুল মনে হলে ব্যয় কমানোর জন্য মানচিত্র ঝুলানোর ব্যবস্থা করা যেতে পারে। বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে শ্রেণিকক্ষের দুইদিকের দেয়াল বরাবর স্টিলের তার টানিয়ে দেওয়া যেতে পারে। যার নির্দিষ্ট দূরত্বে ইংরেজি S আকৃতির হুক লাগানো থাকবে যেখানে মানচিত্র ঝুলানো যাবে। ভূগোলের শ্রেণিকক্ষের দেয়ালের ফাঁকা জায়গা প্রদর্শনের জন্য ব্যবহার করা যায়।

শিক্ষকের জন্য প্রদর্শন ডেস্ক

এটি সাধারণত শ্রেণিকক্ষের সামনের দিকে এবং বোর্ডের কাছাকাছি জায়গায় রাখা হয়। কোন কোন শিক্ষক অবশ্য এ ডেস্কের পরিবর্তে শ্রেণিকক্ষের একপাশে প্রশাসনিক ডেস্ক রাখতে পছন্দ করেন। এ ডেস্কটি হবে কমপক্ষে ২৮০ বর্গ সেন্টিমিটার আকৃতির। যার উপরে বৃহৎ স্কেলের মানচিত্র ও অন্যান্য সরঞ্জাম রাখা যায়। এ ডেস্কে ড্রয়ার থাকবে যাতে ব্যবহারের পর কিছু কিছু শিখন-শেখানো সহায়তাকারী সরঞ্জাম রাখা যায়।

ভূগোলক রাখার ব্যবস্থা

ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ের শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ভূগোলক একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। অনেক ভূগোলের শিক্ষক দুই ধরনের ভূগোলক শ্রেণিকক্ষে রাখতে পছন্দ করে। প্রথমত, কালো রংয়ের ভূগোলকে সাদা রংয়ের মহাদেশ আঁকা যা শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ের ব্যবহারের জন্য এবং উভয়েই তা আঁকতে পারবে। দ্বিতীয়ত, একই আকারের আরেকটি ভূগোলক যাতে বিভিন্ন রংয়ের মাধ্যমে প্রধান প্রধান প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য, শহর এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থায়ীভাবে চিহ্নিত করা থাকে। কমপক্ষে ৪৮ সেন্টিমিটার ব্যাস বিশিষ্ট ভূগোলক আদর্শ শ্রেণিকক্ষে রাখতে হবে। যাতে শিক্ষার্থীরা প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করতে পারে এবং অন্য শিক্ষার্থীরা তা দেখতে পারে।

অভিক্ষেপ (Projection) রাখা

ভূগোল শিক্ষকের বিভিন্ন মানচিত্র, ডিজিটাল কন্টেন্ট, ফিল্মস্ট্রিপ, ছবি, চিত্র, ডকুমেন্ট ক্যামেরার ব্যবহারের জন্য অভিক্ষেপ যন্ত্র এবং অভিক্ষেপ পর্দার প্রয়োজন হয়। শ্রেণির শিক্ষার্থী সংখ্যা এবং শ্রেণিকক্ষের আকার ও আকৃতি অনুযায়ী অভিক্ষেপ যন্ত্র ও পর্দা স্থাপন করতে হবে। শ্রেণিকক্ষের সামনের দিকের দেয়ালে অভিক্ষেপ পর্দা স্থাপন করতে হবে। এমনভাবে স্থাপন করতে হবে যাতে বোর্ডকে আড়াল না করে। এক্ষেত্রে স্প্রিং রোলার পর্দা ব্যবহার করা যেতে পারে।

শ্রেণিতে শিক্ষার্থীদের ব্যবহারিক কার্যক্রমের স্থান

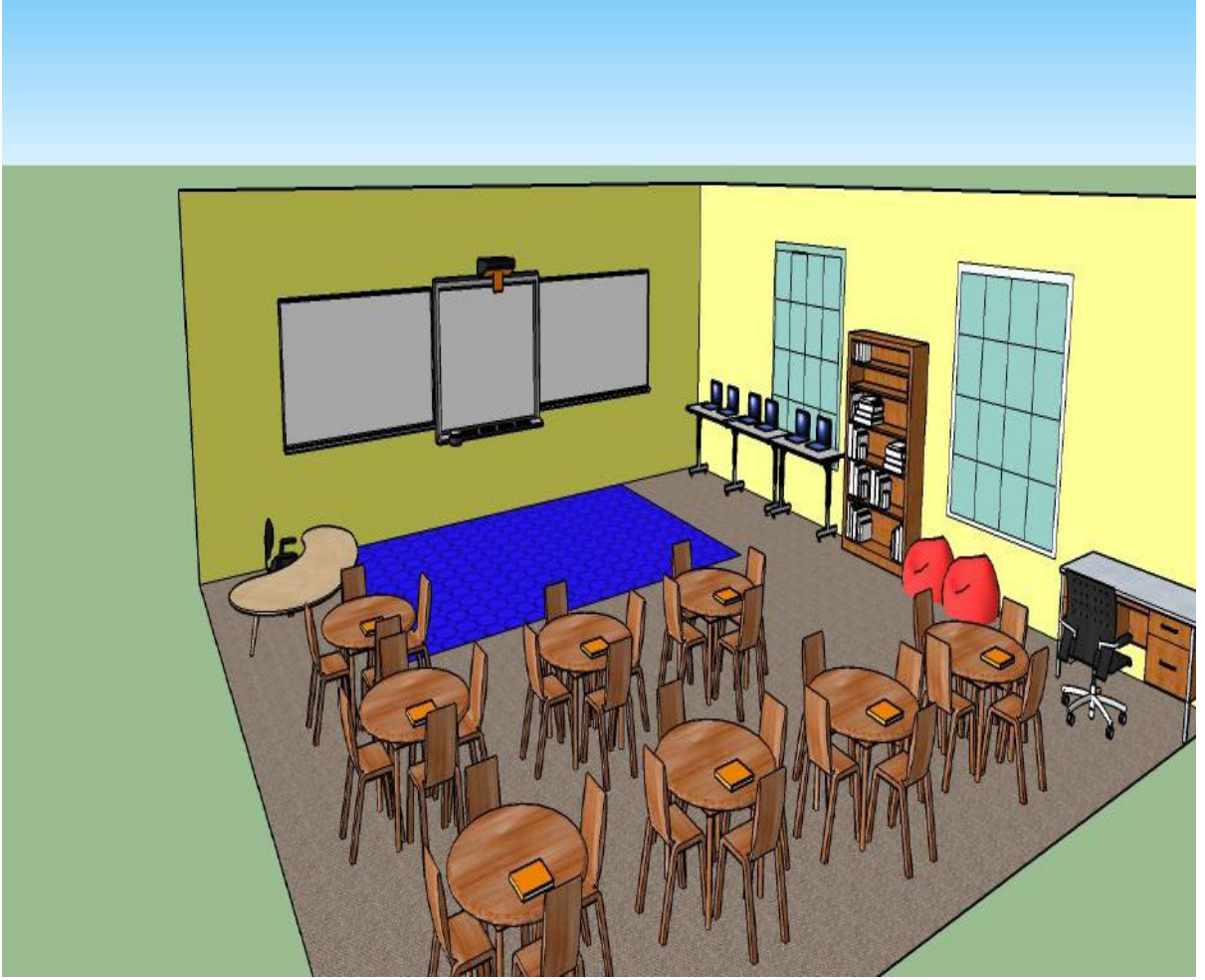
শিক্ষার্থীদের ব্যবহারিক বা হাতে কলমে কাজ করার জন্য স্থানটি কক্ষের একপাশে বা পিছনের অংশে নির্ধারিত হলে ভাল হয়। এমনভাবে এ স্থানটি রাখতে হবে যাতে শিক্ষার্থীরা তাদের বসার ডেস্ক থেকে সহজে আসা যাওয়া করতে পারে, একে অন্যের সাথে সহজে শেয়ার করতে পারে এবং অন্যের যাতে কোন প্রকার সমস্যা না হয়। তাদের কাজের সুবিধার জন্য টেবিল রাখা প্রয়োজন। এ স্থানে যে সকল সরঞ্জাম ও উপকরণ অন্তর্ভুক্ত থাকবে তা হচ্ছে ট্রেসিং টেবিল, স্ট্যান্ড ট্রে, ওয়াটার ট্যাক্স, ওয়ার্ক বেঞ্চ, ডিসপ্লে ক্যাবিনেট, অবজারভেশন উইন্ডো ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি।

উপকরণ, যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম সংরক্ষণের স্থান

কার্যকরভাবে ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ের শিখন-শিখানো কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অনেক ধরনের উপকরণ, যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জামের প্রয়োজন হয়। সংগৃহীত মানচিত্র, ছবি, চিত্র, ডায়াগ্রাম, নমুনা মডেল, সার্ভে যন্ত্রপাতি ইত্যাদি যখন ব্যবহার করা হয় না তখন তা সংরক্ষণ করার জন্য প্রয়োজন হয় ফাইল কেবিনেট, ওয়ালম্যাপ কাপবোর্ড, লাইব্রেরি কাপবোর্ড, কাবার্ড, আলমারি, কার্ড ইনডেক্স ক্যাবিনেট, ডুপ্লিকেটর, জেনারেল কাপবোর্ড ইত্যাদি। প্রজেক্টর, টেলিভিশন ও স্মার্টবোর্ড প্রদর্শনের সুন্দর ব্যবস্থা থাকবে। প্রজেক্টর পর্দা, ইন্টার একটিভ বোর্ড ও টেলিভিশন এমনভাবে স্থাপন করতে হবে যেন শিক্ষার্থীদের চোখের কোন অসুবিধা না হয়। কক্ষের দেওয়ালে বিখ্যাত ভূগোলবিদ ও আবিষ্কারক, তাঁদের আবিষ্কারের ছবি এবং তাঁদের ভূগোল বিষয়ক বিভিন্ন উক্তি লিখিত থাকবে।

এছাড়া ভূগোল কক্ষটি সার্বিকভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও সুসজ্জিত থাকবে, যাতে শিক্ষার্থীরা প্রাণবন্ত ও আগ্রহী হয়ে ওঠে। আদর্শ ভূগোল কক্ষের কারণে শিক্ষার্থীদের শিখন পরিবেশ নিশ্চিত হবে যা তাদেরকে ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ের শিখন অর্জনে উৎসাহী করবে।

ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ের আদর্শ শ্রেণিকক্ষ



চিত্র-৫.২: ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ের আদর্শ শ্রেণিকক্ষ

৫.৬ ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ের শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় শিক্ষক যোগ্যতাসমূহ এবং এ সকল যোগ্যতা অর্জনে শিক্ষক প্রশিক্ষণের ভূমিকা

শিক্ষার সার্বিক ও যথাযথ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়ন বিকশিত হয়। জাতীয় উন্নয়নকে বিকশিত করার জন্য প্রয়োজন বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার উপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা। এ শিক্ষা ব্যবস্থার মূল কাজ হচ্ছে, শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিত করা। গুণগত শিক্ষার উপাদানগুলো হলো, আধুনিক ও যুগোপযোগী শিক্ষাক্রম, পর্যাপ্ত সংখ্যক যোগ্য শিক্ষক, প্রয়োজনীয় ভৌত অবকাঠামো ও শিখনসামগ্রী, যথাযথ শিক্ষণ পদ্ধতি ও কৌশল, ফলপ্রসূ ব্যবস্থাপনা ও তত্ত্বাবধান, উপযুক্ত শিখন-শেখানো পরিবেশ ও যথোপযুক্ত মূল্যায়ন পদ্ধতি ইত্যাদি। আর এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো প্রয়োজনীয় সংখ্যক যোগ্য শিক্ষক। যোগ্য শিক্ষক তৈরিতে মুখ্য ভূমিকা পালন করে প্রশিক্ষণ। প্রশ্ন হচ্ছে, কেবল প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদই কি যোগ্য শিক্ষকের একমাত্র মানদণ্ড? তাহলে যোগ্য শিক্ষক নিয়োগের পর আবার মানসম্মত শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও পৌনঃপুনিক প্রশিক্ষণের কথা বলা হয় কেন? একজন শিক্ষককে তখনই যোগ্য শিক্ষক বলা যাবে শিক্ষাগত ও পেশাগত সনদ অর্জন করার সাথে তিনি যখন শিক্ষণের জন্য আবশ্যকীয় দক্ষতা, জ্ঞান, মনোভাব, মূল্যবোধ, প্রেষণা ও বিশ্বাস অর্জন করবেন যার মাধ্যমে

একটি নতুন পরিবেশে টিকে থেকে শিক্ষকতা কার্যক্রম সফলভাবে পরিচালনা করতে পারবেন। অনেকেই শিক্ষাগত যোগ্যতা ও শিক্ষক যোগ্যতাকে গুলিয়ে ফেলেন। সব পর্যায়ে প্রথম শ্রেণিপ্রাপ্ত একজন শিক্ষক যদি শিক্ষার্থী, অভিভাবক অথবা সহকর্মীদের সাথে আচরণ করতে না পারেন, তাহলে তিনি কি পেশাগতভাবে যোগ্য শিক্ষক? আবার একজন শিক্ষক পাঠের বিষয়বস্তু ভালো জানেন কিন্তু তিনি যদি শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ, বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যা ও বর্ণনা, যথাযথ নির্দেশনা প্রদান, নিয়মানুযায়ী শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা, শিক্ষার্থীদের দুর্বলতা চিহ্নিতকরণ ও দুর্বলতাকে স্বীকৃতি প্রদান, শিক্ষার্থীদের মনোযোগ ধরে রাখা, শিক্ষায় আইসিটির ব্যবহার, শিখনে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ করানোর কৌশল যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে না পারেন তাহলে তিনি কি যোগ্য শিক্ষক হিসেবে বিবেচিত হবেন? এরকম আরও অনেক উদাহরণ দেওয়া যাবে। সহজভাবে বলা যায়, উল্লিখিত কাজগুলো যদি শিক্ষক যথাযথভাবে করতে পারেন তাহলে সে শিক্ষকের কিছু যোগ্যতা আছে। এছাড়া শিক্ষকতা কাজ সুচারুরূপে করার জন্য আরও অনেক যোগ্যতা প্রয়োজন। তবে একজন ভূগোল শিক্ষকের এসকল সাধারণ যোগ্যতার পাশাপাশি আরও অতিরিক্ত যোগ্যতার প্রয়োজন হয়। ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে শিক্ষাবিদগণ বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ে শিক্ষা দেওয়ার জন্য সর্বদা যত্নশীল হওয়ার উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন।

যোগ্যতার ধারণা

যোগ্যতা বলতে কোন কাজ করার বা করতে পারার গুণ, সামর্থ বা সক্ষমতাকে বুঝায়। এটা অর্জনযোগ্য এবং যাচাই/পরিমাপ করা সম্ভব। সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ড মূল্যায়নের মাধ্যমে এ সক্ষমতার মাত্রা নির্ণয় করা যায়।

শিক্ষণ যোগ্যতা

শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের ভূমিকার উপর শিক্ষণ যোগ্যতা কেন্দ্রীভূত হয়ে থাকলেও শিক্ষকতা যে কোন নির্দিষ্ট কার্যভার থেকে অধিকতর ব্যাপক বিষয়। শিক্ষণ যোগ্যতা বলতে এমন জ্ঞান, দক্ষতা, উপলব্ধি, মূল্যবোধ, নৈতিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গিকে বুঝায় যা সকল শিক্ষামূলক অবস্থানে কার্যকর কৃতিত্ব অর্জনের দিকে চালিত করে।

শিক্ষক যোগ্যতা

পেশাগত জ্ঞান, দক্ষতা, বিশ্বাস, মূল্যবোধ এবং দৃষ্টিভঙ্গি সমন্বয়ে গঠিত একগুচ্ছ গুণাবলি যা একজন শিক্ষককে নিজ কর্মক্ষেত্রে প্রত্যাশিত মান অনুযায়ী অর্পিত দায়িত্ব/কার্যক্রম কার্যকরভাবে সম্পাদনে সমর্থ করে তোলে।

ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ের শিক্ষকের যোগ্যতাসমূহ

টিচিং কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট ইন সেকেন্ডারি এডুকেশন প্রজেক্ট কর্তৃক নির্ধারিত মাধ্যমিক শিক্ষক যোগ্যতার আদর্শ মানের ভিত্তিতে নিম্নে ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ের শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় শিক্ষক যোগ্যতাসমূহ বর্ণনা করা হলো।

শিক্ষকদের যোগ্যতার আদর্শ মানকে ৪টি ক্ষেত্রে ভাগ করা হয়েছে। ক্ষেত্র চারটি হচ্ছে-

১. পেশাগত জ্ঞান
২. পেশাগত অনুশীলন
৩. শিক্ষকতা পেশায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি
৪. পেশাগত শিখন, নৈতিকতা ও মূল্যবোধ

১. পেশাগত জ্ঞান ক্ষেত্রের আওতায় ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ের শিক্ষকদের যোগ্যতাসমূহ নিম্নরূপ-

ক. ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ের বিষয়বস্তু সংক্রান্ত জ্ঞানের অধিকারী: ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ের শিক্ষকের প্রথম শর্ত তাঁকে এ বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে। জ্ঞানের গভীরতা স্বাচ্ছন্দ্য গতিতে শিক্ষণ কাজ পরিচালনায় উদ্বুদ্ধ করে। ভূগোল কেবল তত্ত্বীয় বিষয় নয়, বহুমাত্রিক বিষয়ের সমন্বিত রূপ। কাজেই এ বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জ্ঞান ও জ্ঞানের প্রয়োগের দক্ষতা থাকা প্রয়োজন। ভূগোল ও পরিবেশ একটি গতিশীল বিষয় যেখানে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন জ্ঞানের সংযোগ ঘটে। কাজেই এ বিষয়ের শিক্ষককে সমসাময়িক জ্ঞান অনুসন্ধানের যোগ্যতা থাকতে হবে। কেবল বিষয়বস্তুর জ্ঞান থাকলেই চলবে না, তাদেরকে ভূগোল বিষয়ের শিক্ষাক্রম সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করতে হবে এবং তা শ্রেণিতে প্রয়োগের মাধ্যমে প্রদর্শন করতে হবে। ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ের বিভিন্ন শ্রেণির শিক্ষাক্রমের বিষয়বস্তুর মধ্যে এবং অন্যান্য বিষয়ের সাথে আন্তঃসম্পর্ক স্থাপনের যোগ্যতা থাকতে হবে।

খ. ভূগোলের বিষয়বস্তু ও বিষয়বস্তু শিখনের জ্ঞানের প্রয়োগ যোগ্যতা: ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ের বিষয়বস্তু অন্যান্য বিষয়ের বিষয়বস্তু থেকে আলাদা। কাজেই এ বিষয়ের শিক্ষকের শিক্ষার্থীদেরকে বিষয়বস্তু শেখানোর জ্ঞান থাকতে হবে ও তা প্রয়োগের যোগ্যতা থাকতে হবে। ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ের শিখন-শেখানোর যে সকল ভিন্নধর্মী পদ্ধতি, কৌশল ও দক্ষতা আছে তা অনুধাবন করতে হবে ও প্রয়োগ করার সামর্থ্য থাকতে হবে। যেমন- আঞ্চলিক পদ্ধতি ও মানচিত্র পঠন কৌশল ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ের বিষয়বস্তু শিক্ষণের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়; যা অন্যান্য বিষয়ে প্রয়োজন নাও হতে পারে। এ বিষয়ের জন্য প্রযোজ্য কৌশল ও দক্ষতা প্রয়োগের সময় শিক্ষার্থীদের এমনভাবে নির্দেশনা দিতে হবে যা হবে স্পষ্ট ও শিক্ষার্থীদের কাছে বোধগম্য। নির্দেশনার ভাষা হবে শিক্ষার্থীদের বয়স উপযোগী ও প্রমিত মানের। ভূগোল এমন একটি বিষয় যা বৈশ্বিক সচেতনতামূলক বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত। কাজেই কেবল ভূগোল ও পরিবেশের বিষয়বস্তু গতানুগতিকভাবে পড়ালেই হবে না, এমনভাবে পড়াতে হবে যাতে শিক্ষার্থীদের মাঝে বৈশ্বিক সচেতনতা সৃষ্টি হয়। একুশ শতকের শিক্ষা হচ্ছে জ্ঞান ও দক্ষতাভিত্তিক। ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়টিও অনেকগুলো দক্ষতা অর্জন করানোর উপযোগী বিষয়বস্তুর সমন্বয়ে গঠিত। কাজেই শিক্ষার্থীরা যাতে বিশ্লেষণমূলক চিন্তন দক্ষতা অর্জন করতে পারে শিক্ষককে তা শিখাতে হবে। অর্থাৎ শিক্ষকদের এ যোগ্যতা থাকতে হবে।

গ. শিক্ষার্থীর উন্নয়নে শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের জ্ঞান প্রয়োগের যোগ্যতা: ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ের বিষয়বস্তুতে থাকে বহুমাত্রিকতা। আবার এসকল বিষয়বস্তুর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় দক্ষতার বিকাশ ঘটানো হয়। কাজেই বিষয়বস্তুর বহুমাত্রিকতা ও দক্ষতার বিকাশের কথা বিবেচনা করে শিক্ষার্থীরা কোন বয়সে কতটুকু শিখতে ও বুঝতে সক্ষম তা জানতে হবে। ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ের শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বর্ধন ও তাদের জীবন বিকাশ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করবেন এবং এ বিষয়গুলো উপলব্ধি করে শ্রেণিতে পাঠ পরিচালনা করবেন। শিক্ষার্থীদের উন্নয়ন একমুখী নয় আবার ভিন্ন শিক্ষার্থীদের উন্নয়নের ধরন ভিন্ন ভিন্ন। কাজেই অন্যান্য বিষয়ের শিক্ষকের ন্যায় ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ের শিক্ষককেও শিক্ষার্থীদের বিভিন্নমুখী উন্নয়ন ও বর্ধন চিহ্নিত করার ও তা সমর্থন করে পাঠ পরিচালনার যোগ্যতা থাকতে হবে। শিক্ষার্থীদের শিখন প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করে সে অনুযায়ী তাদেরকে নির্দেশনা প্রদান ও তাদের প্রতি যত্নশীল হওয়ার যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন। প্রতিটি শিক্ষার্থীকে ইতিবাচক পরিবেশ প্রদানের মাধ্যমে ও শিক্ষার্থীদের সাথে সহানুভূতিশীল সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়কে তাদের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলার যোগ্যতা থাকতে হবে।

২. পেশাগত অনুশীলন ক্ষেত্রের আওতায় ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ের শিক্ষকদের যোগ্যতাসমূহ নিম্নরূপ-

ক. শিখন-শেখানো পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তা প্রয়োগের যোগ্যতা: শিক্ষার্থীদের নিকট পাঠ ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপনের জন্য ও শিখন উদ্দেশ্য যথাযথভাবে অর্জনের জন্য ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ের শিক্ষকদের বার্ষিক পাঠপরিকল্পনা, একক পরিকল্পনা ও দৈনিক পাঠপরিকল্পনা প্রণয়নের জ্ঞান ও দক্ষতা থাকতে হবে। দৈনিক পাঠপরিকল্পনা অনুযায়ী ভূগোল বিষয়ের বিষয়বস্তু শিখন-শেখানোর জন্য প্রয়োজনীয় কার্যাবলি সংগঠিত করার যোগ্যতা থাকতে হবে। শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বহুরকম পদ্ধতি ও কৌশল আছে। তার মধ্য থেকে ভূগোল ও পরিবেশ বিষয় শিখনের উপযোগী পদ্ধতি বাছাই করার দক্ষতা থাকতে হবে। এ সকল পদ্ধতি ব্যবহার করে ভূগোল বিষয়ের শিখন-শেখানো কার্যাবলির বিন্যাস করার যোগ্যতা থাকতে হবে। শ্রেণির সকল ধরনের শিক্ষার্থী যাতে শিখতে পারে বা সকল ধরনের শিক্ষার্থীর শিখন সহায়ক সামগ্রী প্রণয়ন ও সংরক্ষণ করার যোগ্যতা থাকতে হবে।

খ. শিখন-শেখানো কলাকৌশল ব্যবহারের যোগ্যতা: ভূগোল বিষয়ের বিষয়বস্তু শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ায় সহায়তা হয় এমন শিক্ষণ কৌশল ব্যবহার করে পাঠদান করলে শিক্ষার্থী শিখতে আগ্রহী হয়ে উঠবে। কাজেই ভূগোল শিক্ষকের কার্যকর শিক্ষণ কৌশল ব্যবহারের যোগ্যতা থাকতে হবে। শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিখন হলে তা স্থায়ী ও কার্যকর হয়। ভূগোল শিক্ষকের শিক্ষার্থীদের পাঠে অংশগ্রহণ করাতে পারাও একটি যোগ্যতা। শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও পাঠের বিষয়বস্তু এ তিনটির মধ্যে কার্যকর যোগাযোগের মাধ্যমে শিখন ত্বরান্বিত হয়। কার্যকর যোগাযোগের মাধ্যমে শিখন-শেখানো প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করার যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন। ভূগোল বিষয়ে বাস্তববস্তু, স্বল্পমূল্য, বিনামূল্য ও দামি উপকরণ ব্যবহারের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। ভূগোলের বিষয়বস্তুকে বোধগম্য ও শিখন-শেখানো প্রক্রিয়াকে আনন্দদায়ক করার জন্য বিভিন্ন প্রকার উপকরণ ও প্রযুক্তি ব্যবহারের যোগ্যতা ভূগোল শিক্ষকের জন্য অত্যাাবশ্যক।

গ. ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ের শিক্ষার্থীদের শিখন যাচাই ও সার্বিক মূল্যায়নের যোগ্যতা: ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়টি তত্ত্বীয় জ্ঞান, ব্যবহারিক কাজ, সরেজমিন পর্যবেক্ষণ, সার্ভে ও প্রতিবেদন প্রণয়ন সংক্রান্ত কাজের সমন্বিত রূপ। এছাড়াও এ বিষয়টির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদেরকে বিভিন্ন দক্ষতা অর্জন করানো হয়। বৈশ্বিক, আঞ্চলিক ও স্থানীয় বিষয়সমূহের প্রতি সচেতনতা সৃষ্টি ও ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়টি করে থাকে। এ কারণে একজন ভূগোল শিক্ষককে উল্লিখিত উপাদানগুলোর উপযোগী ও কার্যকর মূল্যায়ন পদ্ধতি ও কৌশল শনাক্ত করতে পারার দক্ষতা থাকতে হবে। যুৎসই মূল্যায়ন পদ্ধতি ও কৌশল শনাক্ত করে শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন কাজে এসকল পদ্ধতি ও কৌশল ব্যবহার করার যোগ্যতা আদর্শ ভূগোল শিক্ষকের জন্য আবশ্যিক। মূল্যায়ন শেষে সকল উপাদানের মূল্যায়নকারীর ভিত্তিতে প্রতিবেদন প্রণয়ন করার দক্ষতা থাকতে হবে। কেবল শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করলেই কাজ শেষ নয়, মূল্যায়নকারীর ফলাফলের উপর ভিত্তি করে শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ার ফলপ্রসূতা যাচাই করতে পারাও আদর্শ ভূগোল শিক্ষকের যোগ্যতা।

৩. শিক্ষকতা পেশায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ক্ষেত্রের আওতায় ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ের শিক্ষকদের যোগ্যতাসমূহ নিম্নরূপ-

ক. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উপকরণ সম্পর্কিত জ্ঞান ও দক্ষতা: ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ে এমন অনেক বিষয়বস্তু রয়েছে যা শিক্ষার্থীদের নিকট বোধগম্য ও আকর্ষণীয় করার জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হয়। এ বিষয়ে কিছু বিষয়বস্তু বাস্তব হলেও আকার, দূরত্ব, পরিস্থিতি, সময়, স্থান ও পরিবেশের প্রেক্ষিতে শ্রেণিকক্ষে বাস্তবে দেখানো যায় না। এমনকি সহজবোধ্য করাও কষ্টকর কোন কোন ক্ষেত্রে অসম্ভব হয়ে পড়ে। যেমন- সৌর জগৎ, বিভিন্ন অঞ্চলের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য, বৃষ্টিপাত, সমুদ্রের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য, আবহাওয়া, জলবায়ু ইত্যাদি। এ সকল বিষয়বস্তু শিখন-শেখানোর জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অত্যন্ত উপযোগী। এ কারণে একজন আদর্শ ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ের শিক্ষকের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উপকরণ ব্যবহারের মৌলিক জ্ঞান থাকতে হবে। যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে পেশাগত যোগাযোগ, সহযোগিতা করার দক্ষতা থাকতে হবে। ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ক বিভিন্ন ধরনের ডিজিটাল কন্টেন্ট তৈরি, ব্যবহার, খুঁজে বের করা, তৈরিকৃত কন্টেন্ট বা উপকরণ নিজের প্রয়োজন অনুসারে সহ-সৃষ্টি ও কাস্টমাইজ করার দক্ষতা আদর্শ ভূগোল শিক্ষকের থাকা প্রয়োজন।

খ. শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সমন্বয় সাধনের যোগ্যতা: ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ের আদর্শ শিক্ষককে কেবল তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির জ্ঞান ও তা ব্যবহারের দক্ষতা থাকলেই চলবে না। তাঁকে বিষয়বস্তু, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং শিক্ষা বিজ্ঞান তথা শিখন-শেখানো ধারা, পদ্ধতি, কৌশল ও দক্ষতাসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন করার যোগ্যতা থাকতে হবে। শিখন যাচাই তথা মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সমন্বয় করে মূল্যায়নের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করার দক্ষতা থাকা উচিত। শিক্ষকের ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়নের জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার যোগ্যতা থাকতে হবে।

৪. পেশাগত শিখন, নৈতিকতা ও মূল্যবোধ ক্ষেত্রের আওতায় ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ের শিক্ষকদের যোগ্যতাসমূহ নিম্নরূপ-

ক. নৈতিকতা ও মূল্যবোধ অনুশীলন করার যোগ্যতা: একজন আদর্শ ভূগোল শিক্ষক তার চাল চলনে, আচরণে পেশা হিসেবে ভূগোল শিক্ষকের নৈতিক মান প্রদর্শন করতে সক্ষম হবেন। তিনি কেবল বিদ্যালয় আঙ্গিনায় নয়, তাঁর ব্যক্তি ও সমাজ জীবনেও নৈতিকতা ও মূল্যবোধসম্পন্ন আচরণ প্রদর্শন করবেন।

খ. পেশাগত শিখন, সহযোগিতা ও নেতৃত্ব প্রদানের যোগ্যতা: ভূগোল বিষয়ে প্রতিনিয়তই পরিবর্তন, পরিবর্তন ও সংযোজন হচ্ছে নতুননতুন বিষয়বস্তু। আর সেই সাথে শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ায়ও আসছে নানা রকম পরিবর্তন। এসকল পরিবর্তনের সাথে তাল মিলানোর জন্য একজন আদর্শ ভূগোল শিক্ষকের প্রয়োজন পেশাগত শিখন অব্যাহত রাখা। এ বিষয়টির অনেক বিষয়বস্তুই সমাজের ও পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত। বিষয়বস্তু শেখার জন্য প্রয়োজন হয় অন্য বিষয়ের জ্ঞান, পরিবেশ ও সমাজ পর্যবেক্ষণ, জরিপ কাজ পরিচালনা, প্রজেক্টের মাধ্যমে শিক্ষণ, ফিল্ড স্টাডি ইত্যাদি। এ সকল কারণে এ বিষয়ের শিক্ষককে নিজ বিদ্যালয়ের সহকর্মীদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে হয়, সহকর্মীদের সাথে পারস্পরিক সহযোগিতার ক্ষেত্র তৈরি করতে হয়। প্রয়োজন হয় নিজ বিদ্যালয় ও আশেপাশের বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সাথে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময় করার দক্ষতা। নিজে নেতৃত্ব প্রদান করে শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে উল্লিখিত কার্যাবলি করানোর মাধ্যমে নেতৃত্বের দক্ষতা প্রদর্শন করার যোগ্যতা অবশ্যই ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ের শিক্ষকের থাকতে হবে।

গ. কমিউনিটি সম্পৃক্ততার যোগ্যতা: পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়টির শিক্ষা কেবল শ্রেণিকক্ষেই সীমাবদ্ধ নয়। স্থান ও কালের প্রেক্ষিতে মানুষের সাথে ভূমি ও পরিবেশের সম্পর্ক স্থাপনই ভূগোলের মূল কাজ। মানুষের বাস সমাজে। কাজেই বিদ্যালয়ের বৃহত্তর কমিউনিটির সাথে মিথস্ক্রিয়া করার দক্ষতা ভূগোল বিষয়ের শিক্ষকের থাকা জরুরি। এ মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে সমাজ থেকে ভূগোল ও পরিবেশ শিক্ষা সম্পর্কিত পরিসেবা গ্রহণ করার যোগ্যতা থাকতে হবে। উপরে বর্ণিত ৪ টি ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত যোগ্যতার বাইরেও একজন আদর্শ ভূগোল শিক্ষককে যে সকল বিষয়ে যোগ্য ও দক্ষ হতে হয় তা নিচে তুলে ধরা হলো-

- **মানচিত্র পঠন, অঙ্কন ও ব্যবহারের দক্ষতা:** ভূগোল শিক্ষায় মানচিত্রের গুরুত্ব অপরিসীম। সাহিত্য পাঠ করতে যেমন ভাষা জানা প্রয়োজন তেমনি ভূগোল পাঠ করতে মানচিত্রের জ্ঞান অপরিহার্য। ভূগোলবিদদের কাছে মানচিত্র ভূগোলের যন্ত্র এবং উপকরণ। মানচিত্র ছাড়া ভূগোলের অনেক বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যা কোনভাবেই সার্থক করা যায় না। এছাড়া শ্রেণিকক্ষে মানচিত্রের মাধ্যমে শিক্ষণ পরিচালনা করলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে কৌতূহলসৃষ্টি হয়। শিক্ষক যদি মানচিত্র অঙ্কন করে তার সাথে বিষয়বস্তু সমন্বয় করে উপস্থাপন করেন তাহলে শিক্ষার্থীরা দ্রুত বুঝতে সক্ষম হয় এবং নিজেরাও মানচিত্র অঙ্কনে দক্ষতা অর্জন করতে পারবে। তাই আদর্শ ভূগোল শিক্ষককের মানচিত্র অঙ্কন ও পঠনের যোগ্যতা থাকতে হবে। তাছাড়া বিভিন্ন ধরনের মানচিত্র আছে। কোথায়, কখন, কীভাবে কোন মানচিত্র ব্যবহার করতে হবে তা শিক্ষককে জানতে হবে। কাজেই ভূগোল শিক্ষককে কেবল মানচিত্র অঙ্কনে পারদর্শী হলেই চলবে না তাদেরকে মানচিত্র ব্যবহারের দক্ষতা ও যোগ্যতা অর্জন করতে হবে;
- **সৃজনশীল ও উদ্ভাবনী প্রবণতা প্রদর্শন:** ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ের শিক্ষক নতুন কিছু সৃষ্টি বা উদ্ভাবনে সচেষ্ট হবেন। যে কোন বিষয়ে নতুনভাবে বা ভিন্নভাবে চিন্তা করতে তৎপর হবেন। ভূগোলের বিষয়বস্তু শেখানোর জন্য বিভিন্ন রকম খেলা উদ্ভাবন বা আইসিটির মাধ্যমে ভূগোল গেম তৈরি করে শিক্ষার্থীর মাঝে উপস্থাপন করবেন। শিক্ষার্থীদের নতুন কিছু সৃষ্টি বা তৈরিতে উৎসাহ প্রদানের দক্ষতা থাকতে হবে। আবার শিখন-শেখানোর নতুন কৌশল ও দক্ষতা উদ্ভাবন করে শিক্ষার্থীদের পাঠের প্রতি আগ্রহী করে তুলতে সক্ষম হবেন;
- **ভ্রমণে উৎসাহী, ভ্রমণ পরিচালনায় ও নেতৃত্ব প্রদানের যোগ্যতা:** ভূগোলের বিষয়বস্তু কেবল শ্রেণিকক্ষের চার দেয়ালের ভিতর বসে বর্ণনা ও উপকরণ ব্যবহারের মাধ্যমে শিখালে পরিপূর্ণ জ্ঞান অর্জিত হয় না। ভৌগোলিক উপাদান ও বৈশিষ্ট্যগুলোর প্রকৃতরূপ প্রত্যক্ষভাবে দেখার ও শেখার জন্য ভ্রমণ অত্যাাবশ্যিক। তাই মাঝে মাঝে শিক্ষার্থীদের শিক্ষামূলক ভ্রমণে নিয়ে যাওয়ার যোগ্যতা ভূগোল শিক্ষকের থাকতে হবে। এ বিষয়টি নির্ভর করে শিক্ষকের মানসিকতা ও পরিচালনার যোগ্যতার উপর। ভ্রমণ কেবল আনন্দের জন্য নয়, শিক্ষার্থীদের ভূগোল বিষয়ক জ্ঞান অর্জন, পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি ও চিন্তাশক্তির উন্মোচন ঘটানো ভ্রমণের উদ্দেশ্য;
- **গতিশীল শিক্ষায় বিশ্বাসী ও তাল মেলানোর দক্ষতা প্রদর্শন:** শিক্ষা সব সময় গতিশীল। ভূগোল বিষয়ের মধ্যে এ গতিশীলতা অনেক বেশি। তাই ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ের শিক্ষককে নতুন ভাবধারায় বিশ্বাসী ও তা গ্রহণ ও অন্যকে শিখানোর জন্য প্রচেষ্টা থাকা উচিত। এক্ষেত্রে তাঁকে নিজ উদ্যোগে নিয়মিত গবেষণা জার্নাল, পত্র-পত্রিকা ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে নতুন নতুন তত্ত্ব ও তথ্য পাঠ করার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। শিক্ষার্থীদেরকেও নতুন নতুন বিষয়বস্তু জানার কৌশল রপ্ত করানোর যোগ্যতা থাকতে হবে;
- **ধৈর্য ও সহানুভূতি প্রদর্শন:** শিখন-শেখানো একটি জটিল প্রক্রিয়া। শিখন-শেখানো কাজের সময় কখনও কখনও প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়। এ পরিস্থিতি ভূগোল বিষয়ের শিক্ষক ধৈর্য সহকারে মোকাবেলা করবেন এবং নিরপেক্ষতা বজায় রেখে সিদ্ধান্ত নিবেন। মাধ্যমিক পর্যায়ে নিচের শ্রেণিতে ভূগোল আলাদা বিষয় হিসেবে না থাকায় এবং বিদ্যালয়ে ভূগোল শিক্ষণ সহায়ক পরিবেশ না থাকার কারণে ভূগোলের বিষয়বস্তু বোধগম্যতায় আনতে অনেক কষ্ট হয়। এক্ষেত্রে শিক্ষককে ধৈর্য ধারণ করতে হবে এবং শিক্ষার্থীদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করতে হবে।

ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ের শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় শিক্ষক যোগ্যতাসমূহ অর্জনে শিক্ষক প্রশিক্ষণের ভূমিকা

শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পরিবর্তনশীল। এ পরিবর্তন শিক্ষা ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করে। শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনার মূল দায়িত্ব শিক্ষকদের এবং এজন্য তাদের শক্তিশালী ও কার্যকর পেশাগত যোগ্যতা প্রয়োজন। এসকল যোগ্যতা অর্জন করানোর জন্য গতানুগতিক প্রশিক্ষণের পরিবর্তে প্রয়োজন যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ। প্রশিক্ষণের মূল্যায়নও হতে হবে যোগ্যতাভিত্তিক।

প্রশিক্ষণের ধারণা

জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি বৃদ্ধির প্রক্রিয়াই প্রশিক্ষণ। অন্যভাবে বলা যায়, কর্মীদের উপর অর্পিত দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য দক্ষতা বৃদ্ধির প্রক্রিয়াই প্রশিক্ষণ। জ্ঞান, দৃষ্টিভঙ্গি ও দক্ষতার ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটলে মানুষের আচরণ উন্নত হয়। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যখন অংশগ্রহণকারীদের জ্ঞান, দৃষ্টিভঙ্গি ও দক্ষতা পেয়ে তাদের মাঝে আচরণিক পরিবর্তন আসবে, তখন তারা সে জ্ঞান ও দক্ষতাকে ব্যবহার করে তাদের কর্ম সম্পাদনের মান উন্নত করতে পারবেন।

শিক্ষক প্রশিক্ষণের উপযোগিতা

- পেশাগত জ্ঞান বৃদ্ধি;
- শিক্ষাদান পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞানার্জন ;
- শিক্ষাদান পদ্ধতি ব্যবহারে সক্ষমতা বৃদ্ধি ;
- শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি সম্পর্কে জ্ঞানার্জন;
- শিখন-শেখানো উপকরণসমূহ ব্যবহার পদ্ধতি ও কৌশল সম্পর্কে দক্ষতা অর্জন;
- বিষয়বস্তুসমূহ পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণে দক্ষতা অর্জন;
- স্থানীয় সম্পদ ব্যবহার করে স্বল্প ব্যয়ে উপকরণ প্রস্তুতের জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন;
- মূল্যায়ন উপকরণ ও কৌশল সম্পর্কে জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন।

প্রশিক্ষণার্থীদের ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ের জ্ঞান বৃদ্ধিতে শিক্ষক প্রশিক্ষণ অন্যতম প্রধান উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। শিক্ষক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীগণ নিজেদের পেশাগত জ্ঞানের পরিধিকে বিস্তৃত করতে পারেন, শিক্ষাদানের তাত্ত্বিক এবং ব্যবহারিক পদ্ধতিগুলো রপ্ত করে শ্রেণি শিক্ষণকে সাফল্যমণ্ডিত করতে পারেন। শিক্ষক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীগণ শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি, শিক্ষা পরিকল্পনা, শ্রেণিব্যবস্থাপনা, শিক্ষার্থীদের পুরস্কৃত করা, স্বল্প মেধাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের উন্নয়ন, উপকরণের যৌক্তিক ব্যবহার, স্থানীয় সম্পদ ও স্বল্পব্যয়ে উপকরণ প্রস্তুতকরণ শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণমূলক পাঠে উদ্বুদ্ধকরণ, ভূগোল কক্ষের প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন, বিষয়বস্তুসমূহ বিশ্লেষণের এবং শিক্ষার্থীদের মূল্যায়নের উপকরণ ও পদ্ধতি সম্বন্ধে জ্ঞানার্জন করেন।

ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ের শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় যোগ্যতা অর্জন করার জন্য প্রয়োজন যোগ্যতাভিত্তিক প্রশিক্ষণ। প্রশিক্ষণসমূহ হতে হবে অংশগ্রহণমূলক। অংশগ্রহণমূলক প্রশিক্ষণের বৈশিষ্ট্যসমূহ হচ্ছে-

- এটি যৌথ ও সহযোগিতামূলকভাবে পরিচালিত হবে;
- সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণের সুযোগ থাকবে;
- সকলের অভিজ্ঞতাকে মূল্যায়ন করা হবে;
- সকলের মতামত প্রকাশের সুযোগ থাকে;
- বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ বিদ্যমান থাকে;
- অংশগ্রহণকারী নির্ভর প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়া।

যোগ্যতা অর্জন করানোর জন্য তাত্ত্বিক প্রশিক্ষণই যথেষ্ট নয়। প্রয়োজন কতকগুলো মৌলিক যোগ্যতার সাথে প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তুর সমন্বয় সাধন করে প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা। প্রশিক্ষণের সাথে সংশ্লিষ্টতাবিহীন কাউকে অল্প কয়েকদিনের প্রশিক্ষণ প্রদান করে প্রশিক্ষকের দায়িত্ব দিলে সেই প্রশিক্ষণে সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তু সংক্রান্ত কিছু যোগ্যতা অর্জন করানো সম্ভব হলেও প্রশিক্ষকের নিজের মূল যোগ্যতার ঘাটতির কারণে প্রশিক্ষণ আশানুরূপ হবে না। এসব প্রশিক্ষণের মূল্যায়নও হতে হবে যোগ্যতাভিত্তিক। যোগ্যতাভিত্তিক প্রশিক্ষণ যথাযথভাবে পরিচালনা করতে পারলে একদিকে শিক্ষকদের যোগ্যতা অর্জিত হবে আবার অন্যদিকে কোন কোন যোগ্যতার ঘাটতি রয়েছে তা নিরূপণ করে পরবর্তী প্রশিক্ষণের জন্য বাছাই করা সহজ হবে। এভাবে পৌনঃপুনিক বা ধারাবাহিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ের শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় যোগ্যতা অর্জন করানো সম্ভব হবে।

প্রশ্নমালা

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ের শিক্ষা উপকরণ তৈরি, সংগ্রহ, ব্যবহার ও সংরক্ষণে 3Rs এর ব্যবহার এর উদাহরণ দিন।
২. স্থানীয় সম্পদ ব্যবহার করে ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ের যে সকল উপকরণ তৈরি করা যায় তার একটি তালিকা প্রণয়ন করুন।
৩. স্বল্পমূল্যের উপকরণ তৈরি ও বিনামূল্যের উপকরণ সংগ্রহের ক্ষেত্রে কী কী বিষয় বিবেচনা করতে হয়? লিখুন।
৪. মানচিত্র ও ভূগোলকের মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য চিহ্নিত করুন।
৫. ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ের ভালো মানের একটি ডিজিটাল কন্টেন্ট তৈরির শর্তসমূহ কী?
৬. আদর্শ ভূগোল কক্ষে মানচিত্র ও ছবি প্রদর্শনের ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করুন।
৭. আদর্শ ভূগোল কক্ষে শিক্ষকের শিক্ষণ কাজ পরিচালনার স্থান কীরূপ হওয়া উচিত?
৮. আদর্শ ভূগোল শিক্ষকের শিখন-শেখানো পরিকল্পনা প্রণয়ন ও প্রয়োগের যোগ্যতা উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।
৯. আদর্শ ভূগোল শিক্ষকের শিখন-শেখানো কলা কৌশল ব্যবহারের যোগ্যতা উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিন।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. শিক্ষা উপকরণ কাকে বলে? শিক্ষা উপকরণ নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়সমূহ বর্ণনা করুন। ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ের শিক্ষা উপকরণের সংরক্ষণের নিয়মাবলি ব্যাখ্যা করুন।
২. ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ের শিখন-শেখানো কাজে মানচিত্র ব্যবহার করা গুরুত্বপূর্ণ কেন? ব্যাখ্যা করুন। শ্রেণি শিক্ষণে মানচিত্র ব্যবহারে সতর্কতা অবলম্বন না করলে কী কী ভুল হতে পারে? এসকল ভুল থেকে পরিত্রাণের উপায় ব্যাখ্যা করুন।
৩. ভূগোল ও পরিবেশ বিষয় শিক্ষণের জন্য স্বল্পমূল্যের ও বিনামূল্যের উপকরণের একটি তালিকা প্রণয়ন করুন। এ সকল উপকরণ সংগ্রহ ও সংরক্ষণের প্রক্রিয়া তুলে ধরুন।
৪. ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ের জন্য আলাদা কক্ষের প্রয়োজন কেন? একটি ভূগোল কক্ষ সজ্জিতকরণের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণের তালিকা প্রণয়নপূর্বক ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ের একটি আদর্শ কক্ষের নকশা অঙ্কন করুন।
৫. ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ের একজন আদর্শ শিক্ষকের যোগ্যতাসমূহ উল্লেখ করে এসকল যোগ্যতা অর্জনে শিক্ষক প্রশিক্ষণ কীভাবে ভূমিকা রাখে তা লিখুন।

ইউনিট ৬ : মানব ভূগোল, বাংলাদেশের ভৌগোলিক বিবরণ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ

ভূগোল শাস্ত্রের একটি প্রধান শাখা হলো মানব ভূগোল। মানব ভূগোল হলো মানব পরিবেশের মিথস্ক্রিয়া সংক্রান্ত সামাজিক বিজ্ঞান। এ শাস্ত্রের মাধ্যমে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের পরিবেশের সঙ্গে সেখানকার মানুষের জীবন-যাপন প্রণালি ও অর্থনৈতিক কার্যকলাপ সম্পর্কে জানা যায়। মানব ভূগোল বিভিন্ন প্রাকৃতিক পরিবেশে মানুষের আচরণ ব্যাখ্যা করে। এছাড়াও মানব ভূগোল মানুষের অর্থনৈতিক কার্যকলাপ তথা মানব সংস্কৃতির আঞ্চলিক তারতম্য ব্যাখ্যা করে। এ ভূগোলের মধ্যে সাংস্কৃতিক বিষয়বস্তু, অর্থনীতি ও সম্পদ, জনসংখ্যা ও জনপদ, অঞ্চল, সমাজ ও সামাজিক কল্যাণ ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচিত হয়। জনসংখ্যা, অর্থনৈতিক কার্যাবলি মানব ভূগোলের উল্লেখযোগ্য অংশ যা এ ইউনিটে আলোচিত হয়েছে। বাংলাদেশ আঞ্চলিক ভূগোলের একটি অংশ। বাংলাদেশের ভৌগোলিক বিবরণের মধ্যে ভূপ্রকৃতি, নদ-নদী, জলবায়ু, কৃষিপণ্য, খনিজসম্পদ, শিল্প, যোগাযোগ ও বাণিজ্য, পর্যটন ও প্রযুক্তি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। বাংলাদেশ দুর্যোগপ্রবণ দেশ, বর্তমানে এর গুরুত্ব বিবেচনা করে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আলোচনার সুবিধার্থে এ ইউনিটটিকে কয়েকটি পাঠে বিভক্ত করে আলোচনা করা হয়েছে।

৬.১: বিশ্বের ও বাংলাদেশের জনসংখ্যার বর্তমান পরিস্থিতি এবং পরিবর্তনের ধারা; অর্থনৈতিক কার্যাবলি

৬.২: বাংলাদেশের ভৌগোলিক বিবরণ: আয়তন ও অবস্থান

৬.৩: বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতি, নদনদী

৬.৪: বাংলাদেশের জলবায়ু

৬.৫: বাংলাদেশের কৃষিপণ্য (অর্থকরী ও খাদদ্রব্য)

৬.৬: বাংলাদেশের খনিজসম্পদ, শিল্প, যোগাযোগ ও বাণিজ্য, পর্যটন ও প্রযুক্তি

৬.৭: বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা

৬.১ বিশ্বের ও বাংলাদেশের জনসংখ্যার বর্তমান পরিস্থিতি এবং পরিবর্তনের ধারা; অর্থনৈতিক কার্যাবলি

পৃথিবীর জনসংখ্যা অসমভাবে বণ্টিত হয়েছে। বিশ্বের প্রায় অর্ধেক জনসংখ্যা মোট ভূমির মাত্র ৫ শতাংশ এলাকায় বসবাস করছে। অন্যদিকে ৫৭ শতাংশ ভূভাগে ৫ শতাংশের কম জনসংখ্যা রয়েছে। জনসংখ্যার এ অসম বণ্টনের পেছনে প্রাকৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ঐতিহাসিক ইত্যাদির প্রভাব রয়েছে। আবার জনসংখ্যা বৃদ্ধির ধারা সবসময় একইরকম ছিল না। পৃথিবীতে চিকিৎসাবিজ্ঞানের উন্নতি, সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ, প্রতিষেধক আবিষ্কার, পুষ্টির খাবার, স্বাস্থ্যকর পরিবেশ, নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবহার ও শিক্ষার প্রসার ঘটায় ফলে নবজাতক ও শিশু মৃত্যুহার হ্রাস, মানুষের আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি এবং জন্মহার হ্রাসকেও প্রভাবিত করেছে। এর ফলে পৃথিবীর জনসংখ্যা বৃদ্ধির ধারা উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে তাই একই রকম দেখা যায় না।

বিশ্বের জনসংখ্যার বর্তমান পরিস্থিতি এবং পরিবর্তনের ধারা

এপ্রিল, ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৭.৫ বিলিয়ন। World Population Prospects এর মতে, ২১০০ খ্রিষ্টাব্দ নাগাদ এর মোট সংখ্যা দাঁড়াবে ১১.২ বিলিয়ন। ১৩১৫-১৭ খ্রিষ্টাব্দের Great Famine এবং ১৩৫০ খ্রিষ্টাব্দের Black Death (তখন জনসংখ্যা ছিল প্রায় ৩৭০ মিলিয়ন) এর পর থেকে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৬৫০ খ্রিষ্টাব্দে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যা ছিল প্রায় ৫০০ মিলিয়ন, ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দে বৃদ্ধি পেয়ে হয় ১.২ বিলিয়ন। ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দের পর কৃষি ও শিল্প ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়, এর ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির গতি আরও দ্রুত হয়। মাত্র এ ১০০ বছরে পৃথিবীর জনসংখ্যা দ্বিগুণ হয়। জনসংখ্যার সর্বোচ্চ বৃদ্ধির হার ১.৮% এর বেশি হয় ১৯৫৫-১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে, যা ১৯৬৫-১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে ২.০৬% এ পৌঁছায় এবং এর পর থেকে ক্রমশঃ বৃদ্ধির হার কমেতে থাকে। ২০১০-২০১৫ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে এ বৃদ্ধির হার কমে গিয়ে দাঁড়িয়েছে ১.১৮% এ। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশ ভেদে এবং অঞ্চলভেদে একরকম নয়। United Nations Population Fund এর হিসাব অনুযায়ী ২০১১ খ্রিষ্টাব্দের ৩১ অক্টোবর পৃথিবীর জনসংখ্যা ৭ বিলিয়ন এ পৌঁছায়। যা ২০১৪ খ্রিষ্টাব্দে এসে দাঁড়িয়েছে ৭.২৩ বিলিয়নে (সারণি ৬.১)।

সারণি ৬.১: বিশ্ব জনসংখ্যা বৃদ্ধির ধারা (১৭৫০-২০১৪)

খ্রিষ্টাব্দ	পৃথিবীর মোট জনসংখ্যা (মিলিয়ন)
১৭৫০	৭৫১
১৮০০	৯৭৮
১৮৫০	১২৬২
১৯০০	১৬৫০
১৯৫০	২৪৮৬
১৯৭০	৩৬৩৫
২০০০	৬৪৯৪
২০১১	৭০০০
২০১৪	৭২৩০

উৎস: World population, Wikipedia.)

ওপরের তথ্য ও বর্ণনার প্রেক্ষিতে বিশ্ব জনসংখ্যা বৃদ্ধির ধারাকে সাধারণভাবে তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়। যেমন-

প্রাথমিক পর্যায় (Initial Stage): সুদূর অতীতকাল থেকে ১৬৫০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়কে প্রাথমিক পর্যায় বলে। এ সময় পৃথিবীর মোট জনসংখ্যা ও বৃদ্ধির হার উভয় ছিল খুবই কম। এ পর্যায়ে পৃথিবীর সকল অংশেই জন্ম এবং মৃত্যু হার উভয়ই খুব বেশি ছিল।

মাধ্যমিক পর্যায় (Middle Stage): ১৬৫০ থেকে ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়কে মাধ্যমিক পর্যায় বলে। এ পর্যায়ে প্রথমে ধীরে এবং পরে দ্রুতগতিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এ সময়ে কিছু অঞ্চলে মৃত্যুহার হ্রাসের ফলে এবং কিছু অঞ্চলে অভিজগমনের ফলে জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পায়। আফ্রিকা ও এশিয়ায় পূর্বের মতো জন্ম ও মৃত্যুহার উভয়ই বেশি থাকার কারণে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অপেক্ষাকৃত কম থাকে।

সাম্প্রতিক পর্যায় (Recent Stage): ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ২০১০ সময় পর্যন্ত সাম্প্রতিক পর্যায়ভুক্ত। বিগত কয়েক দশকে সমগ্র বিশ্বে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সার্বিকভাবে যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে বিশ্বের অঞ্চলভেদে জনসংখ্যার মোট আকার, ঘনত্ব এবং বৃদ্ধির হারের পার্থক্য রয়েছে।

মহাদেশভিত্তিক জনসংখ্যার ঘনত্ব ও বণ্টন: এশিয়া মহাদেশের জনসংখ্যা সবচেয়ে বেশি যা মোট জনসংখ্যার ৫৯.৭ শতাংশ (সারণি ৬.২)। পৃথিবীর সবচেয়ে জনবহুল দেশ হচ্ছে চীন ও ভারত এবং এখানে মোট জনসংখ্যার ৩৭% লোকের বসবাস। পৃথিবীর জনবহুল দেশগুলো যথাক্রমে চীন, ভারত, যুক্তরাষ্ট্র, ইন্দোনেশিয়া, ব্রাজিল, পাকিস্তান, নাইজেরিয়া, বাংলাদেশ, রাশিয়া, জাপান। ঘনত্বের দ্বারা ভূমির ওপর জনসংখ্যার চাপের নিবিড়তা প্রকাশ পায়। পৃথিবীর জনবহুল রাষ্ট্রগুলোর ঘনত্ব পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, বসতির নিবিড়তা (Intensity) ও সংঘবদ্ধতার (Compactness) দিক থেকে এদের মধ্যে ব্যাপক তারতম্য রয়েছে। নিম্নের সারণিতে ঘনত্বের ভিত্তির ক্রমানুসারে জনবহুল মহাদেশের তালিকা দেয়া হলো -

সারণি ৬.২: মহাদেশভিত্তিক জনসংখ্যার ঘনত্ব ও বণ্টন (২০১৬)

মহাদেশ	মোট জনসংখ্যা	জনসংখ্যার ঘনত্ব (প্রতি বর্গ কিলোমিটার)	বিশ্ব জনসংখ্যার অংশীদার (%)
এশিয়া	৪,৪৩৬,২২৪,৪৭৩	৩৭০	৫৯.৭
আফ্রিকা	১,২১৬,১২৯,৮১৫	১০৬	১৬.৪
ইউরোপ	৭৩৮,৮৩৯,০০২	৮৭	৯.৯
উত্তর আমেরিকা	৫৭৯,০২৩,৯৩৮	৭০	৭.৮
দক্ষিণ আমেরিকা	৪২২,৫৩৪,৬৯২	৬৩	৫.৭
অস্ট্রেলিয়া	৩৯,৯০১,৩৫৫	১২	০.৫

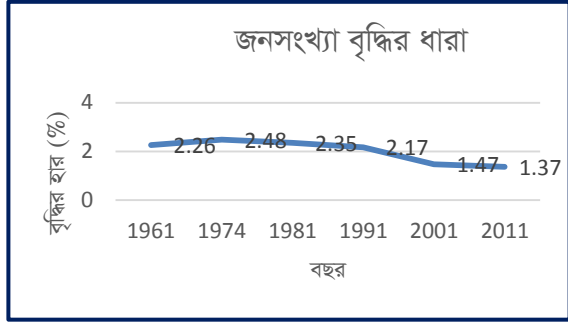
উৎস: শাহীদ, হ জ ম হাসিবুশ এবং রেজা, আ ই ম গাউছার

বাংলাদেশের জনসংখ্যার বর্তমান পরিস্থিতি এবং পরিবর্তনের ধারা

বাংলাদেশ পৃথিবীর জনবহুল দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। ১৯৬১ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশের জনসংখ্যা ছিল ৫.৫২ কোটি এবং ২০১১ খ্রিষ্টাব্দে এ জনসংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ১৪.৯৭ কোটিতে (চিত্র ৬.১)। মোট জনসংখ্যার বস্তুন সকল অঞ্চলে একইরকম নয়। জনসংখ্যার আকারের দিক থেকে বাংলাদেশ পৃথিবীর অষ্টম বৃহত্তম দেশ।

জনসংখ্যার বৈশিষ্ট্য

জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার: ১৯৬০ এবং ১৯৭৪ এর দশকে বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অত্যন্ত বেশি ছিল। ১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দ হতে ১৯৮১ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে বার্ষিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২.৪৮% থেকে কমে ২.৩৫% হয়েছে। এ ধারা বজায় চিত্র ৬.১: বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির ধারা রেখে ২০১১ খ্রিষ্টাব্দের আদমশুমারিতে দেখা যায় বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৩৭%। জনসংখ্যার ঘনত্ব: ২০১১ খ্রিষ্টাব্দের আদমশুমারি অনুযায়ী বাংলাদেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ১,০১৫ জন। ১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দে এ ঘনত্ব ছিল প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৪৯৭ জন (সারণি ৬.৩)। জনসংখ্যার ঘনত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে ২০১৫ খ্রিষ্টাব্দে তা বেড়ে দাঁড়ায় ১২৩৬ জন।



সারণি ৬.৩: বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা, বৃদ্ধির হার, ঘনত্ব (১৯৬১-২০১১)

বছর	জনসংখ্যা (কোটি হিসেবে)	বৃদ্ধির হার (%)	ঘনত্ব (প্রতি বর্গ কি. মি. হিসেবে)
১৯৬১	৫.৫২	২.২৬	৩৫৬
১৯৭৪	৭.৬৪	২.৪৮	৪৯৭
১৯৮১	৮.৯৯	২.৩৫	৬২৪
১৯৯১	১১.১৪	২.১৭	৭৫৫
২০০১	১২.৯২	১.৪৭	৮৩৪
২০১১	১৪.৯৭	১.৩৭	১,০১৫

উৎস: Statistical Year Book of Bangladesh, 2015

বয়স অনুযায়ী জনসংখ্যা বস্তুন: বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমে যাবার ফলে বয়স কাঠামোর উপর বিশেষ প্রভাব পড়েছে। কর্মক্ষম লোকের জনসংখ্যা নির্ভরশীল জনসংখ্যার থেকে অনেক বেশি। কোনো দেশের জনসংখ্যা কাঠামোতে কর্মক্ষম লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে তা অর্থনৈতিক উন্নতিকে ত্বরান্বিত করে।

নারী-পুরুষ অনুপাত: বাংলাদেশে ১৯৭৪ থেকে ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দের আদমশুমারি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, নারীর তুলনায় পুরুষের সংখ্যা বেশি ছিল। ২০১১ খ্রিষ্টাব্দের আদমশুমারিতে এ অনুপাত প্রায় সমান। বাল্যবিবাহ, সন্তান প্রসবকালীন মৃত্যু, অপরিণত বয়সে গর্ভধারণ, পুত্র সন্তানের আকাঙ্ক্ষা, চিকিৎসা ও পুষ্টির অভাব প্রভৃতি কারণে নারীর মৃত্যুহার বেশি ছিল। তবে বর্তমানে এসব ক্ষেত্রে উন্নতির ফলে নারী মৃত্যুহার অনেকাংশে কমেছে।

জন্ম ও মৃত্যুহার অনুযায়ী জনসংখ্যা: বর্তমানে বাংলাদেশে জন্মহার এবং মৃত্যুহার আগের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে, একই সাথে শিশু মৃত্যুহার আগের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে। তার কারণ হলো পরিবার পরিকল্পনা, শিক্ষা, নারীর ক্ষমতায়ন, কর্মসংস্থানের সুযোগ, শিক্ষা, প্রসূতি মায়ের মৃত্যুর হার কমে যাওয়া, সচেতনতা বৃদ্ধি ইত্যাদি।

জীবনপ্রত্যাশা অনুযায়ী জনসংখ্যা: ২০১৪ খ্রিষ্টাব্দে জীবন প্রত্যাশা ছিল ৭০.৪, যা ২০০২ খ্রিষ্টাব্দে ছিল ৬৪.৯।

গ্রাম ও শহরের জনসংখ্যা: বাংলাদেশের অধিকাংশ লোক গ্রামে বসবাস করে। ২০১১ খ্রিষ্টাব্দের আদমশুমারি অনুযায়ী দেখা যায়, মোট জনসংখ্যার প্রায় ৭৬.৬১% গ্রামে এবং ২৩.৩৯% জন শহরে বাস করে। দ্রুত নগরায়ণের ফলে ২০১৫ খ্রিষ্টাব্দে শহরের জনসংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় জনসংখ্যার ৩৪.৩%, ২০১০-২০১৫ খ্রিষ্টাব্দের বৃদ্ধির হার ৩.৫৫%। (উৎস: Bangladesh Demographics Profile 2017)।

ধর্মের ভিত্তিতে জনসংখ্যা বণ্টন: ২০১১ খ্রিষ্টাব্দের আদমশুমারি অনুযায়ী বাংলাদেশে ৯০.০% লোক মুসলমান, ৯% লোক হিন্দু, ০.৬% লোক বৌদ্ধ, ০.৩% লোক খ্রিষ্টান এবং অন্যান্য ০.১%।

উপজীবিকাভিত্তিক জনসংখ্যা বণ্টন: বাংলাদেশের অধিকাংশ লোক প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে কৃষি ও কৃষিভিত্তিক পেশার সাথে জড়িত। Labor Force Survey (LFS), 2013, BBS সূত্র অনুসারে মোট জনসংখ্যার ৩৭.৭% বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত, তন্মধ্যে ৫৩.৮% পুরুষ এবং ২১.৭% মহিলা। কর্মজীবী জনসংখ্যার ৪৫.১% কৃষিক্ষেত্রে, ২০.৮% শিল্পক্ষেত্রে, ৩৪.১% চাকরিতে নিয়োজিত।

শিক্ষিতের হার: বাংলাদেশে ২০১১ খ্রিষ্টাব্দের আদমশুমারি অনুযায়ী শিক্ষিতের হার ৫১.৭৭%।

বাংলাদেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব অধিক হওয়ার কারণসমূহ

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশে জনসংখ্যার ঘনত্ব অনেক বেশি। জনসংখ্যার আকারের দিক থেকে বাংলাদেশ পৃথিবীর অষ্টম বৃহত্তম দেশ। ভূপ্রকৃতি, মৃত্তিকার উর্বরতা, জলবায়ু, পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, শিল্প ও বাণিজ্যের প্রভাব, খনিজ সম্পদের প্রাচুর্য, সাংস্কৃতিক প্রভাব প্রভৃতি বিভিন্ন কারণে জনসংখ্যার ঘনত্ব বেশি হয়।

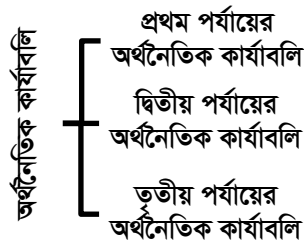
বাংলাদেশে জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধির প্রভাব

বাংলাদেশে জনসংখ্যার অন্যতম সমস্যা হলো দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি। ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দের আদমশুমারি রিপোর্ট অনুসারে এ বৃদ্ধির হার ছিল ২.১৭%, ২০১১ খ্রিষ্টাব্দে তা দাঁড়ায় ১.৩৭% (সারণি ৬.৩)। দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার পূর্বের তুলনায় হ্রাস পেলেও এর প্রভাব পড়ছে বাসস্থান, আবাদি জমি, খাদ্যশস্য ও যাতায়াত ব্যবস্থা ইত্যাদির ওপর।

অর্থনৈতিক কার্যাবলি

মানুষ দৈনন্দিন জীবনে জীবিকা নির্বাহের জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যে সব কার্যকলাপ সম্পাদন করে তাদের সমষ্টিকে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ বা অর্থনৈতিক কার্যাবলি বলে।

পণ্যসামগ্রী ও সেবাকার্যের উৎপাদন, বিনিময় এবং ব্যবহারের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত যে কোনো মানবীয় আচরণের প্রকাশই অর্থনৈতিক কার্যাবলি। অর্থনৈতিক কার্যাবলি তিন ভাগে বিভক্ত: প্রথম পর্যায়, দ্বিতীয় পর্যায় এবং তৃতীয় পর্যায়।



প্রথম পর্যায়ের অর্থনৈতিক কার্যাবলি (Primary Economic Activities): প্রথম পর্যায়ের কার্যাবলিতে মানুষ প্রকৃতির সঙ্গে সরাসরি কাজ করে। যেমন-খনিজ উত্তোলনের ক্ষেত্রে মানুষ পৃথিবীর বুকে থেকে তার সঞ্চিত ধনরত্ন ছিনিয়ে আনে। কৃষিকার্যের ক্ষেত্রে মানুষ বীজ বপন করে, প্রকৃতি এ বীজকে অঙ্কুরিত করে শস্যে পরিণত করে। প্রকৃতির এ অবদান মানুষ পুরস্কাররূপে গ্রহণ করে। পশু শিকার, মৎস্য শিকার, কাঠ চেরাই, পশু পালন, খনিজ উত্তোলন এবং কৃষিকার্য প্রথম পর্যায়ের অর্থনৈতিক কার্য। বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ প্রথম পর্যায়ের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত।

দ্বিতীয় পর্যায়ের অর্থনৈতিক কার্যাবলি (Secondary Economic Activities): দ্বিতীয় পর্যায়ের কার্যাবলিতে মানুষ তার প্রথম পর্যায়ের কার্যাবলি দ্বারা উৎপাদিত সামগ্রীকে গঠন করে, আকার পরিবর্তন করে এবং উপযোগিতা বৃদ্ধি করে। খনিজ লোহা আকরিক উত্তোলন করে তা থেকে লোহা, শলাকা, পেরেক, টিন, ইস্পাত ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যে পরিণত করা হয়। রন্ধনকার্য থেকে আরম্ভ করে অত্যন্ত জটিল যন্ত্রপাতি প্রস্তুতকরণ (Manufacturing) সকল প্রকার কার্যই দ্বিতীয় পর্যায়ের অর্থনৈতিক কার্যাবলি।

তৃতীয় পর্যায়ের অর্থনৈতিক কার্যাবলি (Tertiary Economic Activities): তৃতীয় পর্যায়ের কার্যাবলিতে মানুষ উৎপাদন কার্য ব্যতীত অন্যান্য উপায়ে প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের কার্যাবলি থেকে উৎপাদিত বস্তুসমূহের উপযোগিতা বৃদ্ধি করে এবং সেবাকার্য সম্পাদন করে। কোনো দেশের উৎপাদিত পণ্যের উদ্ভাংশ ঘাটতি অঞ্চলসমূহে প্রেরণ করলে ঐ বস্তুর উপযোগিতা অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। এটা সম্ভবপর হতে পারে ব্যবসা-বাণিজ্য, পরিবহণ ইত্যাদির মাধ্যমে। পাইকারি বিক্রেতা, খুচরা বিক্রেতা, ফেরিওয়ালা, পরিবেশক, এজেন্ট, ব্যাংকার, শিক্ষক, চিকিৎসক, নার্স, আইনজীবী, ধোপা, নাপিত, রিকশাচালক ও ঠেলাগাড়িওয়ালা প্রভৃতি অসংখ্য প্রকার জনসমষ্টির কার্যাবলি তৃতীয় পর্যায়ের অর্থনৈতিক কার্যাবলির অন্তর্ভুক্ত।

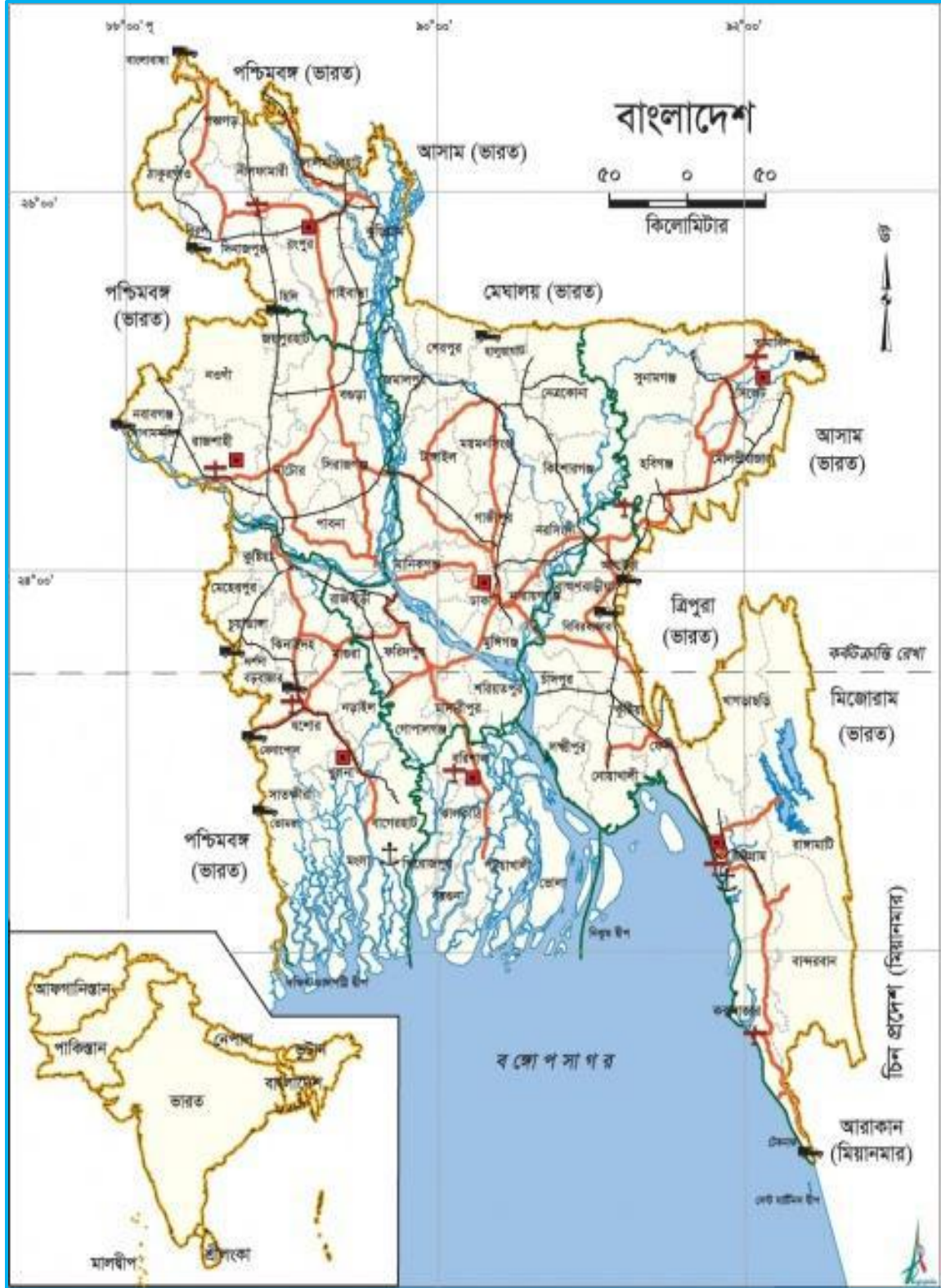
৬.২ বাংলাদেশের ভৌগোলিক বিবরণ: আয়তন ও অবস্থান

১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ই আগস্ট ভারতবর্ষ বিভক্ত হয়ে ভারত ও পাকিস্তান দুটি রাষ্ট্রের জন্ম হয়। তৎকালীন পাকিস্তানের দুটি অংশ ছিল- একটি পূর্ব পাকিস্তান ও অন্যটি পশ্চিম পাকিস্তান। দীর্ঘ নয়মাস পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে যুদ্ধ করার পর ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দের ১৬ই ডিসেম্বর পূর্ব পাকিস্তান মুক্ত হয় এবং একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে পৃথিবীর মানচিত্রে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের আবির্ভাব ঘটে।

অবস্থান: বাংলাদেশ এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণ এশিয়ার অন্তর্ভুক্ত একটি দেশ এবং ২০°৩৪' উত্তর অক্ষাংশ থেকে ২৬°৩৮' উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮°১' পূর্ব দ্রাঘিমাংশ থেকে ৯২°৪১' পূর্ব দ্রাঘিমাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত। বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে কর্কটক্রান্তি রেখা (২৩.৫° উত্তর অক্ষাংশ) অতিক্রম করেছে।

আয়তন: বাংলাদেশের মোট আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কিলোমিটার। বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে স্বাক্ষরিত স্থল সীমানা চুক্তি অনুযায়ী ২০১৫ খ্রিষ্টাব্দের ৩১ জুলাই দুদেশের মধ্যে পারস্পরিক ছিটমহল বিনিময়ের মাধ্যমে বাংলাদেশের মোট ভূখণ্ডে ১০,০৪১,২৫ একর জমি যোগ হয়েছে। পূর্ব-পশ্চিমে সর্বোচ্চ বিস্তৃতি ৪৪০ কিলোমিটার এবং উত্তর-উত্তর পশ্চিম থেকে দক্ষিণ-দক্ষিণ পূর্ব প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃতি ৭৬০ কিলোমিটার। ভূখণ্ডগত সমুদ্রসীমা ১২ নটিক্যাল মাইল (২২.২ কি. মি.) এবং অর্থনৈতিক একান্ত অঞ্চল সমুদ্রসীমা উপকূল থেকে ২০০ নটিক্যাল মাইল (৩৭০.৪০ কি. মি.) এবং সামুদ্রিক মালিকানা মহীসোপানের শেষ সীমানা পর্যন্ত।

সীমা: বাংলাদেশের তিনদিকে ভারত ও দক্ষিণ-পূর্বে মায়ানমার এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর অবস্থিত। পশ্চিমে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ। উত্তরে ভারতের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও মেঘালয়; পূর্বে ভারতের আসাম, ত্রিপুরা ও মিজোরাম এবং সেই সঙ্গে মায়ানমার; এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর (চিত্র ৬.১)।



চিত্র ৬.১: বাংলাদেশের অবস্থান

বাংলাদেশের সর্বমোট সীমারেখার দৈর্ঘ্য ৪,৭১১ কিলোমিটার। এর মধ্যে ভারত-বাংলাদেশ সীমারেখার দৈর্ঘ্য ৩,৭১৫ কিলোমিটার, বাংলাদেশ-মায়ানমার সীমারেখার দৈর্ঘ্য ২৮০ কিলোমিটার এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের তটরেখার দৈর্ঘ্য ৭১৬ কিলোমিটার। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমে হাড়িয়াভাঙ্গা নদী এবং দক্ষিণ-পূর্বে নাফ নদী যথাক্রমে ভারত ও মায়ানমারের সীমানায় অবস্থিত।

জনসংখ্যা: বাংলাদেশের পঞ্চম আদমশুমারি অনুষ্ঠিত হয় ২০১১ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ মার্চ হতে ১৯ মার্চ পর্যন্ত। ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুসারে বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা ১৪,৪০,৪৩,৬৯৭ জন। তন্মধ্যে ৭,২১,০৯,৭৯৬ জন পুরুষ এবং ৭,১৯,৩৩,৯০১ জন মহিলা। জনসংখ্যা বৃদ্ধির বার্ষিক হার ১.৩৭ এবং জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গ কি. মি. এ ১,০১৫ জন (২০১১ খ্রিষ্টাব্দ)। বাংলাদেশের পুরুষ ও নারীর অনুপাত ১০০.২৫ : ১০০।

ধর্ম: এদেশের অধিবাসীদের অধিকাংশ মুসলমান। ২০১১ খ্রিষ্টাব্দের আদমশুমারি অনুযায়ী বাংলাদেশে ৯০.০% মুসলমান, ৯% হিন্দু, ০.৬% বৌদ্ধ, ০.৩% খ্রিষ্টান এবং অন্যান্য ০.১%। এদেশে চাকমা, মগ, সাঁওতাল, গারো, মারমা প্রভৃতি উপজাতি বাস করে।

ভাষা: বাংলাদেশের একমাত্র রাষ্ট্রীয় ভাষা বাংলা। বিদেশি ভাষা হিসেবে ইংরেজি ভাষার প্রচলন রয়েছে।

উপজীবিকা: প্রধান উপজীবিকা কৃষিকাজ। বাংলাদেশের অধিকাংশ লোক প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে কৃষি ও কৃষিভিত্তিক পেশার সাথে জড়িত। এছাড়া ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকুরি ইত্যাদি পেশায় বাকি লোক নিয়োজিত। Labor Force Survey (LFS), 2013, BBS সূত্র অনুসারে মোট জনসংখ্যার ৩৭.৭% বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত, তন্মধ্যে ৫৩.৮% পুরুষ এবং ২১.৭% মহিলা। কর্মজীবী জনসংখ্যার ৪৫.১% কৃষিক্ষেত্রে, ২০.৮% শিল্পক্ষেত্রে, ৩৪.১% চাকরিতে নিয়োজিত।

শিক্ষা: বাংলাদেশে ২০১১ খ্রিষ্টাব্দের আদমশুমারি অনুসারে শিক্ষার হার ৫১.৭৭%।

প্রশাসনিক বিভাগ: ঢাকা বাংলাদেশের রাজধানী। বর্তমানে ৮টি প্রশাসনিক বিভাগ আছে। ৬৪টি জেলা, ১১টি সিটি কর্পোরেশন, ৩২১টি মিউনিসিপালিটি, ৪৮৯টি উপজেলা, ৬৩১টি থানা, ৪৫৫৩টি ইউনিয়ন পরিষদ।

৬.৩ বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতি, নদ-নদী

ভূপ্রকৃতি (Physiography): সমগ্র পৃথিবী বা তার কোন অংশের প্রাকৃতিক বস্তুসমূহের বর্ণনা হলো ভূপ্রকৃতির বিবরণ; বিশেষ করে তাদের প্রকৃতি, গাঠনিক উপাদান, সজ্জাবিন্যাস, পরিবর্তন প্রভৃতি। Huxley ১৮৬৯ খ্রিষ্টাব্দে ভূগোল শাস্ত্রে প্রাকৃতিক প্রপঞ্চসমূহের সাধারণ বর্ণনা অধ্যয়নের জন্য ‘Physiography’ শব্দটির প্রচলন করেন। বাংলাদেশের ভূপৃষ্ঠের প্রায় অর্ধেক অংশ গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র এবং মেঘনা এ তিনটি বৃহৎ নদী প্রণালির সর্বনিম্ন ভাটিতে অবস্থিত এবং গড় উচ্চতা ১০ মিটার সমোন্নতি রেখার নিচে। বাংলাদেশের ভূখণ্ড উত্তর হতে দক্ষিণ দিকে ক্রমশ ঢালু। ফলে সব নদ-নদী এবং এদের উপনদী ও শাখা নদীগুলো উত্তর হতে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর অভিমুখে প্রবাহিত হয়েছে। বাংলাদেশের উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্বাংশের পাহাড়িয়া অংশ ব্যতীত প্রায় সমগ্র দেশই এ সব নদ-নদীর পলল দ্বারা গঠিত সমভূমি।

শ্রেণিবিভাগ: ভূমির অবস্থা এবং গঠনের সময়ানুক্রমিক দিক হতে বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতিকে তিনটি প্রধান বিভাগে ভাগ করা যায়; যথা-

- টারশিয়ারি যুগের পাহাড়সমূহ,
- প্লাইস্টোসিন কালের সোপানসমূহ ও
- সাম্প্রতিককালের প্লাবন সমভূমি



চিত্র ৬.২: বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতির শ্রেণিবিভাগ (উৎস: চৌধুরী, মোয়াজ্জেম হোসেন)

টারশিয়ারি যুগের পাহাড়সমূহ

সিলেটের উত্তর ও পূর্বাংশ এবং চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ী এলাকা নিয়ে এ অঞ্চল গঠিত। টারশিয়ারি যুগের হিমালয় পর্বত উত্থিত হওয়ার সময় এ অঞ্চল গঠিত হওয়ায় একে টারশিয়ারি যুগের পাহাড় বলে। এ পাহাড়গুলো বেলে পাথর, স্লেট জাতীয় পাথর এবং কর্দমের সমন্বয়ে গঠিত। পাহাড়গুলো ক্ষুদ্র-বৃহৎ বৃক্ষরাজি দ্বারা আচ্ছাদিত। এ পাহাড়গুলো দুভাগে বিভক্ত করা যায়, যথা-দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়সমূহ এবং উত্তর ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়সমূহ।

দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়সমূহ: রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান এবং চট্টগ্রাম জেলার কিছু অংশ নিয়ে এ অঞ্চল গঠিত। ভাঁজহস্ত এ পাহাড়গুলো উত্তর-দক্ষিণে লম্বালম্বিভাবে বিস্তৃত এবং এর মাঝে বহু সংকীর্ণ উপত্যকা বিদ্যমান। এ উপত্যকা দিয়ে পাহাড়ীয়া নদীগুলো যেমন, কর্ণফুলী, সাঙ্গু, মাতামুহুরী, হালদা, কাসালং, নাফ প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে। এ পাহাড়গুলোর গড় উচ্চতা প্রায় ৬০০ মি. কিন্তু পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে এর উচ্চতা ক্রমশ বেশি। তবে আরাকান ও লুসাই পাহাড়ের কাছে কয়েকটি পাহাড়ের উচ্চতা খুব বেশি। সর্বোচ্চ শৃঙ্গ বিজয় (তাজিংডং)-এর উচ্চতা ১২৮০ মিটার। এছাড়া কেওক্রাডং (১,২৩০ মি.), মোদকমুয়াল (১,০০৩ মি.), পিরামিড পাহাড় (৯১৯ মি.) উল্লেখযোগ্য।

এ অঞ্চলের জমি কৃষিকাজের জন্য অনুপযুক্ত। অধিবাসিরা জুম পদ্ধতিতে চাষাবাদ করে। ধান, চা, আনারস পার্বত্য অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য ফসল। এছাড়া বর্তমানে রাবার ও তুলা চাষ হচ্ছে। এছাড়া কতিপয় স্থানে প্রাকৃতিক গ্যাস, কয়লা, চূনাপাথর পাওয়া গেছে। যেমন- লামা ও বান্দরবান এলাকায় লিগনাইট কয়লা ও চূনাপাথর এবং সেমুতাং এলাকায় প্রাকৃতিক গ্যাস আবিষ্কৃত হয়েছে। অসংখ্য চিরসবুজ বৃক্ষরাজি দ্বারা এসব পাহাড় আবৃত। এ বনাঞ্চলে শাল, সেগুন, গর্জন, কড়ই, টিক, চাম্বল প্রভৃতি মূল্যবান বৃক্ষ জন্মে থাকে। এ অঞ্চলে অফুরন্ত বাঁশ সম্পদের উপর ভিত্তি করে কর্ণফুলী কাগজের কল ও রেয়ন মিল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

উত্তর ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়সমূহ: ময়মনসিংহ ও নেত্রকোনা জেলার উত্তরাংশ, সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জে অবস্থিত ছোট বড় বিচ্ছিন্ন পাহাড়গুলো নিয়ে এ অঞ্চল গঠিত। এ অঞ্চলের গড় উচ্চতা ৪০-৬০ মিটার। সিলেট জেলার পাহাড়ীয়া অঞ্চল সিলেট শহরের উত্তরপূর্ব দিকে ১৮৬ বর্গ কি. মি. জুড়ে অবস্থিত। এ পার্বত্য ভূমির উচ্চতা ৬০-৯০ মি. এর বেশি নয়। সুনামগঞ্জ জেলার ছাতক শহরের উত্তরে প্রায় ৪০ বর্গ কি. মি. স্থান নিয়ে একটি টিলা পাহাড় অবস্থিত। এটি ছাতক পাহাড় নামে পরিচিত। মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলার দক্ষিণের পাহাড়গুলো দক্ষিণাঞ্চলে বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিত। এসব পাহাড়ের ঢালগুলো খাড়া এবং উপরিভাগ অসমান। এদের উচ্চতা ৬০ হতে প্রায় ৩১০ মি.। এদেরকে ত্রিপুরার পাহাড় বলে। শেরপুর ও ময়মনসিংহ জেলার উত্তর সীমানার পাহাড়গুলো ভারতের গারো পাহাড়ের অংশবিশেষ।

এ পার্বত্য অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। তাই এখানকার পাহাড়ের ঢালে প্রচুর চা উৎপন্ন হয়। দেশের অধিকাংশ চা বাগান এ অঞ্চলে অবস্থিত। এখানে প্রচুর আনারসও উৎপন্ন হয়। এছাড়া এ অঞ্চলে বাঁশ ও বেত প্রচুর জন্মে থাকে। এ অঞ্চল প্রাকৃতিক গ্যাস, খনিজ তেল, চূনাপাথর, কয়লা প্রভৃতি খনিজসম্পদে সমৃদ্ধ।

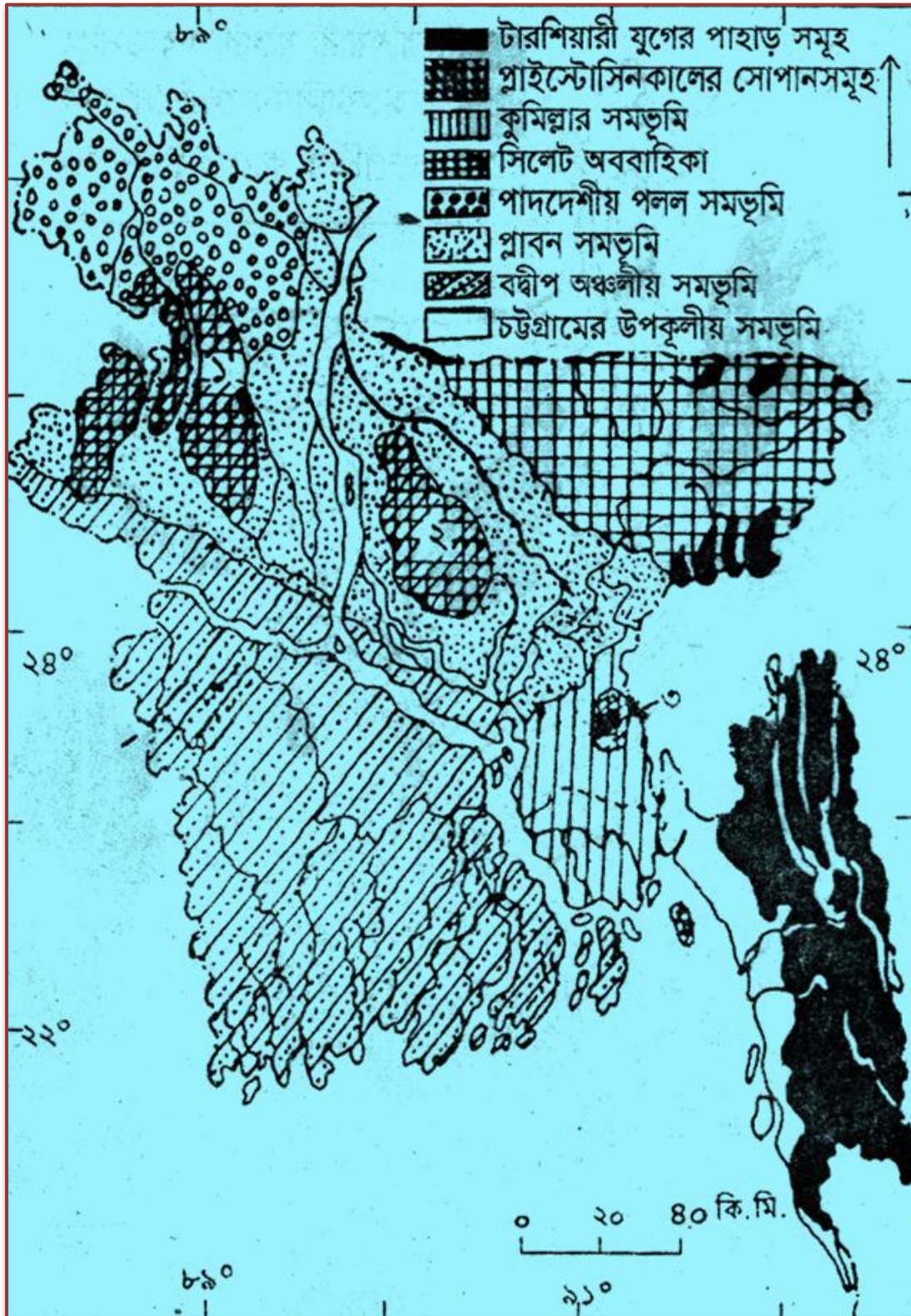
প্লাইস্টোসিন কালের সোপানসমূহ

প্লাইস্টোসিন যুগের অন্তঃবরফ গলা পানিতে প্লাবনের সৃষ্টি হয়ে এ সব উচ্চভূমি গঠিত হয়েছে বলে অনুমান করা হয়। বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাংশের সুবিশাল বরেন্দ্রভূমি, মধ্যভাগের মধুপুর ও ভাওয়ালের গড় এবং কুমিল্লা জেলার লালমাই পাহাড় এ অঞ্চলের অন্তর্গত। এ অঞ্চলের মাটির রং লাল ও ধূসর।

বরেন্দ্রভূমি: বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমে পদ্মা যমুনার দোয়াব অঞ্চলের মধ্যভাগে, রাজশাহী বিভাগের নওগাঁ, রাজশাহী, বগুড়া, জয়পুরহাট, গাইবান্ধা, রংপুর, দিনাজপুর জেলার অংশবিশেষ এটি অবস্থিত। এর আয়তন ৯,৩২০ বর্গ কি. মি. এবং বঙ্গ অববাহিকায় এটি সর্ববৃহৎ প্লাইস্টোসিন যুগের উচ্চভূমি। এ এলাকার ভূমি অসমতল এবং মাটি লাল ও কংকরময়। এ এলাকা প্লাবন সমভূমি থেকে ৬-১২ মি. উঁচু বলে এ ভূমি বার্ষিক প্লাবনের আওতামুক্ত থাকে। বরেন্দ্রভূমিকে উত্তর-পূর্বে বেঁটন করে। করতোয়া নদী বরাবর ৬৪ কি. মি. দীর্ঘ একটি চ্যুতি বিদ্যমান। এ চ্যুতি করতোয়া নদীর গতিপথকে নিয়ন্ত্রণ করছে।

গভীর খাতবিশিষ্ট আঁকাবাঁকা ছোট ছোট কয়েকটি শ্রোতস্বিনী এ অঞ্চলে রয়েছে। এ সব শ্রোতস্বিনী খাঁড়ি নামে পরিচিত। এটি পশ্চিমে মহানন্দা ও পূর্বে করতোয়া নদী দ্বারা বেষ্টিত। সমগ্র অঞ্চলটি মহানন্দা, পুনর্ভবা, আত্রাই ও যমুনা নদী দ্বারা চারটি অংশে বিভক্ত। এর পূর্বদিকের তিনটি অংশ বাংলাদেশে অন্তর্গত। মহানন্দা ও পুনর্ভবা মধ্যবর্তী অপর অংশটি ভারতের পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত। বরেন্দ্রভূমির দক্ষিণ-পূর্বের অববাহিকাকে ভর অববাহিকা নামে আখ্যায়িত করা হয়। রাজশাহী, নাটোর ও পাবনা জেলার অংশবিশেষ নিয়ে ভর অববাহিকা গঠিত এবং এর কেন্দ্রভাগের বিশাল জলমগ্ন এলাকা চলন বিল নামে সুপরিচিত। এ অঞ্চল কৃষিকাজের জন্য যথেষ্ট উপযোগী। প্রধান ফসল ধান ছাড়া পাট, ভুট্টা, পান প্রভৃতি এ অঞ্চলে কিছু কিছু উৎপন্ন হয়।

মধুপুর ও ভাওয়ালের গড়: উত্তরে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদ হতে দক্ষিণে বুড়িগঙ্গা নদী পর্যন্ত এ অঞ্চল বিস্তৃত। এটি প্লাইস্টোসিন কালের দ্বিতীয় বৃহত্তম উচ্চভূমি। এ অঞ্চলের মোট আয়তন ৪,১০৫ বর্গ কি. মি.। টাঙ্গাইল ও ময়মনসিংহ জেলার মধ্যে অবস্থিত এ অঞ্চলের উত্তরাংশ মধুপুর গড় এবং গাজীপুর জেলার মধ্যে অবস্থিত এ অঞ্চলের দক্ষিণাংশ ভাওয়ালের গড় নামে পরিচিত। এ গড়েরপূর্ব ও দক্ষিণাংশের উচ্চতা ৬ মি. কিন্তু পশ্চিম ও উত্তর দিকের উচ্চতা ৩০ মি.।



চিত্র ৬.৩: বিভাগ উপবিভাগসহ বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতি (উৎস: চৌধুরী, মোয়াজ্জেম হোসেন)

মালভূমি সদৃশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টিলার সমন্বয়ে এ গড় গঠিত। টিলাগুলো পাকে পাকে জড়ানো শ্রোতধারা দ্বারা বিচ্ছিন্ন। শ্রোতধারার অববাহিকাসমূহ বেশিরভাগই সমতল এবং এগুলোতে সাম্প্রতিক কালের কালো রং এর পলল বিদ্যমান। স্থানীয় ভাষায় এদেরকে বাইদ বলা হয়। বাইদগুলো এ গড়ের সর্বাপেক্ষা উর্বর এলাকা এবং এগুলোতে ধান চাষ হয়ে থাকে। এ গড়ের উত্তর প্রান্তকে বেষ্টিত করে বানার নদী গড়ের পূর্বাংশ বরাবর প্রবাহিত হয়ে দক্ষিণ-পূর্বমুখী হয়ে শীতলক্ষ্যা নদীর সাথে মিলিত হয়েছে। বরেন্দ্রভূমির মত এখানকার মাটির রং লাল ও কংকরময় কিন্তু এ অঞ্চল কৃষিকাজের জন্য বিশেষ উপযোগী নয়। এ এলাকায় আনারস ও নানা ধরনের সবজি উৎপন্ন হয়। এ বনভূমিতে প্রচুর শাল গাছ জন্মে থাকে।

লালমাই পাহাড়: কুমিল্লা শহরের ৮ কি. মি. পশ্চিমে লালমাই পাহাড় অবস্থিত। এর আয়তন প্রায় ৩৪ বর্গ কি. মি.। এটি পশ্চিম এবং পূর্ব দিকে চ্যুতি দ্বারা বেষ্টিত। এটি চ্যুতির মধ্যবর্তী অংশ হর্স্ট (Horst) শ্রেণিভুক্ত। এর গড় উচ্চতা ২১ মি. কিন্তু স্থান বিশেষে কোন কোন চূড়ার উচ্চতা ৪৬ মি. পর্যন্ত দেখা যায়। এখানকার মাটির রং লাল এবং নুড়ি, বালি ও কংকর দ্বারা গঠিত। এ পাহাড়ের পাদদেশে তরমুজ, আলু ইত্যাদির চাষ হয়।

সাম্প্রতিককালের প্লাবন সমভূমি

এ অঞ্চল গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, যমুনা এবং মেঘনা প্রভৃতি নদ-নদী, এদের উপনদী ও শাখা নদীবাহিত পলল দ্বারা গঠিত। এ অঞ্চলটি বাংলাদেশের অধিকাংশ স্থানব্যাপী অবস্থিত। এ সমভূমির গড় উচ্চতা ৯ মিটারের বেশি নয়। এ অঞ্চলের মাটি খুব উর্বর এবং কৃষিকাজের জন্য খুব উপযোগী। এ অঞ্চলটি সর্বত্র একইরূপ নয় বলে একে ৫ টি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

কুমিল্লার সমভূমি: চাঁদপুর, কুমিল্লা ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার অধিকাংশ এবং লক্ষ্মীপুর, নোয়াখালি, ফেনী ও হবিগঞ্জ জেলার কিছু অংশ জুড়ে এ সমভূমি অবস্থিত। এ সমভূমির উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৩.৬-৬ মি. এবং বর্ষাকালে এটি প্রায়ই ডুবে যায়। এ অঞ্চলের মাটি খুব উর্বর বলে ধান, পাট ও অন্যান্য ফসল জন্মে থাকে।

সিলেট অববাহিকা: সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলার অধিকাংশ এবং কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোনা জেলার পূর্বদিকের সামান্য অংশ নিয়ে এ অঞ্চল গঠিত। এ অঞ্চলের উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৩ মি. বর্ষাকালে এটি পানিতে ডুবে যায় এবং শীতকালে পানি নেমে গেলে এখানে বোরো ও ইরি ধানের চাষ হয়। সর্বনিম্ন স্থানগুলোতে প্রকাণ্ড জলাশয়ের ন্যায় পানি জমে থাকে। এগুলো হাওড় নামে পরিচিত। এর মধ্যে ছাতকের দেখার, জগন্নাথপুরের নালায়ার, ফেঞ্চুগঞ্জের হাকালুকি, শ্রীমঙ্গলের হাইল, প্রভৃতি হাওড় বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

পাদদেশীয় পলল সমভূমি: হিমালয় পর্বত থেকে বিভিন্ন জলধারা ও নদ-নদী (তিস্তা, আত্রাই, করতোয়া প্রভৃতি) কর্তৃক বাহিত পলি পর্বতের পাদদেশে অবক্ষেপনের ফলে সুষম ঢালবিশিষ্ট এ পাদদেশীয় সমভূমি গঠিত হয়েছে। দেশের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত বৃহত্তর রংপুর ও দিনাজপুর জেলার অধিকাংশ স্থান জুড়ে এ সমভূমি বিস্তৃত। এ সমভূমির উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৩০ মি. এবং বর্ষাকালে এর সামান্য অংশ পানিতে ডুবে যায়। ধান, পাট, ইক্ষু, তামাক প্রভৃতি এ অঞ্চলে প্রচুর জন্মে থাকে।

গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনার পলল সমভূমি: এটি বাংলাদেশের মূল প্লাবনভূমি। এ সমভূমি বৃহত্তর ঢাকা, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, পাবনা ও রাজশাহী জেলার অংশবিশেষ নিয়ে বিস্তৃত। বর্ষাকালে এর অধিকাংশ প্রতিবছর পানিতে ডুবে যায়। প্রাকৃতিক বাঁধ, পশ্চাৎ ঢাল, অগভীর জলাভূমি বা বিল, অশ্বখুরাকৃতি হ্রদ, চর ইত্যাদি এ প্লাবন সমভূমির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

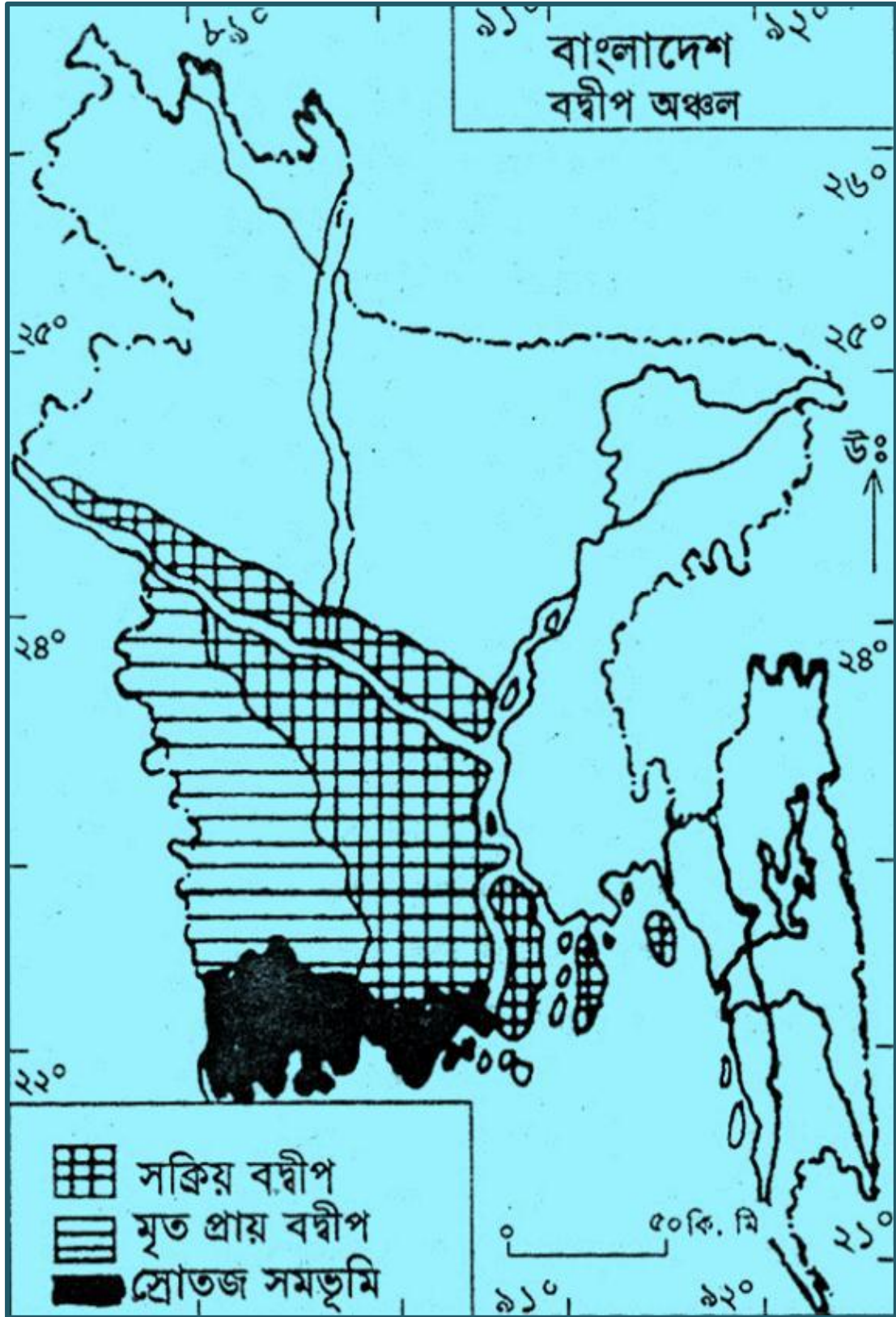
বদ্বীপ অঞ্চলের সমভূমি: বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমের সমভূমিকে সাধারণত বদ্বীপ বলা হয়। এ বদ্বীপ অঞ্চলটি বৃহত্তর কুষ্টিয়া, যশোর, ফরিদপুর, বরিশাল, পটুয়াখালি অঞ্চলের সমুদয় অংশ এবং রাজশাহী, পাবনা ও ঢাকা অঞ্চলের কিছু অংশ জুড়ে বিস্তৃত।

বদ্বীপ অঞ্চলের সমভূমিকে আবার তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়; যেমন- সক্রিয় বদ্বীপ, মৃতপ্রায় বদ্বীপ, শ্রোতজ সমভূমি।

সক্রিয় বদ্বীপ: পূর্বে মেঘনা নদীর মোহনা হতে পশ্চিমে গড়াই- মধুমতি নদী পর্যন্ত বিস্তৃত বদ্বীপ সমভূমির পূর্বাংশকে সক্রিয় বদ্বীপ বলা হয়। এর পূর্বাংশীয় অঞ্চল প্রতি বছর বর্ষাকালে প্লাবিত হয়।

মৃতপ্রায় বদ্বীপ: বাংলাদেশের বদ্বীপ সমভূমির মধ্যে গড়াই-মধুমতি নদীর পশ্চিমাংশকে মৃতপ্রায় বদ্বীপ বলা হয়। এটা বৃহত্তর কুষ্টিয়া ও যশোর অঞ্চলের অধিকাংশ স্থানব্যাপী বিস্তৃত। এ অঞ্চলের অধিকাংশ নদী ভরাট হয়ে মৃতপ্রায় অবস্থায় রয়েছে।

শ্রোতজ সমভূমি: বাংলাদেশের বদ্বীপ সমভূমির দক্ষিণ ভাগের যে অংশে বঙ্গোপসাগরের জোয়ার-ভাটার প্রভাব পরিলক্ষিত হয় সেই অংশকে শ্রোতজ সমভূমি বলে। এ অঞ্চলের নদীতে নিয়মিত জোয়ার-ভাটা হয়। এ সমভূমির অধিকাংশ অঞ্চল জুড়ে ম্যানগ্রোভ বনভূমি।



চিত্র ৬.৪: বঙ্গোপসাগরীয় সমভূমি (উৎস: চৌধুরী, মোয়াজ্জেম হোসেন)

চট্টগ্রামের উপকূলীয় সমভূমি: সমুদ্র উপকূল বরাবর চট্টগ্রাম জেলার সংকীর্ণ স্থান জুড়ে অবস্থিত একটি ভূপ্রাকৃতিক অঞ্চল (চিত্র ৬.৪)। উত্তরে ফেনী নদী থেকে শুরু করে দক্ষিণে মাতামুহুরী নদীর বদ্বীপ পর্যন্ত বিস্তৃত এ সমভূমি ১২১ কি. মি. দীর্ঘ। গড়ে প্রস্থ ৮-১০ কি. মি. পর্যন্ত, তবে কর্ণফুলি নদীর মোহনায় প্রায় ২৬ কি. মি. (উৎস: বাংলাপিডিয়া)।

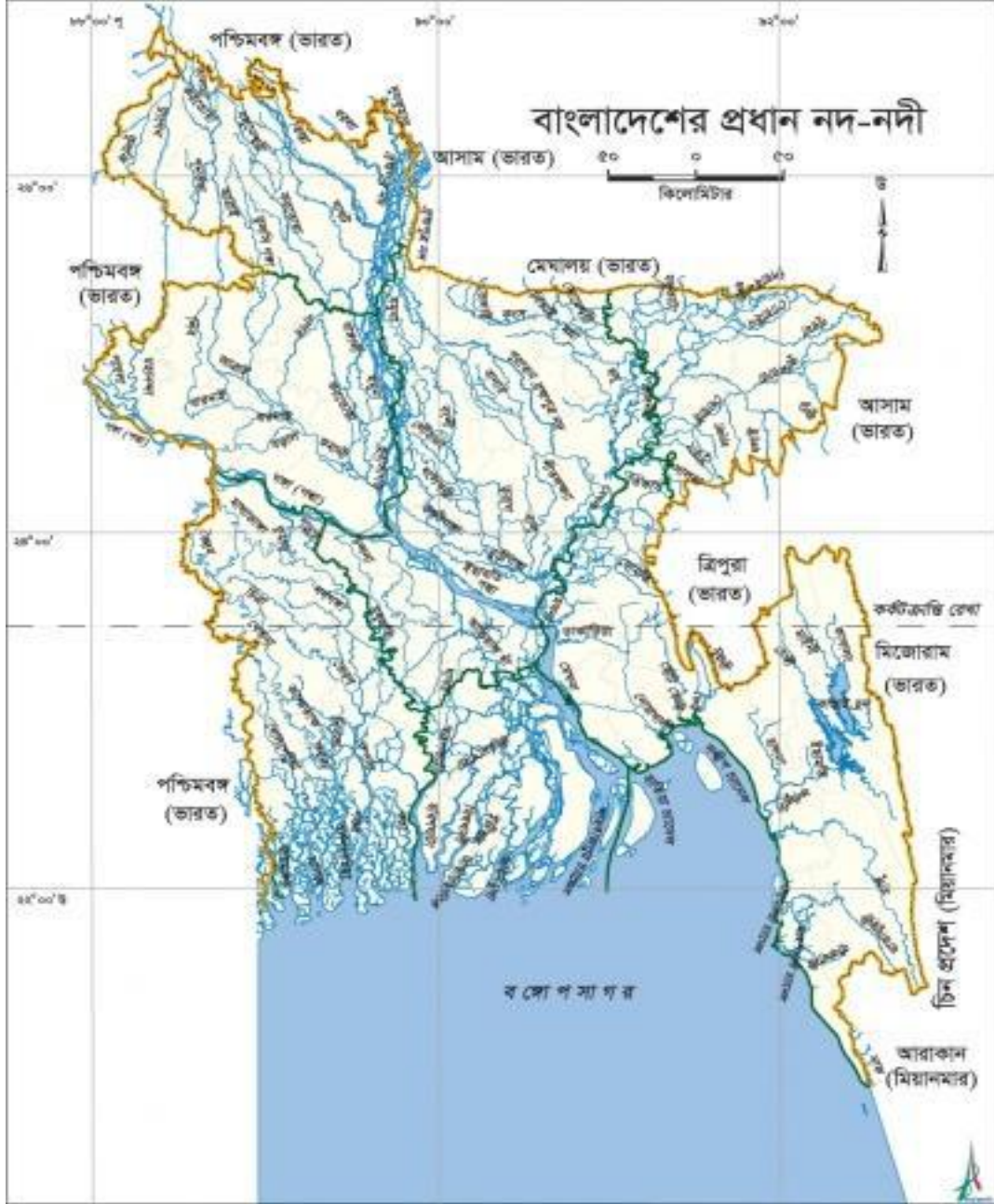
এ সমভূমি কর্ণফুলি, সাঙ্গু, মাতামুহুরী, বাঁশখালি প্রভৃতি নদীবাহিত পলল দ্বারা গঠিত। এছাড়া সমুদ্রতট, বালুসৈকত, বালিয়াড়ি, কর্দমভূমি ইত্যাদি উপকূলীয় প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যসমূহ এখানে পরিলক্ষিত হয়। এ অঞ্চলের পতেঙ্গা সমুদ্র সৈকত, কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত, ইনানী সমুদ্র সৈকত, টেকনাফ সমুদ্র সৈকত বিশেষ প্রসিদ্ধ। এর কোন কোন স্থানে সমুদ্রের পানি হতে লবণ প্রস্তুত করা হয়।

বাংলাদেশের নদ-নদী

বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। শাখানদী, উপনদীসহ প্রায় ৭০০ নদী জালের মত ছড়িয়ে আছে, যার দৈর্ঘ্য প্রায় ২৩,১৪০ কি. মি.। প্রধান নদীব্যবস্থা গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা (BGM)। পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র, যমুনা, মেঘনা ও কর্ণফুলি প্রভৃতি বাংলাদেশের প্রধান নদী। ছোট ছোট পাহাড়ি বরগা, আঁকাবাঁকা মৌসুমি খাড়ি, কাঁদাময় খাল-বিল, নদ-নদী ও এদের উপনদী এবং শাখানদী সমন্বয়ে বাংলাদেশের বিশাল নদীব্যবস্থা গড়ে ওঠেছে।

পদ্মা: পদ্মা বাংলাদেশের প্রধান নদী। পদ্মা হিমালয়ের গঙ্গোত্রী হিমবাহ থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে। এ নদী দক্ষিণে অগ্রসর হয়ে প্রথমে পশ্চিমে ও পরে পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়ে ভারতের হরিদ্বারের কাছে পৌঁছে সমভূমিতে পড়েছে। এ স্রোত গঙ্গা নামে পরিচিত। পরে গঙ্গা নদী উত্তর প্রদেশ ও বিহার রাজ্যের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে মুর্শিদাবাদ জেলার ওপর দিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়ে বাংলাদেশের রাজশাহী জেলার দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্ত এবং কুষ্টিয়া জেলার উত্তর-পশ্চিম প্রান্ত দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। কিছুদূর পূর্বদিকে অগ্রসর হওয়ার পরে দৌলতদিয়ার কাছে যমুনা নদীর সাথে মিলিত হয়ে পদ্মা নামে প্রবাহিত হয়ে চাঁদপুরের কাছে মেঘনা নদীর সাথে মিশেছে। এ মিলিত স্রোত দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে মেঘনা নামে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে। পদ্মানদীর দৈর্ঘ্য ১২০ কি. মি. (উৎস: Wikipedia) এবং ৪-৮ কি. মি. প্রশস্ত। বর্ষা মৌসুমে পানি নিঃসরণের পরিমাণ ৭৫০,০০০ কিউসেক পর্যন্ত দেখা যায় এবং এর সাথে পলি বহনের পরিমাণও বেড়ে যায়। পদ্মার নিম্ন পর্যায়ে পানি নিঃসরণের পরিমাণ ১৫,০০০ কিউসেক এবং এ সময়ে স্বাভাবিকভাবে খুব সামান্য পরিমাণ পলি বাহিত হয়। নদীর বদ্বীপ অংশে প্রশস্ততার পরিসীমা ১.৬-৮ কি. মি.। শাখা নদীর মধ্যেকুমার, মাথাভাঙ্গা, গড়াই, ভৈরব, মধুমতি ও আড়িয়াল খাঁ উল্লেখযোগ্য। উপনদী হলো মহানন্দা, পুনর্ভবা, নাগর, কুলিখ, টাঙ্গন। পদ্মা বিধৌত অঞ্চলের আয়তন প্রায় ৩৪,১৮৮ বর্গ কিলোমিটার।

মেঘনা: আসামের নাগা ও মনিপুরের জলবিভাজিকার দক্ষিণ ঢালে বরাক নদী উৎপন্ন হয়েছে। এ প্রবাহিত ধারা সিলেট সীমান্তসুরমা ও কুশিয়ারা নামে দুই শাখায় বিভক্ত হয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। উত্তরের শাখা সুরমা নামে খাসিয়া ও জয়ন্তিকা পাহাড়ের নিকট দিয়ে প্রবাহিত হয়ে পশ্চিমে দিকে ছাতক, সিলেট ও সুনামগঞ্জের নিকট দিয়ে অগ্রসর হয়ে দক্ষিণে হবিগঞ্জ জেলার উত্তর সীমানায় পৌঁছে এবং আজমিরিগঞ্জের কাছে কালনী নদীর সাথে মিলিত হয়েছে। দক্ষিণের শাখা কুশিয়ারা নাম ধারণ করে কালনী নদীর সাথে মিলিত হয়েছে। এ দুই নদীর মিলিত প্রবাহ কিছুদূর প্রবাহিত হয়ে মেঘনা নাম ধারণ করে এবং ভৈরববাজারের কাছে পুরাতন ব্রহ্মপুত্রের সাথে মিলিত হয়েছে। পরে এ মিলিত স্রোত দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে চাঁদপুরের নিকট পদ্মা নদীর সাথে মিলিত হয়েছে। পরে এ নদী আরও দক্ষিণে অগ্রসর হয়ে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে। বাংলাদেশে সুরমা-মেঘনার মোট দৈর্ঘ্য ৬৭০ কি. মি.। নদীটির উপরের অংশ, নিম্নাংশের চেয়ে অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ। ভৈরব বাজারে নদীর বিস্তার প্রায় ১ কি. মি., ষাটনলের কাছে ৫ কি. মি. এবং চাঁদপুরের কাছে ১১ কি. মি.। শাখানদী হলো- গোমতি, তিতাস, খোয়াই। উপনদী হলো ধনু, মোগরা, মহাসিংহ ও বাউলাই। মেঘনা বিধৌত আয়তন ২৯,৭৮৫ বর্গকিলোমিটার।



চিত্র ৬.৫: বাংলাদেশের নদ-নদী

ব্রহ্মপুত্র: পৃথিবীর দীর্ঘতম নদীর মধ্যে একটি। এর অববাহিকা চীন, ভারত ও বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে বিস্তৃত। তিব্বতের মানস সরোবর এবং হিমালয় পর্বতের কৈলাশ শৃঙ্গের মধ্যবর্তী পার্খা নামক গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য কেন্দ্র থেকে ১৪৫ কি. মি. অদূরে অবস্থিত চেমায়ুং-দুং হিমবাহ থেকে সাংপো নামে উৎপন্ন হয়েছে। উৎপত্তি লাভের পর তিব্বত ও আসামের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে কুড়িখাম জেলার মাজহিয়ালী নামক স্থানে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। জামালপুরের দেওয়ানগঞ্জের কাছে ব্রহ্মপুত্র নদী দুটি শাখার বিভক্ত হয়। একটি শাখা যমুনা নামে দৌলতদিয়ার কাছে পদ্মার সাথে মিলিত হয়েছে। অন্যশাখা পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নামে প্রবাহিত হয়ে ভৈরবের নিকট মেঘনা নদীর সাথে মিলিত হয়েছে। প্রায় দুশ বছর আগে এটাই ব্রহ্মপুত্রের মূলগতিপথ ছিল। ১৭৮৭ খ্রিষ্টাব্দের তীব্র ভূমিকম্প ও প্রলয়ংকরী বন্যার পরে নদীটির গতিপথে পরিবর্তন হয়েছিল। এ বিশাল প্রভাবিত এলাকার আয়তন ৫,৮৩,০০০ বর্গ কি. মি., যার ৪৭,০০০ বর্গ কিলোমিটারের অবস্থান বাংলাদেশ এলাকায়। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে নদীটি বিনুনি ধরনের। ব্রহ্মপুত্রের প্রধান শাখানদী যমুনা ও পুরাতন ব্রহ্মপুত্র। যমুনা নদীর শাখানদী ধলেশ্বরী। তিস্তা, ধরলা, দুধকুমার ব্রহ্মপুত্রের উপনদী।

যমুনা নদী: ব্রহ্মপুত্রের অন্য শাখানদীর নাম যমুনা। এটি দক্ষিণাভিমুখে প্রবাহিত হয়ে গোয়ালন্দের নিকট পদ্মার সাথে মিলিত হয়েছে। বাংলাদেশে ভূখণ্ডে ব্রহ্মপুত্র-যমুনার দৈর্ঘ্য ২৭৬ কি. মি. যার যমুনা নদীর দৈর্ঘ্য ২০৫ কি. মি.। নদীটির প্রশস্ততা ৩-২০ কি. মি., তবে এর গড় প্রশস্ততা প্রায় ১০ কি. মি.। তবে বর্ষা ঋতুতে এর প্রশস্ততা কোন স্থানেই ৫ কি. মি. এর কম হয় না।

বাস্তবে যমুনা একটি চরোৎপাদী নদী এবং বিনুনি, সর্পিলাকৃতি প্রভৃতি বিভিন্ন প্যাটার্নের প্রবাহখাত নিয়ে এ নদী গঠিত। এ নদীর মধ্যে বালুচর (Sandbars), চর (bars) দেখা যায়। যমুনা নদীর শাখানদী ধলেশ্বরী এবং আত্রাই, করতোয়া, ইছামতি যমুনার উপনদী।

কর্ণফুলী: আসামের লুসাই পাহাড় হতে কর্ণফুলী নদীর উৎপত্তি হয়ে রাঙ্গামাটি ও চট্টগ্রামের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে। কর্ণফুলি নদী ২৭.৪ কিলোমিটার দীর্ঘ। কাপ্তাই নামক স্থানে এ নদীতে বাঁধ দিয়ে কর্ণফুলি পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। উপনদী হলো হালদা, ইছামতি, বোয়ালখালী ও কাসালং।

সাপু: বাংলাদেশ এবং মায়ানমার সীমানার অবস্থিত আরাকান পাহাড় হতে সাপু নদী উৎপত্তি লাভ করেছে। নদীটি এ পাহাড় হতে নির্গত হয়ে বান্দরবন ও চট্টগ্রামের ওপর দিয়ে প্রবাহিত কর্ণফুলি নদীর মোহনার দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে।

ফেনী: ভারতের পার্বত্য ত্রিপুরা হতে ফেনী নদীর উৎপত্তি ঘটেছে। উৎপত্তিস্থল হতে দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। এ স্রোতধারা ফেনী জেলার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে পূর্ব সীমানায় অবস্থিত সন্দ্বীপ প্রণালির উত্তরে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে।

মাতামুহুরী: এটি লামার এভার পর্বত হতে উৎপন্ন হয়ে লামা থানার ভিতর দিয়ে উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয় এবং কক্সবাজার জেলার চকোরিয়ার নিকট দিয়ে পশ্চিমে অগ্রসর হয়ে বঙ্গোপসাগর পতিত হয়েছে। এর দৈর্ঘ্য-প্রায় ১২০ কি. মি.।

হালদা: হালদা নদী খাগড়াছড়ির বাদনাতলী পর্বত শৃঙ্গে উৎপন্ন হয়ে দক্ষিণে অগ্রসর হয়ে কালুরঘাটের নিকট কর্ণফুলী নদীতে পতিত হয়েছে।

নাফ: নাফ নদী বাংলাদেশের সর্বদক্ষিণ সীমা বরাবর প্রবাহিত হচ্ছে, এর দৈর্ঘ্য ৫৬ কি. মি.। মায়ানমার ও টেকনাফের সীমা নির্দেশ করে এ নদী বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে।

৬.৪ বাংলাদেশের জলবায়ু

বাংলাদেশের জলবায়ু উষ্ণ, আর্দ্র ও সমভাবাপন্ন। এ দেশের মধ্যভাগে কর্কটক্রান্তি রেখা অতিক্রম করেছে এবং মৌসুমি বায়ুর প্রভাব অধিক হওয়ায় “ক্রান্তীয় মৌসুমি জলবায়ুর দেশ” বলা হয়। ঋতুভেদে উচ্চ তাপমাত্রা, ভারী বর্ষণ, অত্যধিক আর্দ্রতা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য বাংলাদেশের জলবায়ুতে পরিলক্ষিত হয়। সার্বিক বৃষ্টিপাত এবং তাপমাত্রার উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের জলবায়ুকে প্রধানত তিনটি ঋতুতে ভাগ করা যায়, যথা-শীতকাল, গ্রীষ্মকাল এবং বর্ষাকাল।

শীতকাল

নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাস এদেশের শীতকাল বিরাজ করে। এ সময় সূর্য দক্ষিণ গোলার্ধে অবস্থান করে বলে বাংলাদেশে এর রশ্মি তীব্রভাবে পড়ে এবং উত্তাপের পরিমাণ যথেষ্ট কমে যায়। ফলে তাপমাত্রার পরিমাণ কম থাকে। কখনও শিশির এবং কুয়াশা পড়তে দেখা যায়। এ ঋতুতে বাংলাদেশের আবহাওয়া মোটামুটি শুষ্ক, শীতল ও আরামদায়ক থাকে বলে সবচেয়ে সুন্দর ও উপভোগ্য ঋতু বলতে এ ঋতুকে বোঝায়।

উষ্ণতা: শীতকালে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন উষ্ণতার তাপমাত্রা যথাক্রমে ২৯° সে. ও ১১° সে. এবং গড় তাপমাত্রা প্রায় ১৭.৭° সে.। এসময় দক্ষিণাংশ থেকে উত্তরদিকে ক্রমশ তাপমাত্রা কম থাকে। এসময় সমোষ্ণ রেখাগুলো প্রায় সোজা হয়ে পূর্ব-পশ্চিম অবস্থান করে।

বৃষ্টিপাত: এ সময় বাংলাদেশের উপর দিয়ে উত্তর-পূর্ব মৌসুমি বায়ু প্রবাহিত হয়। এ বায়ু স্থলভাগের উপর দিয়ে আসে বলে জলীয়বাষ্প খুব কম থাকে। তবে হিমালয় পর্বতের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার সময় তুষারকণা হতে সামান্য পরিমাণে জলীয়বাষ্প বহন করে। এ বায়ু দেশের পূর্বাঞ্চলের পর্বতসমূহ বাধা পেয়ে সামান্য বৃষ্টিপাত ঘটায়। কোন কোন বছর নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে বঙ্গোপসাগর হতে আগত ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে দেশের দক্ষিণাঞ্চলে কয়েকদিন বৃষ্টিপাত হয়। শীতকালীন বৃষ্টিপাত উপকূলবর্তী অঞ্চল এবং পূর্বদিকের পার্বত্য অঞ্চলেই হয়ে থাকে। এ বৃষ্টিপাতের পরিমাণ স্থানভেদে ৫ হতে ১৫ সে. মি.।

বায়ুপ্রবাহ: শীতকালে উত্তর-পূর্ব দিক হতে শীতল মৌসুমি বায়ু বাংলাদেশের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়। এ সময় বায়ুর সর্বনিম্ন আর্দ্রতা প্রায় ৩৬%। কোন কোন সময় তীব্র শীতল বায়ু দেশে প্রবেশ করে এবং এর উত্তরাংশ তীব্র শীত অনুভূত হয়।

গ্রীষ্মকাল

মার্চ মাস হতে মে মাস পর্যন্ত বাংলাদেশের গ্রীষ্মকাল। সূর্যের উত্তরায়ণের ফলে এ সময় তাপমাত্রা ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। এ বৃদ্ধির পরিমাণ দক্ষিণ হতে উত্তর দিকে ক্রমে অধিক। মার্চ মাসে তাপমাত্রা বেশ বৃদ্ধি পায়।

উষ্ণতা: গ্রীষ্মকাল বাংলাদেশের সবচেয়ে উষ্ণতম ঋতু। এ ঋতুতে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৪°সে. এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২১°সে. পর্যন্ত হয়ে থাকে। এপ্রিল সবচেয়ে উষ্ণতম মাস (গড় হিসেবে) এবং এ মাসের গড় তাপমাত্রা প্রায় ২৮°সে.। অক্টোবর মাস পর্যন্ত তাপমাত্রা সর্বত্র বেশি থাকে। তবে, এপ্রিল ও সেপ্টেম্বর এ দুই মাসকে সর্বাপেক্ষা উষ্ণতম মাস বলে গণ্য করা হয়। এ সময় দেশের দক্ষিণ হতে উত্তর দিকে তাপমাত্রা ক্রমান্বয়ে বেশি থাকে। বাংলাদেশে গ্রীষ্মকালে বৃষ্টিপাত অনুসারে সমতাপ রেখা উত্তর-দক্ষিণে প্রসারিত থাকে। এ সময় বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ক্রমে বেশি এবং পশ্চিম দিকে ক্রমে কম হয়ে থাকে। ফলে সমতাপ রেখার মান পশ্চিম দিকে ক্রমে বেশি। এপ্রিল মাসে দেশের পূর্ব ও দক্ষিণাঞ্চলে তাপমাত্রা ২৭°সেলসিয়াসে এবং পশ্চিম-মধ্যভাগে তা ৩১° সেলসিয়াসে পৌঁছায়। পশ্চিমাঞ্চলে গ্রীষ্মের তাপমাত্রা কখনও কখনও ৪০°সেলসিয়াস পর্যন্ত উঠে থাকে।

বৃষ্টিপাত (কালবৈশাখী বৃষ্টিপাত): প্রাক-মৌসুমি বায়ুর পূর্ববর্তী গ্রীষ্মকালের বৈশিষ্ট্য হলো- অধিক তাপমাত্রা ও বজ্র বিদ্যুৎসহ ঝড়বৃষ্টির ঘটনা। বাংলাদেশের গ্রীষ্মকালীন বৃষ্টিপাত কালবৈশাখী হতে সংঘটিত হয়। সাধারণত উত্তর-পশ্চিম দিক হতে এ ঝড়ের উৎপত্তি হয়। তাই কালবৈশাখী ঝড়কে উত্তর-পশ্চিম বজ্রবিদ্যুৎপূর্ণ ঝড়-বৃষ্টিও বলা হয়। মার্চ হতে মে মাস পর্যন্ত এ ঝড় প্রায়ই সংঘটিত হয়। জুন মাসে মৌসুমি বায়ুর আগমনের সাথে এটি অন্তর্হিত হয়। এ জন্য একে মৌসুমি বায়ুর অগ্রদূত বলা হয়ে থাকে।

দক্ষিণ দিক হতে প্রবাহিত উষ্ণ জলীয়বাস্পপূর্ণ বায়ু উত্তর-পশ্চিমে পৌঁছিয়ে উপরে উঠিত হয়ে থাকে। এ বায়ুর ঠিক উপর দিয়ে উত্তর-পশ্চিম বা পশ্চিম দিক হতে শুষ্ক শীতল বায়ু প্রবাহিত হয়। এ দুই বিপরীতগামী বায়ুপ্রবাহের সন্ধিস্থলে বজ্রবিদ্যুৎ সহ কালবৈশাখী ঝড় শুরু হয়। এ ঝড় সবসময় সন্ধ্যার পূর্বে বা অব্যবহিত পরে আবির্ভূত হয়। এ কালবৈশাখী গতি প্রতি ঘণ্টায় ৪০-৮০ কি. মি.। অনেক সময় এ ঝড়ের গতি ঘণ্টায় ১২৮ কিলোমিটারেরও বেশি হয়ে থাকে এবং ঘরবাড়ি, গাছপালা, শস্য প্রভৃতি নষ্ট হয়। কোন কোন বছর এর দরুন মানুষ ও পশুপাখির প্রাণহানি ঘটে। অনেক সময় কালবৈশাখী ঝড়ের সাথে শিলাবৃষ্টিও হয়ে থাকে।

কাল বৈশাখী ঝড় পূর্বাঞ্চলে সর্বাপেক্ষা বেশি সংঘটিত হয় এবং এ অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অধিক। মার্চ হতে মে মাস পর্যন্ত ৩৮ সে. মি. সমবর্ষণ রেখাটি উত্তর-দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে বাংলাদেশকে দুটি অঞ্চলে বিভক্ত করে। এ রেখার পূর্বে ৩৮ সে. মি. হতে ৭৫ সে. মি. পর্যন্ত এবং পশ্চিমে ২৫ সে. মি. হতে ৩৮ সে. মি. বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে। গ্রীষ্মকালীন মাসগুলোর মধ্যে মে মাস সর্বাপেক্ষা বৃষ্টিবহুল। গড়পড়তা প্রতি তিনদিনে একদিন বৃষ্টি হয়। বাংলাদেশে বার্ষিক বৃষ্টিপাতের এক-পঞ্চমাংশ বৃষ্টিপাত গ্রীষ্মকালেই হয়ে থাকে। গ্রীষ্মকালীন গড় বৃষ্টিপাত ৫১ সে. মি.। অবশ্য কোন কোন বছর এর তারতম্য হয়ে থাকে। সিলেট জেলাতেই এ সময় সর্বাপেক্ষা বেশি বৃষ্টিপাত হয় এবং সেখানে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৭৫ সে. মি. এর অধিক। উত্তর বঙ্গের জেলাগুলোতে এ সময় ৩৮ সে. মি. এর কম বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে। রাজশাহী অঞ্চলে বৃষ্টিপাত সবচেয়ে কম। এখানে ২৫ সে. মি. এর কম বৃষ্টিপাত হয়।

বর্ষাকাল

বাংলাদেশে জুন হতে অক্টোবর মাস পর্যন্ত বর্ষাকাল স্থায়ী হয়। অর্থাৎ গ্রীষ্ম ও শীতকালের মাঝামাঝি বৃষ্টিবহুল সময়কে বর্ষাকাল বলা হয়। জুন মাসের শেষদিকে মৌসুমি বায়ুর আগমনের সাথে সাথে বাংলাদেশে বর্ষাকাল শুরু হয়ে যায়। নিচে বর্ষাকালীনজলবায়ুর বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা হলো-

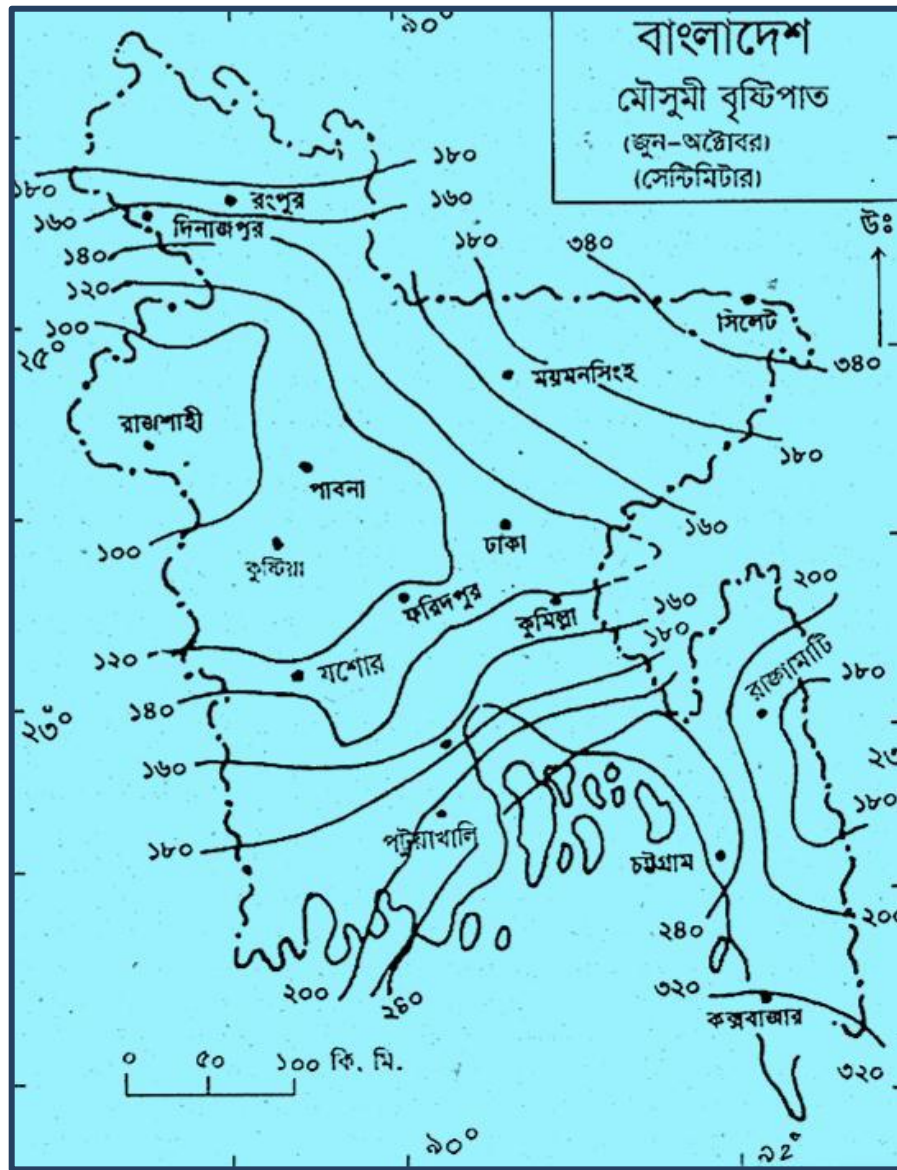
উষ্ণতা: বর্ষাকালে সূর্য বাংলাদেশে লম্বভাবে কিরণ দেওয়ার এখানে অতিরিক্ত তাপ অনুভূত হবার কথা। কিন্তু এ ঋতুতে অধিক বৃষ্টিপাত হয় বলে তাপমাত্রা যে রূপ বৃদ্ধি পাবার সেরূপ বৃদ্ধি পায় না। তবে আবহাওয়া সর্বদা উষ্ণ থাকে। এ সময়কার গড় উষ্ণতা প্রায় ২৭° সে.। প্রাক-বর্ষা মৌসুমের শেষদিকে আকাশে মেঘ জমতে থাকলে তাপমাত্রার সঙ্গে আর্দ্রতার সংযোগ ঘটে এক ধরনের ভ্যাপসা আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়। জুলাই মাসে দেশের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের গড় তাপমাত্রা ২৭° সে. এবং উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে তা বৃদ্ধি পেয়ে ২৯° সে. এ পৌঁছায়। বর্ষাকালের মধ্যে জুন ও সেপ্টেম্বর মাসে সর্বাধিক গরম পড়ে।

এ ঋতুতে উপকূলবর্তী এবং দেশের দক্ষিণ-পূর্বদিকের পাহাড়িয়া অঞ্চলে অধিক বৃষ্টিপাত হওয়ায় এ অঞ্চলে তাপমাত্রা কিছুটা হ্রাস পায়। তবে এ অঞ্চল হতে উত্তর-পশ্চিম দিকের কম বৃষ্টিযুক্ত অঞ্চলে তাপ ক্রমশ বেশি হয়ে থাকে। দক্ষিণ-পূর্বদিকের পার্বত্য অঞ্চলে ২৪.৪° সে., উপকূলবর্তী অঞ্চলে প্রায় সর্বত্র ২৭.২° সে. তাপ অনুভূত হয়। দেশের উত্তর-পশ্চিমাংশে সমোষ্ণ রেখা অনেকটা উত্তর-দক্ষিণে খাড়াভাবে এবং দক্ষিণে উপকূল বরাবর অনেকটা পূর্ব-পশ্চিম দিকে বেকে অবস্থান করে।

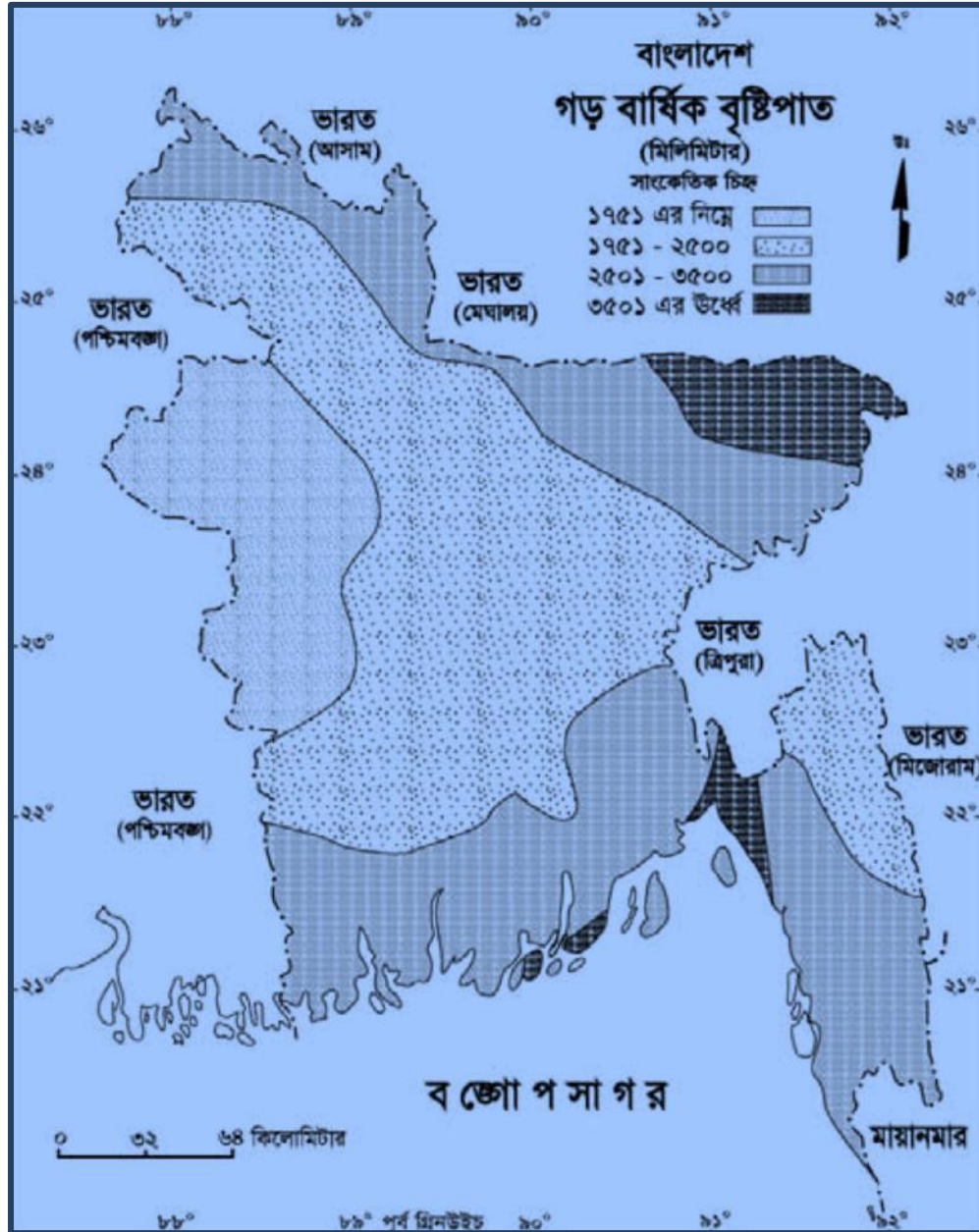
বায়ু প্রবাহ: জুন মাসে সূর্য বাংলাদেশের উপর অবস্থান করায় এ অঞ্চলে বায়ু চাপের পরিবর্তন হয়। এতে উত্তর-পূর্ব বায়ু প্রবাহ অর্ন্তহিত হয় এবং দক্ষিণে-পশ্চিমে মৌসুমি বায়ু প্রবাহিত হতে থাকে। প্রকৃতপক্ষে এ বায়ু সমুদ্র বায়ু নয়, এটা দক্ষিণ-পূর্ব অয়ন বায়ুর সম্প্রসারণ মাত্র। দক্ষিণ-পূর্ব অয়ন বায়ু নিরক্ষরেখা অতিক্রম করার সময় ফেরেলের সূত্র অনুসারে উত্তর গোলার্ধে ডান দিকে বেঁকে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুতে পরিণত হয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে।

বৃষ্টিপাত (মৌসুমি বৃষ্টিপাত): বর্ষাকালে বাংলাদেশের উপর দিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু বইতে থাকে। ভারত মহাসাগরের উপর দিয়ে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে বলে প্রচুর জলীয়বাষ্প থাকে। এ সময় বাংলাদেশের সর্বত্র পানি থাকে এবং অধিক তাপে এ পানিও বাষ্পে পরিণত হয়ে জলীয়বাষ্পপূর্ণ মৌসুমি বায়ুর সাথে মিলিত হয়। ফলে প্রায় প্রতিদিন পরিচলন প্রক্রিয়ায় বৃষ্টিপাত হয়।

এ ছাড়া, জলীয়বাষ্পপূর্ণ বায়ু পর্বত গাত্রে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে উপরে উঠিত হয় এবং ঠাণ্ডা হয়ে ব্যাপকভাবে বৃষ্টিপাত ঘটায়। এ কারণে সিলেট, মৌলভীবাজার, সুনামগঞ্জ, রাঙামাটি, বান্দরবান প্রভৃতি জেলার পাহাড়িয়া অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে। এ সময় দেশের কোথাও ৮০ সে. মি. এর কম বৃষ্টিপাত হয় না।



চিত্র-৬.৬: বাংলাদেশের মৌসুমি বৃষ্টিপাত



চিত্র ৬.৭: বাংলাদেশের গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাতের মানচিত্র

বাংলাদেশে মোট বৃষ্টিপাতের পাঁচ ভাগের চার ভাগ বৃষ্টিপাত বর্ষাকালেই হয়ে থাকে। এ সময়কার গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ সর্বনিম্ন ১১৯ সে. মি. এবং সর্বোচ্চ ৩৪০ সে. মি.। দেশের পশ্চিমাঞ্চলে সবচেয়ে কম বৃষ্টিপাত হয়। পশ্চিম হতে পূর্ব দিকে বৃষ্টিপাত ক্রমে বেশি হয়ে থাকে। যেমন- পাবনায় প্রায় ১১৪ সে. মি., ঢাকায় ১২০ সে. মি., কুমিল্লায় ১৪০ সে. মি., শ্রীমঙ্গলে ১৮০ সে. মি. এবং রাঙামাটিতে ১৯০ সে. মি. বৃষ্টিপাত হয়। এরূপ হবার কারণ হচ্ছে প্রধানত জলীয়বাষ্পপূর্ণ বাতাস যতই পশ্চিমে যায় ততই আর্দ্রতা কমতে থাকে। কারণ, পূর্বাঞ্চলে বৃষ্টিপাত হয়ে যাওয়ায় এ বায়ু অনেকটা জলীয়বাষ্পবিহীন হয়ে পড়ে। এ কারণেই পশ্চিমাঞ্চলে বৃষ্টিপাত কম হয়। এ ঋতুতে পর্বতের পাদদেশে এবং উপকূলবর্তী অঞ্চলের কোথাও ২০০ সে. মি. এর কম বৃষ্টিপাত হয় না। যেমন- সিলেটের পাহাড়িয়া অঞ্চলে ৩৪০ সে. মি.; পটুয়াখালিতে ২০০ সে. মি.; চট্টগ্রামে ২৫০ সে. মি.; রাঙামাটি অঞ্চলে ২৯০ সে. মি. এবং কক্সবাজারে ৩২০ সে. মি. বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে।

আবহাওয়া কেন্দ্রসমূহ

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর দেশের বিভিন্ন স্থানের আবহাওয়া ও জলবায়ু পর্যবেক্ষণ, উপাত্ত সংগ্রহ, নথিভুক্তকরণ এবং সংরক্ষণের দায়িত্ব পালন করে থাকে। দেশের প্রধান প্রধান আবহাওয়া কেন্দ্রসমূহ হলো-বরিশাল, ভোলা, বগুড়া, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, কক্সবাজার, ঢাকা, দিনাজপুর, ফরিদপুর, ফেনী, হাতিয়া, ঈশ্বরদী, যশোর, খেপুপাড়া, খুলনা, কুতুবদিয়া, মাদারীপুর, মাইজদী কোর্ট, ময়মনসিংহ, পটুয়াখালী, রাজশাহী, রাঙ্গামাটি, রংপুর, সৈয়দপুর, সন্দ্বীপ, সীতাকুণ্ড, শ্রীমঙ্গল, সিলেট এবং টেকনাফ।

৬.৫ বাংলাদেশের কৃষিপণ্য (অর্থকরী ও খাদ্যদ্রব্য)

প্রাচীনকাল থেকেই কৃষি বাঙালির জীবিকার উৎস। বাংলাদেশে মূলত কৃষিপ্রধান দেশ। কৃষিজ সম্পদের উপর ভিত্তি করে এ দেশের অর্থনীতি গড়ে উঠেছে। দেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৮৫ ভাগ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল। কৃষি জাতীয় আয়ের প্রধান উৎস। বিস্তীর্ণ সমভূমি, উর্বর মৃত্তিকা ও বৃষ্টিবহুল উষ্ণ-আর্দ্র জলবায়ু এ দেশের মৃত্তিকাকে উৎকৃষ্ট কৃষিভূমিতে পরিণত করেছে। ফসল উৎপাদনের ক্ষেত্রে জমি প্রধান উপাদান হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশে এটি একটি অপ্রতুল প্রাকৃতিক সম্পদ।

বাংলাদেশের কৃষির বৈশিষ্ট্য

বাংলাদেশ কৃষিনির্ভর হলেও প্রকৃত পক্ষে এ দেশের কৃষি ব্যবস্থা অনুন্নত। এ দেশের কৃষি বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ -

স্বয়ংভোগী কৃষি: এদেশের কৃষির প্রধান বৈশিষ্ট্য স্বয়ংভোগী ব্যবস্থা। কৃষকরা সাধারণত নিজের ও পারিবারিক প্রয়োজন মেটাবার কৃষিকাজ করে যা স্বয়ংভোগী কৃষি নামে পরিচিত।

প্রাচীন পদ্ধতিতে চাষাবাদ: এদেশে কৃষিক্ষেত্রে প্রাচীন পদ্ধতিতে চাষাবাদ করা হয়। বর্তমানে বৈজ্ঞানিক যুগেও কৃষকেরা চাষ করতে প্রাচীন আমলের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে। এছাড়া রাসায়নিক সারের সঠিক ব্যবহার জ্ঞানও তাদের জানা নাই।

প্রকৃতি নির্ভর কৃষি: বাংলাদেশের কৃষকেরা এখনও প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে কৃষিকাজ করেন। প্রাকৃতিক নিয়ামক যথা ভূপ্রকৃতি, জলবায়ু, নদ-নদী ও মৃত্তিকা দ্বারা এদেশের কৃষিকাজ প্রভাবিত। বিশেষ করে মৌসুমি বায়ুদ্বারা এদেশের কৃষি অধিক নিয়ন্ত্রিত।

ভূমিহীন কৃষক: বাংলাদেশে ভূমির তুলনায় জনসংখ্যা বেশি। তাই জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য এদেশে ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা অধিক। ফলে তারা অন্যের জমিতে কাজ করে এবং অধিক উৎপাদনে উৎসাহ বোধ করে না। এ কারণে উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় না।

স্বল্প উৎপাদন ক্ষমতা: এ দেশের কৃষির উল্লেখযোগ্য দিক হলো স্বল্প উৎপাদন ক্ষমতা। প্রাচীন পদ্ধতিতে চাষাবাদ, সেচ ব্যবস্থার অভাব, ক্ষুদ্র আয়তন বিশিষ্ট ভূমি, অন্যের জমিতে চাষের কাজ প্রভৃতি কারণে এদেশে কৃষিক্ষেত্রে একর প্রতি উৎপাদন কম হয়।

ক্ষুদ্র কৃষি ভূমি: এদেশের কৃষিভূমি গুলো ক্রমে খণ্ডিত হচ্ছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমি বৈজ্ঞানিক উপায়ে চাষাবাদের অযোগ্য। কৃষি উৎপাদনের স্বল্পতার এটি অন্যতম কারণ।

পতিত জমি: জমির অযোগ্যতার কারণে কৃষকেরা দেশের সব জমিতে চাষ করতে পারে না। ফলে প্রতিবছর বেশ কিছু জমি অনাবাদী বা পতিত থাকে। সেচ ব্যবস্থা, পানি নিষ্কাশন প্রভৃতির মাধ্যমে জমিকে উপযুক্ত করে চাষাবাদের যোগ্য করে জাতীয় উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করা সম্ভব।

বৃষ্টিপাতের ওপর নির্ভরশীল: এদেশের কৃষি বৃষ্টিপাতের ওপর নির্ভরশীল। দেশের সর্বত্র সেচ ব্যবস্থা যথেষ্ট নয়। তাই কৃষকরা পানির জন্য বৃষ্টিপাতের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এ কারণে আমাদের দেশে সময়মত বৃষ্টিপাত না হলে চাষের অসুবিধার সৃষ্টি হয়।

কৃষকের দরিদ্রতা: আমাদের দেশের কৃষকরা সাধারণত গরিব শ্রেণির। অভাব তাদের নিত্যসঙ্গী। ফলে তারা শারীরিক ও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত থাকে। তাই বলা যায় কৃষির উন্নয়নে কৃষকের দরিদ্রতা বাঁধাস্বরূপ।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষির গুরুত্ব

জাতীয় আয়ের প্রধান উৎস কৃষি জাতীয় আয়ের সর্বপ্রধান উৎস। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে মোট জিডিপি ১৫.৩৩% কৃষিখাত থেকে আসে।

প্রধান পেশা: বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ গ্রামে বাস করে এবং দেশের প্রায় শতকরা ৬৮.৫ ভাগ লোক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষির ওপর নির্ভরশীল। সেজন্য এ দেশের মানুষের প্রধান পেশা হিসেবে কৃষিকে চিহ্নিত করা যায়। আবার এক্ষেত্রে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পেয়ে বেকার সমস্যা দূর হয়।

খাদ্যের উৎস: কৃষিক্ষেত্র হতে জনগণ খাদ্যের যোগান পায়।

বাসস্থান ও জ্বালানি সরবরাহ: কৃষিক্ষেত্র হতে বাসস্থানের উপাদান যেমন- কাঠ, বাঁশ, বেত, গোলপাতা, শন, খড় ইত্যাদি সংগ্রহ করা হয়। জ্বালানি হিসেবে কৃষির উপকরণ অনস্বীকার্য।

শিল্পের কাঁচামাল সরবরাহ: কৃষি বাংলাদেশের কাঁচামাল সরবরাহ করে। তাই শিল্পের উন্নতি অনেকাংশে কৃষির ওপর নির্ভরশীল।

বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন: বৈদেশিক বাণিজ্যে কৃষি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বস্ত্রের সংস্থান করে: বস্ত্রের প্রধান উৎস তুলা, পাট ও বিভিন্ন আঁশ জাতীয় দ্রব্য। সুতরাং বস্ত্রের কাঁচামাল কৃষি সরবরাহ করে।

সরকারি রাজস্ব আয়ের উৎস: সরকারের রাজস্ব আয়ের বেশির ভাগ কৃষি হতে আসে। জমির কর, কৃষিপণ্য পরিবহণের ভাড়া, কৃষিপণ্যের রপ্তানি কর প্রভৃতি বাবদ সরকার যথেষ্ট আয় করে।

কৃষির শ্রেণিবিভাগ: বাংলাদেশের কৃষিকে দুইভাগে বিভক্ত করা যায়। খাদ্যশস্য ও অর্থকরী ফসল।

খাদ্যশস্য

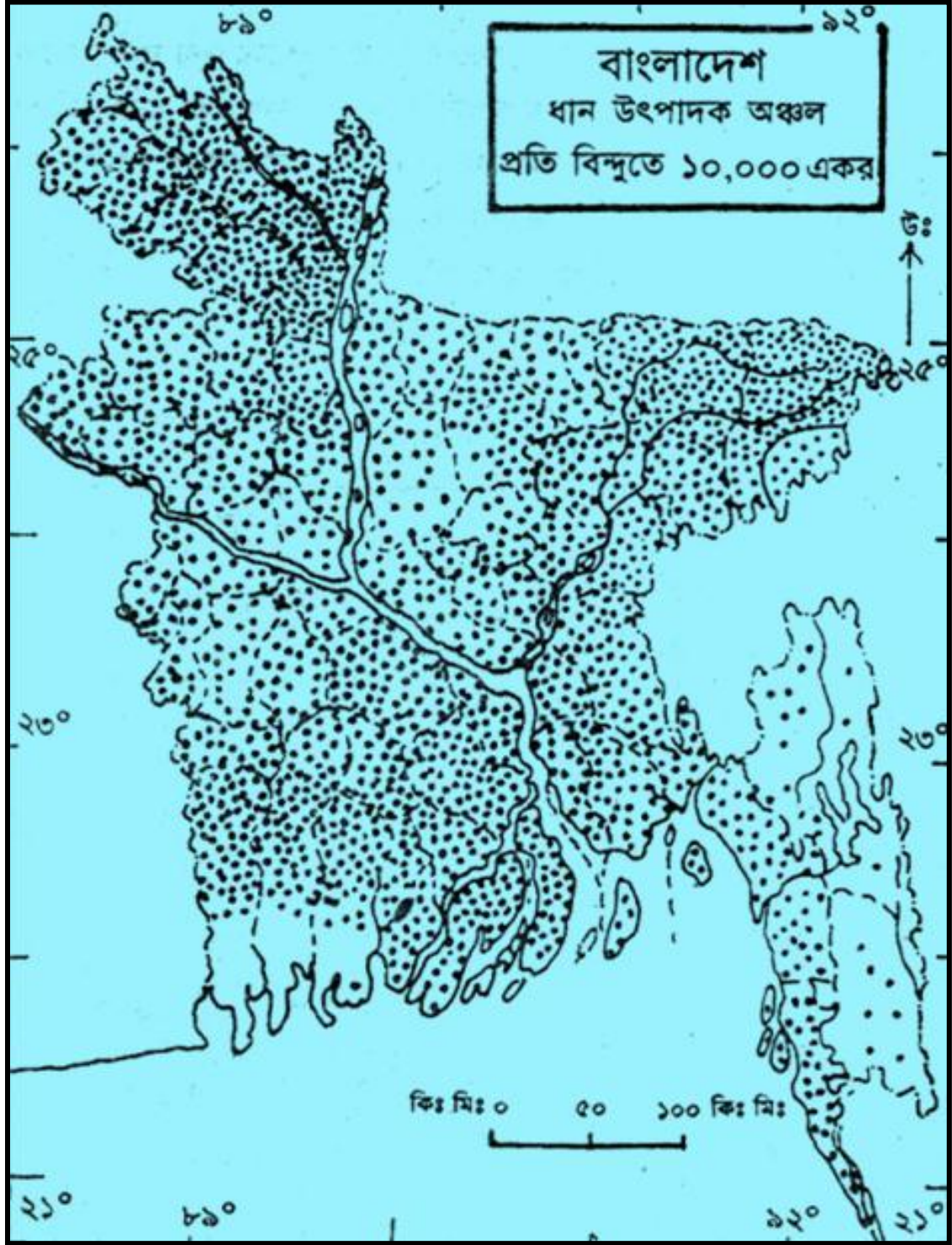
যেসব শস্য খাদ্যের প্রয়োজন মেটানোর জন্য ব্যবহৃত হয়, সেসব ফসলকে খাদ্যশস্য বলে। যেমন- ধান, গম, যব, ভূট্টা, ডাল, তৈলবীজ, ফলমূল, মসলা ইত্যাদি।

ধান: বাংলাদেশের প্রধান খাদ্যশস্য ধান। প্রধান খাদ্য হিসেবে এদেশের প্রায় ৯৮ জন ধানের উপর নির্ভরশীল। বাংলাদেশ পৃথিবীর চতুর্থ বৃহত্তম ধান উৎপাদনকারী দেশ। বাংলাদেশে প্রায় সারা বছর ধানের চাষ হয়।

ব্যবহার ও গুরুত্ব: পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ৪০ ভাগের ক্যালরি চাহিদা মেটায় ধান। বাংলাদেশের প্রায় সব লোকের প্রধান খাদ্য ভাত। ধান বাংলার সংস্কৃতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

ধানের তুষ ছাড়ানো দানাই চাল এবং রান্না করা চালকে ভাত বলে। সুগন্ধি চাল দিয়ে ঘি ও বিভিন্ন মসলাযোগে মুরগি, গরু, খাসির মাংসের পোলাও, বিরিয়ানি, তেহারি ইত্যাদি বিশেষ ধরনের খাবার রান্না হয়। ডাল মেশানো সিদ্ধ চালকে খিচুড়ি বলে। খিচুড়ি সঙ্গে ডাল ও সবজি মেশানো ভাতে প্রোটিনের পরিমাণ বাড়ে এবং অধিক পুষ্তিকর হয়। তাছাড়া চাল দিয়ে বিভিন্ন ধরনের পিঠা, পায়েস তৈরি করা যায়। ধান হতে চিড়া, খই, মুড়ি প্রস্তুত করা হয়। ধানের খড় দিয়ে গবাদি পশুর খাদ্য খড়ের ছাউনী প্রভৃতি কাজে ব্যবহার করা হয়। বর্তমানে ধানের তুষ দিয়ে খাবারের তেল এবং জ্বালানীর জন্য তুষ কাঠ তৈরি করা হয়।

ধানের শ্রেণিবিভাগ: এ দেশে প্রাচীনকাল হতে ধানের চাষ হয়। চাষের সময় অনুযায়ী ধানকে প্রধানত তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যেমন- আউশ, আমন এবং বোরো ধান। বর্তমানে ইরি নামে এক ধরনের উচ্চ ফলনশীল ধানের চাষ হয়ে থাকে। ধানের জাতগুলোর উৎপত্তির প্রক্রিয়া ও সময়কাল নিচের ছকে উল্লেখ করা হলো-



চিত্র ৬.৮: বাংলাদেশের ধান উৎপাদন অঞ্চল

সারণি ৬.৪: ধানের জাতগুলোর উৎপত্তির প্রক্রিয়া ও সময়কাল

ফসল প্রজাতি	জাতের সংখ্যা	ফসলের জাতগুলোর উৎপাদনের প্রক্রিয়া
ধান (<i>Oryza Sativa</i>) আধুনিক জাত (৩৭), BINA (৬), BAU (২) ৭টি	৪৫	৪৫টির মধ্যে BARRI কর্তৃক সংকরণের মাধ্যমে ৩০টি এবং প্রবর্তন ও নির্বাচনের মাধ্যমে BARRI, BINA কর্তৃক মিউটেশন উত্তর নির্বাচনের মাধ্যমে ৬টি। BAU কর্তৃক প্রবর্তন ও সংকরণের মাধ্যমে ২টি। সবগুলোই ১৯৬৮ খ্রিষ্টাব্দের পরবর্তী।
ধান (<i>Oryza Sativa</i>) পুরানো জাতভেদ	২৪	সবগুলো প্রজাতি স্থলজ জাত থেকে নির্বাচিত। প্রবর্তিত হয়েছে নাইজেরিয়া (নাজিরশাইল) থেকে। গভীর পানির ধানের বংশানুসম্পদ ও স্থানীয় বোরো ধানের স্থলজ জাতগুলো থেকে। প্রায় সবগুলোই ১৯৬৮ খ্রিষ্টাব্দের পূর্ববর্তী।

উৎস: বাংলাপিডিয়া, ফসলের জাত উদ্ভাবন

চাষের উপযোগী অবস্থা

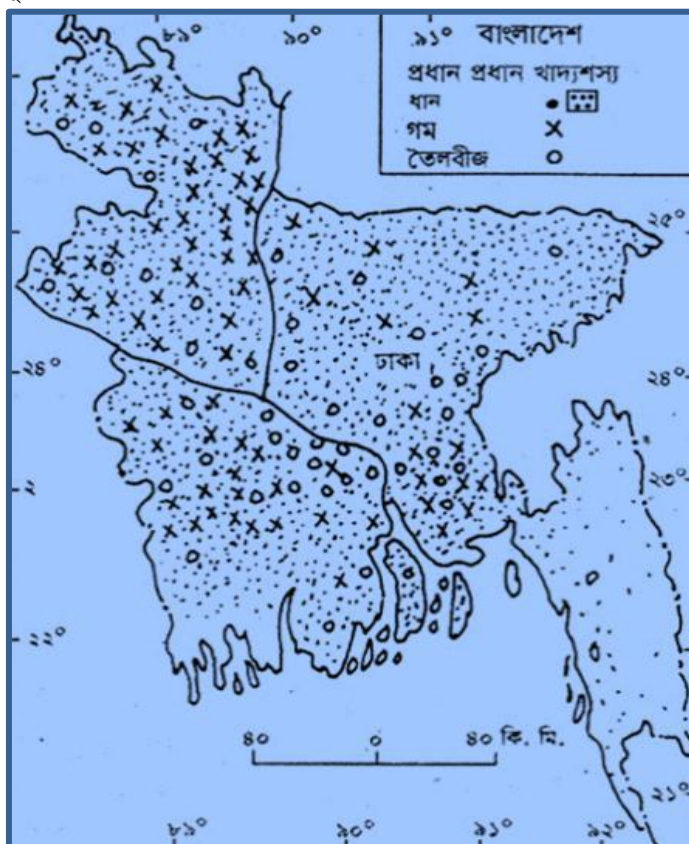
প্রাকৃতিক উপাদান

তাপমাত্রা: সাধারণত ১৬° - ৩০° সে. উত্তাপ প্রয়োজন।

বৃষ্টিপাত: ১০০ - ২০০ সে.মি. বৃষ্টিপাত প্রয়োজন।

মৃত্তিকা: উর্বর পলিযুক্ত মৃত্তিকা ধান চাষের জন্য উপযোগী। কারণ পানি ধরে রাখতে পারে এরূপ কাদামাটিতে ধানের ফলন ভাল হয়। এ কারণে নদীমাতৃক বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্র ধান জন্মে।

ভূ প্রকৃতি: নিচু সমতল ভূমি ধান চাষের পক্ষে শ্রেয়।



চিত্র ৬.৯: বাংলাদেশের প্রধান প্রধান খাদ্যশস্য উৎপাদন অঞ্চল

অর্থনৈতিক উপাদান: অর্থনৈতিক উপাদানের মধ্যে মূলধন, সুলভ শ্রমিক, ব্যাপক স্থানীয় বাজার, সুষ্ঠুপরিবহণ ব্যবস্থা প্রভৃতি প্রধান।

ধানের উৎপাদন: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসাব অনুযায়ী ২০১৪ - ১৫ অর্থবছরে আউশ ধান ২৩.২৮ লক্ষ মেট্রিক টন, আমন ১৩১.৯০ লক্ষ মেট্রিক টন, বোরো ৯১.৯২ লক্ষ মেট্রিক টন, উৎপাদন হয়েছিল। নিম্নের সারণিতে ২০১৫ - ১৬ অর্থবছর পর্যন্ত উৎপাদন দেখানো হলো :

সারণি ৬.৫: ধানের উৎপাদন (লক্ষ মেট্রিক টন)

সন	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪ -১৫	২০১৫ - ১৬ লক্ষমাত্রা
আউশ	২১.৩৩	২৩.৩৩	২১.৫৮	২৩.২৬	২৩.২৮	২৪.৭৫(প্রকৃত)
আমন	১২৭.৯১	১২৭.৯৮	১২৮.৯৭	১৩০.২৩	১৩১.৯০	১৩৫.৫৫(প্রকৃত)
বোরো	১৮৩.১৭	১৮৭.৫৯	১৮৭.৭৮	১৯০.০৭	১৯১.৯২	১৯০.০০
মোট চাল	৩৩৫.৪১	৩৩৮.৯০	৩৩৮.৩৩	৩৪৩.৫৬	৩৪৭.১০	৩৫০.৩০

উৎস: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০১৬

গম: গম বাংলাদেশসহ বিশ্বের অন্যতম প্রধান খাদ্যশস্য। বাংলাদেশের কৃষকরা তাদের নিবিড় ধানভিত্তিক চাষ পদ্ধতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে গম ফলাচ্ছে। বাংলাদেশে বর্তমান খাদ্যশস্য হিসেবে ধানের পর গম দ্বিতীয় স্থানে পৌঁছেছে।

ব্যবহার: ১৯৪৩ খ্রিষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষপরবর্তী চরম খাদ্য চাষের সময় ‘অধিক ফসল ফলাও’ আন্দোলন শুরু হলে গম চাষ গুরুত্ব লাভ করে। ১৯৬৫ খ্রিষ্টাব্দে পশ্চিম পাকিস্তানের তান্তেজান কৃষি গবেষণা স্টেশনে মেক্সিকো থেকে Penjamo ৬২ ও Sonors ৬৪ এ দুই জাতের গমের সামান্য পরিমাণ বীজ পৌঁছালে, সেখানে গমের আধুনিক ভ্যারাইটির গবেষণার সূত্রপাত হয়।

চাল অপেক্ষা গম অধিক পুষ্টিকর খাদ্য। এতে প্রোটিন ও কার্বোহাইড্রেট উভয়ই আছে। একে আটা, ময়দা, সুজি প্রভৃতিতে পরিবর্তিত করে ব্যবহার করা হয়। সাধারণত রুটি ব্যতীত বিস্কুট, কেক, পাউরুটি, নুডুলস প্রভৃতিও গম হতে তৈরী হয়। গম, গরু, মহিষ, কবুতর, হাঁস, মুরগি ইত্যাদির খাদ্য হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। গমের খড় গরু মহিষের খাদ্য ও আস্তাবলের আচ্ছাদন হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

উৎপাদন: বাংলাদেশের কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট গমের প্রায় ২১টি প্রজাতি উদ্ভাবন করেছে। এর মধ্যে কাঞ্চন জাতের গমক্ষেত ৮০ ভাগের বেশি এলাকায় দেখা যায়। ১৯৭৫-১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দের আগে সামান্য পরিমাণ গম বিক্ষিপ্তভাবে উৎপাদন হতো এবং ফসলটি বাংলাদেশের মানুষের কাছে প্রায় অচেনা ছিল। বাংলাদেশে বর্তমানে গম মোট ক্ষেত জমির ৪ ভাগ ও রবি ফসলের জমির ১১ ভাগ দখল করে আছে। বাংলাদেশের প্রায় সব অঞ্চলেই গমের চাষ হয়। তবে উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলোতে গম চাষ বেশি প্রসার লাভ করেছে। বর্তমানে বৃহত্তর দিনাজপুর, পাবনা, রংপুর, রাজশাহী, কুষ্টিয়া, কুমিল্লা, যশোর, ফরিদপুর, ঢাকা, বগুড়া প্রভৃতি জেলায় অধিকাংশ গম উৎপন্ন হয়। নিম্নের সারণিতে বিভিন্ন অর্থবছরে গমের উৎপাদন ও লক্ষ্যমাত্রা দেখানো হয়।

সারণি ৬.৬ : গমের উৎপাদন (লক্ষ মে.টন.)

খাদ্যশস্যের নাম	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬ (লক্ষমাত্রা)
গম	৯.৯৫	১২.৫৫	১৩.০২	১৩.৪৮	১৩.৯৫

উৎস: বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০১৬

২০১৫-১৬ অর্থবছরে (ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত) সার্বিকভাবে সরকারি ব্যবস্থাপনায় দেশে গম আমদানির পরিমাণ ৪.০৩ লক্ষ মে. টন। তবে বেসরকারি খাতে ২৫.৭৬ লক্ষ মে. টন গম আমদানি করা হয়েছে (বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০১৬)।

গম চাষের উপযোগী ব্যবস্থা

প্রাকৃতিক উপাদান

তাপমাত্রা: সাধারণত গম চাষের জন্য ২২°-৫০° সে. তাপমাত্রা প্রয়োজন।

বৃষ্টিপাত: ৫০-৭৫ সে. মি. বৃষ্টিপাত প্রয়োজন।

মাটি: উর্বর দোআঁশ মৃত্তিকা।

ভূপ্রকৃতি: উর্বর সমভূমি।

অর্থনৈতিক উপাদান

গমচাষে অর্থনৈতিক উপাদানের মধ্যে মূলধন, সুলভ শ্রমিক, ব্যাপক স্থানীয় বাজার, সুষ্ঠু পরিবহণ ব্যবস্থা প্রভৃতি প্রধান। এছাড়া সার, পানিসেচ ব্যবস্থা, কীটনাশক প্রভৃতির প্রয়োজন হয়।

অন্যান্য খাদ্যশস্য

বার্লি বা যব (Barley): বার্লি গমজাতীয় শস্য। এটি আটা ও পশুখাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। দেশে উৎপাদিত বার্লির পরিমাণ অতি নগণ্য। যব চাষের জন্য ১০°-১৯° সে. উত্তাপ এবং ৬০ সে. মি. হতে ৭৫ সে. মি. বৃষ্টিপাতের প্রয়োজন। অল্প বৃষ্টিপাত এবং সামান্য উর্বর জমিতে যবের চাষ হয়।

ভূট্টা (Maize): ভূট্টা মানুষ ও পশুর খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ১০° সে. হতে ২২° সে. উত্তাপ এবং ১০০ সে. মি. হতে ১৫০ সে. মি. বৃষ্টিপাত ভূট্টা চাষের জন্য প্রয়োজন। এ দেশের জলবায়ু ভূট্টা চাষের উপযোগী নয়। দেশের উত্তরাঞ্চলে এবং পার্বত্য এলাকায় ভূট্টা চাষ হয়। নিম্নের সারণিতে বিভিন্ন অর্থবছরে ভূট্টার উৎপাদন দেখানো হলো-

সারণি ৬.৭: ভূট্টার উৎপাদন (লক্ষ মেট্রিক টন)

খাদ্যে শস্যের নাম	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬ (লক্ষ্য মাত্রা)
ভূট্টা	১৯.৫৪	২১.৭৮	২৫.১৬	২৩.৬১	২৫.৭২ (প্রকৃত)

উৎস: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০১৬

ডাল (Pulses): বাংলাদেশের ডাল জাতীয় শস্যের মধ্যে মসুর, ছোলা, মটর, মুগ, মাষকলাই, খেসারি, প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। সাধারণত বৃষ্টিহীন শীত মৌসুমে ডাল চাষ হয়। বালিমিশ্রিত দোআঁশ মৃত্তিকা ডাল চাষের জন্য উপযোগী। দেশের সব অঞ্চলে ডাল উৎপন্ন হয়। তবে, পদ্মা ও যমুনা নদীর দোয়াব অঞ্চলে ডাল বেশি উৎপন্ন হয়।

তেলবীজ (Oil seeds): বাংলাদেশ উৎপন্ন তেল বীজের মধ্যে তিল, সরিষা, বাদাম, তিসি, রেডি প্রভৃতি প্রধান। শীতকালে বাংলাদেশে তেলবীজের চাষ হয়। সরিষা বপনের জন্য উর্বর মাটির প্রয়োজন। তিল ও তিসি বালিযুক্ত দোআঁশ মৃত্তিকায় ভালো জন্মে। বাদাম চাষের জন্য বেলে মাটি খুবই প্রয়োজন। ঢাকা, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, ফরিদপুর ও দিনাজপুর তেলবীজ ডাল জন্মে।

ফল (Fruit): বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতি ও জলবায়ুর জন্য দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে নানারকম ফল জন্মে। ফলের মধ্যে আম, জাম, কাঁঠাল, কলা, আনারস, পেঁপে প্রভৃতি এ দেশের প্রধান ফল। আম উৎপাদনের জন্য রাজশাহী প্রসিদ্ধ। ঢাকা, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, দিনাজপুর ও রাজশাহী অঞ্চলে কাঁঠাল ভাল হয়। ফরিদপুর, নরসিংদী ও কুষ্টিয়া অঞ্চলে কলা এবং সিলেট আনারস উৎপাদনে প্রসিদ্ধ। বরিশাল, পটুয়াখালী, ও খুলনা অঞ্চলে নারকেল ভাল জন্মে।

অর্থকরী ফসল (Cash Crops)

সাধারণ কথায়, যে সকল ফসল উৎপাদনের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করা হয়, সেগুলোকে অর্থকরী ফসল বলা হয়। বাংলাদেশের প্রধান অর্থকরী ফসলের মধ্যে পাট, তামাক, চা, আখ, তুলা, রেশম ও রাবার প্রধান।

পাট (Jute)

পাট বাংলাদেশের প্রধান অর্থকরী ফসল। এটা বাংলাদেশে সোনালী আঁশ নামেও পরিচিত। দেশের প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয় পাট ও পাটজাত দ্রব্য রপ্তানির মাধ্যমে।

পাটের ব্যবহার: পাট হতে দড়ি, সুতলি, সুতা, থলি ইত্যাদি প্রস্তুত হয়।

পাট চাষের উপযোগী ব্যবস্থা

প্রাকৃতিক উপাদান

তাপমাত্রা: ২০° সে.-২৫° সে.।

বৃষ্টিপাত: ২০০-২৫০ সে. মি.।

মৃত্তিকা: পাট চাষের ফলে জমির উর্বরতা হ্রাস পায়। ফলে নদীর নিকটবর্তী নরম ও উর্বর দোআঁশ পলিমাটিতে পাটের চাষ হলে প্রতি বছর নদী বহিত পলির দ্বারা স্বাভাবিক উর্বরতা বজায় রাখা সম্ভব হয়। এ জন্য বাংলাদেশের নদী বিধৌত জমিতে পাটের চাষ এত অধিক প্রসার লাভ করেছে।

পর্যাপ্ত পানি: পাট পঁচাবার জন্য পাটক্ষেতের নিকট পানির প্রয়োজন হয়।

ভূপ্রকৃতি: পাট চাষের জন্য নিম্নসমতল ভূমি।

অর্থনৈতিক উপাদান

শ্রমিক: পাটচাষ এর তত্ত্বাবধান, আগাছা পরিষ্কার, পাট কাঁটা, আঁশছাড়ানো, শুকানো, বাজার প্রেরণ প্রভৃতি কাজের জন্য প্রচুর সুলভ ও কষ্টসহিষ্ণু শ্রমিকের প্রয়োজন।

মূলধন: বীজ, সার, কৃষিযন্ত্রপাতি এবং শ্রমিকের মজুরি প্রভৃতি বাবদ যথেষ্ট অর্থের প্রয়োজন হয়।

উৎপাদন: বাংলাদেশের প্রায় সকল জেলাতেই পাট উৎপন্ন হলেও ফরিদপুর, টাঙ্গাইল, যশোর, ঢাকা, সিরাজগঞ্জ, বগুড়া ও জামালপুর প্রধান পাটচাষ অঞ্চল। ২০০৪-২০০৫ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশে ৯ লক্ষ ৬৫ হাজার একর জমিতে পাট চাষ করে প্রায় ৭ লক্ষ ১৭ হাজার মে.টন পাট উৎপন্ন হয়।

পাটের শ্রেণিবিভাগ: পাটকে সাধারণত দুটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়, যথা- দেশি এবং তোষা পাট। নিম্নের সারণিতে কাঁচা পাট উৎপাদন দেখানো হলো-

সারণি ৬.৮: কাঁচাপাট উৎপাদন (লক্ষ মে. টন), রপ্তানী মূল্য (লক্ষ টাকা)

অর্থ বছর	উৎপাদন	রপ্তানী মূল্য (লক্ষ টাকা)
২০১১ - ১২	৭৮.০২	১৫৪,০৬৬
২০১২ - ১৩	৭৫.৭২	১৪৩,৬৪৬
২০১৩ - ১৪	৬৭.৮৫	৭০.৬০৪
২০১৪ - ১৫	৭৫.০১	৮১,৬৭৪
২০১৫ - ১৬	৮৫.৪৫	৫৬,৫৬২

উৎস: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০১৬

তুলা (Cotton)

প্রাচীনকাল থেকেই বাংলা ছিল তুলা চাষের জন্য প্রসিদ্ধ। ঢাকা জেলার তুলা ছিল সর্বোৎকৃষ্ট। এ তুলার সুতা থেকেই তৈরি হতো ঢাকাই মসলিন। তুলা অর্থকরী ফসল। বর্তমানে বাংলাদেশের এর চাষ খুবই কম। ২০০৪-০৫ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশের প্রায় ৪০ হাজার একর জমিতে চাষ হয় এবং উৎপাদিত তুলার পরিমাণ প্রায় ৭৯ হাজার মে. টন। বাংলাদেশের একর প্রতি তুলা উৎপাদন অন্যান্য তুলা উৎপাদনকারী দেশ অপেক্ষা অনেক কম। তবে বাংলাদেশে তুলা চাষের প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। অন্যান্য রবিশস্যের ন্যায় তুলা চাষ বেশি লাভজনক হওয়াতে চাষিদের মধ্যে এর জনপ্রিয়তা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

তুলা চাষের উপযোগী অবস্থা: তুলা সাধারণত ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় অঞ্চলে ভাল জন্মে। ৪০° উত্তর অক্ষাংশ থেকে ২০° দক্ষিণ অক্ষাংশে অবস্থিত অঞ্চলে তুলা চাষ বেশি হয়। তুলা চাষের জন্য মধ্যম বৃষ্টিপাত এবং অধিক তাপের প্রয়োজন। তাই তুলা উৎপাদনের জন্য বার্ষিক ১০০ সে. মি. বৃষ্টিপাত এবং গড়ে ২৭° সে. উত্তাপের প্রয়োজন। এ কারণে বাংলাদেশের জলবায়ুতে তুলার চাষ ও ফলন কম। বাংলাদেশের উর্বর, হালকা পলল মৃত্তিকায় তুলা উৎপাদন করা যায়। কিন্তু তুলা অপেক্ষা অন্যান্য অর্থকরী ফসল চাষ করা অধিক লাভজনক। এ কারণে বাংলাদেশে তুলার চাষ অতি অল্প।

উৎপাদনকারী অঞ্চল: বাংলাদেশের বৃহত্তর যশোর, কুষ্টিয়া, খুলনা, দিনাজপুর, রংপুর, রাজশাহী, পাবনা, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, ঢাকা প্রভৃতি অঞ্চলে তুলার চাষ প্রসার লাভ করেছে। তুলা চাষের ক্ষেত্রে শীতকালীন ফসল গম, তামাক ও আলুর জন্য জমির সাথে তুলার প্রতিযোগিতা চলে। বর্তমান কুষ্টিয়া অঞ্চলে গরিব ও মাঝারি চাষিরা ব্যাপক সংখ্যায় চাষ ছেড়ে তুলা চাষে এগিয়ে আসছে। কারণ, তুলা চাষে খরচ তামাক চাষের চেয়ে ২৫% কম। তদুপরি তামাকের মত তুলা শোধন করার প্রয়োজন পড়ে না।

তুলার বাণিজ্য: বাংলাদেশের তুলার উৎপাদন প্রয়োজনের তুলনায় নগণ্য। তাই বাংলাদেশকে প্রতি বছর বিদেশ হতে প্রচুর তুলা আমদানি করতে হয়। ২০০৪-০৫ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশে বিশ্ব বাজার হতে ৬৬ কোটি ৬০ লক্ষ মার্কিন ডলার মূল্যের ৫৪০ হাজার টন কাঁচা তুলা আমদানি করে।

আখ (Sugarcane)

চিনি উৎপাদনের কাঁচামাল আখ বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে রয়েছে। ২০০৫-০৬ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশে প্রায় ৩.৭৭ লক্ষ একর জমিতে আখের চাষ হয় এবং উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ৫৫.১১ লক্ষ টন। অতি প্রাচীনকাল হতেই এ উপমহাদেশে আখের চাষ হয়। অনেক পণ্ডিতের মতে, বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গ এর আদিভূমি। এ উৎপাদন দেশের চাহিদার তুলনায় বেশ কম।

আখের ব্যবহার

- আখ হতে গুড় ও চিনি প্রস্তুত হয়;
- এর রস হতে সুরাসার প্রস্তুত হয়;
- আখ ছোবড়া ও পাতা পশুর খাদ্য এবং উত্তম জ্বালানি;
- ছোবড়া দ্বারা কাগজ, শব্দরোধক বোর্ড প্রভৃতি তৈরি হয়;
- আখ রস পানীয় হিসেবে প্রত্যক্ষভাবে ব্যবহৃত হয়।

উৎপাদনের অনুকূল অবস্থা

কতিপয় প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক উপাদানের উপর আখের চাষ নির্ভরশীল। যেমন-

প্রাকৃতিক উপাদান: প্রাকৃতিক উপাদানের মধ্যে জলবায়ু, মৃত্তিকা ও ভূপ্রকৃতির প্রভৃতির প্রভাব বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

জলবায়ু: আখ উৎপাদনের জন্য ১৯° সে. হতে ৩০° সে. উত্তাপ এবং কমপক্ষে ১৫০ সে. মি. বৃষ্টিপাতের প্রয়োজন হয়। আবার যে সব অঞ্চলে বার্ষিক ১৫০ সে. মি. এর কম বৃষ্টিপাত হয় সে সব অঞ্চলে পানিসেচের মাধ্যমে আখের চাষ হয়।

মৃত্তিকা: বেলে দোআঁশ মাটি হতে আরম্ভ করে আঠালো কাদামাটি পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের মৃত্তিকায় এটা জন্মাতে পারে। পলিময় দোআঁশ মৃত্তিকায় এবং কর্দমময় দোআঁশ মৃত্তিকায় আখের চাষ ভাল হয়।

ভূপ্রকৃতি: আখ চাষের জন্য সমতলভূমি শ্রেয়। বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্রই নিম্নসমভূমি।

অর্থনৈতিক উপাদান: অর্থনৈতিক উপাদানের মধ্যে মূলধন, শ্রমিক, পরিবহণ, বাজার প্রভৃতি প্রধান। সার, বীজ, কীটনাশক প্রভৃতি ক্রয় এবং শ্রমিকের মজুরি ইত্যাদি বাবদ প্রচুর মূলধনের প্রয়োজন হয়। এটার জন্য প্রচুর শ্রমিকের দরকার কারণ ভূমি কর্ষণ, বীজ রোপণ, আগাছা পরিষ্কার, আখ কর্তন ইত্যাদি কাজে প্রচুর শ্রমিকের প্রয়োজন হয়।

আখের প্রকারভেদ

বাংলাদেশে বিভিন্ন জাতের আখ উৎপন্ন হয়। তন্মধ্যে দুইশ আট, গেগুরী, খাকড়ি ইত্যাদি প্রধান। এদের মধ্যে দুইশ আট উৎকৃষ্ট শ্রেণির। এতে চিনির পরিমাণ খুব বেশি থাকে।

আখের উৎপাদন ও উৎপাদনকারী অঞ্চল: বাংলাদেশের জলবায়ু ও মৃত্তিকা আখ চাষের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। এ কারণে এ দেশের প্রায় সকল অঞ্চলেই আখের চাষ হয়ে থাকে। তবে এদের মধ্যে বৃহত্তম রাজশাহী, রংপুর, দিনাজপুর, পাবনা, কুষ্টিয়া, ফরিদপুর, যশোর প্রভৃতি অঞ্চল বিশেষ প্রসিদ্ধ। এ অঞ্চলগুলোকে একত্রে বাংলাদেশের আখ বলয় বলা হয়। এ ছাড়া ঢাকা, জামালপুর, ময়মনসিংহ প্রভৃতি অঞ্চলেও প্রচুর আখ জন্মে। বর্তমানে আখ উৎপাদনে রাজশাহী প্রথম, কুষ্টিয়া দ্বিতীয়, ফরিদপুর তৃতীয়, রংপুর চতুর্থ এবং দিনাজপুর অঞ্চল পঞ্চম। বিভাগ অনুযায়ী আখ উৎপাদনে রাজশাহী বিভাগ প্রথম, ঢাকা বিভাগ দ্বিতীয়, খুলনা বিভাগ তৃতীয়, চট্টগ্রাম বিভাগ এবং বরিশাল বিভাগ পঞ্চম। ২০০৪-০৫ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশে ৩ লক্ষ ৮৮ হাজার একর জমিতে আখ চাষ করে ৬৪ লক্ষ ২৩ হাজার টন আখ উৎপন্ন হয়। বাংলাদেশের নিম্নভূমিতে খাগড়া নামে এক ধরনের নিম্নমানের আখের চাষ হয়। এর রসে চিনির পরিমাণ খুবই কম। বর্তমানে এ সব আখের দ্বারা দেশের বিভিন্ন চিনির কলে বার্ষিক প্রায় ২ লাখ ৪৬ হাজার টন চিনি প্রস্তুত হয় এবং তদুপরি ৪ লাখ টনের বেশি গুড় তৈরি হয়।

বাণিজ্য: আখ উৎপাদনে বাংলাদেশ এখনও স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে পারেনি। ফলে প্রতি বছরই বাংলাদেশকে বিশ্ব বাজার হতে প্রচুর চিনি আমদানি করতে হয়। ২০০৪-০৫ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশ ১৫০ হাজার টন চিনি আমদানি করে।

আখের অর্থনৈতিক গুরুত্ব

আখ বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থকরী ফসল। এটি চিনি ও গুড় উৎপাদনের প্রধান কাঁচামাল। দেশের অন্যান্য অর্থকরী ফসলের ন্যায় এরও যথেষ্ট ব্যবহারিক ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব রয়েছে। নিচে আখের গুরুত্বের বিভিন্ন দিক আলোচনা করা হলো-

জীবিকা অর্জনের উৎস: আখ একটি অন্যতম অর্থকরী ফসল। বাংলাদেশের কিছুসংখ্যক লোক আখের চাষ, আখের ব্যবসা ও আখের উপর নির্ভরশীল চিনি ও কাগজের কলে নিয়োজিত থেকে জীবিকা নির্বাহ করে।

শিল্পোন্নয়ন ও বেকার সমস্যা হ্রাস: এটি চিনি শিল্পের একমাত্র কাঁচামাল। এর উপর নির্ভর করে বাংলাদেশে ১৭টি চিনির কল গড়ে উঠেছে। এ ছাড়া, পাকশীর কাগজের কলটি আখের ছোবড়ার উপর ভিত্তি করে স্থাপিত হয়েছে। এ সব কলে বহু লোকের কর্মসংস্থান হওয়ায় বাংলাদেশের বেকার সমস্যা কিছুটা লাঘব হয়েছে।

শিল্পের সম্প্রসারণ: আখের ফলন ভালো হলে কৃষকদের আয় ও ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। তখন তারা অধিক শিল্পজাত দ্রব্য ক্রয় করে। ফলে বিভিন্ন শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায়। এতে দেশের শিল্প-কারখানাগুলো সম্প্রসারিত হয়।

সরকারি আয়ের উৎস: বাংলাদেশে সরকারের আয়ের অন্যতম প্রধান উৎস হলো আখ। আখ, চিনি ও গুড় হতে সরকারের প্রচুর রাজস্ব আয় হয়, যা জাতীয় উন্নতিতে সাহায্য করে।

জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন: আখ চাষের ফলে কৃষকদের আয় ও ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়।

বৈদেশিক মুদ্রার অপচয় হ্রাস: বাংলাদেশে আখের ফলন ভাল হওয়ার এ দেশে বহুসংখ্যক চিনির কল গড়ে উঠেছে। ফলে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয়ে চিনি আমদানি বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে।

চা (Tea)

বাংলাদেশের অর্থকরী ফসলের মধ্যে চা অন্যতম। বর্তমানে এটি দেশে দ্বিতীয় বৃহত্তম বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী ফসল। দেশে উৎপাদিত চা এর প্রায় ৭০ভাগ বিদেশে রপ্তানি হয়। এ উপমহাদেশের আসামে ব্রহ্মপুত্র নদের অববাহিকায় প্রথম চা বন্যাগাছ হিসেবে জন্মাত। পরে বাংলাদেশের সিলেট অঞ্চলে সুরমা নদীর উপত্যকায় মালনীছড়াই ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দে এবং চট্টগ্রাম অঞ্চলে ১৮৬২ খ্রিষ্টাব্দে চায়ের আবাদ শুরু হয়। বাংলাদেশে সিলেট, চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলে সর্বমোট ১৫৮টি চা বাগান আছে। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় ৪৭ হাজার ৫ শত হেক্টর জমিতে চা চাষ করা হয়। চা উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে একাদশ স্থানের অধিকারী।

রোপণ পদ্ধতি: চা গাছের বীজ হতে প্রথমে চারা গাছ উৎপন্ন করা হয়। চারার বয়স ৫/৬ মাস পূর্ণ হলে নির্দিষ্ট দূরত্বে লাইন করে জমিতে রোপণ করা হয়। ৩/৪ বছরের মধ্যে গাছগুলো পাতা সংগ্রহের উপযোগী হয়। চা গাছ ৫/৭ মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়। তবে হাত দিয়ে পাতা তুলতে হয় বলে গাছকে কেটে এক হতে দেড় মিটারের মধ্যে রাখা হয়। বাংলাদেশে এপ্রিল হতে নভেম্বর পর্যন্ত ১৫/২০ দিন পরপর চা পাতা সংগ্রহ করা হয়।

চা এর শ্রেণিবিভাগ: বাংলাদেশে সাধারণত কালো, গুঁড়া ও সবুজ চা উৎপন্ন হয়। এ দেশের চা গুণে ও মানে বেশ উন্নত। তবে উৎকৃষ্ট ধরনের চায়ের প্রায় অধিকাংশই বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের জন্য বিদেশে রপ্তানি করা হয়।

চা চাষের উপযোগী অবস্থা: নিচের প্রাকৃতিক এবং অর্থনৈতিক ও মানবিক উপাদানগুলোর প্রভাবে বাংলাদেশ চা চাষে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করেছে।

প্রাকৃতিক অবস্থা

জলবায়ু: চা গাছের জন্য বার্ষিক প্রায় ২৫০ সে. মি. বৃষ্টিপাত এবং ১৬° সে. হতে ১৭° সে. উত্তাপের প্রয়োজন। বাংলাদেশের পাহাড়িয়া অঞ্চলে চা চাষের উপযোগী তাপ ও বৃষ্টিপাত থাকায় সেখানে বহু চা বাগান গড়ে উঠেছে।

মৃত্তিকা: মৃত্তিকার গুণাগুণের উপর চায়ের উৎপাদন বহুলাংশে নির্ভরশীল। হালকা উর্বর লৌহ ও জৈব পদার্থ মিশ্রিত দোআঁশ মাটিতে চা ভালো জন্মে। বাংলাদেশের পাহাড়িয়া অঞ্চলের মাটি এরূপ গুণসম্পন্ন হওয়ার চা চাষের জন্য খুবই উপযোগী।

ভূপ্রকৃতি: চা গাছের গোড়ায় পানি জমলে গাছ মরে যায়। এ কারণে পানি নিষ্কাশন ঢালু জমিতে এর চাষ হয়। তাই সিলেট, চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের পাহাড়ের ঢালে চায়ের বাগান গড়ে উঠেছে।

অর্থনৈতিক ও মানবিক উপাদান

মূলধন: চা চাষের জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়। সার ও কীটনাশক ক্রয় ইত্যাদি বাবদ প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। বাংলাদেশের কতিপয় ব্যবসায়ী চা চাষের জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন সরবরাহ করে থাকে। এ ছাড়া সরকারও যথেষ্ট সাহায্য করে থাকেন।

শ্রমিক: চায়ের আবাদ, তত্ত্বাবধান, পাতা তোলা, পাতা শুকানো, বাস্তবন্দী করা ইত্যাদি কাজের জন্য প্রচুর শ্রমিকের প্রয়োজন হয়। ঘনবসতিপূর্ণ বাংলাদেশে সুলভে প্রচুর শ্রমিক পাওয়া যায় বলে চা শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে।

বাজার: দেশ-বিদেশের বাজারে বাংলাদেশি চায়ের ব্যাপক চাহিদা থাকায় এ শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে।

সুলভ পরিবহণ ব্যবস্থা: সাধারণত রপ্তানির উদ্দেশ্যে চা এর চাষ হয়। তাই চা রপ্তানির জন্য সুলভ পরিবহণ ব্যবস্থা অত্যাৱশ্যক। সুলভ সমুদ্রপথে চা রপ্তানির সুবিধা থাকায় বাংলাদেশে চা চাষের উন্নতি হয়েছে।

ছায়াপ্রদানকারী বৃক্ষ: চা গাছ প্রখর সূর্যকিরণ সহ্য করতে পারে না। এ কারণে চা বাগানে সারিবদ্ধভাবে ছায়া প্রদানকারী বৃক্ষাদি রোপণ করা হয়। এছাড়া, চা চাষের উন্নতির জন্য চা বাগানে সার প্রয়োগ করা হয়। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে পানিসেচ ব্যবস্থা ও কীটনাশক প্রয়োজন হয়।

চায়ের উৎপাদন: ২০০৪-০৫ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশে ১ লক্ষ ৩২ হাজার একর জমিতে চায়ের চাষ করে ৫৮ হাজার মেট্রিক টন চা উৎপন্ন হয়।

উৎপাদনকারী অঞ্চল: বর্তমানে বাংলাদেশে ১৫৮টি চা বাগান রয়েছে। এর মধ্যে মৌলভীবাজার জেলায় ৯১টি, হবিগঞ্জে ২৩টি, সিলেটে ২০টি, চট্টগ্রাম জেলায় ২২টি, রাঙামাটি ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় ১টি করে ২টি চা বাগান রয়েছে।

ভারত ও শ্রীলংকার চায়ের ন্যায় বাংলাদেশের চা ব্রাণে উচ্চমানের নয়। এ কারণেই চীন ও শ্রীলংকা হতে উৎকৃষ্টমানের সামান্য চা আমদানি করে দেশি চায়ের সাথে মিশ্রণ করা হয়। তবে রং তীব্রতা এবং পানীয় ক্ষমতার দিক হতে আমাদের চা উৎকৃষ্টতর।

চা বাগানের মালিকানা ও শ্রেণিবিভাগ: বাংলাদেশের চা বাগানগুলোর মধ্যে ২৯টি বাগানের মালিক বিভিন্ন বিদেশি কোম্পানি, ১৮টি বাংলাদেশ চা শিল্প ব্যবস্থাপনা কমিটি, ১টি বাংলাদেশ চা গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং ১০৪টি ব্যক্তিগত মালিকানাধীন। এর মধ্যে প্রথম শ্রেণির ৫৫টি, দ্বিতীয় শ্রেণির ১৭টি, তৃতীয় শ্রেণির ৩১টি এবং শ্রেণিবিহীন ৪৯টি চা বাগান আছে। প্রথম শ্রেণির বাগানে একর প্রতি প্রায় ৮১২ পাউন্ড, দ্বিতীয় শ্রেণির বাগানে ৫২০ পাউন্ড, তৃতীয় শ্রেণির বাগানে ৩৫৩ পাউন্ড এবং শ্রেণিবিহীন বাগানগুলোতে একর প্রতি গড়ে ১২০ পাউন্ড চা উৎপন্ন হয়। এ সব চা বাগানের জন্য ৯৫টি চা ফ্যাক্টরি রয়েছে। এ ফ্যাক্টরিগুলো সবই অর্ধশতাব্দী কালের পুরানো।

বাণিজ্য: চা বাংলাদেশের দ্বিতীয় প্রধান রপ্তানিযোগ্য ফসল। বর্তমানে বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম চা রপ্তানিকারক দেশ। ২০০৪-২০০৫ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশ প্রায় ১৩ হাজার মেট্রিক টন চা রপ্তানি করে প্রায় ১ কোটি ৬০ লক্ষ মার্কিন ডলার মূল্যের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে। যুক্তরাজ্য, পাকিস্তান, রাশিয়া, মিশর ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশি চায়ের প্রধান ক্রেতা। এ ছাড়া জাপান, জার্মানি, পোল্যান্ড, বুলগেরিয়া, চেক ও স্লোভাকিয়া প্রজাতন্ত্র, হাঙ্গেরি প্রভৃতি দেশও বাংলাদেশ হতে চা আমদানি করে থাকে।

চায়ের গুরুত্ব: চা একটি শ্রেষ্ঠ পানীয় এবং বাগিচা ফসলের মধ্যে সর্বপ্রধান। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থকরী ফসল। পাটের ন্যায় চায়ের মাধ্যমে প্রতি বছর বাংলাদেশ প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত করে থাকে। ২০০৪-২০০৫ খ্রিষ্টাব্দে ১৩ হাজার মেট্রিক টন চা রপ্তানি করে ১ কোটি ৬০ লক্ষ মার্কিন ডলার মূল্যের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয় এবং এটা দেশের মোট অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার শতকরা ০.৩১%। তদুপরি চায়েরচাষ এবং চা শিল্পে প্রচুর লোকের কর্মসংস্থান হয়। দেশের বেকারত্ব হ্রাস পায়। সুতরাং বাংলাদেশের অর্থনীতিতে চা এর ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

তামাক (Tobacco)

বাংলাদেশে কিছু কিছু তামাক উৎপন্ন হয়। বাংলাদেশের প্রায় ১ লাখ ২০ হাজার একর জমিতে বার্ষিক প্রায় ৪০ হাজার টন তামাক উৎপন্ন হয়ে থাকে। বাংলাদেশের অধিকাংশ তামাকই নিকুশ্ট শ্রেণির। সিগারেট প্রস্তুত করার জন্য সামান্য পরিমাণে ভার্জিনিয়া তামাকের চাষ হয়।

তামাকের ব্যবহার: তামাক প্রধানত সিগারেট, চুরুট, বিড়ি, নস্য, জর্দা ইত্যাদি প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া ছস্কা খাওয়ার জন্য তামাক ব্যবহৃত হয়।

চাষের উপযোগী অবস্থা: তামাক চাষ কতিপয় প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক উপাদানের উপর নির্ভরশীল।

প্রাকৃতিক উপাদান

জলবায়ু: তামাক চাষের জন্য উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ুর প্রয়োজন। এর চাষের জন্য ১৮.৭° সে. হতে ২৭° সে. উত্তাপ এবং ১০০ সে. মি. বৃষ্টিপাতের প্রয়োজন। গাছ বড় হবার সময় নিয়মিত আর্দ্রতার প্রয়োজন। অতিবৃষ্টি ও জলাবদ্ধতা তামাক গাছ সহ্য করতে পারে না। এ কারণে শীতকালে বাংলাদেশে তামাকের চাষ হয়। বৃষ্টির স্বল্পতার জন্য তামাক চাষ ক্ষতিগ্রস্ত হয় না।

মৃত্তিকা: হালকা দোআঁশ মাটিতে তামাকের ফলন ভাল হয়। মাটিতে পটাশ ও নাইট্রোজেনের অভাব থাকলে তাপূরণ করতে হয়।

ভূপ্রকৃতি: সাধারণত সমভূমি তামাক চাষের পক্ষে শ্রেয়। এ কারণে বাংলাদেশের সমভূমিতে তামাকের চাষ হয়।

অর্থনৈতিক উপাদান

মূলধন: বীজ, সার, কীটনাশক, কৃষি ও চাষের যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ক্রয় এবং শ্রমিকের মজুরি বাবদ প্রচুর মূলধনের প্রয়োজন হয়।

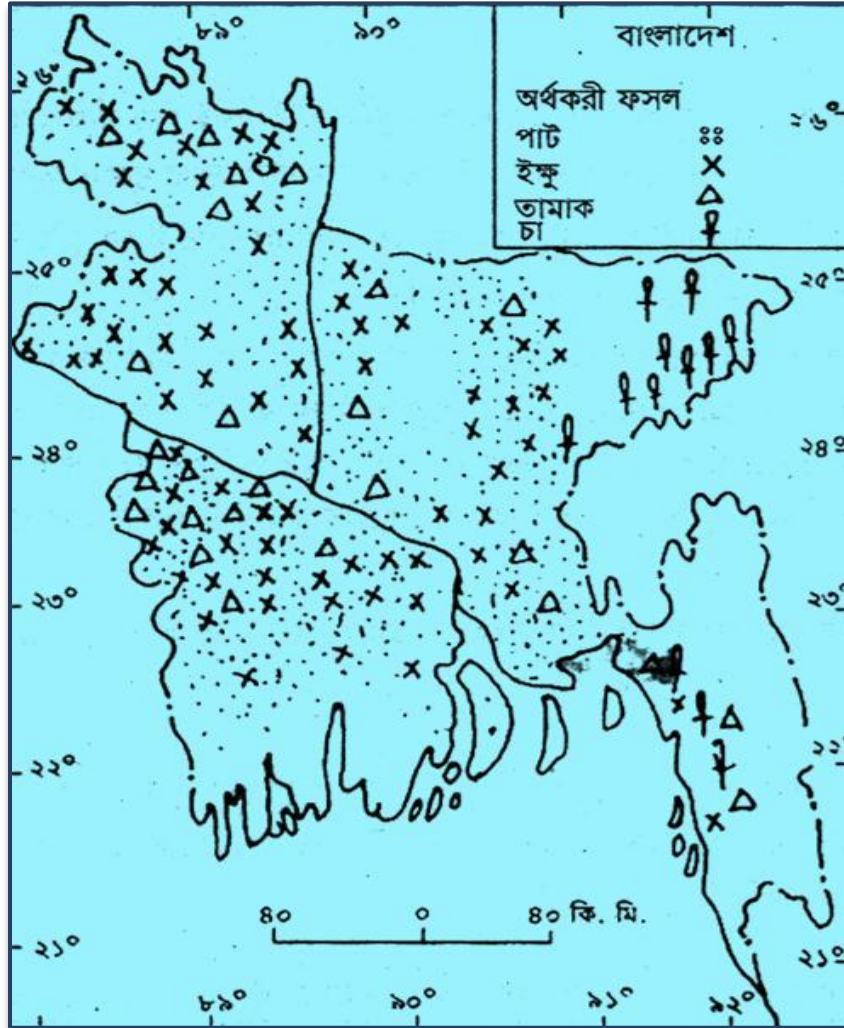
শ্রমিক: তামাক চাষের জন্য প্রচুর শ্রমিকের প্রয়োজন হয়। ঘনবসতিপূর্ণ বাংলাদেশে শ্রমিকের কোন অভাব নেই। তাই তামাক চাষ ক্রমশ প্রসার লাভ করেছে।

বাজার: বাংলাদেশে তামাকের ব্যাপক চাহিদা বা বাজার থাকায় এর চাষের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। এ ছাড়া সার, কীটনাশক, পানিসেচ ব্যবস্থা, সুলভ পরিবহণ ব্যবস্থা প্রভৃতিও তামাক চাষের উন্নতিতে সহায়তা করে।

তামাক চাষ পদ্ধতি: বাংলাদেশে সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে চারা পালন ক্ষেত্রে তামাকের বীজ বপন করা হয় এবং নভেম্বর মাসে চারাগুলো তুলে পৃথকভাবে জমিতে রোপণ করা হয়। চারা রোপণ করার পূর্বে জমি উত্তমরূপে কর্ষণ করে গোবর ও ছাই সার হিসেবে জমিতে দিতে হয়। মার্চ মাসে গাছ বড় হলে তামাক সংগ্রহ করা হয়। অধিকাংশ তামাকই বাড়িতে শুকানো ও সংরক্ষিত হয়।

উৎপাদন ও উৎপাদনকারী অঞ্চল: বাংলাদেশের প্রায় সব অঞ্চলেই কিছু না কিছু তামাকের চাষ হয়। তবে এদের মধ্যে রংপুর, দিনাজপুর, রাজশাহী, পাবনা, কুষ্টিয়া প্রভৃতি অঞ্চল তামাক চাষের জন্য প্রসিদ্ধ। রংপুর অঞ্চলের তিস্তা নদী বিধৌত অঞ্চলটি বাংলাদেশের উৎকৃষ্ট তামাক উৎপাদনকারী এলাকা। ইদানীং যশোর ও কুষ্টিয়া অঞ্চলে তামাক চাষ প্রসার লাভ করেছে। যশোর অঞ্চলে শৈলকুপা, ঝিনাইদহ, হরিণাকুণ্ড, কোটচাঁদপুর এবং কুষ্টিয়া অঞ্চলে চুয়াডাঙ্গা, আলমডাঙ্গা, দৌলতপুর, মিরপুর, ভেড়ামারা ও কোতোয়ালী থানা এলাকায় বাংলাদেশ টোবাকো কোম্পানির তত্ত্বাবধানে বার্ষিক প্রায় ৭ হাজার একর জমিতে উন্নতমানের ভার্জিনিয়া তামাকের আবাদ করা হয়। ২০০৪-০৫ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশে ৭৪ হাজার একর জমিতে তামাকের চাষ করে ৩৮ হাজার মেট্রিক টন তামাক উৎপন্ন হয়।

বাণিজ্য: দেশের চাহিদা মিটিয়ে বাংলাদেশে তামাক রপ্তানি করতে পারে না। বরং উৎকৃষ্ট জাতের তামাক আমদানি করতে হয়। বার্ষিক আমদানিকৃত সিগারেট ও তামাকের মূল্য প্রায় ১০ কোটি টাকা। অভিজ্ঞ মহলের অভিমত তামাক চাষের উন্নতি হলে বাংলাদেশ নিজস্ব চাহিদা মিটিয়ে তামাক রপ্তানির মাধ্যমে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে সক্ষম হবে।



চিত্র ৬.১০: বাংলাদেশের প্রধান অর্থকরী ফসল উৎপাদন অঞ্চল

অন্যান্য অর্থকরী শস্য

অন্যান্য অর্থকরী শস্যের মধ্যে রেশম, রাবার, পান, সুপারি, আলু, নারকেল প্রভৃতি প্রধান।

রেশম (Silk): তুঁত গাছের পোকা হতে রেশম উৎপাদন হয়। রেশমের আদি ভূমি চীন। বাংলাদেশে অতি প্রাচীন কাল হতে রেশম প্রস্তুত হয়। রাজশাহী অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে প্রায় ২০ হাজার একর জমিতে তুঁত গাছের চাষ করা হয়। বার্ষিক রেশম উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ৪০ হাজার টন। এ ছাড়া বগুড়া, ময়মনসিংহ এবং সিলেট অঞ্চলেও রেশম সূতা প্রস্তুত হয়ে থাকে। জাঁকজমক ও মূল্যবান পোশাক প্রস্তুতে এটা ব্যবহৃত হয়।

রাবার (Rubber): রাবার গাছের নিঃসৃত রস হতে রাবার প্রস্তুত হয়। এ গাছে চাষ করার জন্য সারা বছর অধিক তাপ ও বৃষ্টিপাতের প্রয়োজন। ২২° সে. হতে ২৭° সে. উত্তাপ এবং বার্ষিক ২৫০ সে. মি. এর অধিক বৃষ্টিপাতযুক্ত অঞ্চলে এর চাষ ভাল হয়। বাংলাদেশে পূর্বে কোন রাবার গাছ ছিল না। অথচ দেশের রাবার কারখানাগুলোর জন্য রাবার বিদেশ হতে আমদানি করা হত। ১৯৫৯ খ্রিষ্টাব্দে জাতিসংঘ খাদ্য ও কৃষি সংস্থার বিশেষজ্ঞ বাংলাদেশের বৃষ্টিবহুল পাহাড়িয়া এলাকা পরিদর্শন করেন এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম এবং সিলেট অঞ্চলের পাহাড়িয়া এলাকার মাটি ও জলবায়ু রাবার চাষের উপযোগী বলে মত প্রকাশ করেন। এরপর শুরু হয় বাংলাদেশে রাবারের চাষ। ফলে ১৯৬২-৬৩ অর্থ বছরে সরকার প্রথম রাবার চাষ ও উৎপাদন প্রকল্প বাস্তবায়নের দায়িত্ব বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন সংস্থার উপর ন্যস্ত করেন। প্রাথমিক পর্যায়ে ১৯৬৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রায় ৭ হাজার একর জমিতে রাবারের চাষ শুরু করার পর ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দে শিট প্রস্তুতের জন্য গাছ হতে ল্যাটেক্স সংগ্রহ শুরু হয়। ইদানীং বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন সংস্থা ৪৩ কোটি টাকার একটি রাবার বৃক্ষরোপণ ও সমন্বিত প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রকল্প প্রণয়ন করেছে। ১৯৯৫ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে রাবারের স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করাই এ প্রকল্পের লক্ষ্য। এ প্রকল্পের অধীনে ৮ হাজার ৮শ' একরসহ চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম, সিলেট, ঢাকা, ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল অঞ্চলের সাড়ে ৩৭ হাজার একর জমিতে রাবার চাষ করা হয়।

বর্তমানে চট্টগ্রাম অঞ্চলের রামু, রাউজান ও দাঁতমারার ৬ হাজার ১শ' একর জমিতে রাবার গাছ রয়েছে। এ ছাড়া সিলেট অঞ্চলের সাতগাঁও ও অন্যান্য স্থানে ২ হাজার ৭শ' একর জমিতে রাবার বাগান রয়েছে।

রাবার গাছ লাগানোর ৫ হতে ৭ বছরের মধ্যে উৎপাদন শুরু হয় এবং দীর্ঘ ৫০/৬০ বছর পর্যন্ত উৎপাদন ক্রমবর্ধমান গতিতে অব্যাহত থাকে। তাই আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশ রাবার উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে সক্ষম হবে। ফলে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রার অপচয় বন্ধ হবে।

পান (Betel-leaf): পান বাংলাদেশের একটি উল্লেখযোগ্য অর্থকরী ফসল। পান চাষের জন্য অধিক তাপ ও বৃষ্টিপাতের প্রয়োজন হয়। এটা লতা জাতীয় গাছ এবং প্রখর সূর্যরশ্মি সহ্য করতে পারে না। তাই ছায়া প্রদানের জন্য পান গাছের ওপরে বেড়া দেয়া হয়। বাংলাদেশের প্রায় সব জেলাতেই পানের চাষ চলে। কিন্তু নিচু অঞ্চলে বর্ষার পানি আসলে গাছ পঁচে যায়।

এ দেশের সিলেট, ঢাকা, ফরিদপুর, বরিশাল, পটুয়াখালী, রাজশাহী, নোয়াখালী ও কুমিল্লা অঞ্চলে পানের চাষ হয়। রাজশাহী ও ঢাকা অঞ্চলে বেশি পান জন্মে। একবার এ গাছ লাগালে কয়েক বছর পর্যন্ত পাতা সংগ্রহ করা যায়। বরিশাল ও পটুয়াখালী অঞ্চলে 'ধলকো' নামক মিষ্টি পান প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। সিলেট অঞ্চলে 'খাসিয়া' পান পাওয়া যায়। 'সাচি' নামক উৎকৃষ্ট শ্রেণির পানের জন্য রাজশাহী অঞ্চল বিখ্যাত। একমাত্র রাজশাহী অঞ্চলেই বাংলাদেশের ২০% পান উৎপন্ন হয়। মুন্সীগঞ্জে বাংলাদেশের ১৬½% পান জন্মে। বাংলাদেশে বার্ষিক সর্বমোট প্রায় ৩৩ হাজার একর জমিতে ৬৫ হাজার টন পান উৎপন্ন হয়।

দেশের চাহিদা মিটিয়ে প্রতি বছর প্রায় ১৫ লাখ টাকার পান বিদেশে রপ্তানি করা হয়।

আলু (Potato): বাংলাদেশে গোল ও মিষ্টি উভয় প্রকার আলুই জন্মে। ২০০৪-০৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রায় ৮ লক্ষ ৬ হাজার একর জমিতে ৪৮ লক্ষ ৫৫ হাজার টন গোলআলু এবং ৮৭ হাজার একর জমিতে ৩ লক্ষ ১১ হাজার মেট্রিক টন মিষ্টি আলু উৎপন্ন হয়। ঢাকা, রাজশাহী, সিলেট, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, বগুড়া, রংপুর, দিনাজপুর প্রভৃতি অঞ্চলে আলু চাষ হয়। তবে মুন্সীগঞ্জে জেলা গোলআলু চাষের জন্য প্রসিদ্ধ। এ সব ফলন খাদ্যশস্যের অন্তর্ভুক্ত হলেও আলুকে অর্থকরী ফসল বলা চলে। কারণ এটা বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে চাষ করা হয়।

সুপারি ও নারকেল (Betel-nut and coconut): বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্রই সুপারি ও নারকেল জন্মে। তবে খুলনা, বরিশাল, পটুয়াখালী, নোয়াখালী, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি জেলায় এদের চাষ বেশি হয়ে থাকে। কারণ, লবণাক্ত মাটিতে এদের ফলন ভাল হয়।

৬.৬ বাংলাদেশের খনিজসম্পদ, শিল্প, যোগাযোগ ও বাণিজ্য, পর্যটন ও প্রযুক্তি

খনিজ সম্পদ

প্রকৃত প্রদত্ত ভূগর্ভস্থ সম্পদ হচ্ছে খনিজ সম্পদ। নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমারেখা বেষ্টিত ভূ ও জলভাগের ভূনিম্নস্থ খনিজ পদার্থ উঠিয়ে এনে তা ব্যবহার উপযোগী করে তোলা যায়। ভূপৃষ্ঠে অথবা ভূগর্ভে কোন স্থানে সঞ্চিত খনিজ সম্পদের অবস্থান মূলত সংশ্লিষ্ট স্থানের ভূতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ও সময়কাল দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে।

খনিজ প্রাপ্তির উৎস

খনিজ প্রধানত দুটি উৎস থেকে পাওয়া যায়। উৎস দুটির একটি জৈবিক, অপরটি হচ্ছে অজৈবিক। জৈবিক উৎস থেকে যে সব খনিজ পাওয়া যায় তা হলো কয়লা (C), চূনাপাথর (CaCO₃), গ্যাস (CH₄), তেল। অজৈবিক উৎস থেকে আবার দু রকম খনিজ পাওয়া যায় ধাতব আর অধাতব। ধাতব খনিজের মধ্যে রয়েছে দস্তা, স্বর্ণ, সীসা, রূপা, পারদ, তামা, তেজক্রিয় খনিজ। অধাতব খনিজ পদার্থের মধ্যে সালফার (S), ক্যালসিয়াম (Ca), সোডিয়াম (Na), পটাসিয়াম (K) ও শ্বেতকাদা (White Clay)।

কয়লা (Coal)

শক্তির অন্যতম উৎস কয়লা। বাংলাদেশে যে কয়লা পাওয়া গেছে তার বেশীর ভাগ পীট জাতীয়। তবে লিগনাইট ও বিটুমিনাস জাতীয় উৎকৃষ্ট শ্রেণির কয়লা আবিষ্কৃত হয়েছে। কয়লা বাংলাদেশের বিভিন্ন শিল্পের কাঁচামাল ও জ্বালানী হিসেবে ব্যবহৃত হয় বলে অর্থনৈতিক উন্নয়নে এর ভূমিকা অত্যধিক। নিম্নের সারণিতে কয়লার ক্ষেত্র, তার অবস্থান দেখানো হলো-

সারণি ৬.৯: কয়লার ক্ষেত্র, তার অবস্থান, মজুদের পরিমাণ

কয়লার ক্ষেত্রের নাম	অবস্থান	আবিষ্কারের খ্রিষ্টাব্দ	আয়তন	মজুদের পরিমাণ
খালাসপীর	রংপুর জেলা	১৯৮৯ - ৯০	১২.৫৬ বর্গ কি. মি.	৬৮ কোটি মে.টন
বড় পুকুরিয়া	দিনাজপুর জেলা	১৯৮৬ - ৮৭	৫.২৫ বর্গ কি. মি.	৩৮ কোটি ৯০ লাখ মে.টন
জামালগঞ্জ	জয়পুরহাট জেলা	১৯৬২	১১.৬৬ বর্গ কি. মি.	১০৫ কোটি ৩০ লক্ষ মে.টন
দিঘীপাড়া	দিনাজপুর জেলা	১৯৯৪ - ৯৫	-	-

দিনাজপুর জেলার ফুলবাড়িতে ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দে আরেকটি কয়লার ক্ষেত্রের সন্ধান পাওয়া গেছে। বগুড়া জেলার নন্দীগ্রামের কুচমা, নওগাঁ জেলার পত্নীতলা, নবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ এবং রংপুর জেলার পীরগঞ্জে কয়লা খনির সন্ধান পাওয়া গেছে।

পীট কয়লা: উন্নতমানের কয়লা আবিষ্কারের আগে বাংলাদেশে বেশ কয়েকটি স্থানে পীট কয়লা পাওয়া গেছে। গোপালগঞ্জ ও খুলনার পীট সঞ্চয়নের ক্ষেত্রগুলো বেশ বড়। গোপালগঞ্জ জেলার চান্দা ও বাঘিয়া বিলে প্রায় ১২.৫ কোটি টন, মৌলভীবাজার জেলায় ২১ লাখ টন, খুলনা জেলার কোলামৌজা বিলে প্রায় ৮০ লাখ টন, সুনামগঞ্জ জেলার পাগলা ও চরকাই এলাকায় যথাক্রমে ১৮ লাখ ও ১২ লাখ পীট কয়লার সন্ধান পাওয়া গেছে।

পেট্রোলিয়াম বা খনিজ তেল (Petroleum or Mineral Oil)

আধুনিক সভ্য জগতে খনিজ তেল একটি প্রয়োজনীয় সামগ্রী। শক্তি, আলোক ও তাপ উৎপাদনের জন্য এটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রী। খনিজ তেলকে পরিশোধিত করে গ্যাসোলিন, ডিজেল গ্যাস, কেরোসিন, পিচ্ছিলকারক তেল, প্যারাফিন প্রভৃতি পাওয়া যায়। রেলগাড়ি, মোটরগাড়ি, জাহাজ, বিমান ইত্যাদি চালনা করতে পেট্রোল ও ডিজেল ব্যবহৃত হয়।

তেল ক্ষেত্রসমূহ: বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) জ্বালানী তেল আমদানী, আভ্যন্তরীণ সংগ্রহ, মজুদ ও বিপণন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। বর্তমানে দেশের জ্বালানী তেলের ক্ষমতা প্রায় ১০.৯১ লক্ষ মেট্রিক টন।

হরিপুর তেলক্ষেত্র: ১৯৮৬ খ্রিষ্টাব্দের ২২ ডিসেম্বর বাংলাদেশের সিলেট জেলার হরিপুরে এ তেলক্ষেত্রটি আবিষ্কৃত হয়। বর্তমানে এ ক্ষেত্র থেকে তেল উত্তোলিত হচ্ছে।

বরমচল তেলক্ষেত্র: মৌলভীবাজার জেলার বরমচলে বাংলাদেশের দ্বিতীয় তেলক্ষেত্রটি আবিষ্কৃত হয়। বর্তমানে এ তেলক্ষেত্র থেকে তেল উত্তোলিত হচ্ছে।

অন্যান্য ক্ষেত্র: এ ছাড়া বরিশালের হিজলা, মুলাদি, নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ, নাটোর জেলার নিমগাঁ, চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড এবং বগুড়ায় তেল প্রাপ্তির সম্ভাবনা নিশ্চিত বলে জানা গেছে।

গ্যাস খনি হতে প্রাপ্ত তেল: বাংলাদেশের কৈলাশটিলা ও হরিপুর গ্যাস খনি হতে সামান্য তেল পাওয়া যায়। এ তেলকে ‘কনডেনসেট’ বলা হয়।

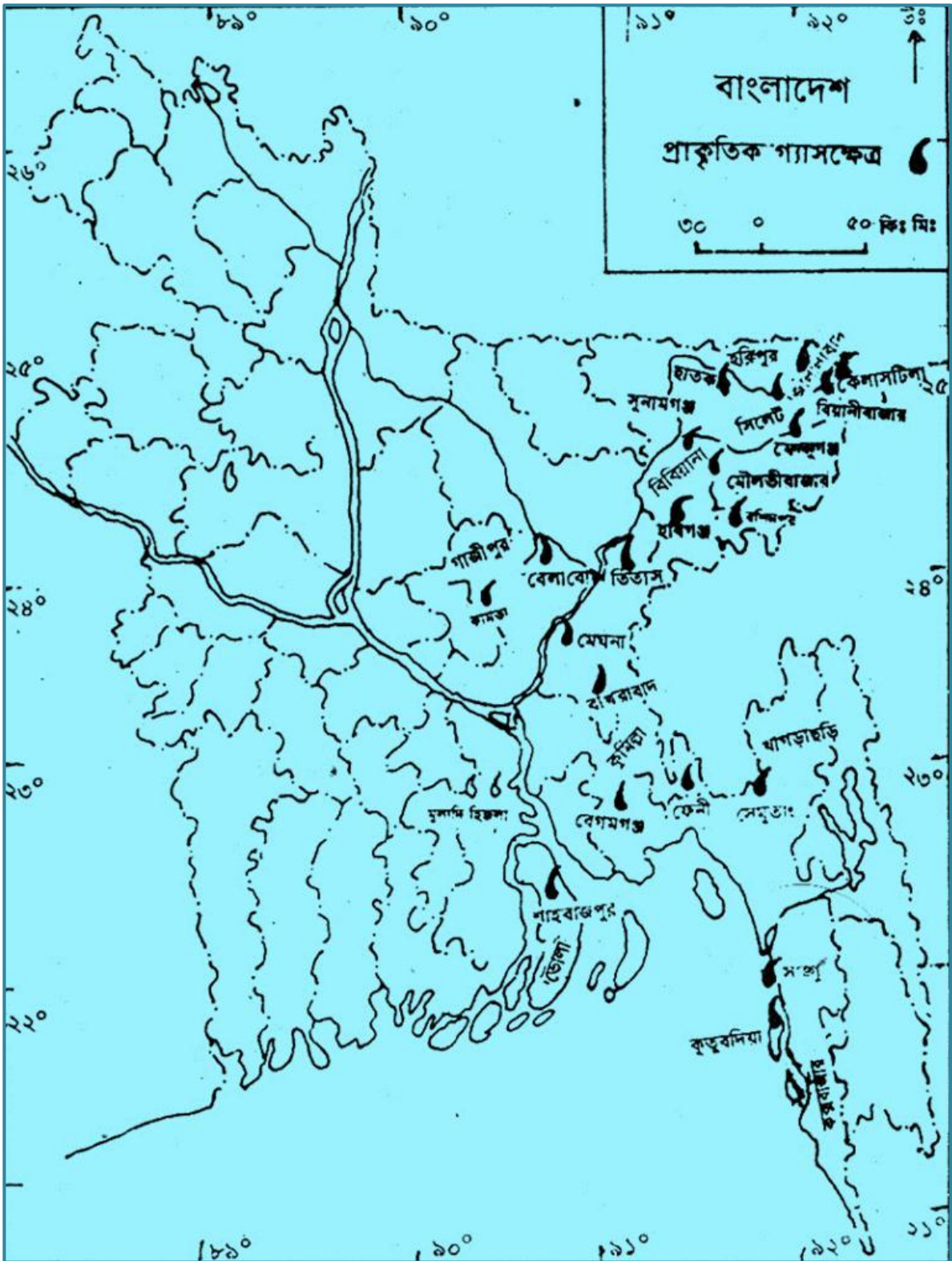
প্রাকৃতিক গ্যাস (Natural Gas)

প্রাকৃতিক গ্যাস বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ জ্বালানি সম্পদ, যা দেশের মোট বাণিজ্যিক জ্বালানি ব্যবহারের শতকরা প্রায় ৭৪ ভাগ পূরণ করে। এ যাবৎ দেশের আবিষ্কৃত মোট গ্যাস ক্ষেত্রের সংখ্যা ২৬টি। সাম্প্রতিক পেট্রোবাংলা কর্তৃক সর্বশেষ প্রাক্কলন অনুযায়ী মোট গ্যাস মজুদের পরিমাণ ৩৮.০২ ট্রিলিয়ন ঘনফুট এবং উত্তোলনযোগ্য প্রমাণিত এবং সম্ভাব্য মজুদের পরিমাণ ২৭.১২ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। ডিসেম্বর, ২০১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত প্রকৃত গ্যাস উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ১৩.৪৮ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। ফলে জানুয়ারি, ২০১৬ খ্রিষ্টাব্দে উত্তোলনযোগ্য নীট মজুদের পরিমাণ ১৩.৬৪ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। সারণি ৬.২৯ এ দেশে গ্যাস মজুদের পরিমাণ দেখানো হলো-

সারণি ৬.১০: দেশে গ্যাস মজুদের পরিমাণ (বিলিয়ন ঘনফুট)

গ্যাস ক্ষেত্র	কুপ সংখ্যা	প্রাথমিক মোট মজুদ	প্রাথমিক উত্তোলনযোগ্য মজুদ	উৎপাদন অর্থবছর ২০১৪-১৫	ক্রমপুঞ্জিত উৎপাদন ডিসেম্বর-২০১৫ পর্যন্ত	অবশিষ্ট জানুয়ারি-২০১৬
তিতাস	২১	৮১৪৮.৯	৬৩৬৭	১৮৮.২৪	৪০৩৪.৬	২৩৩২.৪
হবিগঞ্জ	৭	৩৬৮৪	২৬৩৩	৮১.৬৫	২১৯০.৯৪	৪৪২.০৬
বাখরাবাদ	৬	১৭০১	১২৩১.৫	১৩.৮৭	৭৮৮.৬২	৪৪২.৮৮
নরসিংদী	২	৩৬৯	২৭৬.৮	১০.২১	১৭০.৫৭	১০৬.২৩
মেঘনা	১	১২২.১	৬৯.৯	৩.৭০	৫৬.৯	১৩
সিলেট	২	৩৭০	৩১৮.৯	৩.০৫	২০৮.৩৪	১১০.৫৬
কৈলাশটিলা	৫	৩৬১০	২৭৬০	২৬.৪৬	৬২২.৭৯	২১৩৭.২১
রশিদপুর	৫	৩৬৫০	২৪৩৩	২১.১১	৫৬৪.৮৫	১৮৬৮.১৫
বিয়ানী বাজার	১	২৩০.৭	২০৩	৩.৪৭	৯১.২	১১১.৮
সালদানদী	১	৩৭৯.৯	২৭৯	৪.০১	৮৫.১	১৯৩.৯
ফেঞ্চুগঞ্জ	৩	৫৫৩	৩৮১	১৩.৮৫	১৩৮.১৮	২৪২.৮২
শাহবাজপুর	২	৬৭৭	৩৯০	৩.২২	১৮.৯৬	৩৭১.০৪
সেমুতাং	২	৬৫৩.৮	৩১৭.৭	২.০৮	১১.০৭	৩০৬.৬৩
সুন্দলপুর	১	৬২.২	৩৫.১	১.৪৬	৯.৪৩	২৫.৬৭
শ্রীকাইল	২	২৩০	১৬১	১৪.৬১	৩৯.৫	১২১.৫
বেগমগঞ্জ	১	১০০	৭০	০.৫৪	০.৮	৬৯.২
জালালবাদ	৬	১৪৯১	১১৮৪	৮৭.৮৬	৯৮৪.৮২	১৯৯.১৮
মৌলভীবাজার	৫	১০৫৩	৪২৮	২০.৩২	২৮১.৮৭	১৪৬.১৩
বিবিয়ানা	২৪	৭৪২৭	৫৭৫৪	৩৫৩.৮৭	২২৬৫.০৪	৩৪৮৮.৯৬
বাসুরা	৪	১১৯৮	৫২২	৩৮.৫৯	৩২১০৪৮	২০০.৫২
মোট	১০১	৩৫৭১০.৬	২৫৮১৫	৮৯২.১৭	১২৮৮৫.০৬	১২৯২৯.৮
উৎপাদনে যায় নাই:						
কুতুবদিয়া		৬৫.০	৪৫.৫		০.০	৪৫.৫
বৃপগঞ্জ		৪৮.০	৩৩.৬		০.০	৩৩.৬
মোট		১১৩.০	৭৯.১			৭৯.১
উৎপাদন স্থগিত						
সান্দু		৮৯৯.৬	৫৭৭.৮		৪৮৭.৯	৮৯.৯
ছাতক		১০৩৯.০	৪৭৪.০		২৬.৫	৪৪৭.৫
কামতা		৭১.৮	৫০.৩		২১.১	২৯.২
ফেনী		১৮৫.২	১২৫.০		৬২.৪	৬২.৬
মোট		২১৯৫.৬	১২২৭.১		৫৭৭.৯	৬২৯.২
সর্বমোট	১০১	৩৮০১৯.২০	২৭১২১.১৬	৮৯২.১৭	১৩৪৮২.৯৬	১৩৬৩৮.১৪

উৎস: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০১৬, পৃ. ১৩৭-১৩৮



চিত্র ৬.১১: বাংলাদেশের প্রাকৃতিক গ্যাসক্ষেত্র

অধাতব খনিজ (Non-Metallic Minerals)

চূনাপাথর (Limestone): সিমেন্ট, গ্যাস, ইস্পাত, সাবান, কাগজ, গৃহনির্মাণ, ব্লিচিং পাউডার, ক্যালসিয়াম কার্বাইড এবং রং প্রস্তুত করার জন্য চূনাপাথর ব্যবহৃত হয়।

উৎপাদক অঞ্চল: সুনামগঞ্জের চূনাপাথর: সুনামগঞ্জ জেলার টাকেরহাট, লালঘাট ও বাগলিবাজার অঞ্চলে প্রচুর চূনাপাথর পাওয়া যায়। এ এলাকায় ৩০ লক্ষ টন চূনাপাথর সঞ্চিত আছে বলে অনুমান করা হয়। এ চূনাপাথর খুব উৎকৃষ্ট শ্রেণির। এ চূনাপাথর ছাতক সিমেন্ট কারখানায় কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

সিলেটের চূনাপাথর: সিলেট জেলায়ও প্রচুর চূনাপাথর সঞ্চিত আছে। এর জাফলং, চরগাঁ, ভাঙ্গারহাট প্রভৃতি স্থানে চূনাপাথর পাওয়া যায়।

জয়পুরহাট জেলার চূনাপাথর: জয়পুরহাট জেলার জয়পুরহাট ও জামালগঞ্জ অঞ্চলে প্রায় ৬.৫ বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে চূনাপাথর খনি অবস্থিত।

চট্টগ্রাম জেলার চূনাপাথর: এ জেলার সীতাকুণ্ড নামক স্থানে চূনাপাথর পাওয়া যায়। এখানে ১৮ লক্ষ টন চূনাপাথর সঞ্চিত আছে।

কক্সবাজার জেলার চূনাপাথর: কক্সবাজার জেলার সেন্টমার্টিন দ্বীপে চূনাপাথর পাওয়া গেছে।

চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলার চূনাপাথর: চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলায় চূনাপাথরের সন্ধান পাওয়া গেছে।



চিত্র-৬.১২: বাংলাদেশের খনিজ সম্পদ

সিলিকা বালু

সিলিকা বালু সাধারণত কাঁচ নির্মাণে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া রং, রাসায়নিক দ্রব্য তৈরিতে এ বালি ব্যবহৃত হয়।

উৎপাদক অঞ্চল

শেরপুর জেলা: শেরপুর জেলার উত্তরে গারো পাহাড়িয়া অঞ্চলের নিকটবর্তী বালিজুড়ি নামক স্থানে সিলিকা বালু পাওয়া যায়। এ অঞ্চলে সিলিকা বালুর পরিমাণ প্রায় ২ লক্ষ টন।

মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলা: মৌলভীবাজারের কুলাউড়া এবং হবিগঞ্জের শাহজীবাজার ও নয়াপাড়া অঞ্চলে সিলিকা বালু পাওয়া যায়। শাহজীবাজার ও নয়াপাড়া অঞ্চলে ৮২ মিটার পুরু সিলিকা বালু স্তরে প্রায় ৪ লক্ষ টন উৎকৃষ্টমানের বালি সঞ্চিত আছে বলে ধারণা করা হয়। এ বালিতে প্রায় ৯৭.৯৯%-৯৮.৬২% সিলিকা আছে। এ ছাড়া কুমিল্লা জেলার চৌদ্দগ্রাম থানায় বাতাসিয়ায় সিলিকা বালুর সন্ধান পাওয়া গেছে। বর্তমানে হবিগঞ্জ এবং মৌলভীবাজার জেলায় ৪৫টি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে সিলিকাবালু উত্তোলনের কোয়ারী ইজারা প্রদান করা হয়েছে এবং ২৮টি কোয়ারী ইজারা প্রদানের কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

চীনা মাটি (China Clay)

বাসনপত্র, কাগজ, রবার, বস্ত্র, বৈদ্যুতিক ইনসুলেটর স্যানিটারি জিনিসপত্র প্রভৃতি নির্মাণের জন্য চীনা মাটি ব্যবহৃত হয়।

উৎপাদক অঞ্চল

ময়মনসিংহ জেলা: ১৯৫৩ খ্রিষ্টাব্দে ময়মনসিংহ জেলার বিজয়পুর গ্রামে চীনা মাটি আবিষ্কৃত হয়। এ মাটির স্তর গড়ে প্রায় ৩.০৪ মিটার পুরু। এ অঞ্চলে দুই লক্ষ মেট্রিক টন শ্বেত মৃত্তিকা সঞ্চিত আছে বলে অনুমান করা হয়।

নওগাঁ জেলা: নওগাঁ জেলার পত্নীতলা এলাকায় ৪১১.৪ মিটার মাটির নীচে চীনা মাটির একটি স্তর পাওয়া গেছে। স্তরটি ৯.১ মিটার পুরু।

কঠিন শিলা (Hard Rock): রেললাইন, রাস্তাঘাট, গৃহনির্মাণ, নদীর বাঁধ তৈরিতে কঠিন শিলা ব্যবহার করা হয়। ১৯৬৬ খ্রিষ্টাব্দে রংপুর জেলার বদরগঞ্জের নিকট রাণীপুকুর নামক স্থানে প্রায় ১৮২ মিটার মাটির নীচে কঠিন শিলার সন্ধান পাওয়া গেছে। দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর থানাধীন মধ্যপাড়া নামক স্থানে ১২১ মিটার মাটির নীচে অনুরূপ শিলা পাওয়া গেছে।

নুড়ি পাথর (Gravel): প্রধানত রাস্তাঘাট, গৃহ, পুল, কালভার্ট, রেলপথ ইত্যাদি নির্মাণে ব্যবহৃত হয়। সিলেট জেলার ভোলাগঞ্জ, পিয়ানগঞ্জ, পঞ্চগড় জেলার পঞ্চগড় ও তেতুলিয়া, লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম প্রভৃতি স্থানে নুড়ি পাথর পাওয়া গেছে।

খনিজ বালি (Mineral Sand): এ তেজস্ক্রিয় বালি প্রধানত ধাতব শিল্পে ব্যবহৃত হয়। কক্সবাজার হতে টেকনাফ পর্যন্ত উপকূলীয় এলাকায় প্রচুর পারমাণবিক খনিজ পদার্থের সন্ধান পাওয়া গেছে।

গন্ধক (Sulphur): রাসায়নিক শিল্পের জন্য গন্ধক অপরিহার্য। বারুদ, সালউরিক এসিড, কীটপতঙ্গ নাশক দ্রব্য, দিয়াশলাই ও আতশবাজি তৈরী করতে গন্ধক ব্যবহৃত হয়। আবার পেট্রোলিয়াম পরিশোধন করতে গন্ধকের প্রয়োজন হয়। বাংলাদেশের একমাত্র কুতুবদিয়া দ্বীপে গন্ধক পাওয়া যায়।

নিম্নের সারণিতে খনিজ সম্পদের পরিমাণ দেখানো হলো-

সারণি ৬.১১: বাংলাদেশে আবিষ্কৃত খনিজ সম্পদ এবং এর পরিমাণ (সম্ভাব্য)

খনিজের নাম	ক্ষেত্রের সংখ্যা	পরিমাণ (সম্ভাব্য) মে.টন
কয়লা	৪	১৬৭১
পিট	৬	২০০
চুনাপাথর	৩+	১২৯
সাদা মাটি	৩	৪০
কাঁচ বালি	৫	১১৬
কঠিন শিলা	১+	১১৫+

উৎস: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০১৬, পৃ. ১৪২

ধাতব খনিজ (Metalic Minerals)

তামা (Copper): তামা ছাড়া বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি প্রস্তুত করা অসম্ভব। এ ছাড়া মুদ্রা, যন্ত্রাদি, বাসন প্রভৃতি প্রস্তুতেও এটি ব্যবহৃত হয়। দিনাজপুর জেলার মধ্যপাড়া ও রংপুর জেলার পীরগঞ্জ নামক স্থানে ভূগর্ভস্থ কঠিন শিলার সাথে তামার সন্ধান পাওয়া গেছে।

লোহা (Iron): বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে নিম্নমানের আকরিক লোহা আছে। সিলেট, ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রাম জেলায় আকরিক লোহার সন্ধান পাওয়া গেছে। রাজশাহী, বগুড়া, দিনাজপুর ও রংপুর জেলার ভূনিম্নস্থ প্রাচীন শিলার সাথে উন্নতমানের আকরিক লোহা পাওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে।

বাংলাদেশের শিল্প (Industry of Bangladesh)

শিল্পক্ষেত্রে বাংলাদেশ বিশেষ উন্নত নয়। ব্রিটিশ শাসন অবসানের পর হতে স্বাধীনতা প্রাপ্তি পর্যন্ত দেশে যে সব কারখানা গড়ে উঠেছে তা প্রয়োজনের তুলনায় অতি নগণ্য। ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দের ২৬ শে মার্চ রাষ্ট্রপতির ২৭ নং ধারার ক্ষমতাবলে তৎকালীন EPIDC ব্যবস্থাপনার অধীনে সব দেশি এবং বিদেশি মালিকানায় অধিকাংশ শিল্পকারখানাসমূহ রাষ্ট্রায়ত্ত্ব করা হয়। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসাব অনুযায়ী ২০১৫-১৬ অর্থবছরে স্থির মূল্যে জিডিপিতে সার্বিক শিল্পখাতের অবদান প্রাক্কলন করা হয়েছে ৩১.২৮% যা ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ছিল ৩০.৪২%। দেশের শিল্পায়নের গতিকে বেগবান করতে শিল্পনীতি-২০১৬ ঘোষণা করা হয়েছে। বাংলাদেশের বৃহৎ শিল্পগুলোর মধ্যে পাট, বস্ত্র, কাগজ, চিনি, সিমেন্ট, সার ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দেশের অধিকাংশ শিল্প-কারখানাগুলো যদিও ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম ও খুলনায় অবস্থিত, তথাপি দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও কিছু কিছু শিল্প-কারখানা স্থাপিত হয়েছে। এর মধ্যে হালকা, মাঝারি ও ভারী শিল্প-কারখানা রয়েছে। নিচে বিভিন্ন শিল্পের শ্রেণিবিভাগ করে দেখান হলো-

সারণি ৬.১২: শিল্পের শ্রেণির বিভাগ

(ক) হালকা শিল্প	(খ) মাঝারি শিল্প	(গ) ভারী শিল্প
১. তাঁত শিল্প	১. হোশিয়ারী শিল্প	১. লোহা ও ইস্পাত শিল্প
২. অলঙ্কার শিল্প	২. রেশম শিল্প	২. পাট বয়ন শিল্প
৩. পিতল-কাসা	৩. লবণ শিল্প	৩. কার্পাস বয়ন শিল্প
৪. বিড়ি শিল্প	৪. সিগারেট শিল্প	৪. কাগজ শিল্প
৫. আসবাবপত্র শিল্প ইত্যাদি	৫. চা শিল্প	৫. সিমেন্ট শিল্প
	৬. অ্যালুমিনিয়াম শিল্প ইত্যাদি	৬. চিনি শিল্প

উৎস: খান, মোঃ আবদুল আউয়াল ও আকতার, খুরশীদ

শিল্প স্থাপনের কারণসমূহ: কতিপয় কারণের উপর ভিত্তি করে শিল্প কারখানা গড়ে ওঠে। এ কারণগুলোকে প্রধানত তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন-(ক) প্রাকৃতিক, (খ) অর্থনৈতিক ও (গ) সাংস্কৃতিক কারণ। প্রাকৃতিক কারণের মধ্যে কাঁচামাল, শক্তিসম্পদ, অনুকূল জলবায়ু ও জলসম্পদ; অর্থনৈতিক কারণের মধ্যে মূলধন, সুলভ শ্রমিক, বাজার ও পরিবহণ ব্যবস্থা এবং সাংস্কৃতিক কারণের মধ্যে সরকারি উদ্যোগ, রাজনৈতিক অবস্থা, ব্যবসায়িক সুনাম ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে শিল্পের গুরুত্ব: বাংলাদেশের ন্যায় উন্নয়নশীল দেশের অর্থনীতিতে শিল্পের গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলাদেশ মূলত একটি কৃষিপ্রধান দেশ। কিন্তু তা সত্ত্বেও দেশের অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষার জন্য শিল্পের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি। আধুনিক যুগে কোন দেশ অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য শুধু কৃষির উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকতে পারে না। পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোর অর্থনৈতিক উন্নতির মূলে রয়েছে দ্রুত শিল্পোন্নয়ন। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নেও শিল্পের যথেষ্ট অবদান রয়েছে। পূর্বে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের শিল্পের অবদান ছিল অতি নগণ্য। কিন্তু বর্তমানে শিল্পের মাধ্যমে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়। সুতরাং বাংলাদেশের অর্থনীতিতে শিল্পের ভূমিকাও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের অর্থনীতিতে শিল্পের বিভিন্ন দিক নিচে আলোচনা করা হলো-

কৃষির উন্নয়ন: শিল্পের উন্নতি ছাড়া কৃষির উন্নয়ন অসম্ভব। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষাবাদের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির সরবরাহ শিল্পোন্নয়নের উপর নির্ভরশীল। দেশে কৃষি যন্ত্রপাতির কারখানা থাকলে যান্ত্রিক চাষাবাদ দ্রুত প্রসার লাভ করবে। বর্তমানে কৃষি যন্ত্রপাতি আমদানি করতে হয় বলে এর ব্যবহার অতি বিরল। কৃষির উন্নতি সার ও কীটনাশকের উপরও নির্ভরশীল। দেশে সার ও কীটনাশকের কারখানা থাকলে কৃষির উন্নতি হয়। তাই শিল্প পরোক্ষভাবে কৃষিতে সাহায্য করে থাকে।

বেকার সমস্যার সমাধান: ঘনবসতিপূর্ণ বাংলাদেশের বেকার সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করেছে। কৃষিতে পূর্ব হতেই অতিরিক্ত জনতার চাপ রয়েছে এবং কর্মসংস্থানের সেবুপ ব্যবস্থা নেই। এরূপ পরিস্থিতিতে অধিক কলকারখানা স্থাপিত না হলে বেকার সমস্যার কোন সমাধান হবে না।

বৈদেশিক বাণিজ্য অনুকূল অবস্থার সৃষ্টি: বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যে অনুকূল অবস্থা সৃষ্টির জন্য শিল্পোন্নয়ন প্রয়োজন। বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের কাঁচামালকে শিল্পজাত দ্রব্যে পরিণত করে তা বিদেশে রপ্তানি করতে পারলে বাংলাদেশে অধিক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে সক্ষম হবে। ফলে বাংলাদেশে শিল্পজাত দ্রব্যের আমদানি অনেক কমে যাবে এবং বৈদেশিক মুদ্রার বিরাট অংশ উদ্ধৃত থাকবে।

অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা: যদিও বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ তবুও অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য কৃষিকাষের উপর নির্ভর করা যায় না। কৃষি উৎপাদনে বাংলাদেশ এখনও স্থিতিশীলতা অর্জন করতে পারেনি। নানা ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে বাংলাদেশ কৃষি উৎপাদনে এখনও অনিশ্চয়তায় ভুগছে। কিছু শিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জন করা যায়। তাই কৃষিপ্রধান বাংলাদেশও শিল্পোন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার: বাংলাদেশে প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে। একমাত্র শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে এ প্রাকৃতিক সম্পদকে অর্থনৈতিক কাজে ব্যবহার করা যায়।

জাতীয় আয় বৃদ্ধি ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন: জাতীয় আয় বৃদ্ধি ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ের জন্য শিল্পের উন্নয়ন অপরিহার্য। বর্তমানে বাংলাদেশে জাতীয় আয় অত্যন্ত কম এবং জীবনযাত্রার মান অত্যন্ত নিম্ন। দ্রুত শিল্প উন্নয়নের মাধ্যমে জাতীয় আয় ও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা যায়। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে জিডিপিতে শিল্পখাতের অবদান ৩১.২৮%।

প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালী করা: শক্তিশালী প্রতিরক্ষার জন্য শিল্পের প্রয়োজন। কারণ, দেশে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র ও সাজ-সরঞ্জাম তৈরি করার জন্য কারখানা থাকা উচিত। প্রতিরক্ষার খাতিরে অস্ত্রশস্ত্রের জন্য বাংলাদেশকে অন্য দেশের উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকা উচিত নয়।

পরিবহণ ও যোগাযোগে ব্যবস্থার উন্নতি: দেশ শিল্পে উন্নত না হলে পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হয় না। দেশীয় কারখানায় যানবাহন ব্যবস্থার জন্য যাবতীয় কলকজা সরঞ্জামাদি প্রস্তুত হলে যানবাহন ব্যবস্থার দ্রুত উন্নতি হয়।

কৃষির উপর জনসংখ্যার চাপ রোধ: বর্তমান বাংলাদেশে জনসংখ্যা দ্রুতহারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর ফলে কৃষি জমির উপর চাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং জমিগুলো ক্রমশ খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যাচ্ছে। দেশে দ্রুত শিল্পকারখানা স্থাপিত হলে কৃষির উপর চাপ অনেকটা হ্রাস পাবে। সুতরাং কৃষির উপর জনসংখ্যার চাপ রোধ করার জন্য দেশে দ্রুত শিল্পোন্নয়ন প্রয়োজন।

বিদেশের উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস: বাংলাদেশকে অধিকাংশ শিল্পজাত দ্রব্য বিদেশ হতে আমদানি করতে হয়, কিছু দেশে শিল্প-কারখানার সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে বিদেশের উপর নির্ভরশীলতা যথেষ্ট হ্রাস পাবে। সুতরাং বিদেশের উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস করে আত্মনির্ভরশীল অর্থনীতি গড়ে তুলতে হলে দেশকে দ্রুত শিল্পায়িত করতে হবে।

ওপরে বর্ণিত আলোচনা হতে এটা স্পষ্টতই বোঝা যায় যে, বাংলাদেশের অর্থনীতিতে শিল্পের গুরুত্ব অপরিসীম।

পাট শিল্প (Jute Industry)

পাট ও পাটশিল্প পরিবেশ বান্ধব। বাংলাদেশের বিভিন্ন শিল্পের মধ্যে বর্তমানে পাটশিল্পই সর্বপ্রধান। কিছু পৃথিবীর সর্বপ্রধান পাট উৎপাদনকারী দেশ হওয়া সত্ত্বেও ১৯৫১ খ্রিষ্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত এ দেশে কোন পাটকল প্রতিষ্ঠিত হয়নি। অথচ এদেশের পাটের ওপর নির্ভর করে সে সময় ভারতে ১০৮টি এবং যুক্তরাজ্যের ডাভিতে অনেকগুলো পাটকল স্থাপিত হয়। ১৯৫১ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশে সর্বপ্রথম আদমজী পাটকল নির্মিত হয় এবং এর কয়েক বছরের মধ্যে সরকার ও জনসাধারণের অদম্য প্রচেষ্টায় এ দেশ পাটশিল্পে প্রভূত উন্নতি লাভ করে। ১৯৬৩ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলাদেশে ১০,৮২৩টি তাঁতবিশিষ্ট ১৭টি পাটকল গড়ে ওঠে। ১৯৬৬ খ্রিষ্টাব্দে পাটকলগুলোর সংখ্যা হয় ২৩টি। বর্তমানে বাংলাদেশে ৭৭টি পাটকল রয়েছে। তবে ২০০৪-২০০৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত চালু পাটকলের সংখ্যা ছিল ৭৫টি।

বিশ্ববাজারে ক্রমবর্ধমান চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের পাট ও পাটশিল্পকে প্রতিযোগী করে তোলা এবং পাট খাতের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার ঘোষিত **শিল্পনীতি আদেশ ২০১০** এ পাট জাত পণ্যকে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত খাত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং **পাটনীতি- ২০১১** অনুমোদিত হয়েছে।

পাটশিল্প গড়ে ওঠার কারণসমূহ

প্রাকৃতিক কারণসমূহ

কাঁচামাল: পাটই পাটশিল্পের একমাত্র কাঁচামাল। বাংলাদেশের এ কাঁচামালের সহজপ্রাপ্যতা পাটশিল্পের উন্নতিতে সহায়তা করেছে।

শক্তিসম্পদ: বৃহদাকার পাটকলগুলো চালনা করতে প্রচুর শক্তিসম্পদের প্রয়োজন হয়। বাংলাদেশের অধিকাংশ পাটকলগুলোতে নিকটবর্তী তাপ-বিদ্যুৎ এবং কর্ণফুলি নদীর পানি-বিদ্যুৎ সরবারহ করা হয়। এ ছাড়া প্রাকৃতিক গ্যাসও শক্তিসম্পদ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

জলবায়ু : পাট বয়ন শিল্পের জন্য আর্দ্র জলবায়ুর প্রয়োজন। শুষ্ক জলবায়ুতে বয়নকার্যে বিঘ্ন ঘটে। একারণে বাংলাদেশের আর্দ্র জলবায়ু পাটশিল্পের জন্য বিশেষ উপযোগী। এ ছাড়া এ দেশের জলবায়ুতে পাটের ফলন ভাল হয়। তাই জলবায়ু প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পাটশিল্পের উন্নতিতে প্রভাব বিস্তার করে।

অর্থনৈতিক কারণসমূহ

মূলধন: পাটশিল্প স্থাপনের জন্য প্রচুর মূলধনের প্রয়োজন। জমি ও যন্ত্রপাতি ক্রয় কারখানা নির্মাণ কাঁচামাল ও শক্তি-সম্পদ সংগ্রহ প্রভৃতি কাজে প্রথম অবস্থায় প্রচুর মূলধনের প্রয়োজন হয়। সুতরাং যে স্থানে মূলধন সহজলভ্য সে স্থানে সহজেই পাটশিল্প গড়ে ওঠে। যেমন- নারায়ণগঞ্জে বিভিন্ন ব্যাংক ও বীমা কোম্পানিগুলো হতে ঋণ পাওয়া যায় বলে দেশের অধিকাংশ পাটকলগুলো এ অঞ্চলেই গড়ে উঠেছে। এ ছাড়া এ অঞ্চলের ধনী ব্যবসায়ীগণও পাটশিল্পের প্রচুর মূলধন নিয়োগ করে থাকে।

সুলভশ্রমিক সরবরাহ: পাটশিল্পের জন্য বহুসংখ্যক শ্রমিকের প্রয়োজন হয়। বাংলাদেশ ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চল। এখানে বেকার সমস্যা প্রকট থাকতে স্বল্পমূল্যে প্রচুর শ্রমিক পাওয়া গেলে উৎপাদনের ব্যয় ও কম হয়। তাই সুলভ শ্রমিকের সহজলভ্যতা পাট শিল্পের উন্নতিতে যথেষ্ট সাহায্য করেছে।

পরিবহণ ব্যবস্থা: শিল্পকেন্দ্রে কাঁচা পাট সংগ্রহ এবং কারখানা হতে পাটজাত দ্রব্য দেশ-বিদেশের বাজারে প্রেরণ করতে সুষ্ঠু পরিবহণ ব্যবস্থা থাকা অত্যাবশ্যক। বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের পরিবহণ ব্যবস্থা থাকা অত্যাবশ্যক। বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের পরিবহণ ব্যবস্থা আছে, বিশেষ করে নদীপথে নৌকার সাহায্যে অতি অল্প খরচে পাট পরিবাহিত হয়। চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দরের মারফতে পাটজাত দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি এবং শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কলকজা সহজেই আমদানি করা যায়।

বাজার: বাংলাদেশের পাটজাত দ্রব্যের বাজার প্রায় বিশ্বজোড়া। এ কারণে এ দেশ পাট শিল্পে দ্রুত উন্নতি লাভ করেছে। এ ছাড়া বাংলাদেশের পাটজাত দ্রব্যও উৎকৃষ্ট শ্রেণির।

সাংস্কৃতিক কারণসমূহ

সরকারি উদ্যোগ: পাট শিল্পের উন্নতি ও প্রসারের জন্য সরকার নানাভাবে সাহায্য সহযোগিতা করে থাকে। পাটশিল্পে অর্থসংস্থান, পাটজাত দ্রব্যের বাজার সৃষ্টি ও সম্প্রসারণ, বৃদ্ধি প্রভৃতি বিষয়ে সরকার উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে।

রাজনৈতিক কারণ: রাজনৈতিক কারণও শিল্পের উপর প্রভাব বিস্তার করে। রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা বা বিশৃঙ্খলার দরুন অনেক সময় শিল্প নষ্ট হয়ে যায় বা শিল্প স্থাপনে বাধার সৃষ্টি হয়।

ব্যবসায়িক সুনাম: সুনামের উপরও শিল্পের উন্নতি নির্ভরশীল। বাংলাদেশের পাট শিল্পের সুনাম বিশ্বজোড়া। তাই এ দেশে দ্রুত এ শিল্পের প্রসার ঘটেছে।

উৎপাদন ও উৎপাদিত সামগ্রী: বাংলাদেশের বিভিন্ন পাটকল কাঁচা পাট ব্যবহার করে ২০১৫-১৬ খ্রিষ্টাব্দে ৮.৭৬ লক্ষ মেট্রিক টন পাটজাত দ্রব্য উৎপন্ন হয়। এসব পাটজাত দ্রব্যের মধ্যে চট, বস্তা, কার্পেট, বেকিং, ক্যানভাস, দড়ি, ইত্যাদি প্রধান। দেশের মোট রপ্তানি আয়ের প্রায় ৩% পাট ও পাটপণ্য রপ্তানি থেকে অর্জিত হয়।

সারণি ৬.১৩: পাটজাত পণ্যের উৎপাদন, রপ্তানি ও রপ্তানি মূল্য

অর্থবছর	উৎপাদন (লক্ষ মে.টন)	রপ্তানি (লক্ষ মে. টন)	রপ্তানি মূল্য (লক্ষ টাকা)
২০১১-১২	৭.১৪	৬.৬৯	৫১৭,৪০০
২০১২-১৩	৯.৭৭	৮.৬৮	৬১৬,২৬২
২০১৩-১৪	৯.৮৩	৮.০৮	৫২২,৪২১
২০১৪-১৫	৮.৬৫	৮.১৮	৫৬০,২১৬
২০১৫-১৬	৮.৭৬	৬.৭১	৪৩৬,৫০৫

উৎস: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০১৬

বাংলাদেশ জুট মিলস কর্পোরেশন (বিজেএমসি): এর মিলসমূহে প্রধানত: হেসিয়ান, স্যাকিং, কার্পেট, ক্রুথ উৎপাদিত হয়। এছাড়া কয়েকটি পাটকলে উন্নতমানের রপ্তানিযোগ্য পাটের সুতা, জিওজুট, কটন ব্যাগ, নার্সারী পট, ফাইল কভার ইত্যাদি উৎপাদিত হয়।

বাংলাদেশ জুট মিলস এসোসিয়েশন (বিজেএমএ): এর অধীনে বর্তমানে মোট সদস্য মিলের সংখ্যা ১৪৬টি (৩৮টি বেসরকারিকরণকৃত ও ১০৮টি নতুন স্থাপিত মিল)। নতুন স্থাপিত মোট ১০৮টি পাটকলের মধ্যে ৮৯টি কম্পোজিট, ৪টি কার্পেট মিল ও ১৫টি বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদনকারী মিল রয়েছে। বিজেএমএ এর সদস্যভুক্ত বর্তমান স্থাপিত তাঁত সংখ্যা মোট ১৪,২২৩, তন্মধ্যে হেসিয়ান-৬,০২৮, স্যাকিং-৭,০২৬, সিবিসি-৬৮৭, কার্পেট-৪২ ও অন্যান্য ৪৪০।

বাংলাদেশ জুট স্পিনার্স এসোসিয়েশন (বিজেএসএ): এর আওতার মোট ৯৬টি সূতাকল রয়েছে। এ সকল মিলসমূহ মোটা, মধ্যম ও মিহি কোয়ালিটি জুট ইয়ার্ন/টোয়াইন তৈরি করে। মিলগুলোর বাৎসরিক উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় ১০,৭৮,৬৩২.০০ মেট্রিক টন। চলতি ২০১৫-১৬ অর্থবছরে এর আওতায় উৎপাদিত সূতার পরিমাণ ২.৯২ লক্ষ মেট্রিক টন এবং রপ্তানির পরিমাণ ২.৭৭ লক্ষ মেট্রিক টন ও রপ্তানি মূল্য ১,৯৮৭.০১ কোটি টাকা।

জুট ডাইভার সিকিফেশন প্রমোশন সেন্টার (জেডিপিসি): এর প্রচেষ্টায় ২৫টি মাঝারি শিল্প, ১০০টি ক্ষুদ্র ও ৪০০ টির অধিক কুটির শিল্প স্থাপিত হয়েছে। ২০১৬ খ্রিষ্টাব্দে প্রায় ৫৬ মিলিয়ন ডলারের বহুমুখী পাটপণ্য রপ্তানি হয়েছে।

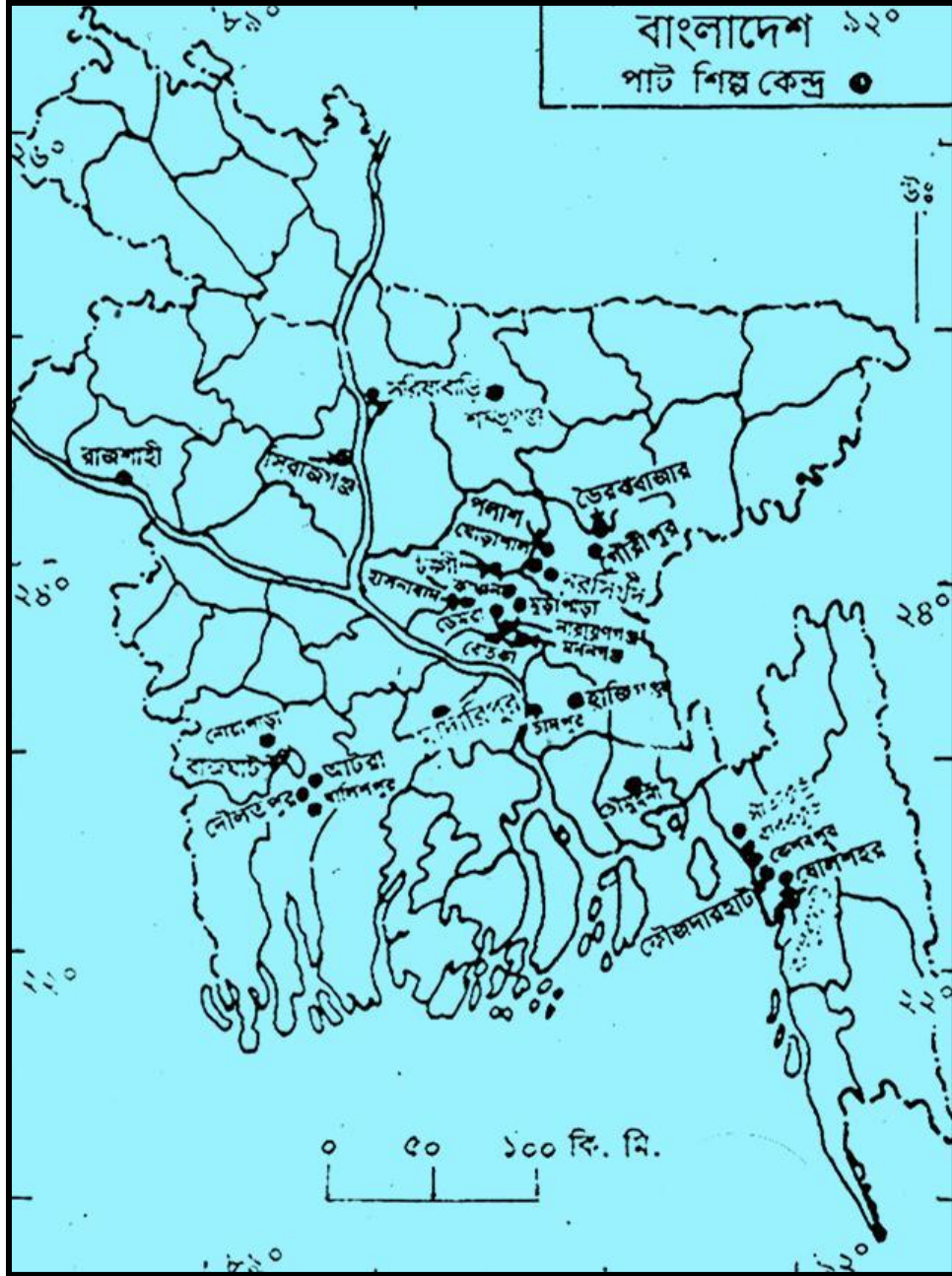
পাট শিল্পের বর্টন

বাংলাদেশে প্রায় ২৩ হাজার তাঁত বিশিষ্ট ৭৮টি পাটকল আছে। তবে চালু পাটকলের সংখ্যা ৭৫টি। এ সব কলে স্থায়ী শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় ১ লক্ষ ২৩ হাজার ২৭৬ জন। ইদানীং সরকারের বিজাতীয়করণ নীতির আওতায় প্রায় ৩৫টি পাটকল বেসরকারি খাতে হস্তান্তর করা হয়। বাংলাদেশের পাটশিল্পের প্রধান প্রধান কেন্দ্রগুলো হলো- নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম, খুলনা ও ঢাকা। এ ছাড়া দেশের অন্যান্য অংশেও বিক্ষিপ্তভাবে কতগুলো পাটকল গড়ে ওঠে। নিম্নের সারণিতে বিভাগ ও অঞ্চলভিত্তিক (সাবেক জেলা) পাট শিল্পের অবস্থান দেখানো হলো-

সারণি ৬.১৪: বিভাগ ও অঞ্চলভিত্তিক (সাবেক জেলা) পাট শিল্পের অবস্থান

বিভাগ/অঞ্চলের নাম	বিভাগ	অঞ্চল (সাবেক জেলা)
১.ঢাকা বিভাগ	৩৯	
(ক) ঢাকা অঞ্চল		৩৪
(খ)ময়মনসিংহ		৩
(গ)জামালপুর		১
(ঘ)ফরিদপুর		১
২.চট্টগ্রাম বিভাগ অঞ্চল	২১	
(ক)চট্টগ্রাম		১৭
(খ)কুমিল্লা		৩
(গ)নোয়াখালী		১
৩.খুলনা বিভাগ অঞ্চল	১৫	
(ক)খুলনা		১১
(খ)যশোর		৪
৪.রাজশাহী বিভাগ অঞ্চল	২	
(ক)রাজশাহী		১
(খ)পাবনা		১
বাংলাদেশ	৭৭	৭৭

উৎস: খান, ড. মোঃ আবদুল আউয়াল ও আকতার, খুরশীদ



চিত্র-৬.১৩: বাংলাদেশের পাটশিল্পকেন্দ্র

বাণিজ্য

বাংলাদেশের পাটজাত দ্রব্যের মধ্যে চট, থলে, পাটের সুতা, কাপড়, কার্পেট, দড়ি প্রভৃতি প্রধান। এসব দ্রব্যের প্রায় সবই বিদেশে রপ্তানি করা হয়। ২০১৫-১৬ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশ ৬ লক্ষ ৭১ হাজার টন পাটজাত দ্রব্য রপ্তানি করে প্রায় ৪৩ কোটি ৬৫ লক্ষ মার্কিন ডলার মূল্যের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে। ভারত, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, মিসর, পোল্যান্ড, বুলগেরিয়া, যুক্তরাজ্যে, ফ্রান্স, ইতালি, জার্মানি, জাপান, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি দেশ বাংলাদেশের পাটজাত দ্রব্যের ক্রেতা। পাটজাত দ্রব্যের উৎপাদন হ্রাস পাওয়ায় রপ্তানির পরিমাণও হ্রাস পেয়েছে।

পাট শিল্পের সমস্যা

বাংলাদেশের পাট শিল্প কতিপয় সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। নিচে প্রধান সমস্যাগুলো আলোচনা করা হলো-

তুলনামূলকভাবে কম মূল্য: বর্তমানে বাংলাদেশের পাট অপেক্ষা ধানের মূল্য বেশি। অথচ পাটের উৎপাদন খরচ ধানের উৎপাদন খরচ অপেক্ষা অনেক বেশি। পাট চাষ করলে কৃষকদের লাভ হয় না, ফলে কৃষকরা ধান চাষে বেশি আগ্রহী হওয়ায় পাট চাষের পরিমাণ মারাত্মকভাবে হ্রাস পাচ্ছে।

খাদ্য ঘাটতি: বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমান খাদ্য ঘাটতি হওয়ায় কৃষকগণ পাট চাষ অপেক্ষা ধান চাষে বেশি আগ্রহী হচ্ছে। এর ফলেও দেশে পাট চাষে নিয়োজিত জমির পরিমাণ ক্রমশঃ হ্রাস পাচ্ছে।

বিকল্প দ্রব্য আবিষ্কার: পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পাটের বিকল্প দ্রব্য আবিষ্কার হওয়ায় বাংলাদেশের পাটজাত দ্রব্য বিশ্ববাজারে তীব্র প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয়েছে। আজকাল অনেক দেশই পাটের পরিবর্তে কৃত্রিম আঁশ ব্যবহার করছে। বিশেষ করে উন্নতশীল দেশগুলোতে কৃত্রিম আঁশের ব্যবহার অত্যাধিক।

চাহিদা হ্রাস: আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশের পাটজাত দ্রব্যের চাহিদা ক্রমশঃ হ্রাস পাচ্ছে। বাংলাদেশ ছাড়াও ভারত, চীন, থাইল্যান্ড, ব্রাজিল, মায়ানমার প্রভৃতি দেশ পাট উৎপাদন শুরু করেছে।

পাটকল স্থাপন: পৃথিবীর অনেক দেশই ইতোমধ্যে পাটকল স্থাপনের চেষ্টা করছে। তুরস্ক, ইরাক ও মালয়েশিয়ায় পাটকল স্থাপিত হচ্ছে। এর ফলে আমাদের পাটজাত দ্রব্যের চাহিদা হ্রাস পাবে।

উল্লিখিত কারণগুলো ছাড়াও প্রয়োজনীয় মূলধনের অভাব, বিদ্যুৎশক্তির স্বল্পতা, শ্রমিক, অসন্তোষ, প্রশাসনিক অস্থিতিশীলতা, খুচরা, যন্ত্রপাতির অভাব ব্যবস্থাপনায় গাফিলতি, নিষ্ঠা ও সততার অভাব, সুনির্দিষ্ট নীতিমালার অভাব প্রভৃতি পাটশিল্পের উন্নতিতে অন্তরায় হিসেবে কাজ করছে।

পাটশিল্পের সমস্যার সমাধান ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা

বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রাণকেন্দ্র: পাটশিল্প নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও আমাদের শক্তিত হওয়ার কোন কারণ নেই। কারণ, বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের জন্য নিচে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাসমূহ অবলম্বন করা হলে এ শিল্প বিশ্ববাজারে প্রাধান্য রাখতে পারবে। যেমন-

কাঁচা পাটের উৎপাদন বৃদ্ধি: পাটশিল্পে প্রাধান্য বজায় রাখতে হলে বর্তমান সরকারকে পাট উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা চালাতে হবে। একর প্রতি উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে ধানের তুলনায় পাট চাষ লাভজনক হবে এবং পাট চাষে চাষিদের আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে।

পাটজাত দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি: কাঁচা পাটের উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পাটজাত দ্রব্যের উৎপাদনও বৃদ্ধি করতে হবে।

প্রয়োজনীয় উপকরণ সরবরাহ: পাটশিল্পের প্রয়োজনীয় উপকরণ যেমন, কাঁচামাল, তাঁত, টাকু, বিবিধ খুচরা যন্ত্রাংশ ও অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্য সরবরাহের নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।

উৎপাদন ব্যয় হ্রাস: উন্নত ব্যবস্থার মাধ্যমে পাটজাত দ্রব্যের উৎপাদন খরচ হ্রাস করা অপরিহার্য। উৎপাদন খরচ হ্রাস পেলে বিশ্ববাজারে বাংলাদেশি দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাবে।

বিভিন্নমুখী উৎপাদন: চট, থলে, বস্তা, দড়ি ইত্যাদির মধ্যে পাটজাত দ্রব্যের উৎপাদন সীমিত না রেখে কার্পেট, কাপড়, গালিচা, ত্রিপল ইত্যাদি উৎপাদন করা শ্রেয়। বিশ্ববাজারে এ সব দ্রব্যের যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে।

রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি: পাটজাত দ্রব্যের বাজার সম্প্রসারণের মাধ্যমে রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি করা যায়। এ বিষয়ে সরকারের পাট মন্ত্রণালয়, পাট ও পাটজাত দ্রব্যের বাজারজাতকরণ সংস্থা ও বৈদেশিক দূতাবাসগুলো প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

দক্ষ শ্রমিক সরবরাহ: শিক্ষিত ও দক্ষ শ্রমিক ব্যতীত পাটশিল্পের উন্নতি সম্ভব নয়। তাই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শ্রমিকদের দক্ষ করে তুলতে হবে।

শ্রমিক বিরোধ হ্রাস: শ্রমিক বিরোধও এ শিল্পের একটি প্রধান সমস্যা। তাই শ্রমিক বিরোধ দূর করে শিল্পে শান্ত পরিবেশ বজায় রাখতে হবে।

উপরে উল্লিখিত পদক্ষেপসমূহ কার্যকরভাবে গৃহীত হলে পাট শিল্প বাংলাদেশের অর্থনীতিতে স্বর্ণোজ্জ্বল ভূমিকা পালন করতে পারবে। সুতরাং বাংলাদেশে পাট শিল্পের ভবিষ্যৎ এখনও যথেষ্ট সম্ভাবনাময়।

বাংলাদেশের কার্পাস বয়ন শিল্প (Cotton Textile Industry of Bangladesh)

কার্পাস বয়ন শিল্প বাংলাদেশের দ্বিতীয় প্রধান গুরুত্বপূর্ণ শিল্প। দৈনন্দিন জীবনে মানুষের খাদ্যের পরই বস্ত্রের প্রয়োজন হয়। তাই এ বস্ত্রশিল্পের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত বাংলাদেশ এ শিল্পে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশে ২,৭১৭টি তাঁত এবং ১,০৯,৭৪০টি টাকুবিশিষ্ট ৮টি কাপড়ের কল ছিল। ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে কাপড়ের কলের সংখ্যা ছিল ৪০টি। বর্তমানে বাংলাদেশে ৬৩টি কাপড়ের কল আছে এবং আরও ৬টি কাপড়ের কলের কাজ সমাপ্তির পথে। স্বাধীনতা লাভের পর দেশের সব কার্পাস-বয়ন কারখানা রাষ্ট্রায়ত্ত্ব করা হয় এবং এগুলো পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ বস্ত্র শিল্প সংস্থা (Bangladesh Textile Mills Corporation) গঠন করা হয়। এ সংস্থাকে সংক্ষেপে বি.টি.এম.সি (B.T.M.C) বলা হয়। ১৯৮১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বি.টি.এম.সি এর অধীনে ৫৬টি বস্ত্রকল ছিল। কিন্তু ১৯৮২ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশি মালিকানার ২৬টি রাষ্ট্রায়ত্ত্ব বস্ত্রকল সাবেক মালিকদের নিকট হস্তান্তর করেন।

এ ছাড়া বাংলাদেশে কয়েকটি কৃত্রিম তন্তর মিলও রয়েছে। এদের মধ্যে আনোয়ারা সিল্ক মিলস্ লিঃ, চন্দ্রঘোনা রেয়ন মিলস্ লিঃ, ভালিকা উলেন মিলস্ লিঃ ইত্যাদি প্রধান।

কার্পাস বয়ন শিল্প গড়ে ওঠার কারণসমূহ: বাংলাদেশে কার্পাস বয়ন শিল্প গড়ে ওঠার মূলে রয়েছে কতিপয় প্রাকৃতিক এবং অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কারণসমূহের প্রভাব। নিচে এ সব কারণ সমূহের বিবরণ দেয়া হলো-

প্রাকৃতিক কারণসমূহ

কাঁচামাল: তুলাই কার্পাস বয়ন শিল্পের একমাত্র কাঁচামাল। যেখানে এ তুলা পাওয়া যায় সেখানেই এ শিল্প গড়ে ওঠে। বাংলাদেশে তুলার উৎপাদন নেই বললেই চলে। আমদানিকৃত তুলার উপর এ দেশের কার্পাস শিল্পের উন্নতি সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। পৃথিবীর প্রধান প্রধান তুলা রপ্তানিকারক দেশগুলোর সাথে বাংলাদেশের সুষ্ঠু যোগাযোগ ও পরিবহণ ব্যবস্থা রয়েছে। এ ছাড়া দেশের অভ্যন্তরে নদীপথ, সড়ক ও রেলপথে সুন্দর পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা আছে। ফলে অতি সহজেই সামুদ্রিক পথে তুলা আমদানি করে বাংলাদেশের বিভিন্ন শিল্পকেন্দ্রে সরবরাহ করা যায়।

শক্তি সম্পদ: বৃহদাকার কার্পাস শিল্পগুলো পরিচালনার জন্য শক্তি সম্পদ অত্যাবশ্যিক। প্রথম অবস্থায় আমদানিকৃত খনিজ তেল ও কয়লা এবং কাগুই-এর পানিবিদ্যুৎ শক্তি সম্পদ হিসেবে ব্যবহৃত হত। বর্তমানে প্রাকৃতিক গ্যাসও শক্তি সম্পদ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তাই বিদ্যুৎশক্তির সহজলভ্যতা এ শিল্পের উন্নতিতে সহায়তা করেছে।

জলবায়ু: কার্পাস বয়ন শিল্পের উপর জলবায়ুর প্রভাব অত্যাধিক। আর্দ্র জলবায়ু ছাড়া কার্পাস-বয়ন শিল্প গড়ে ওঠে না। কারণ, শুষ্ক জলবায়ুতে তুলা হতে সুতা তৈরি করতে কেবলই সুতা ছিঁড়ে যায় এবং বস্ত্র উৎপাদনে বিঘ্ন ঘটে। তাই বাংলাদেশের আর্দ্র জলবায়ু কার্পাস বয়ন শিল্পের জন্য বিশেষ সহায়ক।

অর্থনৈতিক কারণসমূহ

মূলধন: কার্পাস-বয়ন শিল্প প্রতিষ্ঠা এবং এর সমৃদ্ধির জন্য যথেষ্ট মূলধনবিনিয়োগ করতে হয়। বাংলাদেশে মূলধনের প্রাচুর্য রয়েছে। বিভিন্ন ধরনের ব্যাংক ও বীমা কোম্পানিগুলো হতে ঋণ গ্রহণের সুবিধা আছে। এ ছাড়া ধনী ব্যবসায়ীগণও কোন কোন ক্ষেত্রে মূলধন বিনিয়োগ করে থাকেন।

সুলভ শ্রমিক সরবরাহ: কার্পাস বয়ন শিল্পের জন্য সুলভ শ্রমিকের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। কারণ, শ্রমিকের মজুরি কম হলে উৎপাদন খরচও কম হয়। বাংলাদেশে শ্রমিকের অভাব নেই। ফলে কম মজুরিতে অধিক সংখ্যক শ্রমিক পাওয়া যায়।

পরিবহণ ব্যবস্থা: কারখানায় কাঁচামাল সংগ্রহ এবং সেখান হতে শিল্পজাত দ্রব্য বিভিন্ন বাজারে প্রেরণের জন্য সুলভ পরিবহণ ব্যবস্থা প্রয়োজন হয়। বাংলাদেশের বিভিন্ন শিল্পকেন্দ্র হতে বিভিন্ন বাজারে সুতা ও সুতিবস্ত্র প্রেরণের জন্য সুলভ পরিবহণ ব্যবস্থা বিদ্যমান।

বাজার: কার্পাস বয়ন শিল্পের উন্নতির জন্য প্রচুর চাহিদা বিশিষ্ট ব্যাপক বাজার আবশ্যিক। বাংলাদেশের সর্বত্র সুতা ও সুতিবস্ত্রের ব্যাপক চাহিদা থাকায় দিন দিনই কার্পাস-বয়ন শিল্পের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সাংস্কৃতিক কারণসমূহ

প্রযুক্তি জ্ঞান: অতি প্রাচীনকাল হতে বিশ্বের এ অংশে কার্পাস বয়ন শিল্পের প্রচলন ছিল। ফলে ঐতিহ্যগত কারণে বাংলাদেশে কার্পাস বয়ন শিল্পের প্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন কারিগরের বিশেষ অভাব হয় না। এটা এ শিল্পের উন্নতিতে সহযোগিতা করেছে।

সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা: বস্ত্র উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে সরকারি উদ্যোগে দেশে কার্পাস শিল্প তোলা হচ্ছে। এ ছাড়া বেসরকারি খাতেও বস্ত্রকল স্থাপনের জন্য সরকার নানাভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা করে থাকে।

উৎপাদন: কার্পাস বয়ন শিল্পে বাংলাদেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। দেশীয় সুতা ও বস্ত্রকলগুলো দেশের চাহিদার মাত্র ৮% মিটাতে সক্ষম এবং দেশীয় তাঁতসমূহ উৎপন্ন করে প্রায় ৪২%। ফলে বাংলাদেশকে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করে বিশ্ববাজার হতে সুতা ও বস্ত্র আমাদানি করতে হয়। বাংলাদেশে সাধারণত মোটা, মাঝারি ও সূক্ষ্ম- এ তিন শ্রেণির কাপড় প্রস্তুত হয়। এ ছাড়া অতি সূক্ষ্ম শ্রেণির কাপড়ও তৈরি হয়। এর পরিমাণ খুবই কম। বিটিএমসির ২০১৫-১৬ অর্থবছরে স্পিডল (টাকু) এর ক্ষমতা ১৯৮৭৩২ এবং সুতা উৎপাদনের পরিমাণ ১৫.৫১ লক্ষ কেজি।

কার্পাস-বয়ন শিল্পের বণ্টন

বাংলাদেশের ঢাকা, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, নোয়াখালী, পাবনা, যশোর, কুষ্টিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে কার্পাস-বয়ন শিল্প গড়ে উঠেছে। তবে এদের মধ্যে ঢাকা, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা প্রভৃতি অঞ্চলেই দেশের অধিকাংশ কাপড়ের কলগুলো অবস্থিত। আলোচনার সুবিধার্থে বাংলাদেশের কার্পাস বয়ন শিল্পকে কতিপয় অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়; যেমন-

ঢাকা অঞ্চল: বৃহত্তম ঢাকা জেলার বস্ত্রকলগুলো এ অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। মূলধন ও শক্তি সম্পদের প্রাচুর্য, সুলভ শ্রমিক পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, স্থানীয় ব্যাপক বাজার প্রভৃতির দরুন রাজধানী ঢাকা ও এর আশপাশে প্রায় ২৪টি কার্পাস বয়ন কল গড়ে উঠেছে। এ কলগুলো ঢাকার মিরেরবাগ, পোস্তুগোলা, শ্যামপুর, ডেমরা, সাভার, নারায়ণগঞ্জ জেলার নারায়ণগঞ্জ, মুড়াপাড়া, কাঁচপুর, ধামগড়, গোদনাইল, লক্ষণখোলা, ফতুল্লা, গাজীপুর জেলার টঙ্গী, জয়দেবপুর ও কালিগঞ্জ এলাকার (৫টি) কার্পাস বয়ন শিল্পের সংখ্যা অধিক।

চট্টগ্রাম অঞ্চল: চট্টগ্রাম বাংলাদেশের দ্বিতীয় প্রধান কার্পাস বয়নশিল্প কেন্দ্র। আর্দ্র জলবায়ু, পানি-বিদ্যুৎ, শক্তির সহজলভ্যতা, চট্টগ্রাম বন্দর মারফত উন্নতমানের তুলা আমদানির সুবিধা, সুলভ পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, মূলধন ও শ্রমিকের সহজপ্রাপ্যতা শিল্পজাত দ্রব্যের ব্যাপক চাহিদা প্রভৃতি কারণে এ অঞ্চলে কার্পাস বয়নশিল্পে উন্নতি লাভ করেছে। বর্তমানে চট্টগ্রামে ৯টি বস্ত্র ও সুতার কল আছে। এ কলগুলো ফৌজদারহাট, উত্তর কাউলি, ষোলশহর, পাঁচলাইশ, জুবিলী রোড, হালিশহর ও কালুরঘাটে অবস্থিত। তবে এদের মধ্যে ফৌজদারহাট উত্তর বস্ত্রকলের সংখ্যা বেশি।

কুমিল্লা ও নোয়াখালী অঞ্চল: কুমিল্লা ও নোয়াখালী অঞ্চল বাংলাদেশের তৃতীয় প্রধান কার্পাস বয়ন শিল্পকেন্দ্র। এ অঞ্চলে বস্ত্র ও সুতার কলের সংখ্যা ৮টি। কুমিল্লা জেলার কলগুলোর মধ্যে ৩টি, কুমিল্লা শহরের নিকটবর্তী দুর্গাপুর, দৌলতপুর ও হালিমনগরে এবং অপরটি দেবীদ্বার থানার দক্ষিণপ্রান্তে আরিগোলকায় অবস্থিত। এ অঞ্চলে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও বাঞ্ছারামপুরে ২টি কল রয়েছে। নোয়াখালী অঞ্চলের ফেনী ও রায়পুরে একটি করে ২টি কার্পাস কল আছে। আর্দ্র জলবায়ু, শক্তিসম্পদ হিসেবে কাগুই এর পানিবিদ্যুৎ এবং নিকটস্থ তিতাস ও বাখরাবাদ গ্যাসের সহজলভ্যতা, স্থানীয় সুলভ শ্রমিক। উন্নত পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, চট্টগ্রাম বন্দর মারফত প্রয়োজনীয় তুলা ও যন্ত্রপাতি আমদানির সুবিধা প্রভৃতি এ অঞ্চলে কার্পাস বয়ন শিল্প গড়ে তুলতে সহায়তা করেছে।

অন্যান্য কার্পাস বয়ন শিল্পকেন্দ্র: অবশিষ্ট কার্পাস বয়ন কলগুলোর মধ্যে বিক্ষিপ্তভাবে রাজশাহী বিভাগের দারওয়ানী (নীলফামারী), কুড়িগ্রাম, সদরপুর (দিনাজপুর), বগুড়া, রাজশাহী, সিরাজগঞ্জ ও পাবনায়, খুলনা বিভাগের কুষ্টিয়া (২টি) মাগুরা, যশোরের নোয়াপাড়া (২টি) ও ঢাকা বিভাগের আলাদিপুর (রাজবাড়ি), মাদারিপুর, গোড়াই (টাঙ্গাইল) ও কিশোরগঞ্জ এবং চট্টগ্রাম বিভাগের সিলেট ও রাঙ্গামাটিতে অবস্থিত।

বাণিজ্য

বিদেশ হতে আমদানিকৃত তুলা ও সুতার দ্বারাই বাংলাদেশের সুতা ও বস্ত্রকলগুলো পরিচালিত হয়। বাংলাদেশ বস্ত্র উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয় বলে প্রতি বছর বিশ্ব বাজার হতে প্রচুর বস্ত্র ও সুতা আমদানি করতে হয়। ২০০৩-০৪ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশ বিশ্ব বাজার প্রায় ২৬ কোটি মার্কিন ডলার মূল্যের বস্ত্র এবং ৩২ কোটি ২৩ লক্ষ মার্কিন ডলার মূল্যের সুতা আমদানি করে। আমদানিকৃত এ সব পণ্যের অধিকাংশই জাপান, পাকিস্তান, ভারত, কোরিয়া, সিঙ্গাপুর, হংকং প্রভৃতি দেশ হতে সংগ্রহ করা হয়।

পোশাক শিল্প (Garments Industry)

বর্তমানে পোশাক শিল্প বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প। ১৯৭৬-৭৭ খ্রিষ্টাব্দে এ দেশে প্রথম এ শিল্প গড়ে ওঠে। ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দে এ শিল্পের সংখ্যা দাঁড়ায় ৯২টি। ১৯৯২ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিল মাস পর্যন্ত চালু শিল্পের সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় ১২২৮টি। বর্তমানে দেশে ৪৪৫০টি পোশাক শিল্প রয়েছে।

নিম্নলিখিত কারণে বাংলাদেশে এ শিল্প দ্রুত বিকাশ লাভ করেছে। যথা :

প্রাকৃতিক কারণ

অনুকূল জলবায়ু: বাংলাদেশের উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ু স্বাস্থ্যকর বলে শ্রমিকেরা অধিক সময় কারখানায় কাজ করতে পারে। এ ছাড়া আর্দ্র জলবায়ু পোশাক শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাপড় তৈরিতেও সহায়ক।

কাঁচামাল: এ শিল্পের একমাত্র কাঁচামাল হলো বস্ত্র। দেশি ও বিদেশি মিলগুলো হতে প্রয়োজনীয় বস্ত্র সংগ্রহ করা হয়।

শক্তি সম্পদ: বাংলাদেশের পোশাক শিল্পগুলো শহর এলাকায় গড়ে ওঠায় বিদ্যুৎ পেতে কোন অসুবিধা হয় না। ফলে শহর এলাকায় এ শিল্প দ্রুত গড়ে উঠেছে।

অর্থনৈতিক কারণ

মূলধন: মূলধন ছাড়া কোন শিল্পই গড়ে ওঠে না। বিভিন্ন ধরনের ব্যাংক ও বীমা কোম্পানিগুলো হতে ঋণ পাবার সুবিধা থাকায় এ শিল্প দ্রুত প্রসার লাভ করেছে। এ ছাড়া ধনী ব্যবসায়ীগণও প্রচুর মূলধন নিয়োগ করেছেন।

শ্রমিক: বাংলাদেশ বিশ্বের একটি অন্যতম জনবহুল দেশ হওয়ায় এখানে অধিক সংখ্যক দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিক পাওয়া যায়। এ শিল্পের নিয়োজিত শ্রমিকের প্রায় ৯০% জনই মহিলা যাদের কম মূল্যে পাওয়া যায়।

পরিবহণ: শিল্পের কাঁচামাল আমদানি এবং পোশাক বিভিন্ন দেশে রপ্তানির জন্য সুলভ পরিবহণ ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়। সমুদ্রপথে বিভিন্ন দেশের সাথে বাংলাদেশের সুলভ যোগাযোগ ব্যবস্থা থাকায় এ শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল আমদানি ও তৈরি পোশাক রপ্তানিতে সুবিধা হয়েছে।

বাজার: বাংলাদেশের পোশাক সুন্দর, আকর্ষণীয় ও গুণগত মানসম্পন্ন হওয়ায় দেশ-বিদেশ এর প্রচুর বাজার সৃষ্টি হয়েছে।

সাংস্কৃতিক কারণ

সরকারি উদ্যোগ: পোশাক শিল্পের উন্নতি ও প্রসারের জন্য সরকার নানাভাবে সাহায্যে ও সহযোগিতা করে থাকেন। এ শিল্পের বাজার সৃষ্টি ও সম্প্রসারণ, রপ্তানি বৃদ্ধি প্রভৃতি বিষয়েও সরকার উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে।

পোশাক শিল্পের উৎপাদন: ২০০৪-০৫ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশের বিভিন্ন পোশাক শিল্পে সর্বমোট ২২১৩৩ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা মূল্যের প্রায় ৯ কোটি ২৩ লক্ষ ১৮ হাজার ডজন তৈরি পোশাক উৎপন্ন হয়। উৎপাদিত পোশাক বাংলাদেশের বিভিন্ন পোশাক শিল্পের তৈরি পোশাকের মধ্যে ট্রাউজার, জিন্স প্যান্ট, স্কার্টস, জ্যাকেট, মেয়েদের ব্লাউজ, নিট ফেব্রিক্স এর টি-শার্ট, টপস, সোয়েটার ও পুলভার, কার্ডিগান, কোট, ব্লেজার, ছেলে-মেয়েদের শার্ট ও প্যান্ট, জিগিং সুট ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

পোশাক শিল্পের বণ্টন: পরিবেশ দূষণের ব্যাপকতা মুক্ত পোশাক শিল্প যে কোন এলাকায় স্থাপনের উপযোগী হওয়া সত্ত্বেও কাঁচামাল, পোশাক বাজারজাতকরণ ও শ্রমিক প্রাপ্তি ও যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রভৃতি সুবিধাজনক অবস্থানের জন্য এ শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো শহরকেন্দ্রিক গড়ে উঠেছে। এ কারণে ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা প্রভৃতি বড় বড় শহর এলাকায় এ শিল্প গড়ে উঠেছে (সারণি ৬.১৫)।

সারণি ৬.১৫: তৈরিপোশাক শিল্পের অঞ্চল ভিত্তিক বণ্টন

অঞ্চল	শিল্প ইউনিটের সংখ্যা	শতকরা হার (%)
ঢাকা	২,৯১৮	৬৫%
চট্টগ্রাম	১,২৫৭	২৮%
খুলনা	৩১৫	৭%
মোট	৪,৪৯০	১০০%

উৎস: শাহীদ, ড. হ. জ. ম. হাসিবুর শাহীদ এবং রেজা, আ. ন. ম. গাউছার

বাণিজ্য

২০১৫-১৬ খ্রিষ্টাব্দে মোট রপ্তানির প্রায় ৪২.০২% আসে তৈরি পোশাক শিল্পের খাত থেকে। ২০১৬ খ্রিষ্টাব্দে প্রায় ৪ মিলিয়ন লোক বিশেষ করে মহিলা শ্রমিক তৈরি পোশাক শিল্পের মাধ্যমে ১৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে।

রপ্তানিকৃত দেশসমূহ: বর্তমানে বিশ্বের ২০টির অধিক দেশে বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানি হয়। তবে সবচেয়ে বেশি পোশাক রপ্তানি হয় যুক্তরাষ্ট্রে। তারপরই রয়েছে জার্মানির স্থান। এরপর যথাক্রমে ফ্রান্স, ইতালি, যুক্তরাজ্য, নেদারল্যান্ড, কানাডা, বেলজিয়াম, স্পেন, ফ্রান্স ও অন্যান্য দেশ।

বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পের সমস্যা

বাংলাদেশ তৈরি পোশাক শিল্পে উন্নতি লাভ করলেও এ শিল্পের সমস্যা রয়েছে। যেমন-

কাঁচামালের অভাব: বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের অধিকাংশ কাঁচামাল বিদেশ হতে আমদানি করতে হয়। অথচ কোন কোন সময় আমদানিকারকগণ চাহিদামাফিক উন্নতমানের কাঁচামালের পরিবর্তে নিম্নমানের কাঁচামাল সরবরাহ করে থাকে। এতে বিশ্ববাজারে এ শিল্পের সুনাম ক্ষুণ্ণ হয়।

কোটা আরোপ: আমদানিকারক দেশগুলো কর্তৃক কোটা আরোপ পদ্ধতিও এ শিল্পের অন্যতম সমস্যা।

প্রতিযোগিতা: আন্তর্জাতিক বাজারে বিভিন্ন দেশের সাথে তীব্র প্রতিযোগিতাও এ শিল্পের জন্য এক সমস্যা। ভারত, শ্রীলঙ্কা, কোরিয়া, থাইল্যান্ড প্রভৃতি দেশ বাংলাদেশের প্রধান প্রতিযোগী দেশ।

রপ্তানির ক্ষেত্রে সমস্যা: শ্রমিক ধর্মঘট, ঘন ঘন বিদ্যুৎ বিভ্রাট, শুল্কজনিত ঝামেলা, পরিবহণ সমস্যা ইত্যাদির জন্যও সময়মত পণ্য রপ্তানিকারক দেশে পৌঁছানো যায় না। এতে বিদেশি বাজার হাতছাড়া হয়ে যায়।

এ ছাড়া প্রয়োজনীয় মূলধন, দক্ষ শ্রমিক, কারিগরি জ্ঞানের অভাব ইত্যাদিও এ শিল্পের অন্যতম সমস্যা।

বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পের ভবিষ্যৎ বা ভূমিকা

বাংলাদেশ অন্যান্য শিল্পে অনগ্রসর হলেও অতি অল্প সময়ে পোশাক শিল্পে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করেছে। বর্তমানে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এ শিল্প অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। দেশের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার প্রায় অর্ধেকই তৈরি পোশাকের মাধ্যমে পাওয়া যায়। তাছাড়া সমাজের অনগ্রসর মহিলাদের ব্যাপক কর্মস্থানের প্রধান ক্ষেত্র হচ্ছে তৈরি পোশাক শিল্প। দেশের শত শত অসহায় ও নির্যাতিত মহিলাদের বেঁচে থাকার অবলম্বন হচ্ছে শিল্প। এ শিল্পে কাজ করে বহু নারী ধীরে ধীরে স্বাবলম্বী হয়ে উঠেছে। বর্তমানে এ শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় ৪ মিলিয়ন। একমাত্র তৈরি পোশাক রপ্তানি করে বাংলাদেশে বার্ষিক প্রায় ৫০% বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে।

উপরিউক্ত আলোচনা হতে দেখা যায়, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে তৈরি পোশাক শিল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তাই এ শিল্পের ভবিষ্যৎ খুবই উজ্জ্বল।

বাংলাদেশের কাগজ ও বোর্ড শিল্প (Paper and Board Industry of Bangladesh)

কাগজ শিল্প (Paper Industry)

দেশে যথেষ্ট কাঁচামাল থাকা সত্ত্বেও ১৯৫৩ খ্রিষ্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশে কোন কাগজের কল স্থাপিত হয়নি। বাংলাদেশে কাগজ শিল্পের অনুকূলে অবস্থা বিদ্যমান থাকায় কয়েকটি কাগজ কল স্থাপিত হয়েছে।

কাগজ শিল্প গড়ে ওঠার কারণসমূহ

বাংলাদেশে কাগজ শিল্প গড়ে ওঠার মূলে কতিপয় প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক কারণসমূহের প্রভাব রয়েছে। নিচে এ সব কারণসমূহের বিবরণ দেয়া হলো-

প্রাকৃতিক কারণসমূহ

শক্তিসম্পদ: কারখানা চালাবার জন্য শক্তিসম্পদের প্রয়োজন। বাংলাদেশে কয়লা ও খনিজ তেল নেই। পানিবিদ্যুৎ ও প্রাকৃতিক গ্যাসই প্রধান শক্তিসম্পদ। এ সব শক্তিসম্পদের উপর নির্ভর করে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে কাগজ কল গড়ে উঠেছে। এ ছাড়া, আমাদানিকৃত খনিজ তেল ও কয়লা পুড়িয়েও বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা আছে। ফলে কাগজের কলগুলোর জন্য শক্তিসম্পদের অভাব হয় না।

কাঁচামাল: কাগজ তৈরি করার প্রয়োজনীয় কাঁচামাল তথা বাঁশ, নরম কাঠ, ঘাস, আখের ছোবড়া, পাট, পাটখড়ি, পুরাতন কাগজ ও কাপড় ইত্যাদি বাংলাদেশে প্রচুর পাওয়া যায়। ফলে বিভিন্ন ধরনের কাঁচামালের উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে কাগজ ও বোর্ড মিল গড়ে উঠেছে।

জলবায়ু: বাংলাদেশের জলবায়ুতে পর্যাপ্ত পরিমাণে বাঁশ, নরম কাঠ, ঘাস ইত্যাদি জন্মে বলে এ দেশে কাগজ শিল্পের কাঁচামালের কোন অভাব হয় না। উপরন্তু বাংলাদেশের আর্দ্র জলবায়ুতে শ্রমিকগণ অধিক সময় কাজ করতে পারে; অর্থাৎ এদের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

অর্থনৈতিক কারণসমূহ

মূলধন: বাংলাদেশের কাগজের কলগুলো সরকারি মালিকানায ও পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত বলে মূলধনের কোন অভাব হয় না।

সুলভ শ্রমিক সরবরাহ: ঘনবসতিপূর্ণ বাংলাদেশে শ্রমিকের কোন অভাব নেই। তাই কাগজ শিল্পের জন্য সহজেই সুলভ শ্রমিক পাওয়া সম্ভব হয়।

বাজার: অভ্যন্তরীণ চাহিদা এ দেশের কাগজ শিল্প সমৃদ্ধির অন্যতম কারণ। ভারত ও পাকিস্তানসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশি কাগজের চাহিদা রয়েছে।

পরিবহণ ব্যবস্থা: সুলভ পরিবহণ ব্যবস্থা ব্যতীত কোন শিল্প গড়ে উঠতে পারে না। বাংলাদেশের কাগজকলগুলোর সাথে কাঁচামালের উৎস এবং বাজারের সাথে নদী, সড়ক ও রেলপথের উত্তম যোগাযোগ ও পরিবহণ ব্যবস্থা রয়েছে।

স্বচ্ছ পানি: কাগজ শিল্পের জন্য প্রচুর স্বচ্ছ মিঠা পানির প্রয়োজন হয়। নদীবহুল বাংলাদেশে স্বচ্ছ মিঠা পানির অভাব নেই।

বাংলাদেশে কাগজ শিল্পের উৎপাদন ও বণ্টন

উৎপাদন: বাংলাদেশে কাগজের কলগুলোতে প্রধানত লেখার কাগজ, প্যাকিং ও অন্যান্য কাগজ উৎপন্ন হয়ে থাকে। ২০০৪-০৫ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশে সর্বমোট ১১৬ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকা মূল্যের প্রায় ২৪ হাজার ৩১ মেট্রিক টন কাগজ উৎপন্ন হয়। এ সব কাগজের মধ্যে রয়েছে লেখার কাগজ, ছাপার কাগজ, প্যাকিং ও অন্যান্য ধরনের কাগজ।

কর্ণফুলী কাগজ কল: ১৯৫৩ খ্রিষ্টাব্দে পি.আই.ডি.সি-র উদ্যোগে বন্দরনগরী চট্টগ্রাম হতে ৩৮.৫ কি. মি. পূর্বে রাঙ্গামাটি জেলার চন্দ্রধোনা নামক স্থানে কর্ণফুলী নদীর তীরে বাংলাদেশের এ বৃহত্তম কাগজের প্রতিষ্ঠিত হয়। এটিই প্রথম কাগজ কল। কর্ণফুলী নদীর তীরে অবস্থিত বলে একে কর্ণফুলী কাগজ কল বলা হয়। প্রথম অবস্থায় কারখানাটির উৎপাদন ক্ষমতা ছিল ৩০ হাজার টন। বর্তমানে এর উৎপাদন ক্ষমতা ৬০ হাজার টনে উন্নীত করা হয়েছে। এখানে প্রধানত লেখার কাগজ, ছাপার কাগজ, মোড়কের কাগজ, ক্রিম লেড, ব্যাংক বন্ড, পোস্টার প্রভৃতি কাগজ প্রস্তুত হয়।

খুলনা নিউজপ্রিন্ট কারখানা: ১৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৯৫৯ খ্রিষ্টাব্দে সাবেক পি.আই.ডি.সি-র উদ্যোগে খুলনা শহরের অদূরে ভৈরব নদীর খালিশপুর নামক স্থানে একটি নিউজপ্রিন্ট কারখানা স্থাপন করা হয়। এটি বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম কাগজ কল। প্রথম অবস্থায় এর উৎপাদন ক্ষমতা ছিল ৩৫ হাজার মেট্রিক টন। পরে এর উৎপাদন ক্ষমতা ৬৮ হাজার মেট্রিক টনে উন্নীত করা হয়।

খুলনায় নিউজপ্রিন্ট কারখানা গড়ে ওঠার কারণসমূহ: এ কারখানায় ব্যবহৃত কাঁচামাল গেওয়া কাঠ সুন্দরবনে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এর সাথে আমদানিকৃত শ্বেতমণ্ড মিশ্রিত করে কাগজ তৈরি হয়। নিকটবর্তী গোয়ালপাড়া তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে সহজেই বিদ্যুৎ পাওয়া যায়। রেল, সড়ক ও নদীপথে স্থানটি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সাথে যুক্ত থাকায় উৎপাদিত কাগজ সহজেই দেশের বিভিন্ন স্থানে ব্যাপক চাহিদা, সুলভ শ্রমিকের প্রাচুর্য, সরকার কর্তৃক মূলধন সরবরাহ ইত্যাদি কারণে এ অঞ্চলে নিউজপ্রিন্ট কারখানা গড়ে উঠেছে। বর্তমানে এর কার্যক্রম বন্ধ আছে।

উত্তরবঙ্গ কাগজকল: সাবেক পি.আই.ডি.সি-র উদ্যোগে পাবনা জেলার পাকশী নামক স্থানে পদ্মা নদীর তীরে ১৯৬৯ খ্রিষ্টাব্দে একটি কাগজের কল নির্মাণ করা হয়। এটি দেশের তৃতীয় প্রধান কাগজের কল। এর বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ১৫.২৪ হাজার মেট্রিক টন। এখানে উন্নতমানের লেখার কাগজ উৎপাদিত হয়। উত্তরবঙ্গ এলাকার চিনির কলগুলো হতে প্রাপ্ত আখের ছোবড়া এ কাগজকলের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কাঁচামাল ছাড়াও নিকটবর্তী ভেড়ামারা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের বিদ্যুৎশক্তি, পদ্মা নদীর পানি, সুষ্ঠু যোগাযোগ ও পরিবহণ ব্যবস্থা, প্রচুর সস্তা শ্রমিক, দেশীয় বাজার ইত্যাদিও এখানে কাগজকল স্থাপন করতে সহায়তা করেছে।

সিলেটের মণ্ড ও কাগজের কল: সুনামগঞ্জ জেলার নিম্নাঞ্চলের হাওড় এলাকায় নলখাগড়া ঘাস প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এ ঘাসের উপর ভিত্তি করে এখানে ৪৫ হাজার টন ক্ষমতাসম্পন্ন একটি কাগজ ও মণ্ড কারখানা স্থাপন করা হয়েছে। এ ছাড়া বাঁশ ও পাটের কর্তিত অংশও কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করা হয়। ১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দের ২০ জুলাই এ কারখানায় পরীক্ষামূলক উৎপাদন শুরু হয়। এ কারখানায় বার্ষিক ২০ হাজার টন উন্নতমানের লেখার কাগজ এবং ৩০ হাজার টন মণ্ড উৎপাদন করা সম্ভব। এছাড়া এ কারখানায় কার্বন, সিগারেট তৈরির মিহি কাগজ, প্যাকিং পেপার, ডুপ্লেক্স বোর্ডও উৎপাদিত হয়।

বসুন্ধরা কাগজ কল: জার্মানি ও চীনের আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতায় বসুন্ধরা শিল্পগোষ্ঠীর উদ্যোগে মেঘনা ঘাটের নিকট ৩০ হাজার মে.টন ক্ষমতাসম্পন্ন এ কাগজের কলটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমদানিকৃত কাঁচামালের সাহায্যে এখানে মূলত সাদা লেখার ও ছাপার কাগজ এবং সিগারেটের কাগজ তৈরি হয়।

মাগুরা কাগজ কল: মাগুরা কাগজ কল নামে এ কারখানাটিও ব্যক্তি মালিকানায় ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দে চালু হয়েছে। এর বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ৯ হাজার মে. টন। স্থানীয় ও আমদানিকৃত কাঁচামাল ব্যবহার করে এখানে সাদা লেখার ও ছাপার কাগজ উৎপাদন হয়।

অন্যান্য মেঘনা ঘাটের নিকট শাহজালাল কাগজ কল ছাড়া আরও কয়েকটি কাগজের কারখানার নির্মাণ করা হচ্ছে।

বোর্ড শিল্প (Board Industry)

বর্তমানে বাংলাদেশে কয়েকটি বোর্ড শিল্প গড়ে উঠেছে। ২০০৪-০৫ খ্রিষ্টাব্দে ৩ কোটি ৯ লক্ষ ৯৪ হাজার টাকা মূল্যের ৫৫০ হাজার বর্গমিটার হার্ডবোর্ড এবং ৪১ কোটি ৯০ লক্ষ ২০ হাজার টাকা মূল্যের ২৬ লক্ষ ৮০ হাজার বর্গমিটার পার্টিকেল বোর্ড তৈরি হয়। নিচে এ সব শিল্পের বর্ণনা দেয়া হলো।

খুলনা হার্ডবোর্ড মিল: সাবেক ই.পি.আই.ডি.সি-র উদ্যোগে ১৬.১২ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৯৬৬ খ্রিষ্টাব্দে খুলনা জেলার খালিশপুরে একটি হার্ডবোর্ড মিল স্থাপন করা হয়। সুন্দরবনের গেওয়া কাঠ এ মিলের প্রধান কাঁচামাল। এছাড়া তাপ-বিদ্যুতের প্রাচুর্য, বন্দরের নৈকট্য, পরিবহনের সুব্যবস্থা, সুলভ শ্রমিকের প্রাচুর্য এখানকার হার্ডবোর্ড শিল্পের উন্নতিতে সাহায্য করেছে। বর্তমানে এ মিলে বার্ষিক প্রায় ১৭ লাখ বর্গমিটার হার্ডবোর্ড উৎপন্ন হয়। বর্তমানে নিজেদের প্রয়োজন মিটিয়ে বাংলাদেশ হার্ডবোর্ড বিদেশ রপ্তানি করে।

আদমজী পার্টিকেল বোর্ড মিল: নারায়ণগঞ্জের আদমজী পাটকলের অপর পাড়ে শীতলক্ষ্যা নদীর তীরে এ মিলটি অবস্থিত। এখানে বার্ষিক প্রায় ৫ হাজার ৬শ' টন পার্টিকেল উৎপন্ন হয়। পাটকাঠি ও পাটের পরিত্যক্ত অংশ এ কারখানার প্রধান কাঁচামাল।

কাগুই হার্ডবোর্ড মিল: রাঙামাটি জেলার কাগুই নামক স্থানে ২৫০০ ক্ষমতাসম্পন্ন একটি হার্ডবোর্ড মিল আছে। নিকটবর্তী বনাঞ্চল ও বিদ্যুৎকেন্দ্র হতে যথাক্রমে কাঁচামাল ও শক্তি সরবরাহ করা হয়।

বাংলাদেশ বোর্ড মিল: গাজীপুর জেলার টঙ্গীতে এ বোর্ড মিলটি স্থাপন করা হয়েছে। এর উৎপাদন ক্ষমতা ৩৫০০ টন। এখানে ধানের খড় ও পরিত্যক্ত কাগজ কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

সোনালী কাগজ ও বোর্ড কারখানা: ঢাকার অদূরে ডেমনা শিল্প এলাকায় ব্যক্তি মালিকানায় বার্ষিক ৯ হাজার মে.টন ক্ষমতাসম্পন্ন এ কাগজ ও বোর্ড কারখানাটি নির্মিত হয়েছে। এখানে ডুপ্লেক্স বোর্ড উৎপাদন করা হয়।

বাণিজ্য

বাংলাদেশ কাগজ ও কাগজ জাতীয় দ্রব্য উৎপাদনে কেবল স্বয়ংসম্পূর্ণই নয় বরং রপ্তানি করতে সক্ষম ছিল। ভারত, শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান, মায়ানমার, নেপাল, ইরাক প্রভৃতি দেশ বাংলাদেশ হতে নিউজপ্রিন্ট, কাগজ হার্ডবোর্ড ইত্যাদি আমদানি করত। তবে বিগত বছরগুলোতে কাগজের উৎপাদন মারাত্মকভাবে হ্রাস পাওয়ায় বাংলাদেশকে এখন বিশ্ব বাজার হতে প্রচুর কাগজ আমদানি করতে হয়।

বাংলাদেশে কাগজ শিল্পের সমস্যা

বাংলাদেশ কাগজ শিল্পে উন্নতির পথে দ্রুত অগ্রসর হলেও এটি সমস্যামুক্ত নয়। যেমন-

কাঁচামাল: বাংলাদেশের কাগজ শিল্পে বাঁশ, নলখাগড়া ও ঘাস, নরম গেওয়া কাঠ, আখের ছোবড়া পুরাতন কাগজ ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। কিন্তু নরম কাঠ, আখের ছোবড়া ও বাঁশের সরবরাহ অপরিপূর্ণ ও অনিয়মিত। আখের রস জাল দিয়ে গুড় তৈরি করতে প্রচুর আখের ছোবড়া জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ায় উত্তরবঙ্গের কাগজকলে কাঁচামালের অভাব সর্বদাই থেকে যায়। আবার বাঁশ ও গেওয়া গাছের সংরক্ষণ ও উৎপাদনেরও উপযুক্ত পরিকল্পনা নেই।

রাসায়নিক দ্রব্য: রাসায়নিক দ্রব্যের অভাব কাগজ শিল্পের অন্যতম সমস্যা। এ সব দ্রব্যের প্রায় সবই বিদেশ হতে আমদানি করতে হয় বলে কাগজের উৎপাদন খরচও বেড়ে যায়।

শক্তির অভাব: দেশের পশ্চিমাংশে প্রাকৃতিক গ্যাস ও সুলভ পানি-বিদ্যুতের সরবরাহ নেই বললেই হয়। ফলে দেশের পশ্চিমাংশের কাগজকলে বিদ্যুতের অভাব লেগেই থাকে। আবার বিদ্যুৎ বিভ্রাটও এ শিল্পের উন্নতিতে বিঘ্ন ঘটায়।

নিম্নমানের উৎপাদন: এ দেশের কাগজ উন্নতমানের না হওয়ায় বিশ্ব বাজারে বাংলাদেশি কাগজের চাহিদা কম। বিশ্ব বাজারে চাহিদা কম থাকায় কাগজ শিল্পের উন্নতি ব্যাহত হচ্ছে।

অন্যান্য এছাড়া এ শিল্পের যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ এবং প্রযুক্তিবিদ্যারও যথেষ্ট অভাব রয়েছে।

চা শিল্প (Tea Industry)

বাংলাদেশে চা শিল্প বেশ উন্নতি লাভ করেছে। প্রথমে বাগান হতে সবুজ পাতা সংগ্রহ করা হয়। তারপর বাগানের ভেতর অবস্থিত কারখানায় পাতাগুলো শুকিয়ে গুঁড়া করে চা প্রস্তুত করা হয়। বাংলাদেশে বর্তমানে প্রায় ১৬৩টি চা কারখানা আছে। চা শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা ১০ হাজার। বাংলাদেশের শতকরা ৯০ ভাগ চা কারখানা সিলেট, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ চা বাগানগুলোর ভেতরেই অবস্থিত এবং বাকি ১০ ভাগ চট্টগ্রাম জেলায় অবস্থিত। এ সব কারখানায় ২০০৩-০৪ খ্রিষ্টাব্দে ৩৫৬ কোটি ৯২ লক্ষ টাকা মূল্যের ৫৭ হাজার ৫৪৮ মেট্রিক টন চা উৎপন্ন হয়।

সিলেট অঞ্চলে চা শিল্প গড়ে ওঠার কারণসমূহ

নিম্নলিখিত প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক কারণসমূহের প্রভাবে দেশের অধিকাংশ চা কারখানা সিলেট অঞ্চলে, অর্থাৎ সিলেট, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জে গড়ে উঠেছে।

- চা চাষের জন্য প্রচুর বৃষ্টিপাতের প্রয়োজন, কিন্তু গোড়ায় পানি জমে থাকলে চা গাছ মরে যায়। তাই সিলেট অঞ্চলের পাহাড়িয়া এলাকায় পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা থাকায় দেশের অধিকাংশ চা সিলেট অঞ্চলেই জন্মে থাকে। চাষের উপর ভিত্তি করে চা কারখানা স্থাপিত হয় বলে সিলেট অঞ্চল চা শিল্পে সমৃদ্ধি লাভ করেছে;
- চা শিল্পে অভিজ্ঞ ও নিপুণ সুলভ শ্রমিকের প্রয়োজন হয়। সিলেট অঞ্চলের চা বাগানগুলোর নিকটেই এ জাতীয় শ্রমিক পাওয়া যায়;
- সিলেট অঞ্চলের চা গুণে ও মানে উন্নত বলে দেশ-বিদেশের বাজারে এর প্রচুর চাহিদা রয়েছে। ফলে সিলেট অঞ্চলে চা শিল্প প্রসার লাভ করেছে;
- সিলেট অঞ্চলের চা বাগানগুলো দেশের অভ্যন্তরে ও রপ্তানি বন্দরের সাথে সড়ক ও রেলপথে যোগাযোগ ব্যবস্থা উত্তম।

ওপরে বর্ণিত কারণসমূহের প্রভাবে সিলেট অঞ্চলে; অর্থাৎ সিলেট, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলায় চা শিল্প কেন্দ্রীভূতভাবে গড়ে উঠেছে।

বাণিজ্য

চা শিল্পে বাংলাদেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ। দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিশ্ব বাজারে প্রচুর চা রপ্তানি করা হয়। ২০১৫-১৬ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশ চা রপ্তানি করে ১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে। এ চাষের অধিকাংশই চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে বিদেশে রপ্তানি হয়ে থাকে। যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, জার্মানি, অস্ট্রেলিয়া এবং মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো বাংলাদেশি চাষের প্রধান ক্রেতা। বাংলাদেশ সরকার চা বোর্ড এর মাধ্যমে চাষের বাজার সম্প্রসারণ এবং চাষের উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা করছেন। বর্তমানে পানি সেচের সাহায্যে চট্টগ্রামে কয়েকটি নতুন চা বাগান তৈরি করা হয়েছে। সুতরাং বলা যায় যে, বাংলাদেশের চা শিল্পের ভবিষ্যৎ অতিব উজ্জ্বল।

চা শিল্পের সমস্যা

বাংলাদেশে চা শিল্পে কতিপয় সমস্যা রয়েছে। যেমন-

- অনিয়মিত বৃষ্টিপাত;
- প্রয়োজনীয় সারের অভাব;
- দক্ষ ও সুলভ শ্রমিকের অভাব;

- প্যাকিং ও গুদামজাতকরণের অসুবিধা;
- মূলধনের অভাব;
- কারখানায় প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির অভাব;
- শিল্পাঞ্চলের অনুন্নত পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা;
- অনিশ্চিত বাজার।

চা শিল্পের উন্নয়নের উপায়

নিম্নের পদক্ষেপসমূহের মাধ্যমে বাংলাদেশে চা শিল্পের উন্নতি করা সম্ভব-

- অনিয়মিত বৃষ্টিপাত ও খরার জন্য পানিসেচের সুবন্দোবস্ত করা;
- প্রয়োজনীয় সার সরবরাহের ব্যবস্থা করা;
- নিপুণ, সুলভ শ্রমিক সরবরাহের ব্যবস্থা করা;
- প্রয়োজনীয় মূলধনের ব্যবস্থা করা;
- আধুনিক পদ্ধতিতে চা প্যাকিং ও গুদামজাত করার ব্যবস্থা করা;
- শিল্পাঞ্চলের পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন;
- সরকারি উদ্যোগে বিদেশে অধিক পরিমাণে চা রপ্তানি করার ব্যবস্থা করা।

বাংলাদেশের চিনি শিল্প (Sugar Industry of Bangladesh)

চিনি শিল্প বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান কারখানা শিল্প। বাংলাদেশ প্রচুর আখ উৎপাদিত হওয়া সত্ত্বেও ১৯৩৩ খ্রিষ্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত এ দেশে কোন চিনির কল প্রতিষ্ঠিত হয়নি। সে সময় দেশের প্রয়োজনীয় চিনি ইন্দোনেশিয়া হতে আমদানি করতে হত। ১৯৩৩ খ্রিষ্টাব্দ হতে ১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে এ দেশে ব্যক্তি মালিকানায ৫টি চিনির কল গড়ে ওঠে। এ কলগুলো হলো- উত্তর বঙ্গের চিনিকল, দেশবন্ধু চিনিকল, সেতাবগঞ্জ চিনিকল, কেবু এন্ড কোম্পানি ও ন্যাশনাল চিনিকল। তাই ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে দেশ বিভাগের সময় বাংলাদেশে চিনিকলের সংখ্যা ছিল ৫টি এবং তাদের উৎপাদন ক্ষমতা ছিল মাত্র ৩৯,০০০ টন।

বর্তমানে বাংলাদেশে ১৮টি চিনিকল রয়েছে। তবে চালু কলের সংখ্যা ১৬টি। আখের কলগুলোতে ক্ষমতা অনুযায়ী চিনি উৎপন্ন হয় না। বাংলাদেশ চিনি উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। ফলে বিদেশ হতে চিনি আমদানি করতে হয়। বিদেশি মূলধনের নির্মিত কুষ্টিয়ার দর্শনা চিনিকলটি বাদে বাকি ১৬টি কল সরকার রাষ্ট্রায়ত্ত্ব করেছেন। রাষ্ট্রায়ত্ত্ব চিনি কলগুলোর সুষ্ঠু পরিচালনায় জন্য সরকার 'বাংলাদেশ চিনিকল সংস্থা' স্থাপন করেছেন।

বাংলাদেশে চিনির কল গড়ে ওঠার উপাদানসমূহ

প্রাকৃতিক উপাদানসমূহ

কাঁচামালের সহজলভ্যতা: বাংলাদেশের মাটি ও জলবায়ু আখ চাষের পক্ষে উপযোগী। ফলে দেশে অধিক পরিমাণ আখের চাষ হয়, কিন্তু প্রয়োজনমত চিনিকল না থাকায় অনেক ক্ষেত্রে উৎপাদিত আখ গুড় তৈরি করার জন্য ব্যবহৃত হত। ফলে একদিকে যেমন প্রয়োজনীয় চিনির চাহিদা মিটান যেত না, অন্যদিকে আখের অপচয় হতো।

শক্তিসম্পদ: শিল্পের স্থাপন ও স্থানীয়করণের উপর শক্তিসম্পদের প্রভাব অপরিসীম। শক্তিসম্পদগুলো হলো কয়লা, খনিজ তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস ও পানিবিদ্যুৎ, কিন্তু বাংলাদেশের শক্তিসম্পদ হলো পানিবিদ্যুৎ ও গ্যাস। দেশের চিনির কলগুলোতে অতি সহজে পানিবিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা আছে। এ ছাড়া প্রাকৃতিক গ্যাসও শক্তিসম্পদ হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

জলবায়ু: বাংলাদেশের উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ুতে আখের ফলন ভাল হয় বলে এ দেশে প্রতি বছর প্রচুর আখের চাষ হয়ে থাকে। ফলে চিনিকলগুলোর জন্য কাঁচামালের কোন অভাব হয় না। আখের চাষ বৃদ্ধি করতে পারলে দেশে আরও চিনির কল স্থাপন করা যায়।

অর্থনৈতিক কারণসমূহ

মূলধন: চিনি শিল্পে প্রচুর মূলধনের প্রয়োজন। সরকার এ শিল্পের প্রায় মূলধনই সরবরাহ করে থাকে। ফলে চিনির কলগুলোর জন্য মূলধনের কোন অভাব হয় না।

শ্রমিক সরবরাহ: কারখানার কাজ করার জন্য শ্রমিকের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। এ দেশ ঘনবসতিপূর্ণ বলে সুলভে বহু শ্রমিক পাওয়া যায়।

পরিবহণ ব্যবস্থা: কারখানাগুলোতে আর্থ সংগ্রহ এবং বিভিন্ন বাজারে চিনি প্রেরণের সুষ্ঠু পরিবহণ ব্যবস্থাও বাংলাদেশে বিদ্যমান।

বাজার: বাংলাদেশের সর্বত্র চিনির চাহিদা ব্যাপক। ফলে কলগুলোর উৎপন্ন চিনি বাজারজাত করতে কোন অসুবিধা হয় না।

অন্যান্য কারণসমূহ

সরকারি সাহায্য ও সহযোগিতা, রাজনৈতিক কারণ ইত্যাদিও এ শিল্প স্থাপনের উপর প্রভাব বিস্তার করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় চিনি শিল্প গড়ে উঠে। আবার রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা এবং শান্তি- শৃঙ্খলার অভাব শিল্প স্থাপনে বিঘ্ন ঘটে। বাংলাদেশের অধিকাংশ চিনির কল সরকারি সাহায্য ও সহযোগিতার ফলেই গড়ে উঠেছে।

চিনির উৎপাদন

পূর্বে বাংলাদেশের চিনির উৎপাদন প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম ছিল। ১৯৮০ হতে ১৯৮৩ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত চিনির উৎপাদন যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। ২০১৬ খ্রিষ্টাব্দে চিনির উৎপাদন ছিল ৬৫ হাজার মেট্রিক টন। বি এস এফ আই সির নিয়ন্ত্রণাধীন শিল্পকারখানার মধ্যে ১৫টি চিনিকলের বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ২.১০ লক্ষ মে. টন। দেশে বর্তমানে চিনির প্রকৃত চাহিদার (বার্ষিক প্রায় ১৪ লক্ষ মে. টন) তুলনায় সরকার নিয়ন্ত্রণাধীন ইক্ষুভিত্তিক চিনিকলগুলোর চিনির উৎপাদন অপ্রতুল। ফলে বেসরকারিভাবে স্থাপিত ৫/৬ টি সুগার রিফাইনারিতে উৎপাদিত চিনি এবং আমদানিকৃত চিনি দ্বারা ঘাটতি পূরণ করা হয়। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ৮০ হাজার মে. টন চিনি উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে এবং এর বিপরীতে ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত ৫৭.৯০ হাজার মে. টন চিনি উৎপাদিত হয়েছে।

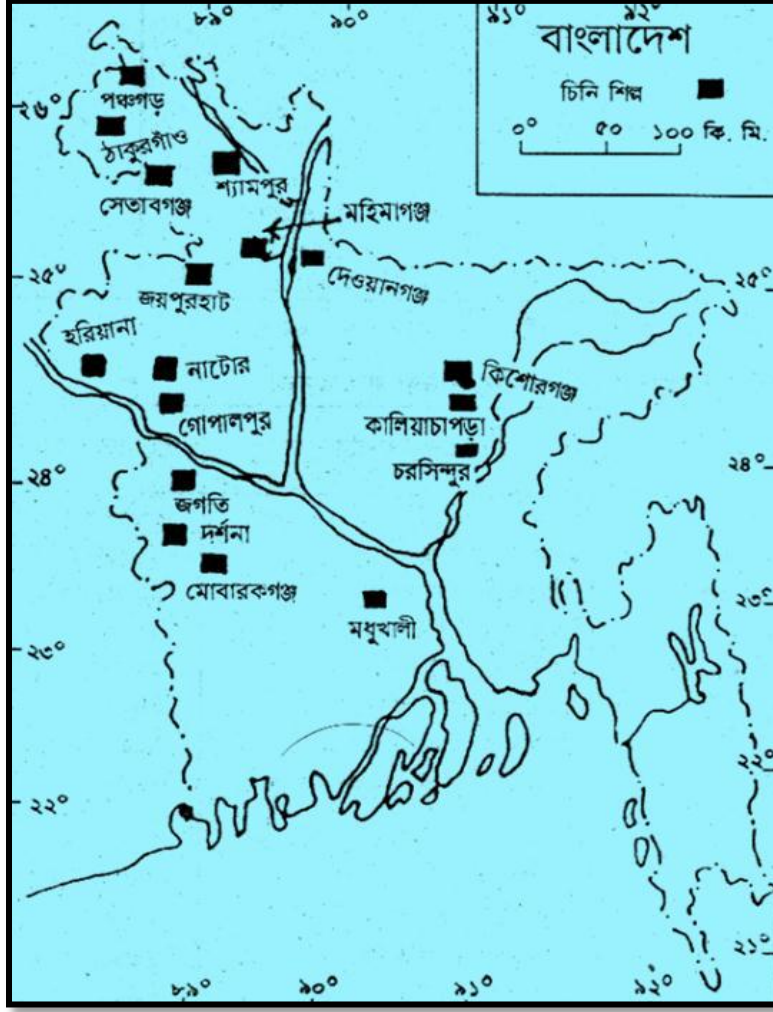
চিনি শিল্পের বণ্টন

বাংলাদেশের চিনির কলগুলো রাজশাহী, ঢাকা ও খুলনা বিভাগে গড়ে উঠেছে। তবে ভূপ্রকৃতি, জলবায়ু ও মৃত্তিকা আর্থ চাষের অনুকূলে নয় বলে চট্টগ্রাম, সিলেট ও বরিশাল বিভাগে কোন চিনির কল গড়ে ওঠেনি (সারণি ৬.১৬)।

সারণি ৬.১৬: বাংলাদেশের চিনিকলগুলোর অবস্থান ও উৎপাদন ক্ষমতা

চিনি কলের নাম	অবস্থান-জেলার নাম	প্রতিষ্ঠার সময়	উৎপাদন ক্ষমতা (টনে)
১. উত্তরবঙ্গ চিনিকল	গোপালপুর, নাটোর জেলা	১৯৩৩/৮৫	১২৫০০
২. কেবু এন্ড কোম্পানি চিনিকল	দর্শনা, চুয়াডাঙ্গা জেলা	১৯৩৮/৮৫	১০১৬০
৩. সেতাবগঞ্জ চিনিকল	সেতাবগঞ্জ, দিনাজপুর জেলা	১৯৩৩/৮৫	১২৫০০
৪. ন্যাশনাল সুগার মিল	কিশোরগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ জেলা	১৯৭০	১০১৬০
৫. দেশবন্ধু চিনিকল	চরসিদ্ধুর, নরসিংদী জেলা	১৯৩৪/৮৬	৩০০০
৬. মহিমাগঞ্জ চিনিকল	মহিমাগঞ্জ, গাইবান্ধা জেলা	১৯৫৮	১৩২১০
৭. ঠাকুরগাঁও চিনিকল	ঠাকুরগাঁও, ঠাকুরগাঁও জেলা	১৯৫৯	১৫২৪০
৮. ঝিলবাংলা চিনিকল	দেওয়ানগঞ্জ, জামালপুর জেলা	১৯৫৯	১০১৬০
৯. জয়পুরহাট চিনিকল	জয়পুরহাট, জয়পুরহাট জেলা	১৯৬৩	২০৩২০
১০. কুষ্টিয়া চিনিকল	জগতি, কুষ্টিয়া জেলা	১৯৬৬	১৫২৪০
১১. রাজশাহী চিনিকল	হরিয়ানা, রাজশাহী	১৯৬৬	১৫২৪০
১২. মোবারকগঞ্জ চিনিকল	মোবারকগঞ্জ, ঝিনাইদহ	১৯৬৬	১০১৬০
১৩. শ্যামপুর চিনিকল	শ্যামপুর, রংপুর	১৯৬৮	১০১৬০
১৪. কালিয়াচাপড়া চিনিকল	কালিয়াচাপড়া, কিশোরগঞ্জ	১৯৭০	১০১৬০
১৫. পঞ্চগড় চিনিকল	পঞ্চগড়, পঞ্চগড়	১৯৭০	১০১৬০
১৬. মধুখালী চিনিকল	মধুখালী, ফরিদপুর	১৯৭৭	১০১৬০
১৭. নাটোর চিনিকল	নাটোর, নাটোর	১৯৮৫	১৫০০০
১৮. পাবনা চিনিকল	দাসুরিয়া, পাবনা	১৯৯৫	১৫০০০

উৎস: খান, মো: আবদুল আউয়াল, আকতার, খুরশীদ)



চিত্র-৬.১৪: বাংলাদেশের চিনি শিল্প

বাণিজ্য

আখের অভাবে বাংলাদেশের চিনিকলগুলোতে ক্ষমতা অনুযায়ী চিনি উৎপাদিত হয় না। ফলে দেশের চাহিদা মিটানোর জন্য কিউবা, ব্রাজিল, পোল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশ হতে প্রচুর চিনি আমদানি করতে হয়। ২০১৬ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশ বিশ্ববাজার হতে ২২ লক্ষ ৮৪ হাজার টন চিনি আমদানি করে। তবে দেশে আখের উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে চিনির কলগুলোতে প্রচুর চিনি উৎপাদন সম্ভব হবে এবং আমদানির পরিমাণও যথেষ্ট কমে যাবে।

চিনি শিল্পের সমস্যা ও ভবিষ্যৎ

চিনি শিল্পের অভাব: বাংলাদেশ চিনি শিল্পের ভবিষ্যৎ খুবই উজ্জ্বল হলেও কতগুলো সমস্যা এ শিল্প প্রসারে বাঁধার সৃষ্টি করছে। যেমন -

আখের অভাব: চিনির কলগুলোতে চাহিদার তুলনায় আখের উৎপাদন অনেক কম। বাংলাদেশ যেখানে একর প্রতি ১৭.৩৩ মেট্রিক টন আখ জন্মে, সেখানে হাওয়াই, জাভা ও কিউবায় একর প্রতি ফলন ৬৫ টন। ফলে কেবল আখের অভাবেই চিনির কলগুলো চাহিদা অনুসারে চিনি প্রস্তুত করতে পারে না।

স্বয়ংসম্পূর্ণ আখ উৎপাদন মৌসুম : বাংলাদেশে আখ উৎপাদনের মৌসুম মাত্র ৪/৫ মাস। ফলে চিনির কলগুলো বছরের প্রায় ৫/৬ মাস বন্ধ থাকে। কল বন্ধ থাকাকালেও শ্রমিকদের বেতন বহন করতে হয় বলে চিনির উৎপাদন খরচ অধিক পড়ে। এ ছাড়া আখ মৌসুম দীর্ঘায়িত না হওয়ায় অতি অল্প সময়েও মধ্যে এত অধিক আখ হতে চিনি উৎপাদন করা মিলগুলোর পক্ষে সম্ভব হয় না। ফলে বেশকিছু পরিমাণ আখ গুড় প্রস্তুতেই ব্যবহার করা হয়।

চিনিকল হতে আখ ক্ষেতের দূরে অবস্থান: কোন কোন চিনিকল আখ উৎপাদন ক্ষেত্র হতে দূরে অবস্থান করায় পরিবহণ ব্যয় কেবল যে অধিক পড়ে তাই নয় উপরন্তু সময়ও বেশি লাগে। অনেক ক্ষেত্রেই গো-মহিষাদির গাড়ির মাধ্যমে চিনির কলে আখ নিয়ে যাওয়া হয়। ফলে সময় অধিক লাগায় আখের রস শুকিয়ে যায়।

ত্রুটিপূর্ণ পদ্ধতি: চিনি পরিশোধন ও আখের রস নিষ্কাশন পদ্ধতিও অনেক ক্ষেত্রে ত্রুটিপূর্ণ হবার ফলে অপচয় ঘটে ও মূল্য বৃদ্ধি পায়। এ সব কারণে বাংলাদেশে প্রতি বছর চিনি উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা যায় না।

গুড় তৈরির প্রবণতা: চিনিকলের নিকটবর্তী অঞ্চলে গুড় তৈরির প্রবণতা বৃদ্ধি পাওয়ায় চিনির কলগুলোতে আখ সংকট দেখা দেয়।

বিদ্যুৎ বিভ্রাট: নিয়মিত বিদ্যুৎ বিভ্রাট চিনি শিল্পের একটি মারাত্মক সমস্যা। এর ফলে উৎপাদন হ্রাস পায় এবং মূল্য বৃদ্ধি পায়।

চিনি শিল্পের উন্নতিকল্পে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা এবং এর ভবিষ্যৎ

বাংলাদেশে প্রতি বছর প্রায় ৩.৮৪ লক্ষ টন চিনির প্রয়োজন। কিন্তু আখের অভাবে উৎপাদন ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও চিনির কলগুলো প্রয়োজনীয় চিনি উৎপাদন করতে পারে না। তাই এ শিল্পের উন্নতিকল্পে নিচের ব্যবস্থাগুলো নেয়া প্রয়োজন -

আখের উৎপাদন বৃদ্ধি: চিনিশিল্পের উন্নতির জন্য বাংলাদেশে আখের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে। এ কাজের জন্য পানিসেচ এবং প্রয়োজনীয় সার সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে। কারণ বাংলাদেশে একরপ্তি আখের ফলন খুবই কম।

মূলধন সরবরাহ ও ন্যায্যমূল্যের নিশ্চয়তা: আখ উৎপাদনকারী কৃষকদের অল্প সুদে মূলধন সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে। কৃষকগণও যাতে উৎপাদিত আখের ন্যায্যমূল্য পায় সে ব্যবস্থা করতে হবে।

চিনিকলের নিকট আখের চাষ: চিনিকলের নিকটবর্তী অঞ্চলে আখ চাষের ব্যবস্থা করতে হবে। কারণ আখ কাটাবার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে রস বের না করা হলে রসের পরিমাণ কমে যায়। ফলে চিনির কলগুলোতে আখ সরবরাহের জন্য প্রয়োজনীয় পরিবহণ যান ও রাস্তাঘাটের ব্যবস্থা করতে হবে।

উন্নত প্রথায আখের চাষ: উন্নত প্রথায আখের চাষ করতে হবে, যাতে আখ কাটাবার সময় দীর্ঘায়িত হয়। ফলে চিনির কলগুলো সারা বছরই চালু থাকবে এবং উৎপাদন খরচও কম হবে।

আধুনিক পদ্ধতির প্রবর্তন: চিনি পরিশোধন ও আখের রস নিষ্কাশনের আধুনিক পদ্ধতি প্রবর্তন করতে হবে। বর্তমান পদ্ধতি ত্রুটিপূর্ণ হবার ফলে অপচয় ঘটে ও মূল্য বৃদ্ধি পায়।

ওপরে বর্ণিত ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করা হলে চাহিদা অপেক্ষাও বেশি চিনি উৎপাদন করা সম্ভব হবে। সুতরাং বাংলাদেশে চিনি শিল্পের ভবিষ্যৎ খুবই উজ্জ্বল।

সিমেন্ট শিল্প (Cement Industry)

আধুনিক সভ্যতায় সিমেন্ট একটি মূল্যবান দ্রব্য। দেশের পূর্তকর্ম ও নগরায়ণ সিমেন্টের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল। অথচ ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশে একটি মাত্র সিমেন্ট কারখানা ছিল। এটি অসাম বেঙ্গল সিমেন্ট কারখানা নামে পরিচিতি। দেশে সিমেন্টের ব্যাপক চাহিদা থাকা সত্ত্বেও প্রয়োজনীয় চূনাপাথরের অভাব থাকায় এ শিল্পের কিছুটা উন্নতি হয়েছে। তথাপি বাংলাদেশ এ শিল্পে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে পারেনি।

উৎপাদন: বর্তমানে বাংলাদেশে বড় ও মাঝারি আকারের ১২টি সিমেন্ট কারখানা রয়েছে। এ সব কারখানায় ২০১৪-১৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রায় ৫৭৭ কোটি ৫লক্ষ ৭০ হাজার ২৭ হাজার মেট্রিক টন সিমেন্ট উৎপন্ন হয়।

সিমেন্ট শিল্পের বণ্টন

ছাতক সিমেন্ট কারখানা: ১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দের ৪ এপ্রিল এ কারখানায় উৎপাদন শুরু হয়। বর্তমানে এ কারখানায় উৎপাদন ক্ষমতা ১ লক্ষ ৫০ হাজার টন, কিন্তু চূনাপাথরের অভাবে ক্ষমতা অনুযায়ী উৎপাদন সম্ভব হচ্ছে না। চূনাপাথরই এ কারখানার প্রধান কাঁচামাল। এ ছাড়া ১০% দেশি মাটি ও ২% জিপসামও কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। পূর্বে দড়িপথে ভারত হতে চূনাপাথর সংগ্রহ করা হত। ১৯৬৫ খ্রিষ্টাব্দের যুদ্ধের পর এ ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে যায়। এরপর সুনামগঞ্জ জেলার টেকেরঘাট ও বাগলিবাজার হতে চূনাপাথর সংগ্রহ করা হয়। টেকেরঘাট ও বাগলি বাজার হতে ছাতকে কাঁচামাল আনয়ন করা খুবই কষ্টসাধ্য ও ব্যয়বহুল ব্যাপার। নদীপথের দূরত্ব প্রায় ১৬০ কিলোমিটারেরও বেশি। পরিবহণের অসুবিধার জন্য এ কারখানার উৎপাদন হ্রাস পাচ্ছে। বর্তমানে দড়িপথে (Ropeway) ভারত হতে চূনাপাথর সংগ্রহের ব্যবস্থা হতে পারে। ছাতকের প্রাকৃতিক গ্যাস এ কারখানায় ব্যবহৃত হয়। এ কারখানার নিজস্ব বিদ্যুৎকেন্দ্র আছে। বর্তমানে এ উৎপাদন ক্ষমতা ২.৬৭ লক্ষ মেট্রিক টন।

চট্টগ্রাম সিমেন্ট কারখানা: ৬ লক্ষ টন উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন চট্টগ্রামের সিমেন্ট কারখানাটি ১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দে চালু হয়। বর্তমানে এ কারখানায় বার্ষিক প্রায় ২১৫ লক্ষ টন সিমেন্ট উৎপন্ন হয়। এ কারখানার জন্য বিদেশ হতে ক্লিংকার বা খণ্ডপাথর আমদানি করা হয়। প্রয়োজনবোধে সীতাকুণ্ড ও সেন্ট মার্টিন দ্বীপের চুনাপাথরও এ কারখানায় ব্যবহার করা যাবে। ১৯৯৩ খ্রিষ্টাব্দে কারখানাটি ব্যক্তি মালিকানায় দেয়া হয়। এর উৎপাদিত সিমেন্ট ‘ব্লুবি সিমেন্ট’ নামে বাজারজাত করা হয়।

জয়পুরহাট সিমেন্ট কারখানা: জয়পুরহাট জেলার জয়পুরহাটের এ কারখানাটিতে শীঘ্রই উৎপাদন শুরু হবে বলে আশা করা যায়। এ প্রকল্পটি সমাপ্ত হতে আনুমানিক ৩৪ কোটি টাকা ব্যয় হবে। এর মধ্যে বৈদেশিক মুদ্রা থাকবে প্রায় ১১ কোটি টাকা। স্থানীয় অফুরন্ত চুনাপাথরই হবে এর কাঁচামাল। এ কারখানায় জন্য কাঁচামাল হিসেবে দৈনিক প্রায় ৩৫ হাজার টন চুনাপাথরের প্রয়োজন। বার্ষিক উৎপাদিত সিমেন্টের পরিমাণ হবে প্রায় ৬ লক্ষ ৬০ হাজার টন। এ কারখানায় উৎপাদন পূর্ণমাত্রায় শুরু হলে দেশে সিমেন্টের চাহিদা অনেকাংশে মিটে যাবে।

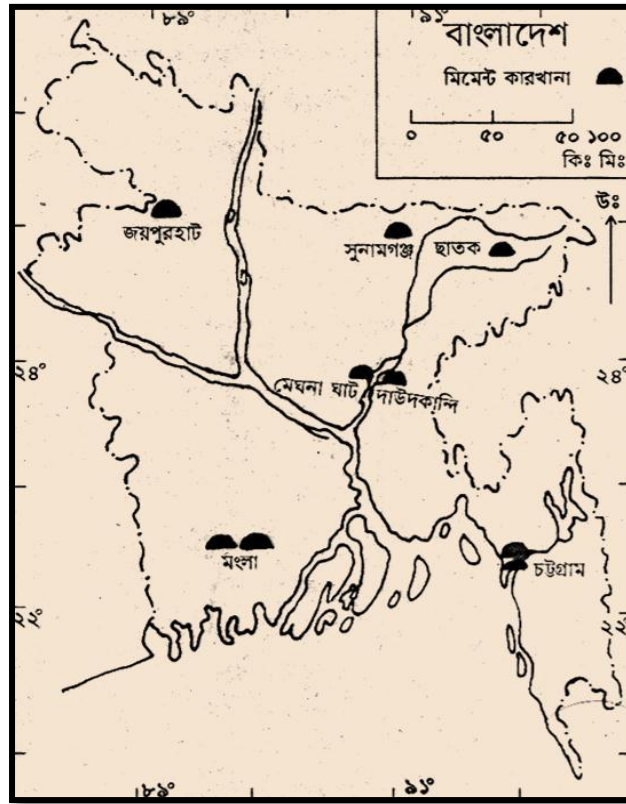
কনফিডেন্স সিমেন্ট কারখানা: চট্টগ্রাম শহরের ২২ কি. মি. উত্তরে সীতাকুণ্ডে ব্যক্তি মালিকানায় ১.৮ লক্ষ মেট্রিক টন ক্ষমতাসম্পন্ন এ কারখানাটি ১৯৯৫ খ্রিষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে চালু হয়। আমদানিকৃত খণ্ডপাথর ও জিপসাম এর কাঁচামাল।

মংলা সিমেন্ট কারখানা: পাকিস্তানের আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতায় ৪.৫ লক্ষ মেট্রিক টন ক্ষমতাসম্পন্ন এ কারখানাটি বাগেরহাটের মংলা বন্দরের নিকট সেনাকল্যাণ সংস্থার উদ্যোগে ১৯৯৫ খ্রিষ্টাব্দে জুন মাসে চালু হয়। আমদানিকৃত খণ্ড পাথরের উপর নির্ভর করে এটি নির্মিত হয়েছে।

মেঘনা সিমেন্ট কারখানা: আমদানিকৃত কাঁচামাল খণ্ড পাথরের উপর নির্ভর করে বসুন্ধরা শিল্পগোষ্ঠীর লক্ষ মেট্রিক টন ক্ষমতাসম্পন্ন এ কারখানাটি মংলা বন্দরের নিকট স্থাপিত হয়। ১৯৯৫ খ্রিষ্টাব্দের শেষ ভাগে এর বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হয়।

হুন্দাই সিমেন্ট কারখানা: দক্ষিণ কোরিয়ার হুন্দাই শিল্পগোষ্ঠীর আর্থিক কারিগরি সহযোগিতা ১.৮০ লক্ষ মেট্রিক টন ক্ষমতাসম্পন্ন এ কারখানাটি নারায়নগঞ্জ জেলার মেঘনা ঘাটের নিকট স্থাপিত হয়। আমদানিকৃত খণ্ডপাথর এর প্রধান কাঁচামাল। ১৯৯৬ খ্রিষ্টাব্দের জুন মাসে এর উৎপাদন কার্যক্রম শুরু হয়।

অন্যান্য: ১৮ হাজার মেট্রিক টন ক্ষমতাসম্পন্ন দুটি ছোট আকৃতির সিমেন্ট কারখানায় একটি সুনামগঞ্জ জেলার আইনপুর এবং কুমিল্লার দাউদকান্দিতে এবং যশোর জেলার নোয়াপাড়ায় নির্মিত হয়েছে। এ ছাড়া বর্তমানে বেসরকারিখাতে নিলয় সিমেন্ট লিঃ, মডার্ন সিমেন্ট লিঃ ইত্যাদি নামে আরও কয়েকটি সিমেন্ট কারখানা চালু হয়েছে।



চিত্র-৬.১৫: বাংলাদেশের সিমেন্ট কারখানা

বাণিজ্য

বাংলাদেশ সিমেন্ট উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। ফলে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করে বিশ্ববাজার হতে সিমেন্ট ক্রয় করতে হয়। এ সিমেন্টের অধিকাংশই পোর্টল্যান্ড সিমেন্ট। তবে সামান্য সাদা সিমেন্টও আমদানি করা হয়। ২০১১-১২ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশ ৫০.৪০ কোটি মার্কিন ডলার মূল্যের প্রায় ৭২৫৭ হাজার টন সিমেন্ট আমদানি করে। এ সিমেন্টের প্রায় সবই আমদানি করা হয় দক্ষিণ কোরিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ভারত ও জাপান হতে। বর্তমানে দেশে কয়েকটি নতুন সিমেন্ট কারখানা নির্মিত হওয়া আমদানির পরিমাণ যথেষ্ট কমে গিয়েছে।

সিমেন্ট শিল্পের ভবিষ্যৎ: বিশ্বের অন্যান্য উন্নতিশীল দেশের মত বাংলাদেশেও বর্তমানে নির্মাণের কাজ দ্রুতগতিতে চলছে। আর এ নির্মাণ কাজের জন্য যে পরিমাণ সিমেন্ট ব্যয় করা হচ্ছে, দুর্ভাগ্যবশত বেশিরভাগই বিশ্ববাজার হতে ক্রয় করতে হয়। এতে প্রতি বছর প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় হয়। সিমেন্ট শিল্পের প্রধান কাঁচামাল হলো চূনাপাথর। চূনাপাথরের অভাবে এতদিন বাংলাদেশে সিমেন্ট শিল্পের সংখ্যা বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়নি। এমনকি প্রয়োজনীয় কাঁচামালের অভাবে ছাতক সিমেন্ট কারখানাটি মাঝে মাঝে বন্ধ হয়ে যেত। পূর্বে প্রয়োজনীয় চূনাপাথরের প্রায় সবই ছাতকের নিকটবর্তী ভারত রাষ্ট্রের মেঘালয় রাজ্য হতে দড়িপথে (Rope Way) সুলভে সংগ্রহ করা হত। কিন্তু ভারত সর্বদা প্রয়োজনীয় চূনাপাথর সরবরাহ করত না। অপরদিকে, দূরবর্তী দেশ হতে চূনাপাথর আমদানি করা লাভজনক হতো না। কারণ, চূনাপাথর খুবই ভারী দ্রব্য বলে বহন করা কষ্টসাধ্য ও ব্যয়বহুল ব্যাপার। ফলে এ দেশের সিমেন্ট শিল্পের ভবিষ্যৎ খুবই অনিশ্চয়তার মধ্যে ছিল। বিগত কয়েক বছরে সুনামগঞ্জ জেলার টাকেরঘাট, বাগলী বাজার, সিলেট জেলার জকিগঞ্জ ও জাফলং, নবাবগঞ্জ জেলার চাঁপাইনবাবগঞ্জ, জয়পুরহাট ও জামালগঞ্জ এবং কক্সবাজার জেলার সীতাকুণ্ড ও সেন্টমার্টিন দ্বীপে অফুরন্ত চূনাপাথরের সন্ধান পাওয়া গেছে। এ সব চূনাপাথরের উপর নির্ভর করে ইদানীং বাংলাদেশে কয়েকটি নতুন সিমেন্ট কারখানা স্থাপন করা হয়েছে এবং পুরাতন কারখানাগুলোর উৎপাদন বৃদ্ধি করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বর্তমানে নির্মাণাধীন কারখানাসমূহ চালু হলে এবং উৎপাদন পূর্ণমাত্রায় শুরু হলে বাংলাদেশ সিমেন্ট উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে সক্ষম হবে। সুতরাং বাংলাদেশের সিমেন্ট শিল্পের ভবিষ্যৎ খুবই উজ্জ্বল।

সারশিল্প (Fertilizer Industry)

বাংলাদেশ একটি কৃষিপ্রধান দেশ। কৃষির উন্নতির জন্য জমিতে সার প্রয়োগ করা একান্ত প্রয়োজন। পূর্বে মানুষের ধারণা ছিল যে, জমিতে ছাই ও গোবর দিলে অথবা অথবা বর্ষার পানিতে ভেসে আসা পলিমাটিই অধিক ফসল উৎপাদনের পক্ষে যথেষ্ট, কিন্তু সে ধারণা অপ্রতুল প্রমাণিত হয়েছে। আগের দিনে যে পরিমাণ ফসলের প্রয়োজন ছিল তাতে উপরিউক্ত ধরনের সার সে ফসলের পক্ষে যথেষ্ট ছিল, কিন্তু এখন প্রয়োজন বৃদ্ধি পেয়েছে। আর সে সাথে বেড়েছে জমির খোরাকের প্রয়োজনীয়তা। বাংলাদেশ বার্ষিক প্রায় ২১ লক্ষ টন সারের প্রয়োজন। ফলে বিশ্ববাজারে হতে প্রচুর সার আমদানি করতে হয়। বর্তমানে দেশে ৯টি সার কারখানা রয়েছে।

উৎপাদন ২০১৪ - ২০১৫ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশে সর্বমোট প্রায় ১০ লক্ষ ২৮ হাজার ১৫৭ মেট্রিক টন সার উৎপাদন হয়। এ সব সারের মধ্যে রয়েছে ইউরিয়া, অ্যামোনিয়াম সালফেট ও টি.এস.পি।

সার কারখানা বণ্টন

ফেঞ্চুগঞ্জ সার কারখানা: পূর্বে বাংলাদেশ কোন সার কারখানা ছিল না। সাবেক ই.পি.আই.ডি.সি. ১৯৬১ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশের প্রথম সার কারখানাটি সিলেট ফেঞ্চুগঞ্জ স্থাপন করে। এ কারখানাই সমস্ত যন্ত্রপাতি জাপান হতে সংগ্রহ করা হয়। এটি হরিপুরের প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার করে। এ কারখানায় বার্ষিক প্রায় ১.১৭ লক্ষ টন ইউরিয়া উৎপন্ন হয়। তবে ১৯৯৩-৯৪ খ্রিষ্টাব্দে এর উৎপাদন ছিল ৮৫ হাজার ৮১৩ মেট্রিক টন। ইদানীং অতিরিক্ত ১২,৫০০ টন অ্যামোনিয়াম সালফেট সার এ কারখানায় উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ঘোড়াশাল সার কারখানা: ঢাকার অদূরে সুগম যোগাযোগ ব্যবস্থাসম্পন্ন নরসিংদি জেলার ঘোড়াশালে ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দে নির্মাণ করা হয়েছে দেশের দ্বিতীয় ইউরিয়া সার কারখানাটি। এটি বার্ষিক ৩ লক্ষ ৪০ হাজার মেট্রিক টন ইউরিয়া সার উৎপাদন করতে সক্ষম। ঘোড়াশালের অতি নিকটে প্রাপ্ত তিতাস গ্যাসই এ কারখানার প্রধান কাঁচামাল। এ পরিকল্পনার নিজস্ব বিদ্যুৎ সরবরাহ কেন্দ্র আছে। জাপানের বিখ্যাত টয়োটা ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশন এর প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সরবরাহ করেছে। এ কারখানা নির্মাণ করতে প্রায় ২৬.৭০ কোটি টাকা ব্যয় হয় এবং ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দের আগস্ট মাসে কারখানাটি চালু হয়। এ কারখানায় বার্ষিক প্রায় ৪ লক্ষ মেট্রিক টন ইউরিয়া সার উৎপন্ন হয়।

আশুগঞ্জ জিয়া সার কারখানা: মেঘনা নদীর বাম তীরে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার আশুগঞ্জে এ সার কারখানাটি নির্মিত হয়েছে। এ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য কয়েকটি বন্ধুদেশ ও আন্তর্জাতিক সংস্থা বৈদেশিক মুদ্রায় ১৮৮ কোটি টাকা প্রদান করে। তবে কারখানাটি নির্মাণ করতে ৩১৬ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়। এটা বার্ষিক ৫ লক্ষ ৩০ হাজার টন ইউরিয়া সার উৎপাদন করতে সক্ষম। ১৯৮১ খ্রিষ্টাব্দের আগস্ট মাসে পরীক্ষামূলকভাবে এ কারখানাটি চালু করা হয়। স্থানীয় তিতাস গ্যাস এর প্রধান কাঁচামাল। পুরাদমে চালু হলে এটাই হবে দেশের সর্ববৃহৎ সার কারখানা। কারখানাটিতে ৪৮ হাজার টন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন কয়েকটি গুদাম রয়েছে। এ ছাড়া সার প্যারকিং-এর পলিথিনও এ কারখানায় প্রস্তুত হয়। এ কারখানায় বার্ষিক প্রায় ৫ লক্ষ মেট্রিক টন ইউরিয়া উৎপাদন হয়।

পলাশ ইউরিয়া সার কারখানা: নরসিংদি জেলার পলাশে শীতলক্ষ্যা নদীর তীরে নির্মিত এ সার কারখানাটি ১৯৮১ খ্রিষ্টাব্দে চালু হয়। এর বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা প্রায় ৯৫ হাজার মেট্রিক টন। এটি চীনের আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতায় নির্মিত হয়েছে। তিতাস গ্যাস এ কারখানায় কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ১৬ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন এর একটি নিজস্ব বিদ্যুৎকেন্দ্র রয়েছে।

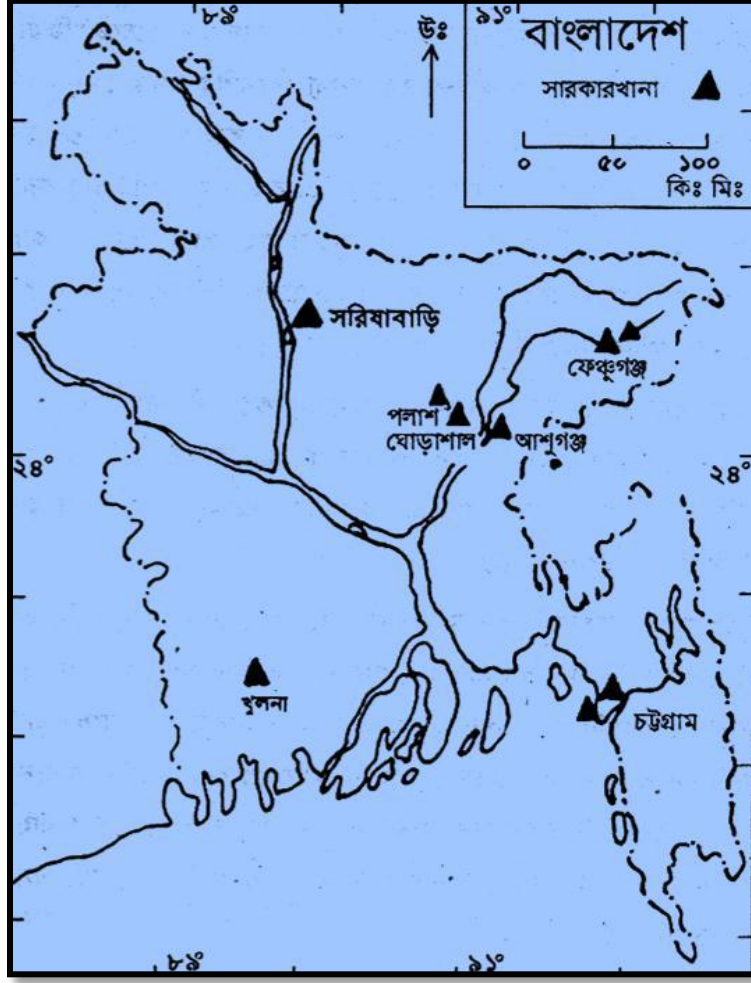
চট্টগ্রামের ট্রিপল সুপার ফসফেট (টি.এস.পি) সার কারখানা: চট্টগ্রামে দুটি টি.এস.পি. সার কারখানা আছে। প্রথম কারখানাটির বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ৩২ হাজার টন। এ কারখানার জন্য প্রায় ৩ কোটি ব্যয় হয়। ফ্রান্সের বিখ্যাত টেকনিকেমি কোম্পানি এ কারখানার সমস্ত সরঞ্জাম সরবরাহ করেছে। এটি চট্টগ্রামের এক নম্বর ট্রিপল সুপার ফসফেট সার কারখানা নামে পরিচিত। এ ছাড়া দুই নম্বর কারখানাটিও এখানে স্থাপিত হয়েছে। এটি এক নম্বরের পরিপূরক। জাপানের হিটাচি জোসেন কোম্পানি এ কারখানার যন্ত্রপাতি সরবরাহ করেছে। প্রধানত সার রপ্তানির উদ্দেশ্যেই এটি নির্মিত হয়েছে। এখানে বার্ষিক প্রায় ৪৫ হাজার মেট্রিক টন টি.এস.পি. এবং ১ লক্ষ ৫০ হাজার মেট্রিক টন এস.এস.পি. উৎপাদন হয়।

খুলনা ট্রিপল সুপার ফসফেটসার কারখানা: সাবেক ই.পি.আই.ডি.সি খুলনায় একটি সার কারখানা স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। এ কারখানায় বার্ষিক ৪ লক্ষ ৬০ হাজার টন নাইট্রোজেন এবং ২ লক্ষ ৭৫ হাজার টন ট্রিপল সুপার ফসফেট সার উৎপন্ন হবে।

অ্যামোনিয়াম সালফেট সার কারখানা: ফেঞ্চুগঞ্জ সার কারখানার পাশেই এটি নির্মিত হচ্ছে। ফেঞ্চুগঞ্জের চালু সার কারখানার উদ্ধৃত অ্যামোনিয়াই এ কারখানায় কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হবে। এর বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা হবে ১২,০০০ টন। এ সারই ব্যাপকভাবে সিলেটের চা বাগানে ব্যবহৃত হবে। এরূপ একটি সার কারখানা হবিগঞ্জেও স্থাপিত হবে।

চট্টগ্রাম ইউরিয়া সার কারখানা: কয়েকটি বন্ধু আরব রাষ্ট্রের আর্থিক সহায়তায় বন্দর নগরী চট্টগ্রামে একটি বৃহদাকার ইউরিয়া সার কারখানা নির্মাণ করা হয়। শক্তি সম্পদ হিসেবে কাপ্তাইয়ের পানি বিদ্যুৎ এবং কাঁচামাল হিসেবে বাখরাবাদের প্রাকৃতিক গ্যাস এ কারখানায় ব্যবহৃত হয়। এখানে বার্ষিক প্রায় ৫ লক্ষ ৫০ হাজার মে. টন ইউরিয়া সার উৎপাদন হয়।

যমুনা সার কারখানা: এ কারখানাটি জামালপুর জেলার সরিষাবাড়ি থানার তারাকান্দি নামক স্থানে স্থাপিত হয়। ৮৮৮ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রাসহ নির্মাণ খরচ প্রায় ১,১৪৬ কোটি টাকা। এ কারখানায় বার্ষিক প্রায় ৫ লক্ষ ৬১ হাজার মে. টন ইউরিয়া সার উৎপাদন হয়। তবে এর উৎপাদন ক্ষমতা এক হাজার মে.টন অ্যামোনিয়া এবং ১,৭০০ মে. টন ইউরিয়া। ১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে এ কারখানায় উৎপাদন শুরু হয়।



চিত্র-৬.১৬ : বাংলাদেশের সার কারখানা

বাণিজ্য

সার উৎপাদনে বাংলাদেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। ফলে প্রচুর বৈদেশিক বিশ্ববাজার হতে ২০১৪-১৫ খ্রিষ্টাব্দে ১৩৩৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের সার আমদানি করে।

সার শিল্পের সমস্যা

কাঁচামালের অভাব: প্রাকৃতিক গ্যাসই সার কারখানার প্রধান কাঁচামাল, কিন্তু প্রয়োজনীয় কাঁচামালের অভাবে অধিকাংশ কারখানায় ক্ষমতা অনুযায়ী সার উৎপাদন সম্ভব হয় না। এ ছাড়া বিদেশ থেকে আমদানিকৃত রাসায়নিক দ্রব্যের যথেষ্ট অভাব রয়েছে।

শক্তি সম্পদ: কারখানার শক্তি সম্পদ সরবরাহের জন্য অধিকাংশ সার কারখানার নিজস্ব বিদ্যুৎকেন্দ্র রয়েছে, কিন্তু প্রয়োজনীয় শক্তি সম্পদ; অর্থাৎ কয়লা, খনিজ এবং গ্যাসের অপ্রতুলতার কারণে এ সব বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে সর্বদা প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ পাওয়া সম্ভব হয় না। তাই অনিয়মিত বিদ্যুৎ বিদ্রাট এ শিল্পের উন্নতিতে বাধার সৃষ্টি করেছে।

যন্ত্রপাতির অভাব: প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও খুচরা যন্ত্রাংশের অভাবও সার শিল্পের অন্যকম সমস্যা।

দক্ষ শ্রমিকের অভাব: এ শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকের অধিকাংশই অজ্ঞ ও অশিক্ষিত। শিল্পের উপযোগী দক্ষ শ্রমিকের একান্ত অভাব।

কারিগরি জ্ঞানের অভাব: বাংলাদেশে কারিগরি জ্ঞানের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। প্রশিক্ষণের অভাবে শ্রমিকেরা আধুনিক যন্ত্রপাতিসমূহ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে পারে না।

মূলধনের অভাব: দেশে প্রয়োজনীয় মূলধনের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। এ কারণে বিদেশ থেকে সময়মত প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও রাসায়নিক দ্রব্য আমদানি করা সম্ভব হয় না। ফলে মাঝে মাঝে উৎপাদন মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়।

শ্রমিক বিরোধ: শ্রমিক বিরোধ এ শিল্পের একটি সমস্যা। শ্রমিকদের বিরোধের ফলে কোন কোন সময় কারখানা বন্ধ থাকে। এতে উৎপাদন যথেষ্ট হ্রাস পায়।

ওপরে বর্ণিত কারণগুলো ছাড়াও প্রশাসনিক অস্থিতিশীলতা, ব্যবস্থাপনা গাফিলতি, নিষ্ঠা ও সততার অভাব, সুনির্দিষ্ট নীতিমালার অভাব প্রভৃতি সার শিল্পের উন্নতিতে অন্তরায় হিসেবে কাজ করেছে।

সার শিল্পের সমস্যার সমাধান

বাংলাদেশে সার শিল্প নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও শক্তিত হওয়ার কোন কারণ নেই। কারণ, বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের জন্য নিচের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাসমূহ অবলম্বন করা হলে এ শিল্পের আরও উন্নতি সম্ভব।

প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সরবরাহের ব্যবস্থা: অধিক গ্যাস উৎপাদনের মাধ্যমে কারখানাগুলোতে প্রয়োজনীয় গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। কারণ, গ্যাসই এ শিল্পের প্রধান কাঁচামাল। এছাড়া যথাসময়ে বিদেশ থেকে প্রয়োজনীয় রাসায়নিক দ্রব্য আমদানি করে কারখানাগুলোতে সরবরাহ করতে হবে।

বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা: বিদ্যুৎ বিভাট রোধ করার জন্য প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। দেশে প্রাপ্ত কয়লা ও প্রাকৃতিক গ্যাসের বহুল ব্যবহারের মাধ্যমে অতিরিক্ত বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন করে এ সমস্যার অনেকটা সমাধান করা যায়।

যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ সরবরাহ: বিদেশ হতে যথাসময়ে কারখানার প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশের আমদানি নিশ্চিত করে এ সমস্যার করা যায়।

দক্ষ শ্রমিক সরবরাহ: শিক্ষিত ও দক্ষ শ্রমিক ব্যতীত সার শিল্পের উন্নতি সম্ভব নয়। তাই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শ্রমিকদের দক্ষ করে তুলতে হবে।

কারিগরি জ্ঞান বৃদ্ধি: আধুনিক যন্ত্রপাতিসমূহ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায় জন্য শ্রমিকদের কারিগরি জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

মূলধন বৃদ্ধি: শিল্পের জন্য প্রয়োজন মূলধন। যন্ত্রপাতি ক্রয়, কারখানার নিজস্ব বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন, কাঁচামাল ক্রয়, শ্রমিকের মজুরি ইত্যাদি বাবদ প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। তাই মূলধন সংগ্রহের ব্যবস্থা করতে হবে।

শ্রমিক বিরোধ হ্রাস: শ্রমিক বিরোধের ফলে কারখানার উৎপাদন কমে যায়। তাই শ্রমিক বিরোধ দূর করে শিল্পে শান্ত পরিবেশ বজায় রাখতে হবে।

ওপরে বর্ণিত পদক্ষেপসমূহ কার্যকরভাবে গৃহীত হলে দেশে সারের অভাবে বহুলাংশে মিটে যাবে। সুতরাং বাংলাদেশে সার শিল্পের ভবিষ্যৎ এখনও যথেষ্ট সম্ভাবনাময়।

বাংলাদেশের চামড়া শিল্প (Leather Industry of Bangladesh)

বাংলাদেশে উন্নতমানের চামড়া পাওয়া যায়। বিগত বছরে পরিসংখ্যান তালিকা থেকে দেখা যায় যে বছরে প্রায় ৪৬ লক্ষ গরুর চামড়া, ৫২ লক্ষ ছাগলের চামড়া ও প্রচুর মহিষের চামড়া পাওয়া যায়। বর্তমানে সারা দেশে ২১৪টি চামড়ার কারখানা এবং রপ্তানিযোগ্য জুতা প্রস্তুতকারী ৮টি প্রতিষ্ঠান রয়েছে।

চামড়া শিল্প গড়ে উঠার কারণসমূহ

নিচের প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক কারণসমূহ প্রভাবে চামড়া শিল্প গড়ে উঠেছে।

প্রাকৃতিক কারণসমূহ

কাঁচামাল: বাংলাদেশে প্রতিদিন শত শতপশু জবাই হয়। এছাড়া ইদুল-আজহার সময় ধর্মীয় কারণে অগণিত পশু কোরবানী দেয়া হয়। ফলে এদেশে পশুর চামড়ার কোন অভাব নেই। মূলত এ কাঁচামালের উপর ভিত্তি করেই বাংলাদেশে চামড়া শিল্প গড়ে উঠেছে।

শক্তি সম্পদ: কারখানা চালাবার জন্য শক্তি সম্পদের প্রয়োজন। বাংলাদেশের চামড়ার শিল্পকেন্দ্রের নিকটবর্তী তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে বিদ্যুৎ পাওয়া যায়। এ ছাড়া প্রাকৃতিক গ্যাসও শক্তি হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

জলবায়ু: বাংলাদেশের উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ুতে প্রচুর পশু খাদ্য জন্মে। ফলে গরু, ছাগল ও মহিষ প্রচুর পরিমাণে পালিত হয়ে থাকে। এ সব পশুর দুগ্ধ ও মাংস খাদ্য হিসেবে এবং চামড়া কাঁচামাল হিসেবে চামড়া শিল্পে ব্যবহৃত হয়।

অর্থনৈতিক কারণ: নিচের অর্থনৈতিক কারণগুলোর উপর চামড়া শিল্প নির্ভরশীল। যেমন-

মূলধন: মূলধন ছাড়া কোন শিল্পকারখানাই গড়ে ওঠে না। চামড়া শিল্পের জন্যও প্রচুর মূলধনের প্রয়োজন হয়। জমি ক্রয়, কারখানার জন্য অট্টালিকা নির্মাণ, চামড়া পাকা জন্য যন্ত্রপাতি, চামড়া ও রাসায়নিক দ্রব্য ক্রয়; শ্রমিকের মজুরি ইত্যাদি বাবদ প্রচুর মূলধনের প্রয়োজন। বিভিন্ন ব্যাংক ও বীমা কোম্পানিগুলো হতে এ শিল্পের জন্য সহজেই ঋণ পাওয়া যায়। এ ছাড়া বহু ধনী ব্যবসায়ীও প্রচুর মূলধন নিয়োগ করে থাকে।

শ্রমিক: এ চামড়া শিল্পের জন্য সুলভ শ্রমিকের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। কারণ, শ্রমিকের মজুরি কম হলে উৎপাদন খরচ কম হয়। ঘনবসতিপূর্ণ বাংলাদেশ বেকার শ্রমিকের কোন অভাব নেই। ফলে কম মজুরিতে সহজেই শ্রমিক পাওয়া যায়।

পরিবহণ: ব্যবস্থা শিল্প কারখানার কাঁচামাল সংগ্রহ ও শিল্পজাত দ্রব্য বিশ্ব-বাজারে প্রেরণের জন্য সুলভ পরিবহণ ব্যবস্থা থাকা আবশ্যিক। বাংলাদেশ বিভিন্ন ধরনের অভ্যন্তরীণ পরিবহণ ব্যবস্থা রয়েছে। এ ছাড়া সুলভ সমুদ্র পথে চামড়াজাত দ্রব্য বাজারে রপ্তানি করা যায়।

বাজার: বিশ্ব বাজারে বাংলাদেশের চামড়াজাত দ্রব্যের প্রচুর চাহিদা রয়েছে। এ কারণে এ শিল্পের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

উৎপাদন ২০০৪-০৫ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশের বিভিন্ন চামড়ার কারখানার প্রায় ১,৪৮৬ কোটি ১০ লক্ষ টাকা মূল্যের ৯০ লক্ষ ২২ হাজার বর্গমিটার পাকা চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্য উৎপন্ন হয়।

বাণিজ্য

বাংলাদেশ থেকে প্রতি বছর চামড়া ও জুতা ছাড়াও চামড়ার তৈরি ট্রাভেল ব্যাগ, শপিং ব্যাগ, স্কুল ব্যাগ, লেডিসব্যাগ, বেগ্ট, ঘড়ির ফিতা, জ্যাকেট, পাসপোর্ট কভার, ফটোফ্রেইম, ওয়ালেটসহ বিভিন্ন ধরনের রুম ডেকোরেশন আইটেম রপ্তানি করা হয়। ২০১৫-১৬ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশ চামড়া ও চামড়ার বিভিন্ন দ্রব্য রপ্তানি করে ৭৫৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের অর্জন করে।

চামড়া শিল্পের সমস্যা ও ভবিষ্যৎ

বাংলাদেশে চামড়া ও চামড়াজাত শিল্পের যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকলেও বিভিন্ন সমস্যার কারণে তা বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। আমাদের দেশের চামড়া শিল্পের বিশেষজ্ঞের বড় অভাব। বিদেশ থেকে বিশেষজ্ঞ এনে কাজ চালাতে হয়। তাই বিশেষজ্ঞ তৈরির জন্য উন্নতমানের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নিতে হবে। শ্রমিকদেরও প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ করতে হবে। আন্তর্জাতিক বাজারে এ শিল্পের প্রচার ও প্রসার বৃদ্ধির ব্যবস্থা নিতে হবে। দেশের উন্নতমানের চামড়া ও জুতা শিল্প প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে দেশী-বিদেশি বিনিয়োগকারীদের সুযোগ বৃদ্ধি করে উৎসাহিত করতে হবে। এ ছাড়া আন্তর্জাতিক বাজারও সৃষ্টি করতে হবে।

ওপরে বর্ণিত ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করা হলে অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম চামড়া ও জুতা রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে। তাই বাংলাদেশে এ শিল্পের ভবিষ্যৎ খুবই সম্ভাবনাময়। এ শিল্পের উন্নতি কল্পে বাংলাদেশ সরকার সাভারে একটি চর্ম শিল্প স্থাপন করার ব্যবস্থা করেছেন। এখানে বিদ্যুৎ, গ্যাস, পানি, শ্রমিক কলোনী, রাস্তাঘাট, চিকিৎসা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং কাঁচা চামড়া সংরক্ষণের আধুনিক সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা হবে।

কুটির শিল্প (Cottage Industry)

নিজগৃহে বসে পরিবারের সদস্যদের দ্বারা ক্ষুদ্রায়তনে যে উৎপাদন সম্পাদন করা হয় তাকেই কুটির শিল্প বলে। বাংলাদেশের কারখানা আইন অনুযায়ী যে শিল্পে অনধিক ২০ জন লোক কাজ করে তাকে কুটির শিল্প বলে। এটি সাধারণত পারিবারিক ভিত্তিক ক্ষুদ্রায়তন ব্যবস্থা।

বাংলাদেশে অকৃষি খাতে বিনিয়োগ, উৎপাদন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির অন্যতম প্রধান হচ্ছে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প খাতে বিনিয়োগ। বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন (বিসিক) বেসরকারি পর্যায়ে ক্ষুদ্র শিল্পের বিকাশ ও উন্নয়নের দায়িত্ব পালন করছে। বিসিকের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহায়তায় ২০১৫-১৬ অর্থবছরে দেশে ১,২৩৩টি ক্ষুদ্র শিল্প ও ২,২৬০টি কুটির শিল্প গড়ে উঠেছে। বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী তাঁত শিল্পে বছরে প্রায় ৬৮.৭০ কোটি মিটার তাঁতবস্ত্র উৎপাদন হয়। দেশের অভ্যন্তরীণ বস্ত্র চাহিদার প্রায় ৪০ শতাংশের বেশি তাঁত শিল্প যোগান দিচ্ছে। এ শিল্পে সারাবছর প্রত্যক্ষভাবে কর্মসংস্থান হয় প্রায় ৯ লক্ষ লোকের এবং পরোক্ষভাবে নিয়োজিত লোকের সংখ্যা প্রায় ৬ লক্ষ। দেশে মোট তাঁত সংখ্যা প্রায় ৫.০৬ লক্ষ।

বাংলাদেশের প্রধান কুটির শিল্প

অতীতে বাংলাদেশে কুটির শিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। ইংরেজ আমলের বিরূপ নীতির দরুন বহু শিল্প ধ্বংস হয়ে গেছে। কিন্তু নানা ধরনের অসুবিধার মধ্যেও বাংলাদেশে এ শিল্প টিকে রয়েছে। বাংলাদেশে নিম্নলিখিত কুটির শিল্পগুলো পরিলক্ষিত হয়-

কার্পাস তাঁত শিল্প: বাংলাদেশের কুটির শিল্পের মধ্যে কার্পাস তাঁত শিল্পই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের ঢাকা, টাঙ্গাইল, পাবনা, কুষ্টিয়া, যশোর, ময়নামতি, চৌমুহনী, নরসিংদী, বাবুরহাট প্রভৃতি তাঁত শিল্পের প্রধান কেন্দ্রস্থল। ঢাকার মসলিন শাড়ি এক সময় জগদ্বিখ্যাত ছিল। বর্তমান কালেও আমাদের দেশের তাঁতীরা অপূর্ব দক্ষতার সাথে জামদানি, বুটিদার ও বেনারসী শাড়ি; লুঙ্গি, গামছা, তোয়ালে, চাদর, গেঞ্জি, মশারি প্রভৃতি উৎপাদন করে থাকে। তাঁত শিল্পই আমাদের দেশের বেশির ভাগ লোকের কাপড়ের চাহিদা মিটিয়ে থাকে।

কার্পাস চরকা শিল্প: চরকা শিল্পে চরকার সাহায্যে তুলা হতে সুতা তৈরি হয় এবং এ সুতা দ্বারা বিভিন্ন ধরনের খদ্দেরের কাপড় তৈরি করা হয়। সাবেক কুমিল্লা ও নোয়াখালী জেলা চরকা শিল্পের জন্য বিখ্যাত।

রেশম শিল্প: বাংলাদেশের একটি ঐতিহ্যবাহী কৃষিভিত্তিক কুটির শিল্প। বাংলাদেশ রেশম বোর্ড, বাংলাদেশ রেশম গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এবং বাংলাদেশ সিঙ্ক ফাউন্ডেশন এ ৩টি সংস্থা একীভূত হয়ে বাংলাদেশ রেশম উন্নয়ন বোর্ড গঠিত হয়েছে। বাংলাদেশের রাজশাহী, পাবনা, বগুড়া প্রভৃতি অঞ্চলে রেশম শিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ। রেশম দ্বারা শাড়ি, চাদর, জামার কাপড় প্রভৃতি তৈরি হয়।

মৃৎশিল্প: এটা বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান কুটির শিল্প। মৃৎশিল্পজাত দ্রব্য হচ্ছে কলস, হাঁড়ি-বাসন, থালা ইত্যাদি। ঢাকার রায়ের বাজার এক সময়ে মৃৎশিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। তবে দেশের কিছু কিছু মৃৎশিল্প চালু আছে।

শঙ্খশিল্প: শঙ্খ হতে বোতাম, ব্রেসলেট, শাখা, আংটি প্রভৃতি তৈরি হয়। এ ছাড়া ঝিনুক ও হাতির দাঁত হতেও নানা প্রকার চিবুনী, বালা, বোতাম প্রভৃতি তৈরি করা হয়। ঢাকা ও রংপুর এ শিল্পের জন্য বিখ্যাত।

কাঁসা ও পিতল শিল্প: কাঁসা ও পিতল শিল্পজাত দ্রব্যের মধ্যে থালা, বাসন, ফুলদানি, ঘটি-বাটি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। ঢাকা ময়মনসিংহ, রাজশাহী ফরিদপুর প্রভৃতি অঞ্চল এ শিল্পে উন্নত।

বেত ও বাঁশ শিল্প: বেত ও বাঁশ শিল্পজাত দ্রব্যের মধ্যে চেয়ার, টেবিল, দোলনা, ঝুঁড়ি, বইয়ের শেলফ প্রভৃতি প্রধান। সিলেট জেলা এ শিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ।

চামড়া শিল্প: চামড়া শিল্প জুতা, স্যুটকেস, মানিব্যাগ, কোমর বন্ধ প্রভৃতি তৈরি হয়। এ শিল্প সর্বত্র বিদ্যমান।

বিড়ি শিল্প: বাংলাদেশের অধিকাংশ লোক গরিব বলে তারা ধূমপান হিসেবে বিড়িই বেশি পছন্দ করে। এ কারণে দেশের সর্বত্র বিড়ি প্রস্তুতের কারখানা আছে। বাংলাদেশের হাজার হাজার লোক বিড়ি শিল্পে নিয়োজিত আছে।

লবণ শিল্প: বাংলাদেশের চট্টগ্রাম, কক্সবাজার নোয়াখালি, বরিশাল, পটুয়াখালী, ভোলা, বরগুনা, খুলনা প্রভৃতি সমুদ্রোপকূলে অবস্থিত জেলাগুলোতে কুটির শিল্প হিসেবে লবণ উৎপাদন করা হয়।

সাবান শিল্প: বাংলাদেশের ঢাকা, চট্টগ্রাম, বগুড়া যশোর প্রভৃতি জেলাগুলোতে কুটির শিল্প হিসেবে কাপড় ধোয়ার সাবান তৈরি হয়।

অন্যান্য শিল্প: নারকেলের ছোবড়া হতে দড়ি, পাপোশ, ব্রাশ প্রভৃতি তৈরি হয়। খুলনা, বরিশাল, পটুয়াখালী, ভোলা, নোয়াখালি, প্রভৃতি জেলার বহু লোক এ শিল্পে নিয়োজিত থেকে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। অন্যান্য কুটির শিল্পের মধ্যে তেলবীজ হতে তেল তৈরি করা, মিষ্টি তৈরি, বই বাঁধানো, আসবাবপত্র তৈরি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

লোহা ও ইস্পাত শিল্প (Iron and Steel Industry)

বর্তমান যুগে লোহা ও ইস্পাত শিল্পের প্রয়োজন সর্বাপেক্ষা অধিক। অন্যান্য শিল্পসমূহের ভিত্তি এর উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। যন্ত্রপাতি ভিন্ন কোন শিল্প-কারখানা গড়ে উঠতে পারে না। কারণ, যন্ত্রপাতি প্রস্তুত করতে লোহা ও ইস্পাতের প্রয়োজন। মোটরগাড়ি, অস্ত্র-শস্ত্র, আসবাবপত্র নির্মাণেও এর প্রয়োজন হয়।

বাংলাদেশে কোন লোহা ও ইস্পাত শিল্পের কারখানা ছিল না। ১৯৬৭ খ্রিষ্টাব্দে সাবেক ই.পি.আই.ডি.সি.-র কারখানাটি চট্টগ্রামে উৎপাদন শুরু করে। দেশে কোন আকরিক লোহা ও কয়লার খনি নেই। কিন্তু পানি-বিদ্যুৎ শক্তি, চুনামাটি, সুষ্ঠু যোগাযোগ ব্যবস্থা, বাজার প্রভৃতির কোন অভাব নেই। একমাত্র কাঁচামালের অভাব। চট্টগ্রাম হতে সমুদ্রপথে এ পণ্য সংগ্রহের সুবিধা থাকায় চট্টগ্রামে লোহা ও ইস্পাত শিল্প গড়ে ওঠা সম্ভব হয়েছে। দেশের অভ্যন্তরে কোন লোহা ও উৎকৃষ্ট শ্রেণির কয়লার খনি না থাকলেও জাপান পৃথিবীতে এ শিল্পে প্রসিদ্ধ। জাপানের মত বাংলাদেশও আজ লোহা ও ইস্পাত শিল্প গড়ে তোলার জন্য বদ্ধপরিকর।

১৯৬৩ খ্রিষ্টাব্দে সাবেক ই.পি.আই.ডি.সি.-র পরিকল্পনাধীন চট্টগ্রামের লোহা ও ইস্পাত কারখানাটির উৎপাদন ১৯৬৭ খ্রিষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে শুরু হয়। এ ছাড়া আরও ৯টি মাঝারি এবং ৮টি ছোট লোহা ও ইস্পাত কারখানাও বাংলাদেশে রয়েছে। এ ছাড়া বেসরকারি মালিকানায ৬টি মাঝারি ও ৮টি ছোট লোহা কারখানা আছে। ২০০৪-০৫ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশে ৯২৭০ মে.টন ইস্পাত পিভি, ১৬৫০ মে.টন এম. এস.প্লেট এবং ৬৩৩.৩২ কোটি টাকা মূল্যের ১৯৪৪২০ মেট্রিক টন এম. এস. রড উৎপন্ন হয়।

বর্তমানে বাংলাদেশের ২ লাখ টন লোহা সামগ্রীর প্রয়োজন। এর মধ্যে প্রায় ১ লাখ টন সামগ্রী স্থানীয়ভাবে পাওয়া যায়। অবশিষ্ট লোহা ও ইস্পাত বিশ্ববাজার হতে সংগ্রহ করা হয়।

এ সব কারখানায় প্রয়োজনীয় কাঁচামালের অধিকাংশই বিদেশ হতে আমদানি করা হয়। এ ছাড়া দেশীয় পরিত্যক্ত পুরাতন লোহাও কাঁচামাল হিসেবে এবং প্রাকৃতিক গ্যাস ও পানি-বিদ্যুৎ শক্তি হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশন (বিএসইসি) এর আওতায় অন্যান্য শিল্প

বিএসইসি এর নিয়ন্ত্রণাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি, যথা- বৈদ্যুতিক কেবলস, ট্রান্সফরমার, ফ্লোরোসেন্ট টিউবলাইট, সিএফএল বাল্ব, সুপার এমেল কপার ওয়্যার ইত্যাদি উৎপাদন করে। দেশের বিদ্যুৎ বিতরণ খাতে অবদান রাখছে। তাছাড়া বিএসইসি বাস, ট্রাক, জীপ, মোটর, সাইকেল ইত্যাদি সংযোজন, জিআই/এমএস/এপিআই পাইপ, সেফটি রেজার ব্লেডও উৎপাদন করে থাকে। এসব কারখানায় ডিজেল ইঞ্জিন, তেলের কল, অস্ত্রপচারের যন্ত্রপাতি, বৈদ্যুতিক পাখা, কৃষিকাজের যন্ত্রপাতি, টিউবওয়েল, পানির পাইপ, সিন্দুক করাত, তালা, ছুরি, কাঁচি, লোহাপাত, স্ক্রু, পেরেক, বন্টু ইত্যাদি প্রস্তুত হয়।

লোহা ও ইস্পাত শিল্পের বটন: বাংলাদেশের লোহা ও ইস্পাত শিল্পের কারখানা। এ কারখানায় প্রধানত ডেউটিন ও এম. এস. এস. রড তৈরি হয়। এ কারখানায় বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ১ লাখ ৫০ হাজার টন। এ ছাড়া ১২ হাজার টন যন্ত্রপাতি উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন একটি টুলস কারখানা গাজীপুর জেলার জয়দেবপুরে অবস্থিত। ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দে জয়দেবপুরের অদূরে গাজীপুরে নামক স্থানে একটি অস্ত্র কারখানাও স্থাপিত হয়েছে।

জাহাজ নির্মাণ শিল্প (Ship Building Industry)

দেশ বিভাগের সময় ৬টি জাহাজ মেরামত কারখানা ব্যতীত বাংলাদেশে কোন জাহাজ নির্মাণ কারখানা ছিল না। এ কারখানাগুলো বরিশাল, সোনাচরা, খুলনা, নারায়ণগঞ্জ এবং চট্টগ্রামে অবস্থিত। বর্তমানে পুরাতন কারখানাগুলোর উন্নতি করা হয়েছে এবং চট্টগ্রাম, নারায়ণগঞ্জ ও খুলনাতে নতুন জাহাজ নির্মাণের কারখানা স্থাপন করা হয়েছে।

১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দে সাবেক ই. পি. আই. ডি. সি নারায়ণগঞ্জ ডকইয়ার্ডের দায়িত্বভার গ্রহণ করে। বর্তমানে এ কারখানাটি অভ্যন্তরীণ ও সমুদ্র উপকূলবর্তী জাহাজ নির্মাণ ও মেরামত করতে সক্ষম। ১৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে এটা বেসরকারি কারখানায় পরিণত হয়। বর্তমানে এ কারখানার বিস্তৃতি সাধন করা হয়েছে। খুলনা শিপইয়ার্ড এটি ১৯৫৭ খ্রিষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। বর্তমানে এখানে জাহাজ, টানা জাহাজ, উপকূলবর্তী তেলবাহী জাহাজ, মোটর লঞ্চ প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। চট্টগ্রাম শিপইয়ার্ড মোটর লঞ্চ, ছোট জাহাজ, সেতু, বজরা প্রভৃতি নির্মাণ করার ব্যবস্থা থাকবে। এ প্রকল্পের কাজ শেষ হলে এতে বার্ষিক ২ কোটি ৬৬ লাখ ৬ হাজার টাকার জাহাজ মেরামত ও নির্মাণের কাজ হবে বলে অনুমান করা হয়েছে। এ প্রতিষ্ঠানে সমুদ্রগামী বড় জাহাজ নির্মাণ করা ছাড়াও বিভিন্ন ধরনের ভারি ইস্পাত কাঠামো নির্মাণের কাজও চলবে।

দিয়াশলাই কারখানা (Match Factory)

১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশে মাত্র একটি দিয়াশলাই কারখানা ছিল। এ শিল্পের প্রয়োজনীয় প্রায় সব দ্রব্যই বাংলাদেশে রয়েছে। দিয়াশলাইয়ের বাক্স ও কাঠি তৈরি করার জন্য দেশে প্রচুর গেওয়া, শিমুল, কদম এবং পিটালী গাছ আছে। কিন্তু বারুদ ও অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্যসমূহ বিদেশ হতে আমদানি করতে হয়। এ ছাড়া এ শিল্পের জন্য অন্যান্য উপাদানসমূহ অর্থাৎ চাহিদা, শ্রমিক, মূলধন ও সহজ যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রভৃতিও বাংলাদেশে বিদ্যমান। এ কারণে বিগত কয়েক বছরে বাংলাদেশে ২০টি দিয়াশলাই কারখানা স্থাপিত হয়েছে। এ কারখানাগুলো ঢাকা, খুলনা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, সিলেট, খেপুপাড়া, পটুয়াখালী প্রভৃতি স্থানে অবস্থিত। দেশের চাহিদা মিটিয়ে বাংলাদেশ প্রচুর দিয়াশলাই বিদেশে রপ্তানি করে। ২০০৪-০৫ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশের বিভিন্ন দিয়াশলাই কারখানায় ৫৫ কোটি ৯৪ লক্ষ টাকা মূল্যের ১ কোটি ২৮ লক্ষ ১১ হাজার বক্স দিয়াশলাই উৎপন্ন হয়।

তামাক শিল্প (Tobacco Industry)

বাংলাদেশে বেশ তামাক উৎপন্ন হয়। তথাপি এ দেশে তামাক শিল্পের উন্নতি হয়নি। এ শিল্পকে তিন শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়; যথা- বিড়ি শিল্প, চুরুট শিল্প ও সিগারেট শিল্প। পূর্বে আমাদের দেশে এ শিল্প কুটির শিল্পরূপে প্রচলিত ছিল। ফলে দেশের চাহিদা মিটাবার জন্য বিদেশ হতে বিড়ির পাতা ও সিগারেট আমদানি করতে হত। এতে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রার অপচয় হত। বাংলাদেশ ভারত হতে টেন্ডু নামক বিড়ির পাতা আমদানি করত। বর্তমানে দেশের বিড়ি শিল্প মৃতপ্রায়। অপরদিকে সিগারেটের চাহিদা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় দেশে ২০টি উন্নত ধরনের সিগারেটের কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশ সিগারেট শিল্পে স্বয়ংসম্পূর্ণ। বাংলাদেশে সিগারেট কারখানার সংখ্যা দিন দিনই বৃদ্ধি পাচ্ছে। আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যৎ দেশের চাহিদা মিটিয়ে বাংলাদেশ বিদেশে সিগারেট রপ্তানি করতে সক্ষম হবে। চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, রাঙ্গামাটি প্রভৃতি স্থানে মগ শ্রমিকদের সহায়তায় প্রচুর চুরুট উৎপন্ন হয়। এ সব কারখানায় মধ্যম ও উন্নতমানের চুরুট প্রস্তুত হয়। ২০০৪-০৫ খ্রিষ্টাব্দে দেশের ২০টি কারখানায় ২,৩৮৬ কোটি শলা সিগারেট উৎপন্ন হয়।

ঔষধ শিল্প (Medicine Industry)

বাংলাদেশ বর্তমানে দেশের চাহিদার প্রায় ৯৮ শতাংশ ঔষধ স্থানীয় উৎপাদনের মাধ্যমে মেটাতে সক্ষম। বর্তমানে শুধুমাত্র কিছু হাইটেক প্রোডাক্ট (ব্লাড প্রোডাক্ট, বায়োসিমিলার প্রোডাক্ট, এন্টিক্যান্সার ড্রাগ, ভ্যাকসিন ইত্যাদি) আমদানি করা হয়। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে ঔষধ আমদানিকারক দেশ হতে রপ্তানিকারক দেশে পরিণত হয়েছে এবং সারাবিশ্বে বাংলাদেশের ঔষধ সুনাম অর্জন করেছে। বর্তমানে বাংলাদেশের ৪৬টি ঔষধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন প্রকারের ঔষধ ও ঔষধের কাঁচামাল উন্নত বিশ্বের ইউরোপ ও আমেরিকাসহ ১১৩টি দেশে রপ্তানি করছে। দেশে ২৭৮টি এলোপ্যাথিক ঔষধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান বছরে ২৬,৪১২ ব্রান্ডের প্রায় ১৫,৬১৯ কোটি টাকার ঔষধ উৎপাদন করছে।

যোগাযোগ ও বাণিজ্য (Communication & Trade)

কোন দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা পরিবহণ ও তথ্য বিনিময় ব্যবস্থার মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। যাতায়াত ব্যবস্থাকে স্থল পথ, নৌ পথ ও আকাশ পথ এ তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে। অপরদিকে যোগাযোগ ব্যবস্থা ডাক, তার, টেলিফোন, বেতার, ইন্টারনেট ও অন্যান্য মাধ্যমে সম্পাদিত হয়।

পরিবহণ ব্যবস্থা: পরিবহণ ব্যবস্থা উন্নতির মাপকাঠি। সার্বিক উন্নয়নে পরিবহণ ব্যবস্থার গুরুত্ব অত্যধিক। একটি দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে সমুন্নত রাখতে পরিবহণ ব্যবস্থা যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। বাংলাদেশের পরিবহণ ব্যবস্থা তত উন্নত নয়। বাংলাদেশের সমগ্র পরিবহণ ব্যবস্থাকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়, যথা-

১. স্থল পথ
২. জল পথ
৩. আকাশ পথ

স্থল পথ: স্থলপথকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

- ক. সড়ক পথ
- খ. রেলপথ

ক. সড়ক পথ

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সড়কপথের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সড়কপথের মাধ্যমে দুর্গম গ্রামাঞ্চলের মধ্যেও যোগাযোগ করা সম্ভব। বর্তমানে বাংলাদেশে সড়ক ও জনপথের অধীনে ২১,৩০২ কিলোমিটার এবং স্থানীয় সরকারের অধীন পাকা সড়ক ৯৭৫৯৭ কিলোমিটার এবং কাঁচা সড়ক আছে ৬৪,৬৯১ কিলোমিটার। বাংলাদেশের সড়কপথ বিভিন্ন ধরনের হয়। যথা-

জাতীয় জনপথ: এপথ রাজধানী ঢাকার সাথে দেশের সমগ্র শহর, বন্দর ও বাণিজ্যিক কেন্দ্রগুলোর সংযোগ রক্ষা করে।

জেলা বোর্ড সড়ক: জেলা সদরের সাথে উল্লেখযোগ্য হাট-বাজারের সংযোগ যে সড়ক রক্ষা করে তা জেলা বোর্ড সড়ক নামে পরিচিত। এ জাতীয় সড়ক নির্মাণের দায়িত্ব জেলা বোর্ডের।

পৌরসভা সড়কপথ: পৌরসভার রাস্তাগুলো এ পথের অধীন। সাধারণত পৌরসভার পথ পাকা হয়।

উপজেলাপরিষদের সড়ক পথ: এপথগুলো নির্মাণ করেন উপজেলাপরিষদ।

ইউনিয়ন পরিষদের সড়ক পথ: এসড়কপথ নির্মাণ করে ইউনিয়ন পরিষদ।

খ. রেলপথ

বাংলাদেশের রেলপথের পরিমাণ অল্প। তবে এদেশের অর্থনৈতিক রেলপথের প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশে ২০১৪-১৫ অর্থবছরের হিসাব অনুযায়ী সর্বমোট ২৮৭৭ কিলোমিটার রেলপথ আছে। বর্তমানে আমাদের দেশে দুই ধরনের রেলপথ আছে, যথা- ব্রডগেজ রেলপথ ও মিটারগেজ রেলপথ। পূর্বে ৩১ কিলোমিটার ন্যারোগেজ রেলপথ ছিল। পরবর্তীতে উক্ত রেলপথকে ব্রডগেজে রূপান্তরিত হয়।

২. জলপথ বা নদীপথ (Waterways)

বাংলাদেশে দুধরনের জলপথ আছে যথা- নদী ও খালপথ এবং উপকূলীয় সামুদ্রিকপথ। সমগ্র বাংলাদেশে নদীগুলো সুদূরভাবে যোগাযোগ করে চলেছে। দেশের প্রায় শতকরা ৭৫ ভাগ অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ও যাত্রী পরিবহণ এ পথ দ্বারা সম্পন্ন হয়। বর্ষাকালে এ পথের দৈর্ঘ্য হয় প্রায় ৮,৪০০ কিলোমিটারের অধিক। প্রধানত স্টিমার, লঞ্চ, নৌকা, ট্রলার, সী-ট্রাক প্রভৃতি জলপথের যাত্রী পরিবহণ কাজে সহায়তা করে। বছরে প্রায় ৩ কোটির অধিক যাত্রী জলপথের সাহায্যে দেশের মধ্যে যাতায়াত করে।

প্রধান জলপথসমূহ

ঢাকা অঞ্চল: এ অঞ্চলের অন্তর্গত প্রধান নদীপথ হচ্ছে, ঢাকা-চাঁদপুর-বরিশাল-খুলনা-ঢাকা-বরিশাল-পটুয়াখালী, ঢাকা-মাদারীপুর-গোপালগঞ্জ, ঢাকা-শ্রীনগর, ঢাকা-নওয়াবগঞ্জ, ঢাকা-চাঁদপুর-ভাগ্যকুল-ফরিদপুর ইত্যাদি।

খুলনা অঞ্চল: এ অঞ্চলের প্রধান নদীপথ হচ্ছে, খুলনা-দৌলতপুর-নলডাঙ্গা, খুলনা-দৌলতপুর-দলগ্রাম, খুলনা-মংলা, খুলনা-সাতক্ষীরা, খুলনা-ফরিদপুর।

বরিশাল অঞ্চল: এ অঞ্চলে উল্লেখযোগ্য নদীপথ, বরিশাল-পটুয়াখালী-খেপুপাড়া, বরিশাল-বাগেরহাট, বরিশাল-হিজলা, বরিশাল-নাজিরপুর, বরিশাল-ঝালকাঠি, বরিশাল-খুলনা, বরিশাল-মাদারীপুর ইত্যাদি।

চট্টগ্রাম অঞ্চল: চট্টগ্রাম অঞ্চলের অন্তর্গত প্রধান নদীপথগুলো যেমন, চট্টগ্রাম-চাঁদপুর, চট্টগ্রাম-সন্দ্বীপ, রাঙ্গামাটি-মৈষছড়ি, সিলেট-ছাতক-মোহনগঞ্জ প্রভৃতি।

সিলেট অঞ্চল: এ অঞ্চলের নদীপথগুলো, সিলেট-সুনামগঞ্জ, সিলেট-টেকেরহাট, সিলেট-কানাইয়ের হাট, সিলেট-ছাতক-মোহনগঞ্জ ইত্যাদি।

উত্তরাঞ্চল: বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের প্রধান নদীপথ, গোয়ালন্দ-জগন্নাথগঞ্জ, গোয়ালন্দ-সোহাগপুর, নগরবাড়ি-সিরাজগঞ্জ, কুষ্টিয়া-কামারখালি, নওগাঁ-মহাদেবপুর, বাহাদুরাবাদ-রৌমারী, কুড়িগ্রাম-ভুরুঙ্গামারী, সিরাজগঞ্জ-সোনামুখী প্রভৃতি।

বাংলাদেশের, জলপথের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহণ সংস্থা (Inland Water Transport Authority) সংক্ষেপে IWTA এবং বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন (BSC) নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। IWTA অভ্যন্তরীণ জল পরিবহণ এবং এ ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধনে নিয়োজিত। অন্যদিকে BSC শুধুমাত্র পণ্যদ্রব্য আন্তর্জাতিক সমুদ্রপথে পরিবহণ করে।

৩. আকাশ পথ (Airways)

আকাশপথের মাধ্যমে সবচেয়ে দ্রুত গতিতে যাত্রী বহন করা হয়। তবে তুলনামূলক ভাবে আকাশপথ ব্যয়বহুল। জরুরি ভিত্তিতে মানুষ, ডাক ও পচনশীল দ্রব্য বহনের জন্য আকাশ পথের বিকল্প নেই। ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পর তৎকালীন পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারওয়েজ (PIA) নাম পরিবর্তন করে বাংলাদেশ বিমান গঠিত হয়। তবে এ সময় বাংলাদেশে কোন বিমান ছিল না। পরবর্তীতে ভারত হতে মাত্র দুটি এফ-২৭ বিমান সংগ্রহ করার পর বাংলাদেশ বিমানের যাত্রা শুরু হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে ৫টি D.C-১০, ২টি ATP, ৬টি F-২৮ ও ৩টি Air bus মিলে সর্বমোট ১৩টি বিমান আছে।

বাংলাদেশ বিমান সার্ভিস: বাংলাদেশ বিমান সার্ভিস দুভাগে বিভাজিত। যথা-অভ্যন্তরীণ বিমান সার্ভিস (Domestic) ও আন্তর্জাতিক বিমান সার্ভিস (International) বাংলাদেশ এয়ার লাইনস।

অভ্যন্তরীণ বিমান সার্ভিস: ঢাকা হতে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে চলাচল এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধার জন্য বিমানের অভ্যন্তরীণ সার্ভিস রয়েছে।

অভ্যন্তরীণ রুটসমূহ: বিমান বাংলাদেশে দেশের অভ্যন্তরে ৭টি বুটে চলাচল করে। ঢাকা-চট্টগ্রাম, ঢাকা-রাজশাহী, ঢাকা-সিলেট, ঢাকা-সৈয়দপুর, ঢাকা-যশোর, ঢাকা-কক্সবাজার, চট্টগ্রাম-কক্সবাজার।

আন্তর্জাতিক বিমান সার্ভিস বাংলাদেশ হতে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে যাওয়া-আসা এবং বিশ্ব বাণিজ্যিক সম্পর্ক বজায় রাখার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ বিমানের আন্তর্জাতিক সার্ভিস রয়েছে। বিমানপথে সরকারি ব্যবস্থার পাশাপাশি প্রাইভেট বিমান কোম্পানি দেশের অভ্যন্তরভাগে বিমান সার্ভিস চালু করেছে।

হেলিকপ্টার সার্ভিস: দেশে একটি নতুন প্রাইভেট কোম্পানি অভ্যন্তরীণ হেলিকপ্টার সার্ভিসের প্রচলন করেছে। Best Aviation নামে এ কোম্পানি দেশের একমাত্র হেলিকপ্টার সার্ভিস প্রদানকারী প্রাইভেট বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান।

যোগাযোগ ব্যবস্থা

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন তথা সার্বিক উন্নয়নে পরিবহণ ব্যবস্থার পাশাপাশি যোগাযোগ ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা বিশেষ উন্নত নয়। তথ্যাদির আদান প্রদানকে যোগাযোগ বলা হয়। ডাক, টেলিফোন, টেলিগ্রাম, মোবাইল, রেডিও, টেলিভিশন, কৃত্তিম উপগ্রহ, সংবাদপত্র প্রভৃতি যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যম।

ব্যবসা-বাণিজ্য: পৃথিবীর কোন দেশই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। ভৌগোলিক অবস্থান ও উপাদানের ওপর দেশের বিভিন্ন ধরনের চাহিদা মেটানোর জন্য অন্য দেশের সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। বিনিময়ের মাধ্যমে দ্রব্য সামগ্রী এবং সেবা কাজের লেনদেনকে বাণিজ্য বলা হয়।

ব্যবসা বাণিজ্য দুই প্রকার, যথা -

ক) অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ও

খ) বৈদেশিক বাণিজ্য বা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য।

অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য: কোন দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে পণ্য বিনিময় ও ক্রয়-বিক্রয় হলে তাকে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য বলা হয়।

বৈদেশিক বাণিজ্য: এক দেশের সাথে অন্যদেশের বা বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মধ্যে দ্রব্যসমূহের আদান প্রদান ও ক্রয় বিক্রয় প্রথাকে বৈদেশিক বাণিজ্য বা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বলে।

আমদানি-বাণিজ্য: ২০১৫-১৬ অর্থবছরে জুলাই জানুয়ারি সময়কালে মোট আমদানি ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২৪,৩৬১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ৬.৭ শতাংশ বেশি।

দেশভিত্তিক আমদানি ব্যয়: দেশভিত্তিক আমদানি পণ্যের সমালোচনা করে দেখা যায় যে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে জুলাই-ডিসেম্বর সময়কালে দেশের আমদানির ক্ষেত্রে চীনের অবস্থান শীর্ষে রয়েছে।

রপ্তানি-বাণিজ্য: কোন দেশ যখন উৎপাদিত পণ্যদ্রব্য বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে বিশ্ব বাজারে প্রেরণ করে তখন তাকে রপ্তানি বাণিজ্য বলে।

রপ্তানি দ্রব্যসমূহ: বাংলাদেশ প্রচুর পরিমাণ শিল্পের কাঁচামাল এবং শিল্পজাত দ্রব্য রপ্তানি করে। রপ্তানি দ্রব্যের মধ্যে পোশাক, কৃষিজাত দ্রব্য ও হিমায়িত মাছ বিশ্বব্যাপী গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। বিদেশে এসব দ্রব্যের যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে। রপ্তানী দ্রব্যসমূহের মধ্যে রয়েছে তৈরী পোশাক, পাট ও পাটজাত দ্রব্য চা, হোসিয়ারি দ্রব্য, মাছ ও হিমায়িত খাদ্য চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্য রাসায়নিক দ্রব্য ইত্যাদি। ৬.১৭ সারণিতে রপ্তানি পণ্যের শ্রেণিবিভাগ ও রপ্তানি প্রবৃদ্ধি দেখানো হলো-

সারণি ৬.১৭: রপ্তানি প্রবৃদ্ধি ও রপ্তানি পণ্যের শ্রেণিবিন্যাস

রপ্তানী দ্রব্য	রপ্তানী আয় (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	
গ্রুপ ভিত্তিক পণ্য	২০১৩ - ১৪	২০১৪ - ১৫
১। প্রাথমিক পণ্য	১৩৮০	১২৬৬
হিমায়িত পণ্য	৬৩৮	৫৬৮
চা	৪	৩
কৃষিজাত পণ্য	৪০২	৩৩৯
অন্যান্য	২০৯	২৪৪
২। শিল্পজাত পণ্য	২৮৮০৯	২৯৯২২
তৈরি পোশাক	১২৪৪২	১৩০৬৫
নীটওয়ার	১২০৫০	১২৪২৭
স্পেশালাইজড টেক্সটাইল	১০৯	১০৭
হোম টেক্সটাইল	৭৯৩	৮০৪
কটন এবং কটন দ্রব্য	১১৬	১০৭
চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্য	১১৩৪	১১৩১
পাটজাত পণ্য	৬৯৮	৭৫৭
সার ও রাসায়নিক দ্রব্য	৯৩	১১২
পাদুকা	১৭২	১৯০
প্রকৌশল সামগ্রী	৩৬৭	৪৪৭
পেট্রোলিয়াম উপজাত	১৬২	৭৮
প্লাস্টিক দ্রব্য	৮৬	১০১
সিরামিক দ্রব্য	৪৮	৪৩
হস্তশিল্পজাত দ্রব্য	৮	৯
অন্যান্য	৫৩৩	৫৪৪
মোট রপ্তানি	৩০১৮৭	৩১২০৯

উৎস: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০১৬

বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণ

জাতীয় অর্থনীতিতে বাণিজ্যের প্রভাব অত্যধিক। প্রতি বছর মূল্য অপেক্ষা আমদানিকৃত মূল্য অনেক বেশি। তাই বাণিজ্য ঘাটতি থাকে। একটি উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে বিপুল পরিমাণ খাদ্য, ভোগ্য পণ্য প্রভৃতি আমদানি করতে হয়। বিশ্বের বাজারে এসব পণ্যের দাম সর্বদা বৃদ্ধি পাচ্ছে। অপরদিকে বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্য ক্ষুদ্র। সুতরাং রপ্তানি আয় আমদানি ব্যয়ের তুলনায় অনেক কম।

দেশভিত্তিক রপ্তানি: দেশভিত্তিক রপ্তানি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, যুক্তরাষ্ট্র আমাদের রপ্তানি পণ্যের বৃহৎ বাজার।

বন্দর

সাধারণত বন্দর দুই প্রকার, যথা -

১. নদী বন্দর

২. সামুদ্রিক বন্দর

নদীবন্দর

দেশের অভ্যন্তরে প্রবাহিত নদীর তীরে কোন বন্দর গড়ে উঠলে তাকে নদীবন্দর বলে। সাধারণত নদীবন্দরের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য সম্পন্ন হয়। চাঁদপুর, গোয়ালন্দ, নারায়ণগঞ্জ প্রভৃতি বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য নদীবন্দর।

সামুদ্রিক বন্দর

জলপথে পণ্যদ্রব্য আমদানি ও রপ্তানি সম্পন্ন করার জন্য সমুদ্র উপকূলে যে বাণিজ্য কেন্দ্র গড়ে ওঠে, তাকে সামুদ্রিক বন্দর বলে।

বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের অধিকাংশ সম্পন্ন হয় সমুদ্র বন্দরের মাধ্যমে। আমাদের দেশে দুটি সমুদ্র বন্দর আছে, যথা - চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর ও মংলা সমুদ্র বন্দর।

চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর: কর্ণফুলি নদীর মোহনা হতে মাত্র ১৩ কিলোমিটার অভ্যন্তরে চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর অবস্থিত। এটি বাংলাদেশের প্রধান সমুদ্র বন্দর। সমুদ্র পথে বাংলাদেশের প্রবেশদ্বার হিসেবে বন্দরটি ব্যবহৃত হয়। বাণিজ্য সাধারণত জলপথে হয়ে থাকে। তাই ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতির জন্য বন্দরের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যে সর্বাপেক্ষা বেশি ব্যবহৃত হয় চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর। এ বন্দরের মাধ্যমে বিভিন্ন পণ্যদ্রব্য আমদানি-রপ্তানি করা হয়।

মংলা সমুদ্র বন্দর: খুলনা জেলার পশুর নদীর তীরে চালনা নামক স্থানে ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দে এ বন্দরটি স্থাপিত হয়। এটি খুলনা শহর হতে মাত্র ৩২ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত ছিল। পলিমাটি দ্বারা পশুর নদী ভরাট হওয়ায় বন্দরটি স্থানান্তরিত হয়। ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দে বাগেরহাট জেলার মংলা বন্দরটি গড়ে ওঠে। স্থানের নাম অনুসারে বন্দরটির নামকরণ করা হয় মংলা বন্দর। এটি বাংলাদেশের দ্বিতীয় সমুদ্র বন্দর। এ বন্দর চালু হওয়ার পর বাংলাদেশে বৈদেশিক বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ঘটে। এ বন্দরটি অভ্যন্তরীণ বন্দরের সাথে নদীপথে যুক্ত। এ কারণে আমদানি ও রপ্তানির বিশেষ সুবিধা হয়।

পর্যটন (Tourism)

পাহাড়, নদী-নালা, ঝর্ণা, বনভূমি, সমুদ্র সৈকত, নৃ-গোষ্ঠী, ঐতিহাসিক নিদর্শন বাংলাদেশে পর্যটনের জন্য প্রাচীনকাল থেকে পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে আসছে। বাংলাদেশের এক একটি অংশ একেক ধরনের বৈচিত্র্য বহন করে।

বাংলাদেশে পর্যটন শিল্পের গুরুত্ব (Importance of Tourism Industry of Bangladesh)

পর্যটন দেশের অভ্যন্তরীণ রাজস্ব আয় ও বিদেশি মুদ্রা উপার্জনের একটি কার্যকর শিল্পখাত এবং একটি উল্লেখযোগ্য সেবাখাতও। পর্যটন উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে স্থল, বিমান ও সমুদ্রপথে যাত্রী পরিবহণ, হোটেল ও রেস্টোরা, ব্যাংকিং, ট্রাভেল এজেন্সি ও ট্যুর অপারেটর কোম্পানি, গাড়ী ভাড়া প্রতিষ্ঠান ও নানারকম খুচরা পণ্যের দোকান প্রভৃতি ব্যবসা বিকাশ লাভ করে। ফলে পর্যটনের উন্নয়ন সব মিলিয়ে দেশের অর্থনীতির উন্নয়নে, সামাজিক গতিশীলতায়, আঞ্চলিক উন্নয়নে, পরিবেশগত উন্নয়নে, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যে এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে বাংলাদেশ সরকার দেশে পর্যটন শিল্প বিকাশের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পর্যটন সংস্থা প্রতিষ্ঠা করে। ১৯৭৩ খ্রিষ্টাব্দে এটিকে বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনে রূপান্তর করে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার (১৯৭৩-১৯৭৮) আওতায়

আনা হয়। পরিকল্পনায় দেশে পর্যটনের প্রাকৃতিক আকর্ষণসমূহের সম্ভাবনা বিকশিত করে তোলা এবং এর মাধ্যমে অধিক পরিমাণে বিদেশি পর্যটক আকর্ষণ ও দেশে তাদের অবস্থান উপভোগ্য করে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়। বাংলাদেশ পর্যটনকে শিল্প হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার পর ২০০৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রণীত জাতীয় শিল্পনীতিতে একে অগ্রাধিকার শিল্প হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এরপর থেকে প্রতি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাতে এ খাতে বাজেট বরাদ্দ এবং বাজেটকৃত অর্থ পর্যটনের উন্নয়ন সংক্রান্ত নানা কার্যক্রম ও প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্যয় করা হচ্ছে।

২০১৩ খ্রিষ্টাব্দে World Travel and Tourism Council (WTTC) রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলাদেশে ২০১২ খ্রিষ্টাব্দে পরিবহণ এবং পর্যটন শিল্পে ১,২৮১,৫০০টি চাকুরির ব্যবস্থা হয়েছে, যা মোট চাকুরির ১.৮%। এর মাধ্যমে আয়, কর্মসংস্থান ও জাতীয় রাজস্ব বৃদ্ধি করা যায়।

বাংলাদেশে গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন কেন্দ্রসমূহ (Important Tourism Centres of Bangladesh)

চট্টগ্রাম বিভাগের পর্যটন স্থানসমূহ: বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম নগরী এবং প্রধান সমুদ্রবন্দর চট্টগ্রাম জুড়ে রয়েছে পাহাড়ি বনাঞ্চল, জলপ্রপাত, সমুদ্রসৈকত ও মনোমুগ্ধকর দৃশ্যাবলি। বায়োজিদ বোস্তামী মাজার, ফয়স লেক, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সৈনিকদের সমাধিস্থল, সীতাকুণ্ড, পতেঙ্গা সৈকত, ইত্যাদি দর্শনীয় স্থান ছড়িয়ে আছে এ শহরে।



চিত্র-৬.১৭: বাংলাদেশের পর্যটন কেন্দ্রসমূহ

চট্টগ্রাম বন্দর থেকে ১৫২ কি. মি. দক্ষিণে ১২৫ কি. মি. দৈর্ঘ্য বিশ্বের দীর্ঘতম বালুকাময় সমুদ্র সৈকত অবস্থিত। সৈকতের একদিকে জলরাশি আর অপরদিক জুড়ে আছে সুদৃশ্য পাহাড়শ্রেণি, সেখানে রয়েছে প্যাগোডা, বৌদ্ধ মন্দির। কক্সবাজার বঙ্গোপসাগরের তীরে অবস্থিত একটি প্রসিদ্ধ স্থান ও বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য পর্যটনকেন্দ্র। এখানে সমুদ্র সৈকত থাকায় স্থানটি স্বাস্থ্যকর। এখানের হিমছড়ি, ইনানী বিচ পর্যটকদের আকর্ষণ করে। বাংলাদেশের সর্বদক্ষিণের শহর টেকনাফ, রামুর বৌদ্ধবিহার, সৈকত সংলগ্ন সোনাদিয়া, সেন্টমার্টিন দ্বীপ, ছেড়াদ্বীপ, মহেশখালী ইত্যাদি দ্বীপসমূহ যেকোন পর্যটকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকে। রাঙ্গামাটি জেলার কাপ্তাই-এ একটি পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্র ও হার্ডবোর্ড কারখানা আছে। কাপ্তাই লেক, ঝুলন্ত সেতু, সুভলং বর্ণা এবং বিভিন্ন প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য জেলাটি প্রসিদ্ধ। পাহাড় এবং বৃক্ষরাজি দ্বারা আচ্ছাদিত বান্দরবনে চিমুক পাহাড়, মেঘলা, নিলগিরি, বৌদ্ধদের স্বর্ণমন্দির ইত্যাদি স্থান প্রসিদ্ধ। কুমিল্লা শহর থেকে ৮ কি. মি. পশ্চিমে বৌদ্ধ-কৃষ্টির সমারোহ রয়েছে ময়নামতি লালমাইয়ের নিচু পাহাড়ি ভূমিতে। আরো রয়েছে বার্ড, ওয়ার সিমেট্রি।



কক্সবাজার সমুদ্রসৈকত



সেন্টমার্টিন দ্বীপ, কক্সবাজার



কাপ্তাই লেক, রাঙ্গামাটি



ঝুলন্ত সেতু, রাঙ্গামাটি



সুভলং বর্ণা, রাঙ্গামাটি



ফয়ে'স লেক, চট্টগ্রাম

চিত্র-৬.১৮: চট্টগ্রাম বিভাগের কয়েকটি পর্যটন স্থান

ঢাকা বিভাগের পর্যটন স্থানসমূহ: ঐতিহাসিক স্থান ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহের জন্য ঢাকা বিখ্যাত। বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে রয়েছে ১৬৭৮ খ্রিষ্টাব্দে নির্মিত লালবাগ দুর্গ, মুঘল সাম্রাজ্য এর নিদর্শন বড় কাটরা ও ছোট কাটরা, ইমামবাড়ি ও মুসলমান ধর্মের শিয়া সম্প্রদায়ের এক তীর্থস্থান হুসেনী দালান, নারায়ণগঞ্জ এর সোনারগাঁও এ আছে পানাম সিটি, সোনারকাটও লোকশিল্প জাদুঘর। সোনারগাঁও পুরাতন অনেক নিদর্শন ও ধ্বংসস্তুপের সাক্ষী মোগড়াপাড়া। বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে রয়েছে ১৮৭২ খ্রিষ্টাব্দে নির্মিত আহসান মঞ্জিল। এছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, কার্জন হল রয়েছে। ঢাকা মেডিকেল এর পাশে রয়েছে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার। ১৯০৪ সনে স্থাপিত বলধা গার্ডেন। এতে আছে দুর্লভ, বিরল ও আকর্ষণীয় গাছপালার সমারোহ। আরো আছে অনেক গাছ-গাছালি, পশু-পাখি সমৃদ্ধ বোটানিক্যাল গার্ডেন, ঢাকা চিড়িয়াখানা।

শাহবাগে রয়েছে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর এবং সাভারে রয়েছে জাতীয় স্মৃতিসৌধ ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।



জাতীয় স্মৃতিসৌধ, সাভার, ঢাকা



আহসান মঞ্জিল, ঢাকা



লালবাগ দুর্গ, ঢাকা

চিত্র-৬.১৯: ঢাকা বিভাগের কয়েকটি পর্যটন স্থান

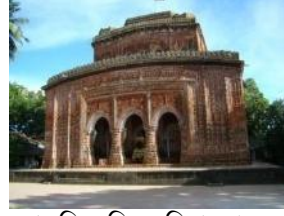
রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের পর্যটন স্থানসমূহ: রাজশাহী শহরের পদ্মা তীরে আছে বড়কুঠি ও বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর। বাংলাদেশ রেশম বোর্ড এর প্রতিষ্ঠিত সিল্ক ফ্যাক্টরি পর্যটকের জন্য আরেকটি আকর্ষণ। সালতানাত এর পুরাকীর্তির মধ্যে রয়েছে দরসবাড়ি মসজিদ (১৪৭০ খ্রি. তৈরি) ও মাদ্রাসা, ধুনিচক মসজিদ, ছোট সোনা মসজিদ (১৪৭০ খ্রি. তৈরি), খনিয়া দিঘি ও রাজবিবি মসজিদ। রাজশাহী শহর থেকে ১৮ মাইল দূরে পুঠিয়া নামক স্থানে মধ্যযুগীয় মন্দিরের মধ্যে গোবিন্দ মন্দির এবং শিবমন্দির অন্যতম। ১৮৯৫ খ্রিষ্টাব্দে রানী হেমন্তকুমারী দেবী কর্তৃক নির্মিত পুঠিয়া রাজপ্রাসাদ একটি ঐশ্বর্যমণ্ডিত ও দর্শনীয় স্থাপনা। নাটোর শহরের দীঘাপাতিয়া রাজবাড়ি (বর্তমানে উত্তরা গণভবন), নাটোরের রাজবাড়ি পর্যটকদের আকৃষ্ট করে। জয়পুরহাট জেলার পাহাড়পুরে রয়েছে হিমালয়ের দক্ষিণাঞ্চলের সর্ববৃহৎ মঠ। বগুড়া জেলায় রয়েছে নগর পুরাকীর্তি মহাস্থানগড়, বেহুলা লক্ষীন্দর এর বাসরঘর। নওগাঁ জেলায় রয়েছে বৌদ্ধ বিহার নামে পরিচিত সোমপুর বিহার, যা বাংলাদেশের একটি অন্যতম পুরাকীর্তি। দিনাজপুর শহরের নিকটে রয়েছে ১৭৫২ খ্রি. দিনাজপুরের মহরাজা প্রাণনাথ কর্তৃক নির্মিত কান্তজি- এর মন্দির। এটি পোড়ামাটি ও ইটের তৈরি বাঙালি শিল্পকর্মের একটি দর্শনীয় নিদর্শন। প্রতিটি দেওয়ালের ভিতরে ও বাইরে ডিজাইন করে সাজানো আছে গাছপালা, জীবজন্তু, জ্যামিতিক আকার ও মানবমূর্তি সম্বলিত অতি সুন্দর পোড়ামাটির ফলকরাজি।



সোমপুর বিহার, নওগাঁ



উত্তরা গণভবন, নাটোর



কান্তজি মন্দির, দিনাজপুর



মহাস্থানগড়, বগুড়া

চিত্র-৬.২০: রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের কয়েকটি পর্যটন স্থান

খুলনা বিভাগের পর্যটন স্থানসমূহ: সাধক খানজাহান আলী (রঃ) পঞ্চদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বাগেরহাটে বিভিন্ন মসজিদ নির্মাণ, দিঘি খনন করেন। শিল্পকার্যের বিশিষ্ট নিদর্শনস্বরূপ এখনও দাঁড়িয়ে আছে ষাটগম্বুজ মসজিদ যা বাংলাদেশের ইট দিয়ে তৈরি বৃহত্তম মসজিদ রূপে গণ্য। গ্রীষ্মমণ্ডলের সুন্দরী, গরান, গেওয়া, কেওড়া প্রভৃতি গাছে সমৃদ্ধ পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ম্যানগ্রোভ বনভূমি হচ্ছে সুন্দরবন। রয়েল বেঙ্গল টাইগার, অনেক জাতের হরিণ, কুমির ও বিভিন্ন বন্য পশুপাখির সমারোহ সুন্দরবনকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে। এখানের করমজল, নীলডুমুর, কটকা সৈকত, হিরণপয়েন্ট, দুবলার চর অন্যতম আকর্ষণীয় স্থান।



সুন্দরবন, খুলনা



ষাটগম্বুজ মসজিদ, বাগেরহাট

চিত্র-৬.২১: খুলনা বিভাগের কয়েকটি পর্যটন স্থান

বরিশাল বিভাগের পর্যটন স্থানসমূহ: পটুয়াখালী জেলায় রয়েছে কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকত, যেখানে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত উভয়ই দেখা যায়। এখানে রয়েছে রাখাইন পল্লী। বানারিপাড়া, চাখার, বরিশাল এ আছে শেরবাংলা এ কে ফজলুল হক এর বসতভিটা ও জাদুঘর। দক্ষিণাঞ্চলের সর্ববৃহৎ পুকুর ১৭৮০ খ্রি. খননকৃত মধ্যখানে দ্বীপসহ দুর্গাসাগর বরিশাল জেলার মাধবপাশায় অবস্থিত।



কুয়াকাটা সমুদ্রসৈকত, পটুয়াখালী



দুর্গাসাগর, মাধবপাশা, বরিশাল

চিত্র-৬.২২: বরিশাল বিভাগের কয়েকটি পর্যটন স্থান

সিলেট বিভাগের পর্যটন স্থানসমূহ: উত্তর-পূর্বদিকে রয়েছে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও উপজাতীয় সংস্কৃতির ধারক সিলেট শহর। শাহজালাল (রঃ), শাহ পরাণ ও অন্যান্য সাধক সন্ন্যাসীদের মাজার সম্মিলিত এ শহরে রয়েছে পাহাড়, নদী, ঝর্ণা, চা বাগান প্রভৃতি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। জাফলং সিলেট ও মেঘালয় রাজ্যের সীমানায় অবস্থিত, বিছানাকান্দি বর্তমানে পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয়। রাতালগুল পৃথিবীর একমাত্র মিঠা পানির জলমগ্ন বনভূমি, সিলেট জেলায় অবস্থিত। মাধবকুণ্ড জলপ্রপাত, মৌলভীবাজার জেলায় অবস্থিত। এখানে রয়েছে লাউয়াছড়া সংরক্ষিত বনভূমি এবং ন্যাশনাল পার্ক। এছাড়া রয়েছে অনেক চা বাগান।



রাতালগুল, সিলেট



মাধবকুণ্ড জলপ্রপাত, মৌলভীবাজার



বিছানাকান্দি, সিলেট

চিত্র-৬.২৩: সিলেট বিভাগের কয়েকটি পর্যটন স্থান

প্রযুক্তি (Technology)

ভূগোলের সাথে প্রযুক্তি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ভূগোলের সব ব্যবহারিক অঙ্কন প্রযুক্তির সাথে সম্পর্কিত যেমন, স্কেল, অভিক্ষেপ, মানচিত্র অঙ্কন, জরিপ কাজ ইত্যাদি। বিমান চিত্র (Aerial Photograph), জিপিএস (Global Positioning System), জিআইএস (Geographic Information System), এসপিএসএস (Statistical Package for the Social Science), রিমোট সেন্সিং (Remote Sensing) ইত্যাদি প্রযুক্তি বর্তমানে ব্যবহৃত হচ্ছে।

৬.৭ বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা

ভূপ্রাকৃতিক এবং পরিবেশগত দিক দিয়ে বাংলাদেশ একটি বৈচিত্রপূর্ণ দেশ। এর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে-

- উত্তর-পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্বের কিছু পাহাড়ী এলাকা, কিছু চত্বর বাদে ৮০% নদী-বিধৌত সাম্প্রতিককালের পলল সমভূমি এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর;
- উষ্ণ-আর্দ্র ক্রান্তীয় জলবায়ু;
- জনসংখ্যার আকার এবং ঘনত্বের দিক থেকে অধিক ঘনবসতিপূর্ণ (প্রতি বর্গ কি. মি.এ ১,০৯৫ জন);
- ১৭.৬% জনসংখ্যা দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাস করছে।
- প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভরশীল।

ভৌগোলিক অবস্থান ও জলবায়ুর কারণে প্রাকৃতিক দুর্যোগ এদেশের একটি পরিচিত দৃশ্যপট। ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, টর্নেডো, কালবৈশাখী, বন্যা, নদী-ভাঙ্গন, লবণাক্ততা, ভূমিধ্বস, প্রাকৃতিক ভূগর্ভস্থ পানি দূষণ, বজ্রপাত প্রভৃতি বাংলাদেশের প্রধান প্রাকৃতিক দুর্যোগ।

দুর্যোগ ও আপদ (Disaster and Hazard): দুর্যোগ হলো প্রকৃতি অথবা মানুষ সৃষ্ট এমন এক চরম পরিস্থিতি যা মানুষ ও তার পারিপার্শ্বিক জীবন, জীবিকা, সম্পদ বা শিল্পকে ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং স্বাভাবিক জীবনধারাকে বিপর্যস্ত করে এমন পর্যায়ে নিয়ে যায় যা ঐ ক্ষতিগ্রস্ত সমাজের পক্ষে এককভাবে মোকাবিলা করা কষ্টসাধ্য বা ক্ষেত্রবিশেষে অসম্ভব।

আপদ একটি অস্বাভাবিক ঘটনা, যা প্রাকৃতিক বা মানবসৃষ্ট কারণে হতে পারে এবং মানুষের জীবন ও জীবিকার ভয়াবহ ক্ষতিসাধন করতে পারে। আপদ দুর্যোগ নয়, বরং দুর্যোগের সম্ভাব্য কারণ। ভৌগোলিক ও অন্যান্য কারণে বাংলাদেশ বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, ভূমিকম্প, খরা, নদী ভাঙ্গন, সুনামি ইত্যাদি আপদের মধ্যে অবস্থান করছে।

এ আপদগুলো যখন প্রাণহানি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ ও অন্যান্য অবকাঠামো ধ্বংস করে জীবন ও জীবিকার অপূরণীয় ও মারাত্মক ক্ষতিসাধন করে এবং ঐ ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায়কে এ ক্ষতি মোকাবেলার জন্য বাইরের সাহায্যের প্রয়োজন হবে, তখনই সেগুলো দুর্যোগ। ব্যাপকভাবে ঘটলে ও ক্ষয়ক্ষতি হলে এ আপদগুলো দুর্যোগ বলে আনে।

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগ (Natural Disaster of Bangladesh)

বাংলাদেশ প্রতিবছর প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্মুখীন হয়। বাংলাদেশে যেসব প্রাকৃতিক দুর্যোগের সৃষ্টি হয় সেগুলো নিম্নরূপ।

ঘূর্ণিঝড় (Cyclone): ভৌগোলিক দিক থেকে বাংলাদেশ অর্ধ গ্রীষ্মমণ্ডলের অংশ, যার উত্তরে হিমালয় পর্বতমালা এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের প্রান্তে রয়েছে অনেকটা চোঙ আকৃতির উপকূলভাগ। বাংলাদেশে প্রায় প্রতি বছরই ঘূর্ণিঝড় হয়ে থাকে। এপ্রিল-মে এবং সেপ্টেম্বর-নভেম্বর মাসে বঙ্গোপসাগরে এ সব ঘূর্ণিঝড়ের সৃষ্টি হয় এবং উত্তর-পূর্বদিকে অগ্রসর হয়ে বাংলাদেশের উপকূলে আঘাত হানে। নিম্নের সারণিতে বাংলাদেশের উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ঝড়ের বর্ণনা দেওয়া হলো-
সারণি ৬.১৮: বাংলাদেশের উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ঝড়ের তথ্যাবলি

ক্রমিক নং	বছর	ঘূর্ণিঝড়ের ধরন	প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলি
১.	১৫৮৪ খ্রিষ্টাব্দ	বজ্র-বিদ্যুৎসহ হারিকেনের বৈশিষ্ট্য সম্বলিত ঘূর্ণিঝড়	বাকেরগঞ্জ এবং পটুয়াখালী জেলায় আঘাত হানে। এ ঝড় পাঁচ ঘণ্টা স্থায়ী ছিল। কেবল উঁচু স্থানে স্থাপিত মন্দিরগুলো ছাড়া সমস্ত ঘরবাড়ি নিমজ্জিত হয় এবং বহু নৌযান ডুবে যায়। মানুষ ও গৃহপালিত জীব মিলিয়ে প্রায় ২০,০০,০০০ প্রাণহানি ঘটে।
২.	১৭৯৭ খ্রিষ্টাব্দ	তীব্র ঘূর্ণিঝড়	চট্টগ্রাম অঞ্চলের উপর দিয়ে বয়ে যায়। সাধারণ ঘরবাড়ি মাটির সাথে মিশে যায় এবং চট্টগ্রাম বন্দরের দুটি জাহাজ নিমজ্জিত হয়।
৩.	১৮৭৬ খ্রিষ্টাব্দ	হারিকেনের বৈশিষ্ট্য সম্বলিত তীব্র ঘূর্ণিঝড় এবং জলোচ্ছ্বাস	মেঘনা মোহনা এবং চট্টগ্রাম, বরিশাল ও নোয়াখালী উপকূলে আঘাত হানে। বাতাসের সর্বোচ্চ গতি ছিল ২২০কি. মি./ঘণ্টা এবং জলোচ্ছ্বাসের উচ্চতা ছিল ১২.২ মিটার। জলোচ্ছ্বাসের ফলে সৃষ্ট ভয়াবহ বন্যায় প্রায় ২,০০,০০০ মানুষ মারা যায়। আরও অধিক মানুষ মারা যায় দুর্যোগ পরবর্তী মহামারী এবং দুর্ভিক্ষে।
৪.	১৮৯৭ খ্রিষ্টাব্দ	হারিকেনের তীব্রতাসম্পন্ন প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় এবং জলোচ্ছ্বাস	চট্টগ্রাম ও কুতুবদিয়া দ্বীপে আঘাত হানে। দুর্যোগে প্রাথমিকভাবে মৃত্যু হয় ১৪,০০০ মানুষের এবং পরবর্তী সময়ে মহামারীর (কলেরা) কারণে ১৮,০০০ জনের মৃত্যু হয়।
৫.	১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দ (৩০-৩১ অক্টোবর)	তীব্র ঘূর্ণিঝড় এবং জলোচ্ছ্বাস	চট্টগ্রাম, নোয়াখালী, বাকেরগঞ্জ, পটুয়াখালী এবং মেঘনা মোহনার পূর্বাঞ্চলে উপকূলে ২১০ কি. মি./ঘণ্টা বায়ুপ্রবাহ ও ৪.৬-৬.১ মিটার জলোচ্ছ্বাসসহ তীব্র ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানে। এতে ৫,৬৮,১৬১টি বাড়িঘর ধ্বংস হয়, বিশেষত হাতিয়া দ্বীপের ৭০% ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়ে যায় এবং ২৭,৭৯৩ টি গবাদি পশুর মারা যায়। ২ টি বৃহৎ সমুদ্রগামী জাহাজ তীরে আছড়ে পড়ে, কর্ণফুলি নদীতে ৫-৭টি জাহাজ নিমজ্জিত হয় এবং মোট প্রায় ১০,০০০ মানুষের মৃত্যু ঘটে।
৬.	নভেম্বর, ১৯৭০ খ্রিষ্টাব্দ	হারিকেনের তীব্রতাসম্পন্ন প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় এবং স্মরণকালের	চট্টগ্রাম, খেপুপাড়া, পটুয়াখালী, চর বোরহানউদ্দিন এর উত্তরাঞ্চল, চর তজিমুদ্দিন ও হরিণঘাটায় তীব্র আঘাত হানে। সরকারি হিসেবে ৫,০০,০০০ মানুষের মৃত্যু ঘটেছিল এবং ৩৮,০০০ সমুদ্রনির্ভর মৎসজীবী ও ৭৭,০০০ অভ্যন্তরীণ মৎসজীবী মারাত্মকভাবে

		সর্বাপেক্ষা বেশি জীবন, সম্পদ ও ফসলের ধ্বংস সাধন হয়।	ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মোট ২০,০০০ এর অধিক মাছ ধরার নৌকা ধ্বংস হয়। সম্পদ ও ফসলের ক্ষতির পরিমাণ বিশাল। দশ লক্ষেরও অধিক গবাদিপশুর মৃত্যু হয়; ৪,০০,০০০ ঘরবাড়ি এবং ৩,৫০০ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভয়ানকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বাতাসের সর্বোচ্চ গতিবেগ ছিল প্রায় ২২২ কি. মি./ঘণ্টা এবং জলোচ্ছ্বাসের উচ্চতা ছিল প্রায় ১০.৬ মিটার।
৭.	১৯৯১ খ্রিষ্টাব্দ (২৯ এপ্রিল)	তীব্র ঘূর্ণিঝড় এবং জলোচ্ছ্বাস (আকারের দিক থেকে এর বিস্তার ছিল ৬০০ কি. মি.)	ঝড়টির উৎপত্তি হয় প্রশান্ত মহাসাগরে, বাংলাদেশের ভূখণ্ড থেকে ৬,০০০ কি. মি. দূরে। বাংলাদেশের উপকূলে পৌঁছাতে ঝড়টির সময় লেগেছিল ২০ দিন। বাতাসের সর্বোচ্চ গতিবেগ ছিল প্রায় ২২৫ কি. মি./ঘণ্টা। নোয়া-১১ উপগ্রহের তোলা চিত্র অনুযায়ী ঘূর্ণিঝড়টির বাতাসের প্রাক্কলিত সর্বোচ্চ গতিবেগ ছিল ২৪০ কি. মি./ঘণ্টা। চট্টগ্রাম বন্দরের উত্তর দিয়ে বাংলাদেশের উপকূল (যেমন নিরুমা দ্বীপ, এপুরা, ভোলা, সন্দ্বীপ) অতিক্রম করে। জলোচ্ছ্বাসের প্রাক্কলিত উচ্চতা ছিল ৫-৮ মিটার। সম্পদের প্রাক্কলিত আর্থিক ক্ষতির ৬,০০০ কোটি টাকা। মোট ১,৫০,০০০ মানুষের মৃত্যু হয়েছিল, গবাদিপশু মারা যায় ৭০,০০০।
৮.	২০০৭ খ্রিষ্টাব্দ (১৫-১৭ নভেম্বর)	ঘূর্ণিঝড় সিডর	বাতাসের সর্বোচ্চ গতিবেগ ছিল ২৬০ কি. মি./ঘণ্টা। দক্ষিণাঞ্চলে ভূমিধ্বসের মাধ্যমে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি সাধন করে যাতে প্রায় ৩,৫০০ জনের বেশি মানুষের প্রাণহানি ঘটে।
৯.	২০০৯ খ্রিষ্টাব্দ (২৭-২৯ মে)	ঘূর্ণিঝড় আইলা	বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে ১৫টি জেলায় আঘাত হানে যাতে প্রায় দেড় শতাধিক মানুষের ঘরবাড়ি এবং তিন লক্ষাধিক একর আবাদি জমি ও ফসলের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়।

উৎস: বাংলাপিডিয়া, Wikipedia

বন্যা (Flood)

বন্যা বাংলাদেশের একটি নিয়মিত চিত্র। পৃথিবীর তিনটি বৃহত্তম নদী- গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, মেঘনার বদ্বীপ এলাকায় বাংলাদেশের অধিকাংশ এলাকা অবস্থিত। বন্যার সময়, এ নদীগুলো থেকে সম্মিলিতভাবে ১৮০,০০০ মি./সে. পানি এবং প্রায় দুই বিলিয়ন টন পলল নিঃসরণ হয়। এদেশের অধিকাংশ ভূপ্রকৃতি সমতল ও নিম্নভূমি এবং দুই-তৃতীয়াংশ এলাকা সমুদ্রসমতল থেকে ৫ মি. এর কম উঁচু (BCCSAP)। সেকারণে বর্ষাকালে, জোয়ারের এবং জলোচ্ছ্বাসের সময় খুব সহজে প্লাবিত হয়। বাংলাদেশে চার ধরনের বন্যা দেখা যায়-

- উত্তর এবং পূর্বাংশের পাহাড়ীয়া ঢলে এপ্রিল-মে এবং সেপ্টেম্বর-নভেম্বর আকস্মিক বন্যা (Flash Flood) দেখা দেয়;
- ভারী বর্ষণ এবং জলাবদ্ধতার কারণে বর্ষাকালীন বন্যা (Rain Flood) দেখা দেয়;
- জুন-সেপ্টেম্বর মাসে প্রধান নদীগুলোর পলল সমভূমিতে মৌসুমী বন্যা (Monsoon Flood) দেখা দেয়;
- জলোচ্ছ্বাসের সময় উপকূলীয় এলাকা প্লাবিত হয়। (Source: NAPA)

বাংলাদেশে বন্যার ক্ষয়ক্ষতি ব্যাপক। নিম্নের সারণিতে প্রধান বন্যাসমূহ এবং এর প্রভাবসমূহ দেখানো হলো-

সারণি ৬.১৯: প্রধান বন্যাসমূহ এবং এর প্রভাবসমূহ

বন্যার সময়	বন্যার প্রভাবসমূহ
১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দ	দেশের ৫৫% এলাকা প্লাবিত হয়
১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দ	দেশের ৫৮% এলাকা প্লাবিত হয় এবং এর ফলে ২০০০ জনের বেশি মৃত্যু হয়। এর কারণে দুর্ভিক্ষের ফলে ৩০,০০০ জনের বেশি লোকের মৃত্যু হয়।
১৯৮৪ খ্রিষ্টাব্দ	৫২,৫২০ বর্গ কি. মি. এলাকা প্লাবিত হয় এবং ৩৭৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমপরিমাণ সম্পদ ক্ষতি হয়।
১৯৮৭ খ্রিষ্টাব্দ	৫০,০০০ বর্গ কি. মি. এলাকা প্লাবিত হয় এবং ১.০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমপরিমাণ সম্পদ ক্ষতি হয় এবং মৃত্যুর সংখ্যা ২,০৫৫ জন।
১৯৮৮ খ্রিষ্টাব্দ	দেশের ৬১% এলাকা প্লাবিত হয়, ১.২ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমপরিমাণ সম্পদের ক্ষতি হয়, ৪৫ মিলিয়নের বেশি মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়ে এবং মৃত্যুর সংখ্যা ২,০০০-৬,৫০০ জন।
১৯৯৮ খ্রিষ্টাব্দ	দেশের ১০০,০০০ বর্গকি. মি. এলাকা প্লাবিত হয়, ৩০ মিলিয়নের বেশি মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়ে, ৫০০,০০০ ঘরবাড়ি বিধ্বস্ত হয় এবং মৃত্যুর সংখ্যা ১,১০০ জন। এতে ক্ষতির পরিমাণ ২.৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।
২০০৪ খ্রিষ্টাব্দ	দেশের ৩৮% এলাকা প্লাবিত হয়, ৬.৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমপরিমাণ সম্পদের ক্ষতি হয়, ৩.৮ মিলিয়ন মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং মৃত্যুর সংখ্যা ৭০০ জন।
২০০৭ খ্রিষ্টাব্দ	দেশের ৩২,০০০ বর্গ কি. মি. এলাকা প্লাবিত হয়, ৮৫,০০০ ঘরবাড়ি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়, প্রায় ১.২ মিলিয়ন একর জমির ফসল নষ্ট হয়ে যায়, এতে ক্ষতির পরিমাণ ১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং মৃত্যুর সংখ্যা ৬৪৯ জন।

উৎস: BCCSAP, NAPA

খরা (Drought)

ফসল জন্মানোর স্বাভাবিক সময়ে শস্য উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় আর্দ্রতার চাইতে জমিতে কম আর্দ্রতা থাকলে সে সময়কে বাংলাদেশে ক্ষরা অবস্থা বলা হয়। বাংলাদেশে খরা ঋতুকালীন এবং এতে ফসলের ক্ষতি হতে পারে, এতে দরিদ্র কৃষকের সেই সময় কাজ থাকে না, সাময়িক দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি করে। বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের জেলাসমূহে খরার প্রকোপ দেখা যায়।

১৯৫১, ১৯৫৭, ১৯৫৮, ১৯৬১, ১৯৬৬, ১৯৭২ এবং ১৯৭৯ খ্রিষ্টাব্দে যথাক্রমে ৩১.৬৩, ৪৬.৫৪, ৩৭.৪৭, ২২.৩৯, ১৮.৪২, ৪২.৮৮, ৪২.০৪ শতাংশ অঞ্চল খরা আক্রান্ত ছিল। ১৯৯৪-৯৫ খ্রিষ্টাব্দের খরা এবং পরবর্তীতে ১৯৯৫-৯৬ খ্রিষ্টাব্দের খরা খাদ্যশস্যের বিশেষ করে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের প্রধান কৃষিফসল ধান ও পাট মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। খরার প্রকোপে শাকসবজি, তামাক, কলা, অন্যান্য শস্যের ফলন দারুণভাবে ব্যাহত হয়। পরিমাণমত ও সীমিত সেচের মাধ্যমে ফসলহানি কিছুটা কমানো যায়।

ভূমিকম্প (Earthquake)

বাংলাদেশ ভূমিকম্পের জন্য অত্যন্ত সংবেদনশীল হলেও এ কম্পনের প্রকৃতিও মাত্রা সম্পর্কে ধ্যান-ধারণা খুবই অপ্রতুল। আবহাওয়া দপ্তর ১৯৫৪ খ্রিষ্টাব্দে চট্টগ্রামে একটি ভূকম্পন মানমন্দির প্রতিষ্ঠা করে। আজও সেটিই দেশের একমাত্র মানমন্দির। ভূগাঠনিক কার্য-কারণের ভিত্তিতে বাংলাদেশে ভূকম্পন মূল্যায়নে ভূমিকম্প সম্পর্কিত ঐতিহাসিক তথ্যের প্রেক্ষাপট খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের ভিতরে ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহের বিগত ২৫০ বছরের ভূকম্পনের ইতিহাস পাওয়া যায়। ভূকম্পনের মাত্রার ভিত্তিতে বাংলাদেশকে তিনটি ভূকম্পন অঞ্চলে চিহ্নিত করা হয়েছে।

অঞ্চল ১: সিলেট, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার, সুনামগঞ্জ, নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ, শেরপুর, জামালপুর, নীলফামারী, লালমনিরহাট, রংপুর, কুড়িগ্রাম ও গাইবান্ধা জেলা অঞ্চল ১ এর অন্তর্ভুক্ত। এটি বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি মাত্রার ভূমিকম্প অঞ্চল।

অঞ্চল ২: পঞ্চগড়, ঠাকুরকাটা, দিনাজপুর, জয়পুরহাট, বগুড়া, টাঙ্গাইল, মানিকগঞ্জ, গাজীপুর, নরসিংদী, ঢাকা, মুন্সীগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কুমিল্লা, চাঁদপুর, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি, বান্দরবন জেলা অঞ্চল ২ এর অন্তর্ভুক্ত।

অঞ্চল ৩: দেশের দক্ষিণাঞ্চল অর্থাৎ অঞ্চল ১ ও অঞ্চল ২ এর অন্তর্ভুক্ত জেলা ছাড়া বাকি জেলাগুলো অঞ্চল ৩ এর অন্তর্ভুক্ত।



চিত্র-৬.২৪: বাংলাদেশের দুর্যোগপ্রবণ অঞ্চল



চিত্র-৬.২৫: বাংলাদেশের ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চল

আর্সেনিক (Arsenic)

আর্সেনিক দূষণ একটি Global Problem. তাইওয়ানে প্রথম শনাক্তকরণের পর থেকে পৃথিবীর সকল মহাদেশের ৫০ টির মতো দেশে ভূগর্ভস্থ বা ভূউপরিস্থ পানিতে উচ্চমাত্রার আর্সেনিক শনাক্ত করা হয়েছে। বাংলাদেশের জনস্বাস্থ্য ও প্রকৌশল অধিদপ্তর ১৯৯৩ খ্রিষ্টাব্দে চাঁপাই নবাবগঞ্জ উপজেলার বড়ঘরিয়া মৌজায় কয়েকটি কূপে পরীক্ষা চালিয়ে সর্বপ্রথম ভূগর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিকের উপস্থিতি লক্ষ্য করে। বাংলাদেশের নলকূপগুলোতে আর্সেনিকের মাত্রা এবং সহনসীমা অতিক্রমকারী (বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা-এর মতে, পানিতে নির্ধারিত মান অনুযায়ী ০.০১ পিপিএম আর্সেনিকের মাত্রা গ্রহণযোগ্য। তবে যখন কোন এলাকার পানিতে ০.০১ পিপিএম এর চেয়ে বেশি পরিমাণ আর্সেনিক থাকে তখন সেই এলাকার পানিকে আর্সেনিক দূষণযুক্ত বলে। নলকূপের বণ্টন বিন্যাস বিভিন্ন রকম। বাংলাদেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে আর্সেনিক দূষণের মাত্রা বেশি এবং উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে এ দূষণের মাত্রা কম। সর্বোচ্চ দূষণযুক্ত জেলাগুলো হচ্ছে চাঁদপুর (৯০%), মুন্সিগঞ্জ (৮৩%), গোপালগঞ্জ (৭৯%), মাদারীপুর (৬৯%), নোয়াখালী (৬৯%), সাতক্ষীরা (৬৭%), কুমিল্লা (৬৫%), ফরিদপুর (৬৫%), শরিয়তপুর (৬৫%), মেহেরপুর (৬০%) ও বাগেরহাট (৬০%)।

লবণাক্ততা (Salinity)

উজান থেকে নদীর পানির প্রবাহ কমে যাওয়া এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সামুদ্রিক লোনা পানি দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশের ফলে উপকূলীয় নদ-নদীর লবণাক্ততা ক্রমশ বাড়ছে। বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকার ভূমি ও পানিতে লবণাক্ততার পরিমাণ বেশি। সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায় ভূমির লবণাক্ততার কারণে ফসল উৎপাদন করা সম্ভব হয় না। এছাড়া মৎস সম্পদের ক্ষতি হবে। সমুদ্রের পানি জোয়ারের সময় নদীর মাধ্যমে উপকূলীয় এলাকায় প্রবেশ করে ভূমিতে লবণাক্ততা সৃষ্টি করে। আগস্ট মাস থেকে ভূমির লবণাক্ততা বৃদ্ধি শুরু হয়। ডিসেম্বর থেকে এপ্রিল মাস পর্যন্ত ভূমির লবণাক্ততা সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছায়।

নদী ভাঙ্গন (Riverbank Erosion)

নদী ভাঙ্গন একটি প্রাকৃতিক ঘটনা। সাধারণ অর্থে নদী ভাঙ্গন বলতে নদীর পানি প্রবাহের ফলে নদীর তীর বা পাড়ের ভাঙ্গনকে বোঝায়। সাধারণভাবে বর্ষা মৌসুমে নদীতে অতিরিক্ত পানি প্রবাহের ফলে নদী ভাঙ্গনের সৃষ্টি হয়। এছাড়া নদীর আঁকাবাঁকা গতিপথ, নদীর তীর শ্রোত ও ঢেউ, পলি সঞ্চয়ন, নদীকূলের মাটির কোমলতা, গাছপালাহীন নদীর কূল, প্রাকৃতিক দুর্ঘোণ (যেমন- বন্যা, ভূমিকম্প বা ভূনিম্নস্থ আলোড়ন প্রভৃতি) এর ফলে নদী ভাঙ্গনের সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশে এটি একটি অন্যতম প্রাকৃতিক দুর্ঘোণ। প্রাকৃতিক ও মানুষ্য সৃষ্ট উভয় কারণই বাংলাদেশে নদী ভাঙ্গনের জন্য দায়ী। এর ফলে ঘর-বাড়ি, রাস্তা-ঘাট, কৃষি ভূমি প্রভৃতি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায়। সবকিছু হারিয়ে মানুষ হয়ে পড়ে নিঃস্ব। এর ফলে সম্পদহানি, উদ্বাস্তু সৃষ্টি, দারিদ্র্য বৃদ্ধি, উৎপাদন হ্রাস, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, সামাজিক বন্ধনে ভাঙন সৃষ্টি, অপরাধ বৃদ্ধি, শহরে জনসংখ্যার চাপ বৃদ্ধি, রোগ-ব্যধির বিস্তার ঘটে।

ভূমিধস (Land Slide)

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের পার্বত্য এলাকায় একটি সাধারণ ঘটনা, বিশেষত বান্দরবন এবং রাঙামাটি জেলায়। প্রতি বৎসর বিশেষত বর্ষা মৌসুমে প্রাকৃতিক এবং মানবসৃষ্ট উভয় কারণে ভূমিধসের ঘটনা ঘটে। খাড়া পাহাড়ি ঢালে রুম চাষ এবং অন্যান্য চাষাবাদ পদ্ধতির প্রভাব, অপরিবর্তিতভাবে পাহাড় কাটা এবং পাহাড়ের উপর ঘরবাড়ি নির্মাণ, পাহাড়ের ঢালে বসতি গড়ে ওঠা ভূমিধসের ঘটনাকে ত্বরান্বিত করে। পাহাড়ি এলাকার সাথে দেশের অন্যান্য অংশের সাথে সংযোগরক্ষাকারী সড়কসমূহ প্রায় প্রতি বৎসরই ভূমিধসের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং শহরের সাথে সংলগ্ন এলাকার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়, ভৌতকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হয়, অনেক মানুষের প্রাণহানি ঘটে। এর মধ্যে ১৯৬৮, ১৯৭০, ১৯৯০, ১৯৯৭, ১৯৯৯, ২০০০, ২০০৭, ২০০৮, ২০১০, ২০১১, ২০১২, ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দের ভূমিধস উল্লেখযোগ্য।

টর্নেডো (Tornado)

বাংলাদেশে প্রাকবর্ষা উষ্ণ মৌসুমে আকস্মিকভাবে ঘটে, বিশেষত এপ্রিল মাসে যখন তাপমাত্রা সর্বোচ্চ পর্যায়ে থাকে। টর্নেডো খুব স্বল্পকালীন দুর্ঘোণ যা সাধারণত ১০-২০ মিনিট স্থায়ী হয়, এবং এর অতিক্রান্ত এলাকার দৈর্ঘ্য ১০-১৫ কি. মি.-র মতো হতে পারে যদিও আকারে এটি ক্ষুদ্র কিন্তু যখন আঘাত হানে তখন ঐ অঞ্চল সম্পূর্ণই ধ্বংস করে। সাধারণত টর্নেডোর সাথে সংঘটিত হয় বজ্র, বিদ্যুৎ, প্রচুর বৃষ্টি এবং হাতির ঝুঁড়ের মত প্রচণ্ড ভয়ংকর শব্দ। বাতাসের ঘূর্ণনের বেগমাত্রা ৩০০-৪৮০ কি. মি./ঘণ্টা এবং টর্নেডোর কেন্দ্রে আপড্রাফট ৩২০ কি. মি./ঘণ্টা এ পৌঁছাতে পারে। অন্যান্য অঞ্চলসমূহের চেয়ে বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় অঞ্চলে টর্নেডো অধিক সংঘটিত হয়। মারাত্মক টর্নেডোসমূহের অধিকাংশই রেকর্ড করা হয়েছে ফরিদপুর, রাজবাড়ি, গোপালগঞ্জ, পাবনা, গাজীপুর, টাঙ্গাইল এবং ঢাকা জেলার অঞ্চলসমূহে।

দুর্ঘোণ ব্যবস্থাপনা (Disaster Management)

দুর্ঘোণ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে ঝুঁকি, বিপদাপন্নতা ও সক্ষমতা সম্পর্কে জানা প্রয়োজন।

ঝুঁকি (Risk): আপদ, বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠী এবং পরিবেশ- এ তিন উপাদানের নেতিবাচক সংমিশ্রণের ফলে সৃষ্ট ক্ষতিকর প্রভাবের আশঙ্কাই হলো ঝুঁকি।

ঝুঁকি = $\frac{\text{বিপদাপন্নতা} \times \text{আপদ}}{\text{সক্ষমতা}}$

সক্ষমতা

বিপদাপন্নতা বা নাজুকতা (Vulnerability): হলো কোন ব্যক্তি, পরিবার বা জনগোষ্ঠীর এক বা একাধিক সুনির্দিষ্ট আপদে আক্রান্ত হওয়ার আশংকা এবং ঐ আপদ সংঘটনের ফলে জনগোষ্ঠীর ও ব্যক্তির জীবন যাপনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাব্য মাত্রা।

সারণি ৬.২০: বাংলাদেশের বিপদাপন্নতার (Vulnerability) চিত্র

আপদসমূহ (Hazards)	বন্যা (Flood)	আকস্মিক বন্যা (Flash Flood)	ক্ষরা (Drought)	ঘূর্ণিঝড় (Cyclone), লবণাক্ততা (salinity)
বিপদাপন্ন ভূমি % (Vulnerable land area)	৬১.০৯	২৩.০৯	৪৫.৮৯	৩১.৯৯
বিপদাপন্ন জনসংখ্যা % (Vulnerable Population)	৭১.৪৭	২৬.৭৫	৪৫.৭৩	২৬.৭১

উৎস: Population and Housing census 2011

সক্ষমতা (Capacity): কার্যকরভাবে কোন দুর্যোগ মোকাবেলার ক্ষমতাকেই সক্ষমতা বলে। সক্ষমতা হচ্ছে আগাম প্রস্তুতি অথবা পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণ করার মতো জ্ঞান বা দক্ষতা তৈরি করা।

দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসকরণ (Disaster Risk Reduction)

দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসকরণ একটি ধারণা বা কৌশল। যে ধারণার আলোকে দুর্যোগে বিপদাপন্ন এলাকার আপদ, বিপদাপন্নতা ও ঝুঁকি নিরূপণ করা হয় এবং এসব ঝুঁকি নিরসনের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণপূর্বক বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নেয়া হয়। এসব ধারণাকেই দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসকরণ বলে। আপদকালীন সময়ে সাড়া দেয়াসহ সম্ভাব্য ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, ঝুঁকির পরিবেশ সম্পর্কে জানা ও ঝুঁকিকে ব্যবস্থাপনা করার জন্য যে পদক্ষেপ নেয়া হয় তাই হচ্ছে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা। দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস এবং দুর্যোগ-পরবর্তী জরুরি সাড়াদানের নিমিত্তে পদ্ধতিগত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও কার্যক্রম, যার মাধ্যমে দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ হলো দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা একটি চলমান প্রক্রিয়া, যা ধারাবাহিক পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে দুর্যোগের প্রতিরোধ, প্রশমন, প্রস্তুতি, ত্রাণ ও পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার সুষ্ঠু প্রয়োগ ও এর উন্নতি সাধনের প্রয়াস দেয়।



চিত্র-৬.২৬: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা চক্র

প্রতিরোধ (Prevention)

সাধারণ অর্থে প্রতিরোধ হচ্ছে কোন একটি পরিস্থিতিতে বা ঘটনাকে ঠেকিয়ে রাখা বা ঘটতে না দেবার ব্যবস্থা গ্রহণ করা। অথবা কার্যকরভাবে সম্ভাব্য কোন দুর্যোগকে প্রতিহত করা বা ঘটতে না দেয়া অথবা ঐ দুর্যোগের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীকে মুক্ত করা। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, বন্যা থেকে রক্ষার জন্য বাঁধ দেওয়া, প্রতিষেধক দেয়ার ফলে বিভিন্ন রোগ নির্মূল হয়ে যাওয়া ইত্যাদি।

প্রশমন (Mitigation): যে কোনো দুর্যোগের সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি কমানো বা দুর্যোগ থেকে জীবন ও সম্পদ রক্ষার জন্য গৃহীত পদক্ষেপসমূহকে দুর্যোগ প্রশমন বলা হয়।

ক. কাঠামোগত ব্যবস্থা (Structural Measures): সাইক্লোন আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ, বেড়িবাঁধ তৈরি ইত্যাদি।

খ. অ-কাঠামোগত ব্যবস্থা (Nonstructural Measures): বিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রমে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অর্ন্তভুক্ত করে সচেতনতা সৃষ্টি করা, মোবাইল বা টিভি বা রেডিও বা হ্যান্ডমাইক এর মাধ্যমে দুর্যোগ সম্পর্কে প্রচার করা।



চিত্র-৬.২৭: হ্যান্ড মাইক এর মাধ্যমে সতর্কীকরণ (উৎস:ক্লডিয়া জ্যাংক, ব্রিটিশ রেডক্রস)

প্রস্তুতি (Preparedness): কোনো দুর্যোগে আক্রান্ত জনগোষ্ঠীকে তাৎক্ষণিকভাবে তাদের অসুবিধাসমূহ দূর করা এবং মৌলিক চাহিদা পূরণের প্রচেষ্টা বা দুর্যোগে আক্রান্ত মানুষের জীবন রক্ষার প্রচেষ্টা। অতীতের দুর্যোগের ঘটনার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ভবিষ্যতে অনুরূপ একটি ঘটনাকে অনুমান করে আগে থেকে দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য যথাযথ এবং কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করাই হলো দুর্যোগ প্রস্তুতি। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলে এমন প্রস্তুতি গ্রহণ করবেন যাতে করে শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত না হয়। সাইক্লোন সংকেত প্রচার করা বা পতাকা প্রদর্শন, এর অর্থ বোঝা এবং সে অনুযায়ী প্রস্তুতি গ্রহণ করা; স্বেচ্ছাসেবক দল প্রস্তুত থাকা। গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সংরক্ষণ ও যথাযথ ব্যবস্থা করা।

সাড়া প্রদান (Response): সাড়া প্রদান কাজটি দুর্যোগ পরবর্তী খুব দ্রুত শুরু করা হয়ে থাকে যার মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে দুর্যোগে আক্রান্ত মানুষের জীবন ও সম্পদ রক্ষা করা। ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার সময়ে তা বিবেচনায় নিয়ে জরুরি অবস্থা মোকাবেলার কার্যকর প্রস্তুতি থাকা এবং দুর্যোগে আক্রান্ত জনগোষ্ঠীকে জরুরি পরিস্থিতিতে কার্যকর সহায়তা দেয়ার জন্য যথাযথ কার্যক্রম গ্রহণ করাই হলো দুর্যোগে জরুরি সাড়া।

জরুরি ব্যবস্থাপনায় সাড়ার মূল কাজ হলো আপদ আসন্নকালীন বা আপদ পরবর্তী সময়ে তাৎক্ষণিকভাবে মানুষের জীবনের ঝুঁকি ও সম্পদের ঝুঁকি কমানো।

দুর্যোগের সময় বা তার ঠিক পর মুহূর্তে দুর্গত জনগোষ্ঠীর জীবন রক্ষা এবং জীবন নির্বাহ করার জন্য তাৎক্ষণিকভাবে গৃহীত ত্রাণ কর্মকাণ্ডের উদ্যোগকে জরুরি সাড়া বলে। যেমন-

- স্থানান্তর করা;
- অনুসন্ধান ও উদ্ধার করা, অনুসন্ধান ও উদ্ধার প্রক্রিয়াটি Search and Rescue (SAR) হিসেবে পরিচিত;
- চাহিদা ও ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ;
- জরুরি ত্রাণ কার্যক্রম: খাদ্য, পানি ও আশ্রয় প্রদান;
- জরুরি চিকিৎসা সহায়তা;
- জরুরি পুনর্বাসন;
- অনুসন্ধান ও উদ্ধার প্রক্রিয়ায় প্রথমে দুর্যোগে আটকে পড়া ও হারিয়ে যাওয়া মানুষদের চিহ্নিত করে এবং উদ্ধার করে।

পুনরুদ্ধার (Recovery): “দুর্যোগ আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর দুর্যোগ ঝুঁকির নিয়ামকসমূহ হ্রাস করার প্রচেষ্টাসহ জীবনযাত্রার সুযোগ-সুবিধা, জীবন-জীবিকা ও জীবনধারণের অবস্থা পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনা এবং সম্ভাব্য ক্ষেত্রে উন্নত করা। পুনরুদ্ধার পর্যায়ে সাধারণত জরুরি অবস্থা শেষ হওয়ার পরপরই শুরু হয় এবং এটি সুস্পষ্ট দায়িত্ব, নীতিমালা ও কর্মকৌশল নির্ধারণের লক্ষ্যে পূর্ব পরিকল্পিত হয়ে থাকে (উৎস: UNISDR, ২০০৯)। তবে ঠিক কোন অবস্থায় সাড়া প্রদান শেষ হয় এবং পুনরুদ্ধার শুরু হয় তার কোন সুনির্দিষ্ট সীমারেখা সব সময় থাকে না। উদাহরণস্বরূপ, আপাতত স্বল্পমেয়াদী বা অস্থায়ী ভিত্তিতে বাসস্থান ও পানি সরবরাহের ক্ষেত্রে সাড়া প্রদান ও পুনরুদ্ধার যুগপৎভাবে ঘটতে পারে এবং যার ফলে নেতৃত্ব ও দায়িত্ব বন্টনের অস্পষ্টতাজনিত ও লজিস্টিক সংক্রান্ত সমস্যা দেখা দিতে পারে।

পুনর্বাসন (Rehabilitation): পুনর্বাসন হলো একটি জনগোষ্ঠীর সামাজিক এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত অত্যাবশ্যকীয় সেবাসমূহের দ্রুত স্বাভাবিক এবং প্রতিস্থাপনের প্রাথমিক প্রচেষ্টা। দুর্যোগ ঘটার পরে যে কার্যক্রম নেয়া হয় তাকে পুনর্বাসন বলে। এ পর্যায়ে এমন কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়, যাতে আক্রান্ত জনগণ পুনরায় স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারে। দুর্যোগে জরুরি ব্যবস্থাপনা একটি বড় কাজ। ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার সময়ে কাজের পরিকল্পনার ওপর জরুরি ব্যবস্থাপনার সাফল্য নির্ভর করে। জরুরি অবস্থার পর প্রচুর কাজেরও প্রয়োজন হয়, যা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাকে ঘিরে আবর্তিত হয়। কার্যকর জরুরি ব্যবস্থাপনার জন্য গণমাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। যারা গণমাধ্যমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তাদের প্রশিক্ষিত হওয়া প্রয়োজন, যাতে তারা সঠিক ও কার্যকর তথ্য/প্রতিবেদন সঠিক সময়ে ও কার্যকরভাবে সরবরাহ করতে পারে।

বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সরকারি ও বেসরকারি প্রয়াস

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা একটি বিশেষ ধরনের ব্যবস্থাপনা যার মধ্যে দুর্যোগের প্রতি পর্যায়ে নীতি নির্ধারণ, প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত এবং বাস্তব পদক্ষেপ থাকবে (Disaster Management is the unit of policy and administrative decisions associated with operational activities which pertain to the various stages of Disaster at all levels)। বাংলাদেশ সরকারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় প্রধানত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত। UNDP, UNICEF প্রভৃতি আন্তর্জাতিক ও বিদেশি সংস্থাসমূহ এবং CPP, BRAC, CARITAS, OXFAM, CCDB, BDPC, PACT/PRIP Disaster Forum ইত্যাদি বেসরকারি সংস্থাসমূহ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত রয়েছে। সরকারি সংস্থাসমূহের মধ্যে আবহাওয়া অধিদপ্তর, স্পারসো ও পানি উন্নয়ন বোর্ড দুর্যোগ সতর্কীকরণ বিষয়ে বিশেষভাবে নিয়োজিত। উপকূলীয় অঞ্চলে বাঁধ নির্মাণ ঘূর্ণিঝড়প্রবণ এলাকাসমূহে আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ ইত্যাদি সরকারি ও বেসরকারি প্রচেষ্টায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো নামক সংস্থাটি বাংলাদেশ সরকারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন একটি সরকারি প্রতিষ্ঠান যার কার্যাবলি হচ্ছে-

- (ক) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন;
- (খ) দুর্যোগ প্রশমন সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিশ্লেষণ;
- (গ) একটি জরুরি অপারেশন সেন্টার (EOC) পরিচালনা;
- (ঘ) সকল পর্যায়ে দুর্যোগ প্রস্তুতি ও প্রশমনের উদ্যোগ গ্রহণ;
- (ঙ) ইউনিয়ন, থানা ও জেলা পর্যায়ে প্রশমন পরিকল্পনা প্রণয়নকে সহায়তা করা;
- (চ) বিভিন্ন মন্ত্রণালয় অধিদপ্তর সংস্থাসমূহকে আপদকালীন পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা দান;
- (ছ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত উপকরণসমূহ সংগঠিতকরণ।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকাঠামো

বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার আইনগত দিক আদেশাবলি ও পরিচালনা পর্ষদ, নীতি ও নীতি নির্দেশিকা ইত্যাদি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকাঠামোর অন্তর্গত। দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস এবং জরুরি ব্যবস্থাপনা সঠিকভাবে পরিচালিত ও বাস্তবায়িত করার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকাঠামো গঠন করা হয়েছে। এ পরিকাঠামোর অন্তর্ভুক্ত হলো-

১. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন ২০১২
২. জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ২০১৪
৩. জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ২০১০-২০১৫
৪. দুর্যোগ বিষয়ে স্থায়ী আদেশাবলী (এস ও ডি) ১৯৯৭ (সংশোধিত ২০১০)।

প্রশ্নমালা

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. অর্থনৈতিক কার্যাবলি কী?
২. বাংলাদেশের পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চলের মধ্যে বৃষ্টিপাতের তারতম্যের কারণ কী?
৩. বৈদেশিক বাণিজ্যে হিমায়িত খাদ্য রপ্তানির সুবিধাজনক পথ কোনটি এবং কেন?
৪. বাংলাদেশের জনসংখ্যার বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করুন।
৫. কুটির শিল্প বলতে কী বুঝায়? বাংলাদেশে কী কী কুটির শিল্প চালু রয়েছে?
৬. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ধাপগুলো লিখুন।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের কৃষির প্রধান ৪টি সমস্যা উল্লেখ করে সমাধানের উপায়গুলো বর্ণনা করুন।
২. বাংলাদেশে পাট শিল্প গড়ে ওঠার কারণ ব্যাখ্যা করুন।
৩. অর্থনৈতিক উন্নয়নে খনিজ সম্পদের ভূমিকা আলোচনা করুন।
৪. বাংলাদেশের অর্থনীতিতে মৌসুমি বায়ুর গুরুত্ব বর্ণনা করুন।
৫. নিজ এলাকার যে কোন একটি দুর্যোগ উল্লেখ করে দুর্যোগ মোকাবেলার উপায়গুলো উল্লেখ করুন।

ইউনিট ৭ : মাধ্যমিক স্তরের ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ের মূল্যায়ন

শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতি যাচাই করার জন্য বিভিন্ন হাতিয়ার বা কৌশল ব্যবহার করা হয়। শিখন যাচাইয়ের এ হাতিয়ারসমূহ কী হবে তা দেশের শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত শীর্ষ সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান নির্ধারণ করে। বাংলাদেশে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড বা এসিটিবি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের শিখন অগ্রগতি যাচাইয়ের মানদণ্ড নির্ধারণের প্রাতিষ্ঠানিক দায়িত্ব পালন করে থাকে। অন্যদিকে প্রাথমিক পর্যায়ে ন্যাশনাল একাডেমি ফর প্রাইমারি এডুকেশন বা নেপ ও মাধ্যমিক পর্যায়ে বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ড এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ এসিটিবি নির্ধারিত মানদণ্ডের ভিত্তিতে বিভিন্ন পরীক্ষা ও ধারাবাহিক মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শিখন অগ্রগতি যাচাই করে। এ ইউনিটে বাংলাদেশের মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ের শিখন অগ্রগতি যাচাই বা মূল্যায়ন এর বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

- ৭.১ ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ে শিখন-শিখনো কার্যক্রমে মূল্যায়ন- ধরন- গঠনকালীন ও প্রান্তিক এবং আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক মূল্যায়ন এবং ধারাবাহিক মূল্যায়ন কার্যক্রম শ্রেণিকক্ষে প্রয়োগ প্রক্রিয়া
- ৭.২ অভীক্ষার প্রকারভেদ ও অভীক্ষা প্রণয়ন: সৃজনশীল ও নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষা
- ৭.৩ ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ের বিষয়বস্তু ব্যবহার করে সৃজনশীল ও বহু নির্বাচনী অভীক্ষা প্রণয়ন

৭.১ : ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ে শিখন-শিখনো কার্যক্রমে মূল্যায়ন- ধরন- গঠনকালীন ও প্রান্তিক এবং আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক মূল্যায়ন এবং ধারাবাহিক মূল্যায়ন কার্যক্রম শ্রেণিকক্ষে প্রয়োগ প্রক্রিয়া

মূল্যায়ন

Assessment বা মূল্যায়ন হলো কোন বিষয় বা ঘটনা সম্পর্কে উদ্দেশ্যমূলকভাবে জানার প্রক্রিয়া। শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে মূল্যায়ন হলো কতগুলো হাতিয়ার বা কৌশলের ব্যবহার করে শিখনের কার্যকারিতা পরিমাপ। Wikipedia-তে উল্লিখিত সংজ্ঞা অনুযায়ী- “Educational assessment is the systematic process of documenting and using empirical data on the knowledge, skill, attitudes, and beliefs to refine programs and improve student learning. Assessment data can be obtained from directly examining student work to assess the achievement of learning outcomes or can be based on data from which one can make inferences about learning”.

Oxford Dictionary-এর সংজ্ঞা অনুযায়ী- “The action of assessing someone or something”.

মূল্যায়নের প্রকারভেদ

আমরা জানি, শিক্ষার্থীর শিখনের অগ্রগতি অবস্থা যাচাই হচ্ছে শিক্ষা মূল্যায়ন। গঠনকালীন মূল্যায়ন হলো শিক্ষার্থীর উন্নয়নের উদ্দেশ্যে শিখন-শিখনো কার্যক্রম চলাকালে কতগুলো হাতিয়ার বা কৌশল ব্যবহার করে শিক্ষার্থীর শিখনের অগ্রগতি সম্পর্কে জানা। আবার একটি কোর্স শেষে একজন শিক্ষার্থী সামগ্রিকভাবে কতটুকু অর্জন করেছে সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া হলো প্রান্তিক মূল্যায়ন যাঁকে আমরা সাধারণভাবে মূল্যায়ন বলি। এ কারণে মূল্যায়ন প্রধানত দুই প্রকার। যথা-

১. গঠনকালীন মূল্যায়ন (Formative assessment)
২. চূড়ান্ত মূল্যায়ন (Summative assessment)

১. গঠন কালীন মূল্যায়ন (Formative assessment)

Form থেকে Formative শব্দের উৎপত্তি। Form অর্থ গঠন করা বা তৈরি করা। শিক্ষার্থীর দুর্বলতা বা সবলতা শনাক্ত করে নিরাময়মূলক ব্যবস্থা (Remedia / Measure) গ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে তৈরি বা গঠন করে নেয়ার জন্য যে যাচাই তা গঠনকালীন মূল্যায়ন। কোন পাঠ বা কোর্স চলাকালে শিক্ষার্থীদের শিখনের অগ্রগতি যাচাই করা হলে তাকে গঠনকালীন মূল্যায়ন বলে। যেমন- ধারাবাহিক মূল্যায়ন, সাপ্তাহিক পরীক্ষা, মাসিক পরীক্ষা ইত্যাদি।

Wikipedia-তে উল্লিখিতসংজ্ঞা অনুযায়ী- Formative assessment, including diagnostic testing, is a range of formal and informal assessment procedures conducted by teachers during the learning process in order to modify teaching and learning activities to improve student attainment.

Page Thomasgএর মতে, “যে মূল্যায়নব্যবস্থাই ব্যবস্থায় প্রয়োগকৃত অভীক্ষার ফলাফল থেকে তথ্যের ফলাফল (Feed Back) মাধ্যমে শিক্ষণ-শিখন ব্যবস্থাকে উন্নত করা যায় বা যা শিক্ষণ পদ্ধতির কার্যকারিতা ও সর্বোচ্চশিখন প্রতিবন্ধকতার চিত্র তুলে ধরতে সক্ষম, তাকে গাঠনিক মূল্যায়নব্যবস্থাই বলে।

Ruth Suttonএর মতে “গাঠনিক মূল্যায়নব্যবস্থাই হলো আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিকভাবে পরিচালিত একটি চলমান অবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে শিখন শিখন সংক্রান্ত তথ্য ও প্রমাণ পাওয়া যায় এবং তার মাধ্যমে পরবর্তী ধাপের পরিকল্পনা গ্রহণ করা যায়।

Best & Khan বলেছেন, “গাঠনিক মূল্যায়নব্যবস্থাই একটি চলমান অবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া। গঠনমূলক পর্যবেক্ষণের প্রধান উদ্দেশ্য হলো কোন নির্দিষ্ট শিখন কাজের কতটুকু পূর্ণ হলো তার মাত্রা নিরূপণ এবং সফল শিখন ঘটাতে কতটুকু বাকি থাকল তার সুনির্দিষ্টকরণ।

রয়গ ও থমাসের মতে, “শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া উন্নয়নের জন্য যে মূল্যায়ন ব্যবহৃত হয় তাই গঠনমূলক মূল্যায়ন।”

এবল ও ফ্রিজবি বলেন, “পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী শিখন সংগঠিত হচ্ছে কি না তা তদারকি করার জন্য পরিচালিত মূল্যায়নই গঠনমূলক মূল্যায়ন।”

সুটন বলেন, “গাঠনিক মূল্যায়ন হলো আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিকভাবে পরিচালিত একটি চলমান প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শিখন সম্পর্কে সংগৃহীত তথ্য ও সাক্ষ্য বিবেচনা করে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়।

গাঠনিক মূল্যায়নব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Formative Assessment)

বিভিন্ন শিক্ষাবিদগণের সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করে গাঠনিক মূল্যায়নের নিম্নরূপ বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করা যায়-

- এটি একটি চলমান ও অবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া;
- শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নকালে শিক্ষার্থীর অগ্রগতি সম্পর্কে ধারণা দেয়;
- শিক্ষার্থীর সমস্যা সমাধানে এটি তাত্ক্ষণিক সিদ্ধান্ত দিতে সহায়তা করে;
- এটি শিক্ষার্থীর শিখন উদ্দেশ্যকে পরিমাপ করতে সক্ষম ;
- এটি আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক দুভাবেই সম্পন্ন করা যায়;
- গাঠনিক মূল্যায়নব্যবস্থাই হতে পারে দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক অথবা যেকোন পিরিয়ডিক মূল্যায়ন;
- এর মাধ্যমে শিক্ষক শিক্ষাদানের জন্য পরবর্তী কার্যক্রম কী হবে তা ঠিক করে থাকেন;
- এর মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে শিক্ষণ পদ্ধতি ও উপকরণের ধরন ও ব্যবহার পরিবর্তন করা হয়;
- শিক্ষণীয় বিষয়ে শিক্ষার্থীরা ধারণা গঠনের জন্য গঠনমূলক মূল্যায়ন একটি ধারাবাহিক ও নিরন্তর প্রক্রিয়া;
- পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী শিখন-শেখানো কার্যক্রম কতটা অগ্রসর হচ্ছে তার একটি তদারকি প্রক্রিয়া ;
- এ মূল্যায়নের জন্য সময়সীমা বা প্রয়োগক্ষেত্র সম্পর্কে কোন ধরাবাঁধা নিয়ম নেই;
- শিক্ষার্থীর দুর্বলতা ও সর্বোচ্চতার মাত্রা শনাক্ত করে নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য গঠনমূলক মূল্যায়ন হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়;
- এ মূল্যায়নের স্বল্প সময়ে শিক্ষার্থীর অগ্রগতি সম্পর্কে একটা বিস্তৃত ধারণা পাওয়া যায়;
- এ মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষক তাঁর শিক্ষণ কৌশল ও পদ্ধতিতে দুর্বলতা চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনতে পারেন;
- ব্যবহৃত শিক্ষণপদ্ধতির ফলপ্রসূতা যাচাইয়ের মাধ্যমে সঠিক উপকরণ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে পারেন;
- শিক্ষক শিক্ষাদানে প্রতিটি স্তরে তাঁর সফলতা ও ব্যর্থতা শনাক্ত করে পরবর্তী পদক্ষেপ প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনতে পারেন;

- গাঠনিক মূল্যায়ন আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিকও হতে পারে;
- এ প্রক্রিয়া শিক্ষার্থীর বারংবার ও প্রতিনিয়ত মূল্যায়ন হয় বলে মূল্যায়নের প্রতি শিক্ষার্থীর ভীতি দূর হয়;
- সমস্যা সমাধানের অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাত্ক্ষণিক সিদ্ধান্ত নেয়ার মতো ফলাবর্তন পাওয়া যায়;
- শিক্ষাক্রমের ধারাবাহিক বাস্তবায়ন এবং সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ জানা যায় এবং শিক্ষাক্রম নবায়ন ও পরিমার্জনে সহায়তা করে।

গাঠনিক মূল্যায়নচাইয়ের কৌশল

অভীক্ষা তৈরির পর আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিয়ে অথবা ঘোষণা না দিয়ে এ মূল্যায়ন করা যেতে পারে। অভীক্ষা ছাড়াও পর্যবেক্ষণ, চেকলিস্ট, প্রশ্নোত্তর, বাড়ির কাজ প্রদান, কুইজ, ক্লাস-টেস্ট ইত্যাদি কৌশল অবলম্বন করে এ মূল্যায়ন করা যায়। অবশ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিকভাবেই এ মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে। গাঠনিক মূল্যায়নচাইয়ের পদ্ধতি ও হাতিয়ারগুলো হলো -

- **শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের পর্যবেক্ষণ:** এ প্রক্রিয়ার পাঠের প্রতি শিক্ষার্থীর মনোযোগ, আগ্রহ ও অংশগ্রহণ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়;
- **মৌখিক প্রশ্নকরণ:** শিক্ষার্থী পাঠের কতটুকু বুঝতে পারল বা পারল না মৌখিক প্রশ্নকরণের মাধ্যমে তা জানা যায়;
- **শ্রেণির কাজ:** শ্রেণিতে শিক্ষার্থীকে দলগতভাবে বা ব্যক্তিগতভাবে কাজ করতে দিয়েও তাদের শিক্ষণের অগ্রগতির মাত্রা যাচাই করা যায়;
- **শ্রেণির অভীক্ষা:** শ্রেণিতে শিক্ষার্থীকে দলগতভাবে বা ব্যক্তিগতভাবে শ্রেণির অভীক্ষার মাধ্যমে তাদের শিক্ষণের অগ্রগতির মাত্রা যাচাই করা যায়;
- **বাড়ির কাজ:** দৈনন্দিন বাড়ির কাজ দিয়ে বা বিশেষ কাজ দিয়েও শিক্ষার্থী শিখনের ধরন ও মাত্রা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়;
- **সাপ্তাহিক পরীক্ষা:** প্রতি সপ্তাহে সাপ্তাহিক পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পাঠের অগ্রগতি যাচাই করে;
- **পাক্ষিক পরীক্ষা:** পাক্ষিক পরীক্ষা গ্রহণ করে শিক্ষার্থীদের পাঠের অগ্রগতি যাচাই করে তাদের পাঠে মনোযোগী করা যায়;
- **মাসিক পরীক্ষা:** মাসিক পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা পুরোমাসে কী শিখতে পেরেছে এবং তাদের জ্ঞানের পরিধি কতটুকু বেড়েছে তা জানা যায়;
- **ত্রৈমাসিক পরীক্ষা:** প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর বা ত্রৈমাসিক পরীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পাঠের অগ্রগতি যাচাই করা যায়;
- **ষান্মাসিক পরীক্ষা:** প্রতি ছয় মাস অন্তর শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে তাদের পাঠের অগ্রগতি যাচাই করা যায়। যাকে ষান্মাসিক পরীক্ষা বলে;
- **অর্পিত কাজ:** শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের উপর যে কাজ দেওয়া হয় তাকে অর্পিত কাজ বলে। শিক্ষক তাদের অর্পিত কাজের তদারকি করবেন। এ পরীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পাঠের অগ্রগতি যাচাই করা যায়;
- **টার্মপেপার:** শিক্ষার্থীদের ক্লাসে বিভিন্ন বিষয়ের উপর টার্ম পেপার করে আনতে বলবেন এবং তারা তা করেছে কিনা তা খতিয়ে দেখবেন;
- **সেমিনার:** শিক্ষার্থীদেরকে নিয়ে বিভিন্ন বিষয়ের উপর সেমিনার বা সিম্পোজিয়াম আয়োজন করতে পারেন। এতে তাদের পাঠে অগ্রগতি হয়;
- **শিক্ষা সফর:** প্রতি বছর স্কুল থেকে দেশের বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানে শিক্ষা সফরের আয়োজন করা যেতে পারে;
- **কুইজ:** সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন, নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন, প্রণয়ন করে ধাঁধার আকারে প্রাত্যহিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক বা মাসিক প্রতিযোগিতার মাধ্যমেও মূল্যায়ন করা যায়;
- **ইনভেন্ট্রি বা চেকলিস্ট:** কে কোনদিন কী শিখল তার তালিকা তৈরি করার জন্য শিক্ষার্থীদের দায়িত্ব দিতে পারেন। শিক্ষক নিজে শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুর উপর একটি চেকলিস্ট তৈরি করে তাদের শিখনের অগ্রগতি যাচাই করতে পারেন;
- **রেটিং স্কেল:** পাঠের বিভিন্ন পয়েন্ট বা বিষয়বস্তুর উপর ৩ মাত্রা বা ৫ মাত্রা স্কেল করে শিক্ষার্থীদের শিক্ষার মান যাচাই করতে পারেন;
- **বিতর্ক ও আলোচনা সভা:** বিভিন্ন বিষয়ে বিতর্ক, আলোচনা সভা করেও শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি মূল্যায়ন করা যায়;

- দৈনন্দিন উপস্থিতি বা ক্লাসের হাজিরাও গঠনমূলক মূল্যায়নের একটি নির্ভরযোগ্য কৌশল;
- শিক্ষার্থীদেরকে ডায়েরি লিখতে দিয়েও গঠনমূলক মূল্যায়ন করা যায়;
- এক একজন শিক্ষক এক একটি শাখার দায়িত্ব নিয়ে শিক্ষার্থীর ক্রমপুঞ্জিত বা কিউমুলেটিভ রেকর্ড সংরক্ষণ করতে পারেন। এটিও গঠনমূলক মূল্যায়নের একটি কৌশল;
- এনেকডোটাল রেকর্ড বা শিক্ষার্থীর বিশেষ বিশেষ কৃতকার্যের বিবরণের রেকর্ড করাও গাঠনিক মূল্যায়নের কৌশল।

গঠনকালীন মূল্যায়নচাইয়ের গুরুত্ব

- শিক্ষক-শিক্ষার্থীর পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার ফলে কোন বিষয়বস্তু সম্পর্কে শিক্ষার্থীর শিখন সম্পর্কিত অগ্রগতি সম্পর্কে তাত্ক্ষণিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়;
- শিক্ষাদান পদ্ধতি-কৌশল ও উপকরণ নির্বাচন কতটা সঠিক ছিল তা যাচাই করা যায় এবং শিক্ষক ভবিষ্যত শিক্ষাদানের পদ্ধতি-কৌশল ও উপকরণের উন্নয়ন সম্পর্কে নির্দেশনা পাওয়া যায়;
- শিক্ষাদান কার্যক্রমকে কার্যকর করে।

২. চূড়ান্ত মূল্যায়নচাই (Summative assessment)

কোন কোর্স শেষে বা কোর্স সমাপ্তির পর শিক্ষার্থীদের শিখনের অগ্রগতি যাচাই করা হলে তাকে চূড়ান্ত মূল্যায়নচাই বলে। যেমন- বার্ষিক পরীক্ষা, এস.এস.সি পরীক্ষা, এচ.এস.সি পরীক্ষা ইত্যাদি। Wikipedia-তে উল্লিখিতসংজ্ঞা অনুযায়ী-Summative assessment (or summative evaluation) refers to the assessment of participants where the focus is on the outcome of a program. This contrasts with formative assessment, which summarizes the participants' development at a particular time. Summative assessment is widely taught in educational programs in the United States. Scriven claims that while all assessment techniques can be summative, only some are formative.

প্রাথমিক মূল্যায়নচাইয়ের গুরুত্ব

- কোন বিষয়বস্তু শিক্ষার উদ্দেশ্য পরিমাপ করার জন্য প্রাথমিক মূল্যায়নচাই একান্ত আবশ্যিক;
- এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীর কোন বিষয়ের শিখন দক্ষতা পরিমাপ করা যায়;
- ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ করা যায়।

মূল্যায়ন

কোন শিখন-শেখানো কার্যক্রমে একজন শিক্ষার্থীর কতটুকু অগ্রগতি হয়েছে তা নির্ণয় করার উপায় হলো মূল্যায়ন। বিদ্যালয়ে শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীর অগ্রগতি, সফলতা, ত্রুটি যাচাই করাই হলো মূল্যায়নের মূল উদ্দেশ্য। মূল্যায়নের আরেকটি উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের মাত্রা নির্ণয় করা। মনোবিজ্ঞানী গ্রোনল্যান্ড এবং লিন (Grondland & Linn) এর মতে,"শিক্ষার্থীরা শিক্ষণ উদ্দেশ্য কতটুকু অর্জন করতে পেরেছে তা নির্ণয়ের জন্য তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার সুসংবদ্ধ প্রক্রিয়াই হলো মূল্যায়ন"। Wikipedia-তে উল্লিখিতসংজ্ঞা অনুযায়ী- Evaluation is a systematic determination of a subject's merit, worth and significance, using criteria governed by a set of standards.

আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক মূল্যায়নচাই

বিভিন্ন কোর্সওয়ার্কের মাধ্যমে যখন শিক্ষার্থীদের শিখন অগ্রগতি যাচাই করা হয় এবং এ শিখন অগ্রগতির মাত্রা নম্বরের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয় তখন আনুষ্ঠানিক মূল্যায়নচাই বলে। যেমন- বাংলাদেশে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জ্ঞান ও মনোপেশীজ স্তরের শিখন অগ্রগতি যাচাই করার জন্য যে ধারাবাহিক মূল্যায়নচাই করা হয় তা আনুষ্ঠানিক মূল্যায়নচাই। অন্যদিকে কোন কোর্সওয়ার্ক ছাড়া শিক্ষার্থীদের কেবল পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে যখন শিক্ষার্থীদের আবেগীয় ক্ষেত্রের শিখন অগ্রগতি যাচাই করা হয় তখন তাকে অনানুষ্ঠানিক মূল্যায়নচাই বলে।

ধারাবাহিক মূল্যায়ন কার্যক্রম শ্রেণিকক্ষে প্রয়োগ প্রক্রিয়া

বাংলাদেশে জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২ অনুযায়ী শিক্ষাক্রমে বর্ণিত শিক্ষার্থীর শিখনের তিনটি ক্ষেত্রের শিখন অর্জন যাচাইয়ের লক্ষ্যে শিখনফলভিত্তিক ধারাবাহিক শিখনের অগ্রগতি যাচাইকার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। ধারাবাহিক শিখন অগ্রগতি যাচাইএর ক্ষেত্রগুলো হচ্ছে-

১. বুদ্ধিবৃত্তীয় ক্ষেত্র
২. মনোপেশিজ ক্ষেত্র
৩. আবেগীয় ক্ষেত্র।

বুদ্ধিবৃত্তীয় ও মনোপেশিজ ক্ষেত্রের শিখনফলের ধারাবাহিক শিখন অগ্রগতি যাচাই (আনুষ্ঠানিক মূল্যায়ন)

বুদ্ধিবৃত্তীয় ও মনোপেশিজ ক্ষেত্রের শিখনফলের শিখন অগ্রগতি যাচাইয়ের জন্য নম্বর বরাদ্দ হচ্ছে প্রতিটি বিষয়ের মোট নম্বরের ২০%। সিলেবাসের আওতাভুক্ত কোর্স ওয়ার্কের যে সকল কার্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে মূল্যায়ন করা হবে সেগুলো হচ্ছে-

- শ্রেণির কাজ
- বাড়ির কাজ ও অনুসন্ধানমূলক কাজ
- শ্রেণি অভীক্ষা

শ্রেণিকক্ষে সম্পাদিত সকল কাজই শ্রেণির কাজ। এ জন্য বরাদ্দকৃত নম্বর ১। বাড়ির কাজ ও অনুসন্ধানমূলক কাজের জন্য নম্বর বরাদ্দ হচ্ছে ৫। শ্রেণি অভীক্ষার জন্য নম্বর বরাদ্দ হচ্ছে ৫।

কোর্সওয়ার্কের রেকর্ড সংরক্ষণ ছক

বিষয়: ভূগোল ও পরিবেশ																								
শিক্ষার্থীর রোল নম্বর	শিক্ষার্থীর নাম	প্রথম সাময়িক পরীক্ষা										দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষা												
		শ্রেণির কাজ			বাড়ির কাজও অনুসন্ধান মূলক কাজ			শ্রেণি অভীক্ষা			মোট	গড়	শ্রেণির কাজ			বাড়ির কাজও অনুসন্ধান মূলক কাজ			শ্রেণি অভীক্ষা			মোট	গড়	মোট গড় নম্বর
		১০	১০	১০	৫	৫	৫	৫	৫	৫	৬০	২০	১০	১০	১০	৫	৫	৫	৫	৫	৫	৬০	২০	২০
১																								
২																								
৩																								

- ৩টি শ্রেণির কাজের রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- ২টি বাড়ির কাজ ও ১টি অনুসন্ধানমূলক কাজের রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- ৩টি লিখিত অভীক্ষার রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- প্রতি সাময়িকে প্রাপ্ত মোট নম্বরকে ৩দিয়ে ভাগ করে এবং দুই সাময়িকের গড় নম্বরের যোগফলকে ২ দিয়ে ভাগ করে মোট গড় নির্ণয় করা হবে।

আবেগীয় ক্ষেত্রের শিখনফলের ধারাবাহিক শিখন অগ্রগতি যাচাই (অনানুষ্ঠানিক মূল্যায়ন)

শিক্ষক সারা বছর বিদ্যালয়ে সংগঠিত বিভিন্ন কার্যক্রমের সাহায্যে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর আচরণ ও সামাজিকমূল্যবোধ পর্যবেক্ষণ করবেন। এর জন্য কোন নম্বর বরাদ্দ নেই। প্রতিটি সাময়িক শেষে সুনির্দিষ্ট মানদণ্ডের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন করবেন এবং মতামত দিবেন।

শিক্ষার্থীর আচরণ ও মূল্যবোধের (আবেগীয় শিখনফল) ধারাবাহিক রেকর্ড সংরক্ষণ ছক

প্রথম সাময়িক পরীক্ষা													
রোল নম্বর	শিক্ষার্থীর নাম	নিয়মানু বর্তিতা	দেশপ্রেম	সততা	নেতৃত্ব	শৃঙ্খলা	সহযোগিতা	সক্রিয় অংশগ্রহণ	সহি ষ্ণুতা	সচেত নতা	সময়ানুবর্তিতা	প্রাপ্ত নম্বর	মন্তব্য
১													
২													
৩													

দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষা													
রোল নম্বর	শিক্ষার্থীর নাম	নিয়মানু বর্তিতা	দেশ প্রেম	সততা	নেতৃত্ব	শৃঙ্খলা	সহযোগিতা	সক্রিয় অংশগ্রহণ	সহি ষ্ণুতা	সচেত নতা	সময়ানুবর্তিতা	প্রাপ্ত নম্বর	মন্তব্য
১													
২													
৩													

নির্দেশনা

আচরণ ও ধারাবাহিক মূল্যবোধের মূল্যায়নে একজন শিক্ষার্থী প্রতিটি আচরণ ও মূল্যবোধের জন্য ৩ (অতি উত্তম) বা ২(ভাল) বা ১ (অগ্রগতি প্রয়োজন) পেতে পারে। ১০টি আচরণ ও মূল্যবোধের জন্য একজন শিক্ষার্থীসর্বোচ্চ ৩০ এবং সর্বনিম্ন ১০পেতে পারে। শিক্ষার্থীর আচরণ ও মূল্যবোধ মূল্যায়নে চার স্তরের পৃথক গ্রেড প্রদান করা হবে। নিচে নম্বরের সীমার জন্য নির্ধারিত গ্রেড দেওয়া হলো-

নম্বরের সীমা	ধারাবাহিক মূল্যায়নের গ্রেড
৩০-২৬	অতি উত্তম
২৫-২১	উত্তম
২০-১৬	ভালো
১৫-১০	অগ্রগতি প্রয়োজন

শিক্ষার্থীর আচরণ ও মূল্যবোধের ভালো দিকগুলো এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অগ্রগতি প্রয়োজন তা উল্লেখপূর্বক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর কৃতিত্বের চূড়ান্ত প্রতিবেদনে মন্তব্য করতে হবে।

৭.২ অভীক্ষার প্রকাভেদ ও অভীক্ষা প্রণয়ন: সৃজনশীল ও নৈব্যক্তিক অভীক্ষা

শিক্ষার্থী মূল্যায়নের উল্লেখযোগ্য হাতিয়ার হলো অভীক্ষা। অভীক্ষার প্রতিশব্দ Test; যার আভিধানিক অর্থ Trail of the qualities of a person or a thing. ব্যাপক অর্থে যে পরিমাপক যন্ত্রের সাহায্যে বিশেষ ধরনের শিক্ষাগত ও মানসিক বৈশিষ্ট্য বা যোগ্যতা পরিমাপ করা হয় তাকে অভীক্ষা বলে। অভীক্ষার ফল সংখ্যায় প্রকাশযোগ্য।

বিখ্যাত শিক্ষাবিদ ম্যারি এ. গ্রনল্যান্ড (Marie A. Grondlend) ও জয়সি ই. লিন (Joyse E. Linn) এর মতে, "The Test is the set of question ". সুতরাং বলা যায়, "পরীক্ষা গ্রহণের জন্য যে প্রশ্নপত্র বা উপকরণ বা কৌশল ব্যবহৃত হয় তাকে অভীক্ষা বলে"।

অভীক্ষার সাধারণ শ্রেণিবিভাগ

অভীক্ষাগুলোর শ্রেণিবিভাগ করার সময় সেগুলোর আকৃতি-প্রকৃতি, উৎস, উদ্দেশ্য, কার্য এবং বিষয়বস্তু বিবেচনা করা হয়। সে হিসেবে অভীক্ষার শ্রেণিবিভাগ অত্যন্ত জটিল। কার্যের বিবেচনায় অভীক্ষার শ্রেণিবিভাগ তিন ধরনের। এগুলো হলো-

- শিক্ষামূলক অভীক্ষা
- বুদ্ধির অভীক্ষা
- ব্যক্তিত্ব পরিমাপক অভীক্ষা

শিক্ষামূলক অভীক্ষা: শিক্ষামূলক অভীক্ষা হলো এমন প্রশ্নপত্র বা কৌশল বা হাতিয়ার যার সাহায্যে শিক্ষার্থীদের অর্জিত জ্ঞান, কৃতিত্ব বা পারদর্শিতা যাচাই করে তাদের পরস্পরের শিক্ষাগত পার্থক্য নিরূপণ করা যায়।

বুদ্ধির অভীক্ষা: বুদ্ধির অভীক্ষা হলো এমন অভীক্ষা যার সাহায্যে ব্যক্তি বা শিশুর মানসিক ক্ষমতা বা বুদ্ধির পরিমাপ করা যায়।

ব্যক্তিত্ব পরিমাপক অভীক্ষা: ব্যক্তিত্ব পরিমাপক হলো একটি এমন অভীক্ষা যার সাহায্যে ব্যক্তির মানসিক সংগঠন, যথা- দৃষ্টিভঙ্গি, আগ্রহ, প্রাক্ষোভিক সংগতিবিধান, চরিত্র, সামাজিকতা ইত্যাদি মূল্যায়ন করা যায়।

শিক্ষামূলক অভীক্ষার শ্রেণিবিভাগ

উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে শিক্ষামূলক অভীক্ষাকে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. **পারদর্শিতার অভীক্ষা:** যে সব অভীক্ষার দ্বারা শিক্ষার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতা পরিমাপ করা হয়, তাদের বলা হয় পারদর্শিতার অভীক্ষা।
২. **নির্ণায়ক অভীক্ষা:** শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান আহরণের ক্ষেত্রে কোন দুর্বলতা থাকলে তা চিহ্নিত করার জন্য যে অভীক্ষা ব্যবহার করা হয় তাকে নির্ণায়ক অভীক্ষা বলে।
৩. **পূর্বাভাসমূলক অভীক্ষা:** শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জনের জন্য যে মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলো থাকা প্রয়োজন তা পরিমাপ করা এবং এ পরিমাপের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ পারদর্শিতার পূর্বাভাস করা হয় তাকে পূর্বাভাসমূলক অভীক্ষা অভীক্ষা বলা হয়।
৪. **পর্যালোচনামূলক অভীক্ষা:** শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি বা পারদর্শিতা পরিমাপ ছাড়াও শিক্ষণ ব্যবস্থার কার্যকারিতা পরিমাপ করা এবং শিক্ষণ ব্যবস্থা বা শিক্ষণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে সংযুক্ত অন্যান্য বিষয়ের কার্যকারিতা পরিমাপ করার জন্য যে অভীক্ষা ব্যবহার করা হয় তাকে পর্যালোচনামূলক অভীক্ষা বলে।

গঠন, ধরন এবং প্রয়োগের ভিত্তিতে শিক্ষামূলক অভীক্ষাকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

- ক. সর্ধক্ষিপ্ত উত্তরমূলক অভীক্ষা
- খ. রচনামূলক অভীক্ষা
- গ. সৃজনশীল অভীক্ষা
- ঘ. নৈব্যক্তিক অভীক্ষা
- ঙ. মৌখিক অভীক্ষা

ক. সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক অভীক্ষা: শিক্ষার্থীদের জ্ঞান স্তরের শিখন যাচাইয়ের জন্য এ ধরনের প্রশ্ন করা হয়। এ ধরনের প্রশ্ন এক বা দুই নম্বর মান জ্ঞাপক হয়ে থাকে। নিম্নে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হলো-

১. দুর্যোগ কাকে বলে?
২. পরিচলন বৃষ্টিপাত কী?
৩. মানচিত্রের স্কেল কাকে বলে?

খ. রচনামূলক অভীক্ষা: দীর্ঘ-উত্তর জাতীয় রচনামূলক অভীক্ষায় একটি নির্দিষ্ট শিক্ষাক্রম হতে কয়েকটি প্রশ্ন করা হয়। তিন ঘণ্টা সময়ের পরীক্ষার জন্য প্রশ্নের সংখ্যা থাকে সাধারণত পাঁচ থেকে দশটি। প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে হয় রচনা আকারে। নিম্নে কয়েকটি রচনামূলক প্রশ্নের উদাহরণ দেয়া হলো-

১. বৃষ্টিপাতের প্রকারভেদ আলোচনা কর।
২. ঋতু পরিবর্তনের সচিত্র বর্ণনা দাও।

গ. সৃজনশীল অভীক্ষা: সৃজনশীল অভীক্ষায় শিক্ষার্থীর চিন্তন দক্ষতার চারটি স্তর থেকে প্রশ্ন করে মূল্যায়ন করা হয়। এ চারটি স্তর হচ্ছে জ্ঞান, অনুধাবন, প্রয়োগ এবং উচ্চতর চিন্তন দক্ষতা। দক্ষতার স্তরসমূহকে কাঠিন্যের ক্রমানুসারে নিম্নোক্তভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে-

- **জ্ঞান স্তর:** চিন্তন দক্ষতার প্রথম স্তর হলো জ্ঞান স্তর। এর অর্থ পূর্বে জানা কিছু স্মরণ করা বা চিনতে পারা। এর মধ্যে আরও যে বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত সেগুলো হলো: বিশেষ তথ্য, তত্ত্ব, পদ্ধতি, প্রক্রিয়া, ধারণা, নীতিমালা ইত্যাদি। জ্ঞান স্তরের প্রশ্নের উত্তর সরাসরি পাঠ্যপুস্তকে পাওয়া যায়।
- **অনুধাবন স্তর:** অনুধাবন হলো কোন বিষয়ের অর্থ বোঝার দক্ষতা। অর্থাৎ কোন তথ্য, নীতিমালা, সূত্র, নিয়ম, পদ্ধতি, প্রক্রিয়া বুঝতে পারা এবং তা ব্যাখ্যা করে মৌখিক বা লিখিতভাবে উপস্থাপন করার দক্ষতাই হলো অনুধাবন।
- **প্রয়োগ স্তর:** প্রয়োগ বলতে বুঝায় পূর্বের শেখা কোন বিধি, আইন, তত্ত্ব, সূত্র, নিয়ম, পদ্ধতি, ধারণা, নীতি নতুন পরিস্থিতিতে ব্যবহার করা।
- **উচ্চতর চিন্তন দক্ষতার স্তর:** উচ্চতর চিন্তন দক্ষতা বলতে বুঝায় কোন বিষয়ের বিশ্লেষণ (বিশেষ থেকে সাধারণ), সংশ্লেষণ (সাধারণ থেকে বিশেষ) এবং মূল্যায়ন (বিচার-বিবেচনা, যুক্তি)। দক্ষতার সর্বোচ্চ স্তর হিসেবে এর মধ্যে নিম্নতর স্তরের অন্য সব চিন্তন দক্ষতাগুলো অন্তর্ভুক্ত থাকে। পূর্বের জানা তথ্য/তত্ত্ব (জ্ঞান) ব্যবহার করে নতুন কোনো পরিস্থিতিতে বিচার-বিশ্লেষণ করার, সিদ্ধান্ত গ্রহণের এবং মূল্যায়নের দক্ষতাই হলো উচ্চতর চিন্তন দক্ষতা।

ঘ. নৈব্যক্তিক অভীক্ষা: যে সকল অভীক্ষার গঠন, প্রয়োগ, ফল নির্ণয় বা নম্বর প্রদানে পরীক্ষকের কোন প্রভাব এবং উত্তর প্রদানে পরীক্ষার্থীরও ব্যক্তিগত কোন প্রভাব থাকে না তাদের নৈব্যক্তিক অভীক্ষা বলে। নৈব্যক্তিক অভীক্ষার উদাহরণ হলো: সত্য-মিথ্যা, শূন্যস্থান পূরণ, হ্যাঁ-না, মিলকরণ, শুদ্ধ-অশুদ্ধ, বহুনির্বাচনী ইত্যাদি। ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ে কেবল বহুনির্বাচনী (MCQ) প্রশ্নের মাধ্যমে নৈব্যক্তিক অভীক্ষা গঠন করা হয়।

ঙ. মৌখিক অভীক্ষা: একজন শিক্ষার্থী কোন বিষয়ে কতটা জ্ঞান, দক্ষতা এবং দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করেছে তা মৌখিক প্রশ্ন করে মূল্যায়ন করার জন্য যে অভীক্ষা ব্যবহার করা হয় তা হচ্ছে মৌখিক অভীক্ষা। এ ক্ষেত্রে কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে ধারাবাহিকভাবে কিংবা এলোমেলো ভাবে প্রশ্ন করা হয়। এ অভীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর উপস্থিত জ্ঞান, ভাষার ব্যবহার, বাচনভঙ্গি, ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে মূল্যায়ন করা যায়।

৭.৩ ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ের বিষয়বস্তু ব্যবহার করে বহুনির্বাচনী ও সৃজনশীল অভীক্ষা প্রণয়ন

বহুনির্বাচনী অভীক্ষা

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন নৈব্যক্তিক অভীক্ষার একটি বহুল ব্যবহৃত উপাদান (Item)। বহু নির্বাচনী প্রশ্নের একটি উদ্দীপক (Stem)/নির্দেশনা (Instruction) থাকে এবং তার ভিত্তিতে কতগুলো বিকল্প উত্তর (Options) দেওয়া থাকে। বিকল্প উত্তরসমূহের মধ্যে একটি সঠিক উত্তর (key) এবং অপরগুলো বিক্ষিপক (Distracters)। এ বিক্ষিপকগুলো সঠিক উত্তর নয়। বহুনির্বাচনী প্রশ্ন প্রণয়নের জন্য কিছু নীতিমালা রয়েছে। এগুলো হলো- বহুনির্বাচনী প্রশ্নের উদ্দীপক প্রয়োজনীয় সব তথ্য সরবরাহ করবে, সহজ ভাষায় সংক্ষিপ্ত আকারে হবে, অপ্রাসংগিক উপাদানমুক্ত হতে হবে।

এসএসসি এবং দাখিল পরীক্ষায় তিন ধরনের বহুনির্বাচনি প্রশ্ন থাকবে। এ তিনটি ধরন হলো-

১. সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন
২. বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন
৩. অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন: এ ধরনের প্রশ্নের শুরুতে একটি প্রশ্ন থাকে এবং প্রশ্নের সাথে সাধারণত ৪টি বিকল্প উত্তর থাকে, যার মধ্যে একটি থাকে সঠিক উত্তর। শিক্ষার্থীর চিন্তন দক্ষতার জ্ঞানস্তর যাচাই করার জন্য সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ব্যবহার করা হয়। কখনো কখনো অনুধাবন স্তর যাচাই করার জন্যও এ ধরনের প্রশ্ন ব্যবহার করা হয়। সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নে উদ্দীপক/নির্দেশনা একই সাথে থাকে এবং উদ্দীপকে কোন নতুন পরিস্থিতি থাকে না। যেমন-

প্রশ্ন: কোনটি সূর্যের নিকটতম গ্রহ?

- ক. বুধ
- খ. শুক্র
- গ. পৃথিবী
- ঘ. মঙ্গল

২. বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন: এ ধরনের প্রশ্নের শুরুতে বাক্যাংশের পরে ৩টি তথ্য/বিবৃতি/ধারণা দেওয়া হয়। ৩টি তথ্য/বিবৃতি/ধারণার ১ টি/ ২টি/ ৩টি সঠিক হতে পারে। এ তথ্যসমূহকে সাজিয়ে ৪টি বিকল্প উত্তর তৈরি করা হয়। ৪টি বিকল্প উত্তর থেকে শিক্ষার্থীকে একটি বাছাই করতে হয়। এ ধরনের প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের অনুধাবন, প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতা যাচাই করা হয়। বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নে তথ্য/বিবৃতি/ধারণা উদ্দীপক হিসেবে বিবেচিত হয়। প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতা যাচাইয়ের জন্য এ ধরনের প্রশ্ন করা হলে উদ্দীপকে নতুন পরিস্থিতি থাকতে হবে। যেমন-

প্রশ্ন: মধ্যপ্রাচ্যের জলবায়ুকে চরমভাবাপন্ন বলার কারণ, এ অঞ্চলে-

- i. শীতকালে বায়ুতে আর্দ্রতা বেশি থাকে
- ii. গ্রীষ্মকালে প্রচণ্ড উত্তাপ থাকে
- iii. শীতকালে তীব্র ঠাণ্ডা থাকে

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i ও ii
- খ. ii ও iii
- গ. i ও iii
- ঘ. i ও ii ও iii

৩. অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন: এ ধরনের প্রশ্নের শুরুতে একটি উদ্দীপক/দৃশ্যপট/ঘটনা থাকে। এ উদ্দীপক/দৃশ্যপট/ঘটনা থেকে কয়েকটি প্রশ্ন করা হয়। উদ্দীপক হতে পারে সংক্ষিপ্ত অনুচ্ছেদ, মানচিত্র, সারণি, ডায়াগ্রাম, অনুচিত্র ইত্যাদি। পত্র-পত্রিকা, রেডিও, টেলিভিশনের খবর, নাটক, বিভিন্ন অনুষ্ঠানের পরিবেশনা/দৃশ্য/ঘটনা উদ্দীপক হিসেবে হতে পারে। এ ধরনের উদ্দীপক থেকে প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্ন করা হয়। অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নের ক্ষেত্রে উদ্দীপক শিক্ষার্থীর সামনে একটি নতুন পরিস্থিতি উপস্থাপন করে যে পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থী তার পাঠ্যপুস্তকের জ্ঞান প্রয়োগ করতে পারে এবং পাঠ্যপুস্তকের জ্ঞান ব্যবহার করে নতুন পরিস্থিতি বিশ্লেষণ, নতুন পরিস্থিতিতে যুক্তি প্রদর্শন, সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং মূল্যায়ন করতে পারে। এ ক্ষেত্রে উদ্দীপক ও নির্দেশনা আলাদাভাবে সুনির্দিষ্ট থাকে।

প্রশ্নের উদ্দীপক (নতুন পরিস্থিতি) তৈরির কৌশল

- উদ্দীপক হবে মৌলিক, এটি পাঠ্যপুস্তকে সরাসরি থাকবে না;
- উদ্দীপকের ভাষা হবে সহজবোধ্য ও যতদূর সম্ভব সংক্ষিপ্ত;
- অপ্রয়োজনীয় শব্দ ও বাক্যের পরিহার;
- উদ্দীপক পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর সাথে সম্পৃক্ত হতে হবে;
- পত্রপত্রিকা, রেফারেন্স বই, রেডিও টেলিভিশনের প্রচারিত বিভিন্ন ঘটনা, প্রামাণ্য চিত্র, বিজ্ঞাপন ইত্যাদি উদ্দীপকের উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে;

- সংক্ষিপ্ত অনুচ্ছেদ, মানচিত্র, সারণি, গ্রাফ, ডায়াগ্রাম, লেখচিত্র, ছবি ইত্যাদির সমন্বয়ে উদ্দীপক তৈরি হবে;
- দৃশ্যকল্পে প্রশ্নের উত্তর সরাসরি থাকবে না, তবে উত্তর করার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীকে সাহায্য করবে;
- প্রশ্নপত্রে চিন্তন দক্ষতার বিভিন্ন স্তরের ভিত্তিতে বহুনির্বাচনি প্রশ্নের শতকরা হার নিম্নরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

জ্ঞান স্তর	- ৩০ থেকে ৪০%
অনুধাবন স্তর	- ৩০ থেকে ৪০%
প্রয়োগ স্তর	- ১০ থেকে ২০%
উচ্চতর দক্ষতা স্তর	- ১০ থেকে ২০%

বহুনির্বাচনি প্রশ্নপত্রে জ্ঞান ও অনুধাবন স্তরের ৭০% এবং প্রয়োগ ও উচ্চতর স্তরের ৩০% প্রশ্ন অন্তর্ভুক্ত হবে।

সৃজনশীল প্রশ্নের গঠন কাঠামো: একটি সৃজনশীল প্রশ্নের শুরুতে একটি নতুন পরিস্থিতিযুক্ত উদ্দীপক এবং উদ্দীপক সংশ্লিষ্ট চারটি প্রশ্ন থাকে। প্রশ্ন চারটি কাঠিন্যের পর্যায় ক্রমানুসারে থাকে। একটি সৃজনশীল প্রশ্ন চিন্তন দক্ষতার বিভিন্ন স্তর যাচাই করতে পারে। প্রতিটি সৃজনশীল প্রশ্নের জন্য ১০ নম্বর বরাদ্দ রয়েছে।

সৃজনশীল প্রশ্নের প্রথম অংশটি (ক) জ্ঞান স্তরের যা স্মৃতি নির্ভর। জ্ঞান স্তর হলো চিন্তন দক্ষতার প্রথম স্তর। এর অর্থ পূর্বে জানা কিছু স্মরণ করা। এর মধ্যে আরও যে বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত সেগুলো হলো: বিশেষ তথ্য, তত্ত্ব, পদ্ধতি, প্রক্রিয়া, ধারণা, নীতিমালা ইত্যাদি স্মরণ করা বা চিনতে পারা। এ প্রশ্নটি সরাসরি বই থেকে থাকবে। প্রশ্নটি স্মৃতিনির্ভর হলেও তা যেন অর্থবহ এবং শিক্ষণীয় হয়। এ অংশটির জন্য বরাদ্দকৃত নম্বর হলো ১।

সৃজনশীল প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশ (খ) হলো অনুধাবন স্তরের প্রশ্ন। অনুধাবন হলো কোন বিষয়ের অর্থ বোঝার দক্ষতা। অর্থাৎ কোন তথ্য, নীতিমালা, সূত্র, নিয়ম, পদ্ধতি, প্রক্রিয়া বুঝতে পারা এবং তা ব্যাখ্যা করে মৌখিক বা লিখিতভাবে উপস্থাপন করার দক্ষতাই হলো অনুধাবন। এ প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষাক্রমের আওতায় অনুমোদিত পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তু অনুধাবনের ক্ষমতা যাচাই করা হয়। প্রশ্নের এ অংশের জন্য বরাদ্দকৃত নম্বর হলো ২।

প্রশ্নের তৃতীয় অংশটি (গ) হলো প্রয়োগ স্তরের প্রশ্ন। প্রয়োগ বলতে বুঝায় পূর্বের শেখা কোন বিধি, আইন, তত্ত্ব, সূত্র, নিয়ম, পদ্ধতি, ধারণা, নীতি নতুন পরিস্থিতিতে ব্যবহার করা। পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তু শিক্ষার্থী ভালভাবে পড়লে সে বিষয়ে তার স্পষ্ট ধারণা তৈরি হবে এবং সেটা শিক্ষার্থী উদ্দীপকে উল্লিখিত নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করতে পারবে। শিক্ষার্থীর এ সক্ষমতাকে বলা হয় প্রয়োগ দক্ষতা। প্রশ্নের এ অংশের জন্য বরাদ্দকৃত নম্বর হলো ৩।

সৃজনশীল প্রশ্নের চতুর্থ অংশটি (ঘ) হচ্ছে উচ্চতর চিন্তন দক্ষতার প্রশ্ন। উচ্চতর চিন্তন দক্ষতা বলতে বোঝায় কোন বিষয়ের বিশ্লেষণ (বিশেষ থেকে সাধারণ), সংশ্লেষণ (সাধারণ থেকে বিশেষ) এবং মূল্যায়ন (বিচার-বিবেচনা, যুক্তি) দক্ষতার সর্বোচ্চ স্তর হিসেবে এর মধ্যে নিম্নতর স্তরের অন্য সব চিন্তন দক্ষতাগুলো অন্তর্ভুক্ত থাকে। পূর্বের জানা তথ্য/ তত্ত্ব (জ্ঞান) ব্যবহার করে নতুন কোনো পরিস্থিতিতে বিচার-বিশ্লেষণ করার, সিদ্ধান্ত গ্রহণের এবং মূল্যায়নের দক্ষতাই হলো উচ্চতর চিন্তন দক্ষতা। প্রশ্নের এ অংশের জন্য বরাদ্দকৃত নম্বর হলো ৪।

শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্যের সাথে সংগতি রাখার ক্ষেত্রে সৃজনশীল প্রশ্নে উদ্দীপক বা নতুন পরিস্থিতি অপরিহার্য। একটি সৃজনশীল প্রশ্নের ক, খ, গ, ঘ অংশ থাকবে। উদ্দীপক না পড়ে "ক" ও "খ" অংশের উত্তর দেওয়া সম্ভব হতে পারে। কিন্তু "গ" ও "ঘ" অংশের উত্তর অবশ্যই উদ্দীপকের আলোকে দিতে হবে। উদ্দীপক বিবেচনায় না এনে "গ" ও "ঘ" অংশের উত্তর করা যাবে না।

সৃজনশীল প্রশ্নের নমুনা: ১৪ আগস্ট ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ। বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র জানিয়েছে যে, দেশের উত্তর, উত্তর-পশ্চিম এবং মধ্যবর্তী অঞ্চলের সবগুলো নদ-নদীর পানি বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। আগামী ২১ আগস্ট অমাবস্যা হওয়ার কারণে এ পানি সাগরে যেতে ধীর হবে। আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে দেশের নদী তীরবর্তী মধ্যবর্তী জেলাসমূহ বন্যা কবলিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

ক. বন্যা কাকে বলে?

খ. বন্যার বৃষ্টিপাতজনিত কারণ ব্যাখ্যা কর।

গ. আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে দেশের মধ্যবর্তী নদী তীরবর্তী জেলাসমূহ কেন বন্যাকবলিত হবে- উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. ২১ আগস্টের অমাবস্যা দেশের বন্যা পরিস্থিতিকে দীর্ঘ করবে- বিশ্লেষণ কর।

প্রশ্নমালা

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. মূল্যায়ন কী?
২. মূল্যায়নচাইয়ের উদ্দেশ্য কী ?
৩. শিখনের ক্ষেত্রসমূহ কী কী?
৪. বুদ্ধিবৃত্তীয় ও মনোপেশীজ ক্ষেত্রের শিখনফল মূল্যায়নের কার্যক্রমসমূহ কী কী এবং এর বরাদ্দকৃত নম্বর কত?
৫. শিখনের আবেগীয় ক্ষেত্রের মূল্যায়নের তাৎপর্য কী?
৬. অভীক্ষা বলতে কী বুঝায়?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. মূল্যায়ন ও মূল্যায়নচাইয়ের পার্থক্য আলোচনা করুন।
২. অভীক্ষার সাধারণ শ্রেণিবিভাগের বর্ণনা দিন।
৩. উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে শিক্ষামূলক শ্রেণি বিভাগের বর্ণনা দিন।
৪. গঠন, ধরন এবং প্রয়োগের ভিত্তিতে শিক্ষামূলক অভীক্ষা কী কী?
৫. সৃজনশীল অভীক্ষার স্তরসমূহের তুলনামূলক ব্যাখ্যা দিন।
৬. বহু নির্বাচনি প্রশ্নের স্তরসমূহ কয়টি ও কী কী উদাহরণ আলোচনা করুন।
৭. সৃজনশীল প্রশ্নের গঠন কাঠামো আলোচনা করুন।
৮. বহুনির্বাচনি প্রতিটি স্তর থেকে একটি করে প্রশ্ন দিয়ে একটি অভীক্ষা তৈরি করুন।
৯. বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগ বিষয়বস্তু নিয়ে একটি সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়ন করুন।

ইউনিট ৮ : ব্যবহারিক ভূগোল

তাত্ত্বিক ও ফলিত বিজ্ঞান হিসেবে বর্তমানে ভূগোল ও পরিবেশ শিক্ষণ দ্রুত বিকাশলাভ করছে। এরই ধারাবাহিকতায় ব্যবহারিক ভূগোলও নবরূপে বিকশিত হচ্ছে এবং অনেক ক্ষেত্রে তাত্ত্বিক বিষয়ের পরিপূরক হিসেবে কাজ করে চলেছে। তথ্যবহুল পৃথিবীতে এককভাবে কোন ব্যক্তির পক্ষে সমস্ত উপাত্ত সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। তাই প্রয়োজনীয় বিভিন্ন উপাত্তের জন্য তাকে অন্যের উপর নির্ভর করতে হয়। এক্ষেত্রে পৃথিবীর বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কিত তথ্যদি ব্যবহারিক ভূগোলে বিভিন্ন চিত্র, মানচিত্র, সারণি ইত্যাদির মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। তাই ব্যবহারিক ভূগোলের যথাযথ অনুশীলন বা প্রশিক্ষণ ব্যতীত ভূগোল ও পরিবেশ বিষয়ের শিক্ষা কখনই পরিপূর্ণ হয় না।

যে পুস্তক অধ্যয়ন করলে ভূগোল বিষয়ের ব্যবহারিক জ্ঞান সম্পর্কে বিশদভাবে জানা যায়, তাকে ব্যবহারিক ভূগোল বলে। এখানে ভূগোলের ব্যবহারিক জ্ঞান অর্থে এ বোঝানো হয়েছে যে, সংগ্রহকৃত ভৌগোলিক উপাদান বা উপাত্তসমূহ সাদা কাগজে বা ছক কাগজে বা কোন মানচিত্রের উপর সুন্দরভাবে প্রকাশ করা। এ ছাড়া মানচিত্রের স্কেল অথবা অভিক্ষেপ অঙ্কন, ভূমির বন্ধুরতা প্রদর্শন, ভূসংস্থানিক মানচিত্র পঠন, আবহাওয়া মানচিত্র পঠন প্রভৃতি সম্পর্কে ব্যবহারিক জ্ঞান লাভ করা যায়।

ব্যবহারিক ভূগোলের প্রয়োজনীয়তা অসীম। কারণ পৃথিবীর পাহাড়, পর্বত, নদ-নদী, সাগর, মহাসাগর, উপত্যকা মালভূমি, সমভূমি প্রভৃতির আকার, প্রকৃতি বা একটি হতে অপরটির ব্যবধান কিরূপ সে সম্বন্ধে ছাত্র-ছাত্রীদের সঠিক জ্ঞান বা ধারণা নেই। সুতরাং এ সমস্ত ভূমিরূপগুলোর সঠিক বাস্তব ধারণা জানার জন্য সাদা কাগজে অঙ্কনের মাধ্যমে বা মডেলের সাহায্যে বা চিত্রের সাহায্যে প্রকাশ করা যায় তা হলে ছাত্র-ছাত্রীরা অতি সহজেই বিভিন্ন ভূমিরূপ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে পারে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট ভূমির বন্ধুরতা, শহর-বন্দর, রেলপথ, সড়ক পথ প্রভৃতি সম্পর্কে সঠিকভাবে জ্ঞান দেওয়ার জন্য কাঠের তক্তার উপর পিচবোর্ড, পেরেক, মোম, পুডিং প্রভৃতির সাহায্যে বা মাটিতে সিমেন্ট ও পাথর দ্বারা এগুলোর রূপ প্রকাশ করে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়।

বর্তমানে ব্যবহারিক ভূগোলের পরিধি খুবই ব্যাপক। কারণ ব্যবহারিক ভূগোলের আওতায় অনেক কিছুর উপাত্ত সংযোজিত হয়েছে। যেমন-স্কেল, অভিক্ষেপ, মানচিত্র, ভূমির বন্ধুরতা, আবহাওয়া মানচিত্র, স্থানীয় বৈচিত্রসূচক মানচিত্র পাঠ ও বর্ণনা লিখন, পরিসংখ্যান উপাত্ত দ্বারা মানচিত্র তৈরি করা, জরিপ, খনিজ ও শিলার বৈশিষ্ট্য নিরূপণ, শিক্ষামূলক ভ্রমণ, ভূমিজরিপ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও ব্যবহারিক ভূগোলের সাথে আরও বিভিন্ন শাখার সাথে বেশ সম্পর্ক রয়েছে। এ ইউনিটে ভূগোল ও পরিবেশ শিক্ষণ বিষয়ের ব্যবহারিক বিষয়াদি স্কেল, মানচিত্র, আন্তর্জাতিক সাংকেতিক চিহ্ন ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

৮.১: স্কেল (সরল ও কর্ণীয়)

৮.২: মানচিত্র সংকোচন ও সম্প্রসারণ

৮.৩: মানচিত্রে তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপন ও আন্তর্জাতিক সাংকেতিক চিহ্ন

৮.৪: শিক্ষামূলক সফর ও প্রতিবেদন প্রণয়ন

৮.১ স্কেল (সরল ও কর্ণীয়)

সরল স্কেল (Simple Scale)

স্কেলের আভিধানিক অর্থ মাপনি বা মানদণ্ড অর্থাৎ যা দিয়ে পরিমাপ করা হয়। কিন্তু ভূগোলে স্কেল ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। স্কেল বলতে মানচিত্রের দুটি স্থানের মধ্যবর্তী দূরত্ব এবং ভূভাগের উপরিস্থিত তাদের প্রকৃত দূরত্বের সম্পর্ককে বোঝায়। সাধারণভাবে ভূমির দূরত্ব ও মানচিত্রের দূরত্বের সম্পর্ককে স্কেল বলে। ভূমির সরলীকৃত রূপ স্কেলের মাধ্যমে মানচিত্রে উপস্থাপন করা হয়। অর্থাৎ “মানচিত্রের দুটি স্থানের দূরত্বের সাথে ভূপৃষ্ঠের ঐ দুটি স্থানের দূরত্বের প্রকৃত সম্পর্ককে স্কেল বা মাপনি বলে”।

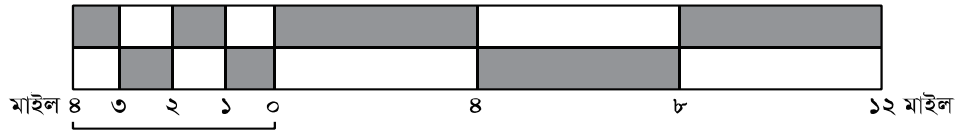
$$\text{মানচিত্রের স্কেল} = \frac{\text{মানচিত্রের দুটি স্থানের দূরত্ব}}{\text{ভূমিতে ঐ দুটি স্থানের প্রকৃত দূরত্ব}}$$

সরল স্কেলের সংজ্ঞা (Definition of Simple Scales): নির্দিষ্ট হিসেব অনুসারে একটি সরল রেখাকে কতিপয় ভাগে ভাগ করলে তাকে সরল স্কেল বা সাধারণ স্কেল (Simple Scale) বলা হয়। সরল স্কেল অঙ্কনের জন্য একটি নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের সরলরেখাকে সুবিধামত প্রাথমিক এবং দ্বিতীয় পর্যায়ের বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করা হয়। এর দৈর্ঘ্য এমন হওয়া উচিত যাতে একে মানচিত্রে সুষ্ঠুভাবে দেখানো যায় এবং স্কেলের দৈর্ঘ্য খুব ছোট বা খুব বড় না হয়।

অনুধাবন বা বর্ণনার সুবিধার্থে সরল স্কেলে প্রাথমিক বা দ্বিতীয় পর্যায়ের ভাগের প্রত্যেকটির মান বিভাজ্য সংখ্যা (Found figure) হওয়া বাঞ্ছনীয়। বিভাজ্য সংখ্যা এমন হওয়া উচিত যাতে প্রাথমিক পর্যায়ে যেকোনো একটি ভাগের মান দ্বিতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন ভাগে সহজে বিভাজ্য হয় এবং স্কেলের বিভিন্ন বিভাগগুলো কোনটি ভগ্নাংশ না হয়।



চিত্র: ১ সরল স্কেল (প্রথম পর্যায়ের ভাগ)



চিত্র: ২ সরল স্কেল (দ্বিতীয় পর্যায়ের ভাগ)

সরল স্কেলের গঠন কাঠামো: বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে সরল স্কেলের গঠন নিম্নরূপ—

সরল স্কেলের দৈর্ঘ্য মাইলের স্কেলে ৪ থেকে ৬ ইঞ্চি এবং প্রস্থ ০.২ ইঞ্চি এবং কি. মি. স্কেলে দৈর্ঘ্য ১০ থেকে ১৫ সে. মি. এবং প্রস্থ ০.৫ সে. মি. হলে স্কেলটি দেখতে সুন্দর হয়। এ ক্ষেত্রে বিভাজ্য মান এমন হওয়া উচিত যাতে অঙ্কিত স্কেলের দৈর্ঘ্য ৪–৬" অথবা ১০–১৫ সে. মি. মধ্যে হয়।

সরল স্কেলে প্রাথমিক ও দ্বিতীয় পর্যায়ের ভাগ থাকে। প্রাথমিক পর্যায়ে এককের নাম একাধিক হলে দ্বিতীয় পর্যায়ে একই একক কিংবা একাধিক না হলে দ্বিতীয় পর্যায়ে নিম্ন একক ব্যবহার করা হয়।

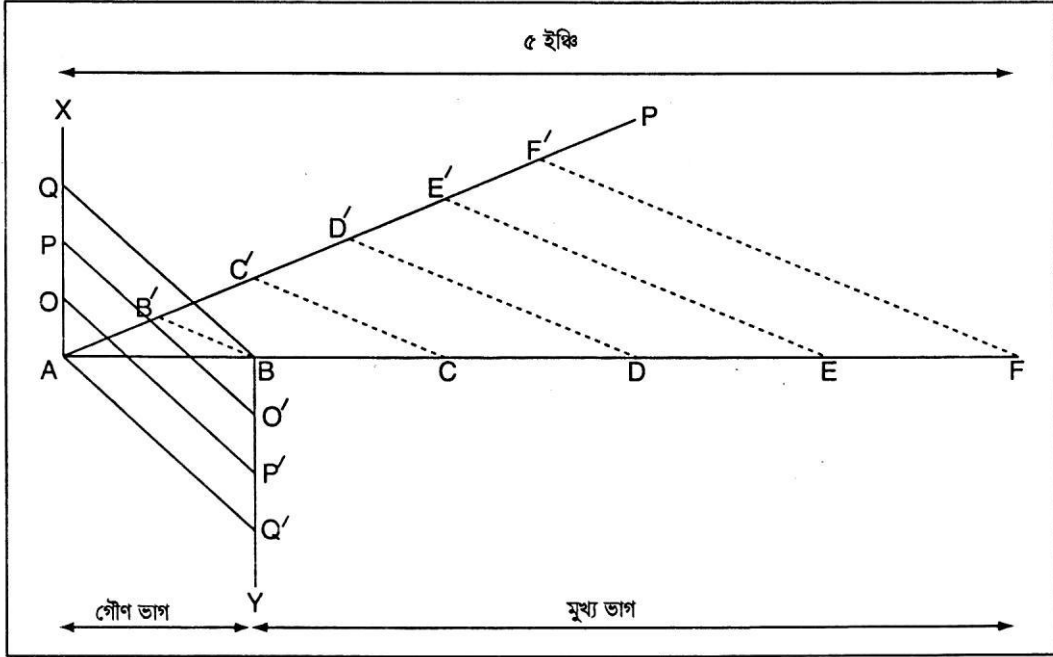
অঙ্কন ও বর্ণনার সুবিধার্থে একটি নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের স্কেলকে প্রাথমিক অবস্থায় বড় ভাগে বিভক্ত করলে তাকে ‘প্রাথমিক পর্যায়ের ভাগ’ (Primary Divisions) বলে এবং সর্ববামের একটি প্রাথমিক পর্যায়ের ভাগকে পরিমাপের বৈশিষ্ট্যানুযায়ী আরও ক্ষুদ্র ভাগে বিভক্ত করলে তাকে ‘দ্বিতীয় পর্যায়ের ভাগ’ (Secondary divisions) বলে।

সরল রেখার বিভাজন পদ্ধতি (Methods of Making Divisions of a Straight Line): যেকোনো দৈর্ঘ্যের সরলরেখাকে জ্যামিতিকভাবে দুটি পদ্ধতিতে প্রয়োজনীয় কয়েকটি সমান অংশে ভাগ করা যায়। এ পদ্ধতি দুটি নিম্নে বর্ণনা করা হলো—

- ১। সাদা কাগজের ওপর প্রায় মাঝামাঝি ৫ ইঞ্চি দৈর্ঘ্যের একটি অনুভূমিক সরলরেখা AF আঁকে নিই।
- ২। AF রেখার A বিন্দু থেকে 30° বা 80° কোণে একটি সরলরেখা AP টাকা। এ AP সরলরেখার ওপর ডিভাইডারের সাহায্যে পছন্দসই একটি মাপ নিয়ে সমান ব্যবধানে পাঁচটি দাগ কাটি। এ দাগগুলোকে যথাক্রমে B', C', D', E' ও F' হিসেবে চিহ্নিত করি।
- ৩। AP রেখার শেষভাগ বিন্দু F' থেকে F পর্যন্ত একটি সরলরেখা (F'F) টেনে দিই।
- ৪। সেট-স্কয়ার (St-square)- এর সাহায্যে AP রেখার ওপর চিহ্নিত বিভাজন বিন্দুগুলো থেকে F'F রেখার সমান্তরালে AF রেখার ওপর পরপর রেখা টানলে ঐ সরলরেখা সমান পাঁচটি অংশে বিভক্ত হয়।
- ৫। গৌণ ভাগের সংখ্যা অনুসারে A বিন্দু থেকে ওপরের দিকে এবং B বিন্দু থেকে নিচের দিকে দুটি লম্ব টেনে দিই। ধরা

$$\text{যাক, ঐ দুটি লম্ব হলো AX ও BY। গৌণ ভাগের সংখ্যা} = \frac{\text{মুখ্য ভাগের মান}}{\text{গৌণ ভাগের মান}} = \frac{১ \text{ গজ বা } ৩ \text{ ফুট}}{১ \text{ ফুট}} = ৩ \text{ টি}$$

বি.দ্র. যখন কোনো পরিমিত সরল রেখাকে অতিসহজে স্কেলের সাহায্যে নির্দিষ্ট ভাগে ভাগ করা যায় (৫ ইঞ্চিকে সমান ৫ ভাগে) তখন জ্যামিতিক পদ্ধতিতে সরলরেখাটি ভাগ করার প্রয়োজন নেই।



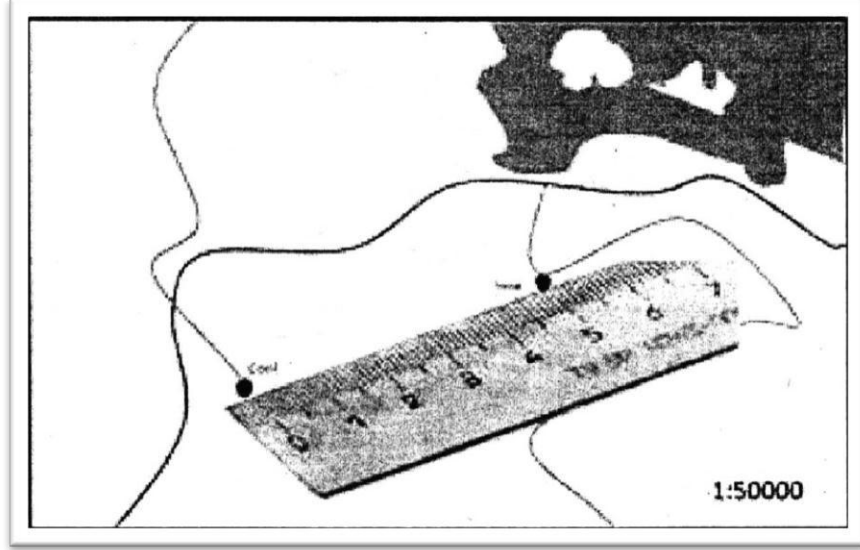
চিত্র: ৮.৩ সরল স্কেলে প্রাথমিক ও দ্বিতীয় পর্যায়ের বিভাজন প্রক্রিয়া

- ৬। ডিভাইডারের সাহায্যে যেকোনো একটি মাপ নিয়ে AX রেখার ওপর সমান ব্যবধানে তিনটি দাগ O, P ও Q কাটি।
অনুরূপভাবে BY রেখার উপরও সম ব্যবধানে তিনটি দাগ O', P' ও Q'কাটি।
- ৭। বাম প্রান্তের উল্লম্ব রেখার প্রথম বিন্দুর A সাথে ডান প্রান্তের উল্লম্ব রেখার Q' বিন্দু যোগ করলে AQ'রেখা পাওয়া যাবে।
একইভাবে পরপর OP' PO' ও QB যোগ করলে পূর্বে অঙ্কিত AB সরলরেখা সমান তিন ভাগে বিভক্ত হবে।
- ৮। সরল স্কেলে প্রাথমিক পর্যায়ের ভাগে পরিমাপ এককের মান দুই বা ততোধিক হলে দ্বিতীয় পর্যায়ের ভাগে একই একক ব্যবহার করতে হবে। কিন্তু প্রাথমিক পর্যায়ে এককের মান একাধিক না হলে দ্বিতীয় পর্যায়ে উক্ত এককের ঠিক নিম্নতম একক প্রকাশ করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, প্রাথমিক পর্যায়ে ৫টি ভাগের প্রতিটিতে ১ গজ পর্যন্ত দেখাতে হবে। আবার, প্রাথমিক পর্যায়ে মান ১ গজ হলে দ্বিতীয় পর্যায়ে স্কেলকে গজের ঠিক ছোট একক হিসেবে ফুটে বিভক্ত করতে হবে এবং এক্ষেত্রে প্রতিটি ভাগে ১ ফুট করে ৩ ফুট বা ১ গজ দেখাতে হবে।



চিত্র: ৮.৪ সরল স্কেলে প্রাথমিক ও দ্বিতীয় পর্যায়ের ভাগ

সরল স্কেলের সুবিধা ও অসুবিধা: গঠন কাঠামোগতভাবে প্রাথমিক ও দ্বিতীয় পর্যায়ের শ্রেণিবিভাগ থাকায় সরল স্কেল দ্বারা মানচিত্রে দুইটি স্থানের দূরত্ব সহজে পরিমাপ করা যায়। এ স্কেলের প্রধান সুবিধা পরিবর্তন করলেও তা প্রকৃত স্কেলকে নির্দেশ করে। এ পরিমাপের একক যে সমস্ত দেশে প্রচলিত, সেই সকল দেশ ভিন্ন বিশ্বের অন্যান্য দেশের জন্য প্রযোজ্য নয়। এছাড়া, তৃতীয় পর্যায়ের কোনো ভাগ না থাকায় এ স্কেল দ্বারা মানচিত্রে দুটি স্থানের দূরত্ব সূক্ষ্মভাবে পরিমাপ করা সম্ভব নয়।



চিত্র ৮.৫: স্কেলের ব্যবহার

উদাহরণ ১। প্রতিভূ অনুপাত (R.F) ১: ৪২ এর সাহায্যে গজ ও ফুট দেখাতে একটি সরল স্কেল অঙ্কন করুন।

প্রশ্নানুসারে,

মানচিত্রে ১ ইঞ্চি ভূমির ৪২ ইঞ্চি দূরত্ব প্রদর্শন করে।

$$\therefore \quad " \quad ৫ \quad " \quad " \quad \frac{৫ \times ৪২}{৩৬} \quad " \quad " \quad " \quad [যেহেতু ৩৬ ইঞ্চি = ১ গজ]$$

$$= ৫.৮৩ গজ$$

[৫.৮৩ গজ একটি ভগ্নাংশিক সংখ্যা। তাই একে পূর্ণ সংখ্যায় পরিণত করে নিতে হবে। এক্ষেত্রে ৫.৮৩ কে পূর্ণসংখ্যা ৬ হিসেবে ধরা হলো এবং প্রতিটি মূখ্য ভাগ ১ গজ করে হলে মূখ্য ভাগের সংখ্যা হবে ৬টি। কারণ একটি রেখাকে ইচ্ছেমত ভাগ করা যায়। কিন্তু একটি সংখ্যাকে ইচ্ছেমত ভাগ করা যায় না।]

ভূমিতে ৫.৮৩ গজ মানচিত্রের ৫ ইঞ্চি দূরত্ব প্রদর্শন করে।

$$\therefore \quad \text{ভূমিতে ১ গজ মানচিত্রে } \frac{৫}{৫.৮৩} \text{ ইঞ্চি } " \quad " \quad "$$

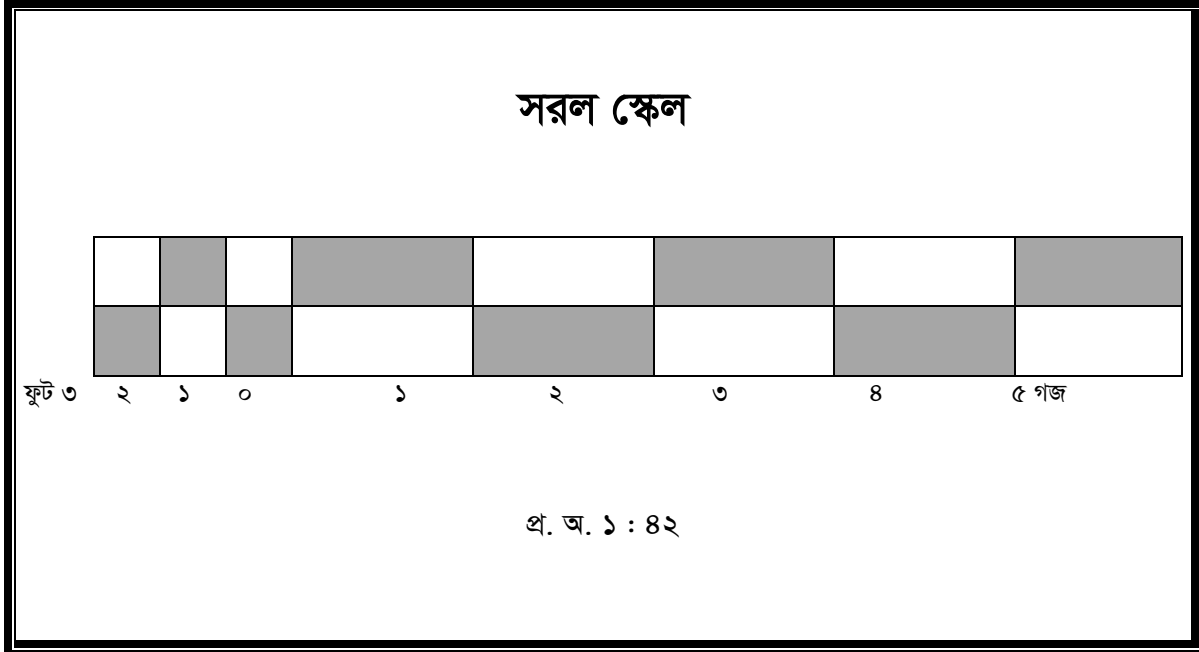
$$\therefore \quad \text{ভূমিতে ৬ গজ মানচিত্রে } \frac{৫ \times ৬}{৫.৮৩} " \quad " \quad " \quad "$$

$$= ৫.১৪ \text{ ইঞ্চি।}$$

৬ গজ দেখানোর জন্য মানচিত্রে অঙ্কিত সরল স্কেলের দৈর্ঘ্য হবে ৫.১৪ ইঞ্চি।

$$\text{গৌণ ভাগের সংখ্যা} = \frac{\text{একটি মূখ্য ভাগের মান}}{\text{একটি গৌণ ভাগের মান}} = \frac{১ \text{ গজ বা } ৩ \text{ ফুট}}{১ \text{ ফুট}} = ৩ \text{ টি।}$$

অঙ্কন পদ্ধতি: ৫.১৪ ইঞ্চি দীর্ঘ একটি রেখা নিয়ে একে সমান ৬ ভাগে ভাগ করা হলো। প্রথম পর্যায়ের প্রতিটি ভাগ ১ গজ করে হলো। বামদিকে ১টি ঘর ছেড়ে যথাক্রমে ০, ১, ২, ৩, ৪, ৫ গজ লেখা হলো। বাম পাশের ঘরকে সমান ৩ ভাগে ভাগ করলে প্রতি ভাগ ১ ফুট করে হবে। ০ থেকে বামদিকে যথাক্রমে ১, ২, ৩ ফুট লেখা হলো। স্কেলের নিচে মাঝামাঝি স্থানে প্র. অ. ১ : ৪২ লেখা হলো।



চিত্র ৮.৬: সরল স্কেল

উদাহরণ ২। প্রতিভূ অনুপাত (R.F) ১: ৪০ এর সাহায্যে গজ ও ফুট দেখাতে একটি সরল স্কেল অঙ্কন করুন।

প্রশ্নানুসারে,

মানচিত্রে ১ ইঞ্চি ভূমির ৪০ ইঞ্চি দূরত্ব প্রদর্শন করে।

$$\therefore \quad " \quad ৫ \quad " \quad " \quad \frac{৫ \times ৪০}{৩৬} \quad " \quad " \quad " \quad [যেহেতু ৩৬ ইঞ্চি = ১ গজ]$$

$$= ৫.৫৫ গজ$$

[৫.৫৫ গজ একটি ভগ্নাংশিক সংখ্যা। তাই একে পূর্ণ সংখ্যায় পরিণত করে নিতে হবে। এক্ষেত্রে ৫.৫৫ কে পূর্ণসংখ্যা ৬ হিসেবে ধরা হলো এবং প্রতিটি মুখ্য ভাগ ১ গজ করে হলে মুখ্য ভাগের সংখ্যা হবে ৬টি। কারণ একটি রেখাকে ইচ্ছেমত ভাগ করা যায়। কিন্তু একটি সংখ্যাকে ইচ্ছেমত ভাগ করা যায় না।]

ভূমিতে ৫.৫৫ গজ মানচিত্রের ৫ ইঞ্চি দূরত্ব প্রদর্শন করে।

$$\therefore \quad \text{ভূমিতে ১ গজ মানচিত্রে } \frac{৫}{৫.৫৫} \text{ ইঞ্চি} \quad " \quad " \quad "$$

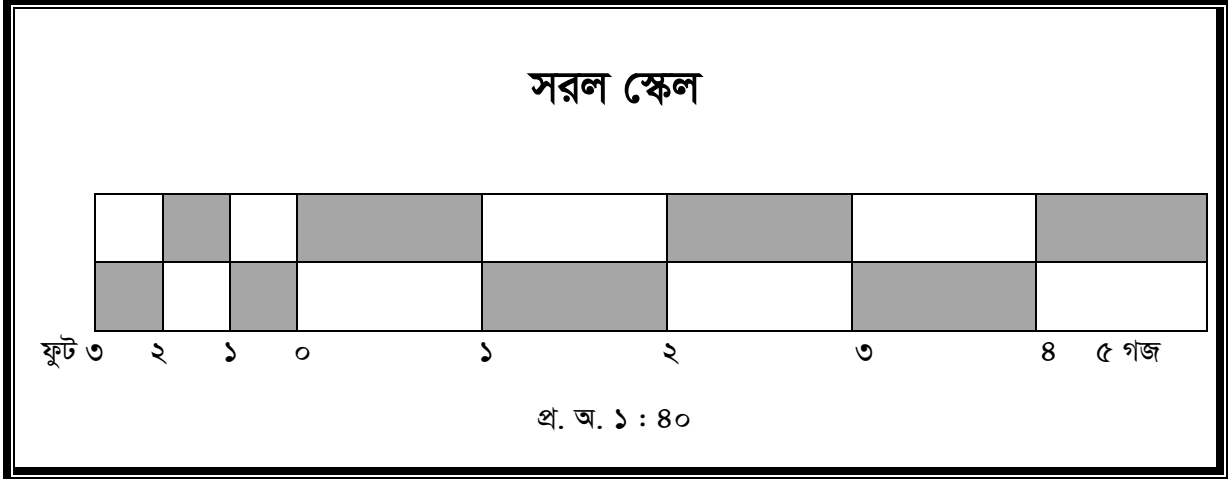
$$\therefore \quad \text{ভূমিতে ৬ গজ মানচিত্রে } \frac{৫ \times ৬}{৫.৫৫} \text{ ইঞ্চি} \quad " \quad " \quad "$$

$$= ৫.৪০ \text{ ইঞ্চি।}$$

৬ গজ দেখানোর জন্য মানচিত্রে অঙ্কিত সরল স্কেলের দৈর্ঘ্য হবে ৫.৪০ ইঞ্চি।

$$\text{গৌণ ভাগের সংখ্যা} = \frac{\text{একটি মুখ্য ভাগের মান}}{\text{একটি গৌণ ভাগের মান}} = \frac{১ \text{ গজ বা } ৩ \text{ ফুট}}{১ \text{ ফুট}} = ৩ \text{ টি}।$$

অঙ্কন পদ্ধতি: ৫.৪০ ইঞ্চি দীর্ঘ একটি রেখা নিয়ে একে সমান ৬ ভাগে ভাগ করা হলো। প্রথম পর্যায়ের প্রতিটি ভাগ ১ গজ করে হলো। বামদিকে ১টি ঘর ছেড়ে যথাক্রমে ০, ১, ২, ৩, ৪, ৫ গজ লেখা হলো। বাম পাশের ঘরকে সমান ৩ ভাগে ভাগ করলে প্রতি ভাগ ১ ফুট করে হবে। ০ থেকে বামদিকে যথাক্রমে ১, ২, ৩ ফুট লেখা হলো। স্কেলের নিচে মাঝামাঝি স্থানে প্র. অ. ১ : ৪০ লেখা হলো।



চিত্র ৮.৭: সরল স্কেল

উদাহরণ ৩। প্রতিভূ অনুপাত (R.F) ১: ৬০,০০০ স্কেলে মাইল ও ফার্লং দেখাবার জন্য একটি সাধারণ স্কেল অঙ্কন করুন।

প্রশ্নানুসারে,

মানচিত্রে ১ ইঞ্চি ভূমির ৬০,০০০ ইঞ্চি দূরত্ব প্রদর্শন করে।

$$\therefore \quad \text{" } ৫ \text{ " " } \frac{৫ \times ৬০০০০}{৬৩৬০} \text{ " " " } \quad [\text{যেহেতু } ৬৩৬০ \text{ ইঞ্চি} = ১ \text{ মাইল}]$$

$$= ৪.৭৩ \text{ মাইল}$$

[৪.৭৩ মাইল একটি ভগ্নাংশিক সংখ্যা। তাই একে পূর্ণ সংখ্যায় পরিণত করে নিতে হবে। এক্ষেত্রে ৪.৭৩ কে পূর্ণসংখ্যা ৫ হিসেবে ধরা হলো এবং প্রতিটি মুখ্য ভাগ ১ মাইল করে হলে মুখ্য ভাগের সংখ্যা হবে ৫টি। কারণ একটি রেখাকে ইচ্ছেমত ভাগ করা যায়। কিন্তু একটি সংখ্যাকে ইচ্ছেমত ভাগ করা যায় না।]

ভূমিতে ৪.৭৩ মাইল মানচিত্রের ৫ ইঞ্চি দূরত্ব প্রদর্শন করে।

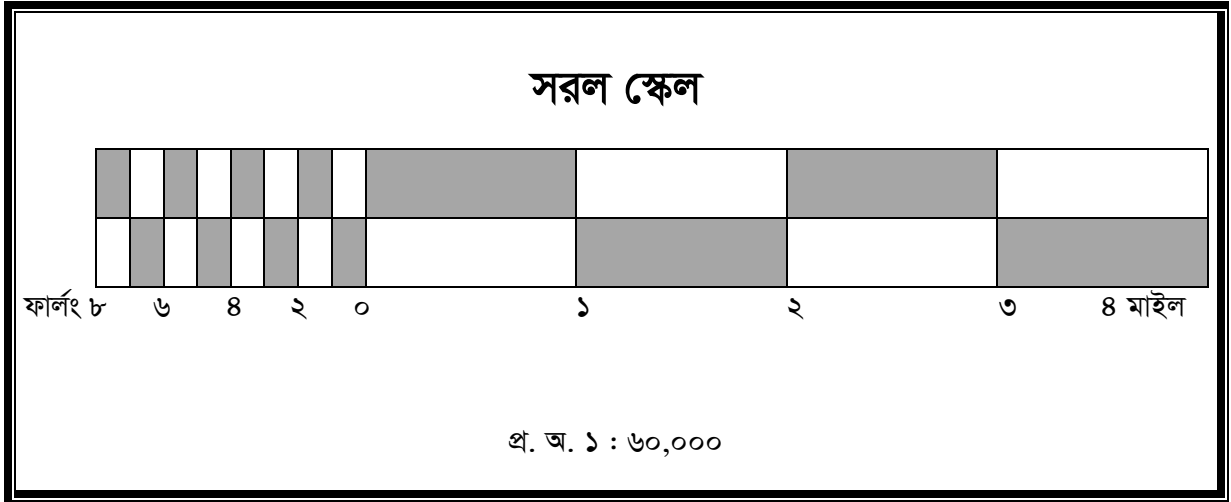
$$\therefore \quad \text{ভূমিতে } ১ \text{ মাইল মানচিত্রে } \frac{৫}{৪.৭৩} \text{ ইঞ্চি " " "}$$

$$\therefore \quad \text{ভূমিতে } ৫ \text{ মাইল মানচিত্রে } \frac{৫ \times ৫}{৪.৭৩} \text{ ইঞ্চি} = ৫.২৮ \text{ ইঞ্চি}$$

৫ মাইল দেখানোর জন্য মানচিত্রে অঙ্কিত সরল স্কেলের দৈর্ঘ্য হবে ৫.২৮ ইঞ্চি

$$\text{গৌণ ভাগের সংখ্যা} = \frac{\text{একটি মুখ্য ভাগের মান}}{\text{একটি গৌণ ভাগের মান}} = \frac{১ \text{ মাইল বা } ৮ \text{ ফার্লং}}{১ \text{ ফার্লং}} = ৮ \text{ টি}।$$

অঙ্কন পদ্ধতি: ৫.২৮ ইঞ্চি দীর্ঘ সরলরেখাকে সমান ৫ ভাগে বিভক্ত করার পর এ স্তরে বামদিকের প্রথম অংশকে দ্বিতীয় পর্যায়ে ক্ষুদ্রতম ভাগে বিভক্ত করা হয়। বামদিকের ১টি ভাগের মান ১ মাইল হওয়ায় গঠন কাঠামো অনুযায়ী মাইলের ক্ষুদ্রতম একক হিসেবে ফার্লং দেখানোর জন্য সুবিধামত রুলার ব্যবহার করে অথবা ১ ফার্লং করে দূরত্ব প্রকাশ করবে। ১ মাইল = ৮ ফার্লং বলে সর্ববামের ঘরটিকে ৮ ভাগে ভাগে করা হয়েছে। এ স্তরে পরিমাপ সুবিধার্থে অঙ্কিত স্কেলকে ০.২" প্রশস্ততায় উল্লম্ব ও অনুভূমিক মোট ২৪টি ভিন্ন আকৃতির আয়তক্ষেত্র অঙ্কন করা হলো। এ স্তরে অঙ্কিত স্কেলের প্রাথমিক ও দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রত্যেকটি অংশের মান, স্কেলের শিরোনাম, প্রতিভূ অনুপাত, স্কেলের সীমানা প্রভৃতি নির্দেশ করে স্কেলের কাঠামোগত অঙ্কন প্রক্রিয়া সম্পাদন করা হলো।



চিত্র ৮.৮: সরল স্কেল

উদাহরণ ৪। ১" তে ১ মাইলের সাহায্যে একটি মিটার স্কেল অঙ্কন করুন।

সমাধান: এখানে ১" = ১ মাইল

$$১" = ৬৩৩৬০" \text{ (৬৩৩৬০" = ১ মাইল)}$$

$$\therefore \text{প্র.ভ. } ১ : ৬৩৩৬০$$

মানচিত্রের দূরত্ব ১ সেন্টিমিটার = ভূমিতে দূরত্ব ৬৩৩৬০ সেন্টিমিটার

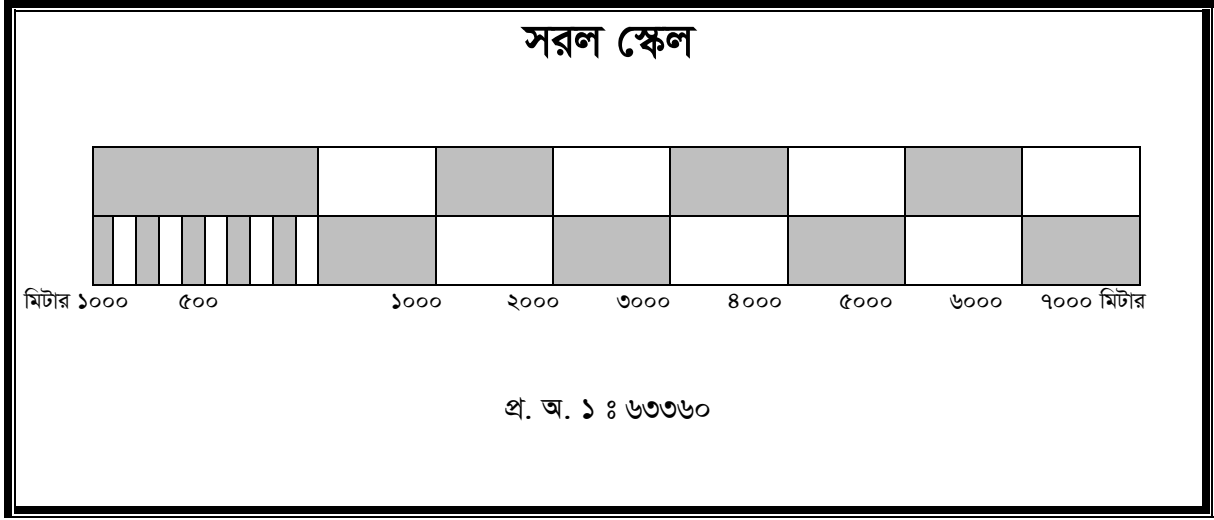
$$\text{" " ১ " = " " } \frac{৬৩৩৬০}{১০০} \text{ মিটার = ৬৩৩.৬ মিটার}$$

৬৩৩.৬ মিটার ভূমির দূরত্ব হলে মানচিত্রে দূরত্ব = ১ সেন্টিমিটার

$$\therefore \text{১ " " " " " " " = } \frac{১}{৬৩৩.৬} \text{ "}$$

$$\therefore \text{৮০০০ " " " " " " " = } \frac{১ \times ৮০০০}{৬৩৩.৬} = ১২.৬ \text{ সেন্টিমিটার}$$

$\therefore$ স্কেলের দৈর্ঘ্য = ১২.৬ সেন্টিমিটার।



চিত্র ৮.৯: সরল স্কেল

অঙ্কন পদ্ধতি: ১২.৬ সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট একটি সরলরেখা টেনে তাকে সমান আট (৮) ভাগে ভাগ করলে প্রতি মুখ্য ভাগের মান হবে ১০০০ মিটার করে এবং সর্বমোট ৮০০০ মিটার নির্দেশ হবে। তারপর বাম পাশের মুখ্য ভাগটিকে দশ ভাগে ভাগ করলে প্রতিটি গৌণ ভাগ ১০০ মিটার দূরত্বকে নির্দেশ করবে। সবশেষে অঙ্কিত স্কেলের উপর সরল স্কেল ও নিচে প্রতীক ভগ্নাংশ (প্র.অ.) ১ : ৬৩৩৬০ লিখতে হবে।

উদাহরণ ৫। ১" তে ৭ মাইল এর সাহায্যে একটি কিলোমিটার স্কেল অঙ্কনকরুন।

সমাধান: দেয়া আছে ১" = ৭ মাইল

$$১" = ৬৩৩৬০ \times ৭ \text{ (যেহেতু ১ মাইল = ৬৩৩৬০") } \therefore \text{প্র.অ. ১ : ৪৪৩৫২০}$$

মানচিত্রে দূরত্ব ১ সে.মি. = ভূমিতে দূরত্ব ৪৪৩৫২০ সে.মি.

$$\text{" " ১ " = " " } \frac{৪৪৩৫২০}{১০০০০০} \text{কি. মি.} = \frac{৪৪৩৫২}{১০০০০} \text{কি. মি.}$$

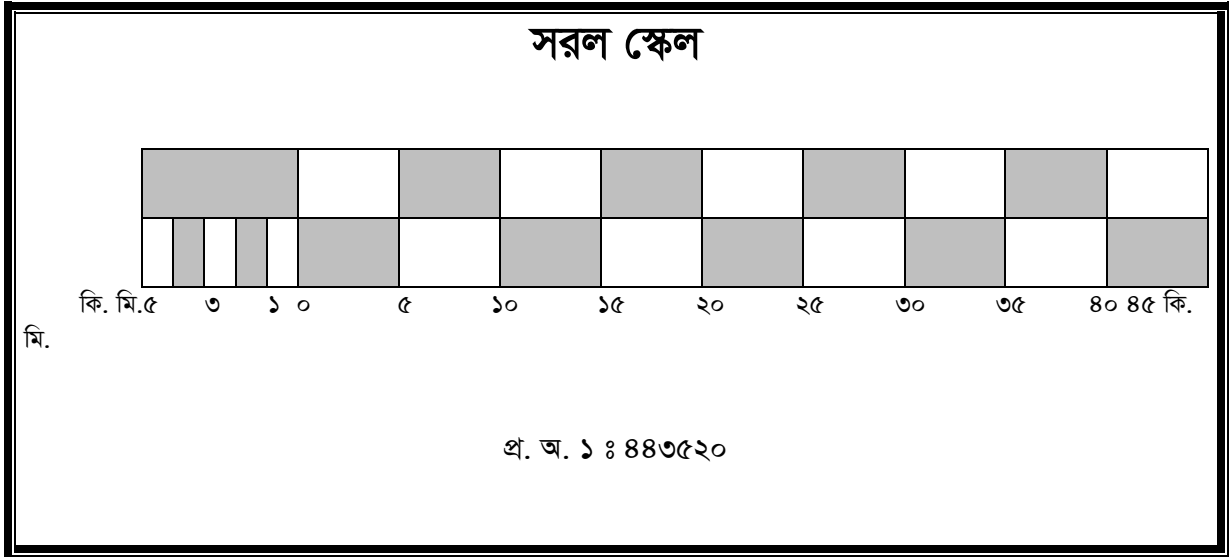
$$\frac{৪৪৩৫২}{১০০০০} \text{কি. মি. ভূমির দূরত্ব হলে মানচিত্রে দূরত্ব} = ১ \text{ সে.মি.}$$

$$\therefore \quad ১ \quad \text{" " " " " " " " } = \frac{১ \times ১০০০০}{৪৪৩৫২} \text{"}$$

$$\therefore \quad ৫০ \quad \text{" " " " " " " " } = \frac{১০০০০ \times ৫০}{৪৪৩৫২} \text{"}$$

$$= \frac{৫০০০০০}{৪৪৩৫২} = ১১.২৭ \text{ সে.মি.} = ১১.৩ \text{ সে.মি. (প্রায়)}$$

$$\therefore \text{স্কেলের দৈর্ঘ্য} = ১১.৩ \text{ সে.মি.}$$



চিত্র ১০: সরল স্কেল

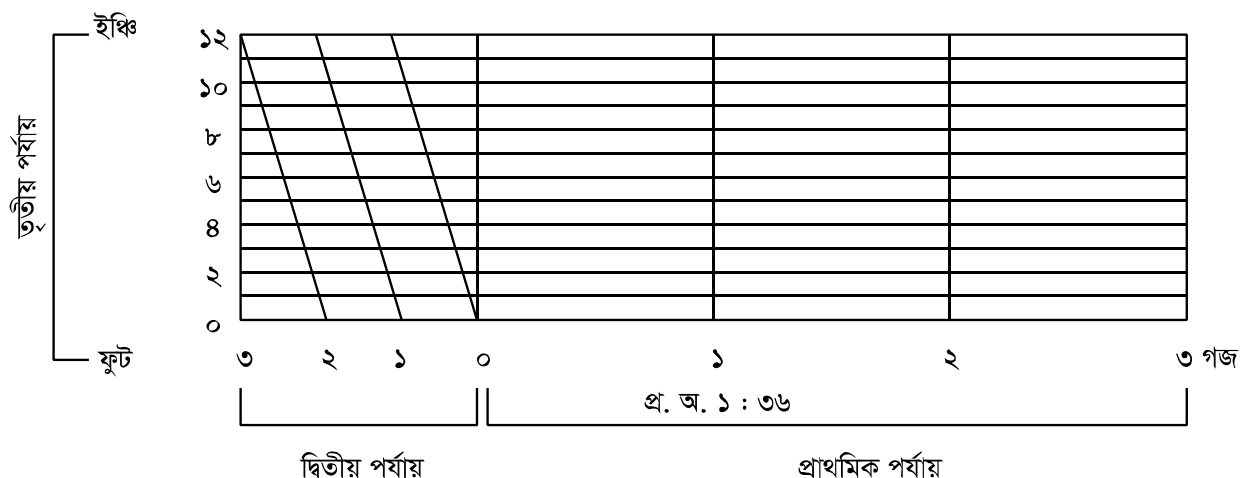
অঙ্কন পদ্ধতি: ১১.৩ সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট একটি সরল রেখা টেনে তাকে দশ ভাগে ভাগ করলে প্রতিটি মুখ্য ভাগের মান হবে ৫ কি. মি. করে। তারপর বাম পাশের ভাগকে ৫ ভাগে ভাগ করলে প্রতিটি গৌণ ভাগের মান হবে ১ কি. মি. করে। সবশেষে অঙ্কিত স্কেলটির উপরে সরল স্কেল ও নিচে প্রতিভূ ভগ্নাংশ (প্র.অ.) ১ : ৪৪৩৫২০ লিখতে হবে।

কর্ণীয় স্কেল (Diagonal Scale)

কতিপয় কর্ণের সাহায্যে অঙ্কিত স্কেলকে কর্ণীয় স্কেল বলে। যেকোনো আয়তক্ষেত্রের পরস্পর বিপরীত কোণদ্বয় যে বাহুর দ্বারা যোগ করা হয় তাকে কর্ণ বলে। কর্ণীয় স্কেলে তিন পর্যায়ের ভাগ দেখানো হয়। যথা- প্রাথমিক, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ের ভাগ। কর্ণীয় স্কেল অঙ্কনের জন্য একটি নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের সরলরেখাকে প্রাথমিক ও দ্বিতীয় পর্যায়ে এবং উল্লম্বভাবে অঙ্কিত অন্য একটি সরলরেখাকে তৃতীয় পর্যায়ের ভাগে বিভক্ত করতে হয় এবং এক্ষেত্রে প্রতিটি বিভাজন পর্যায়ের মান বিভাজ্য সংখ্যা হওয়া বাঞ্ছনীয়।

চতুর্ভুজ ক্ষেত্রের পরস্পর বিপরীত কোণদ্বয়ের সরলরেখাকে কর্ণ বলে এবং এ ধারণার ভিত্তিতে কোনো সরলরেখা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ পরিমাপের জন্য কতিপয় কর্ণের সাহায্যে সৃষ্ট স্কেল মূলত কর্ণীয় স্কেল নামে পরিচিত। কোনো রেখার দৈর্ঘ্য জ্যামিতিক কাঠামোতে সূক্ষ্মভাবে পরিমাপের জন্য এ স্কেল ব্যবহৃত হয়।

কর্ণীয় স্কেলের গঠন-কাঠামো: সাধারণ স্কেলের দ্বিতীয় পর্যায়ের বিভাগসমূহকে উল্লম্ব প্রক্রিয়ায় তৃতীয় পর্যায়ে পুনরায় বিভাজন করে কর্ণীয় স্কেল অঙ্কন করা হয়। কর্ণীয় স্কেলের দৈর্ঘ্য মাইলের স্কেলে ৪-৬" এবং কি. মি. স্কেলে ১০-১৫ সে. মি. পর্যন্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। এক্ষেত্রে বিভাজ্যমান এমন হওয়া উচিত যাতে ১০-১৫ সে. মি. মধ্যে হয়। আবার, কর্ণীয় স্কেলের উল্লম্ব দৈর্ঘ্য বা উচ্চতা ১-১.৫" পর্যন্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়। কর্ণীয় স্কেল ৪-৬ ইঞ্চি এবং ১০-১৫ সে. মি. পর্যন্ত দীর্ঘ হয় এবং উল্লম্বভাবে ০.১ ইঞ্চি দূরত্বে প্রয়োজনীয় সংখ্যক রেখা অঙ্কন করতে হয়। অঙ্কন ও বর্ণনার সুবিধার্থে একটি নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের সরলরেখাকে সাধারণ সরল স্কেলের ন্যায় প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের ভাগে বিভক্ত করার পর দ্বিতীয় পর্যায়ের ভাগকে পরিমাপকের বৈশিষ্ট্যানুযায়ী আরও ক্ষুদ্রতর ভাগে উল্লম্বভাবে বিভক্ত করলে তাকে তৃতীয় পর্যায়ের ভাগ বলে (চিত্র ৮.১১)। কর্ণীয় স্কেলে এ ধরনের বিভাজন প্রক্রিয়া অঙ্কন, পঠন ও মানচিত্রে দুটি স্থানের মধ্যকার দৈর্ঘ্য পরিমাপের জন্য সহজ।



কণীয় স্কেলে প্রাথমিক পর্যায়ে প্রতিটি অংশের পরিমাপ এককের মান একাধিক না হলে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ের বিভাজনে নিম্নতর একক প্রকাশ করতে হবে। তবে প্রাথমিক পর্যায়ে মান একাধিক হলে হিসেব অনুযায়ী একই একক বা ক্ষুদ্রতর একক ব্যবহার করতে হবে।

কণীয় স্কেলের ব্যবহার: কণীয় স্কেল থেকে একই জাতীয় দুই বা তিন প্রকার এককের (যেমন- গজ, ফুট, ইঞ্চি ইত্যাদি) মাপ অতি সহজে পাওয়া যায়। এ স্কেল হতে দশমিক বা অধিকতর সূক্ষ্ম মাপ গ্রহণ করা যায়। একটি ক্ষুদ্র রেখাকে সুবিধামত কতিপয় সমানভাগে বিভক্ত করার জন্য কণীয় স্কেলের ব্যবহার সর্বাধিক। কণীয় স্কেলের সাহায্যে নিখুঁতভাবে মানচিত্র প্রস্তুত ও অঙ্কন করা যায়। এ স্কেল ব্যবহারের মাধ্যমে জমির সীমানা ও আয়তন নির্ধারণের সুবিধা হয়।

অসুবিধা: এ স্কেলের প্রধান অসুবিধা, অঙ্কিত স্কেলে ব্যবহৃত দৈর্ঘ্য পরিমাপের একক যেসব দেশে প্রচলিত সেসব দেশে ভিন্ন বিশ্বের অন্যান্য দেশে প্রযোজ্য নয়। তৃতীয় পর্যায়ের ভাগ থাকায় এ স্কেল দ্বারা সাধারণ স্কেলের তুলনায় পরিমাপ কঠিন।

- ১। অঙ্কিত করণীয় স্কেলটির দৈর্ঘ্য অবশ্যই ১২ থেকে ১৫ সে. মি. বা ৪ থেকে ৬ ইঞ্চি রাখবে।
 - ২। প্রশ্নানুসারে মুখ্য ভাগের সংখ্যা ১৫ সে. মি. বা ৬ ইঞ্চি দৈর্ঘ্যের মধ্যে যতো বেশি সংখ্যক করা যায় ততোগুলো করবেন।
 - ৩। স্কেলের বামদিকে করণীয় অংশটি আঁকতে হবে। এটি করণীয় স্কেলের আদর্শ উপস্থাপনা।
 - ৪। মুখ্য ও গৌণ ভাগগুলো করার জন্য যেখানে জ্যামিতিক পদ্ধতি দরকার, সেখানেই এটি অনুসরণ করবে, অন্যথায় এটির দরকার নেই।
 - ৫। মুখ্য ও গৌণ ভাগে এককগুলোর মান যথাযথভাবে লিখতে হবে।
 - ৬। স্কেলের শিরোনাম ও R.F অবশ্যই লিখতে হবে।

কণীয় স্কেলের অঙ্কন পদ্ধতি: কণীয় স্কেলের অঙ্কন-কাঠামো সাধারণ স্কেলের তুলনায় ভিন্ন ধরনের। এ স্কেলের দৈর্ঘ্য ও বিভাজ্য সংখ্যা নির্ণয় প্রক্রিয়া প্রকৃতপক্ষে সাধারণ স্কেলের ন্যায় তবে তৃতীয় পর্যায়ের শ্রেণিকরণে অঙ্কন কৌশল সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের ধরা যাক, ABCD একটি সমকোণী চতুর্ভুজ যার BC দৈর্ঘ্য মূল স্কেলের একটি মূল্য ভাগের সমান দৈর্ঘ্য নির্দেশ করে।

চিত্র:১২ গৌণ ও টার্শিয়ারি ভাগের গঠন

জ্যামিতিক পদ্ধতিতে BC রেখার দৈর্ঘ্যকে সমান ১০টি গৌণ ভাগে ভাগ করা হলো। এ চতুর্ভুজের উলম্ব বাহু (AB ও CD) দুটিকে একটি নির্দিষ্ট মাপে সমান ১০টি ভাগে ভাগ করা হলো। উলম্ব রেখা দুটির অনুরূপ ভাগ বিন্দুগুলোকে BC অথবা AD রেখার সমান্তরালে যোগ করা হলো। BC রেখায় চিহ্নিত ভাগ বিন্দুগুলোকে AD রেখার ওপর প্রতিস্থাপন করা হলো। এরপর ভাগ বিন্দু সমন্বিত আয়তক্ষেত্রিক ছকে BC রেখার প্রারম্ভিক বিন্দু B থেকে AD রেখার ওপর প্রথম ভাগ বিন্দুকে P যোগ করায় কোনাকুনি সরলরেখা PB পাওয়া যায়। এভাবে PB-এর সমান্তরালে AD ও BC রেখার ওপর চিহ্নিত বিন্দুগুলোকে ক্রমান্বয়ে যোগ করলে কর্ণীয় অংশের অঙ্কন সম্পূর্ণ হয়।

এ কর্ণীয় স্কেলের অঙ্কন পদ্ধতি বিভিন্ন উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হলো-

উদাহরণ ১। প্রতিভূ অনুপাত (R.F) ১: ৪০ এর সাহায্যে গজ, ফুট ও ইঞ্চি দেখাতে একটি কর্ণীয় স্কেল অঙ্কন করুন।

প্রশ্নানুসারে,

মানচিত্রে ১ ইঞ্চি ভূমির ৪০ ইঞ্চি দূরত্ব প্রদর্শন করে।

$$\therefore \quad \text{৫ " " } \frac{80 \times ৫}{৩৬} \text{ " " " } = ৫.৫৫ \text{ গজ} \quad [\text{যেহেতু } ৩৬ \text{ ইঞ্চি} = ১ \text{ গজ}]$$

[৫.৫৫ গজ একটি ভগ্নাংশিক সংখ্যা। তাই একে পূর্ণ সংখ্যায় পরিণত করে নিতে হবে। এক্ষেত্রে ৫.৫৫ কে পূর্ণসংখ্যা ৬ হিসেবে ধরা হলো। কারণ একটি রেখাকে ইচ্ছেমত ভাগ করা যায়। কিন্তু একটি সংখ্যাকে ইচ্ছেমত ভাগ করা যায় না।]

ভূমিতে ৫.৫৫ গজ মানচিত্রের ৫ ইঞ্চি দূরত্ব প্রদর্শন করে।

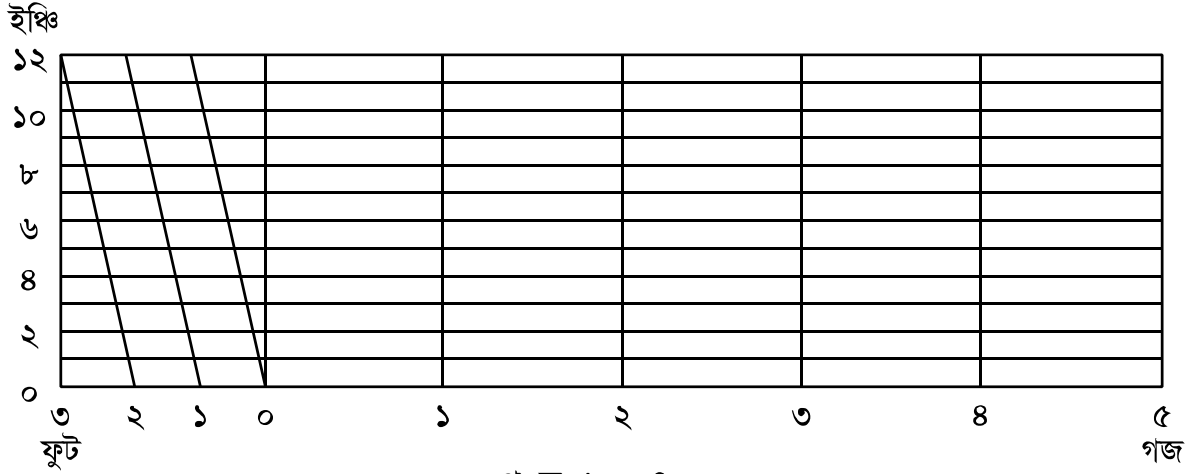
$$\therefore \quad \text{ভূমিতে } ১ \text{ গজ মানচিত্রে } \frac{৫}{৫.৫৫} \text{ ইঞ্চি " " "}$$

$$\therefore \quad \text{ভূমিতে } ৬ \text{ গজ মানচিত্রে } \frac{৫ \times ৬}{৫.৫৫} \text{ ইঞ্চি " " " } = ৫.৪০ \text{ ইঞ্চি।}$$

৬ গজ দেখানোর জন্য মানচিত্রে অঙ্কিত কর্ণীয় স্কেলের দৈর্ঘ্য হবে ৫.৪০ ইঞ্চি।

অঙ্কন পদ্ধতি: ৫.৪০ ইঞ্চি দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট একটি সরলরেখা অঙ্কন করে তাকে সমান ৬ ভাগে ভাগ করতে হবে। প্রতি ভাগের মান হবে ১ গজ করে। সর্ববামের অংশটিকে দ্বিতীয় পর্যায়ের জন্য বাদ দিয়ে পরের ডানদিকের ভাগসমূহের নিচে যথাক্রমে ০, ১, ২, ৩, ৪ এবং ৫ লিখে তার ডানদিকে গজ লিখতে হবে। দ্বিতীয় পর্যায়ে, সর্ববাম পাশের ভাগকে সমান ৩ ভাগে ভাগ করতে হবে। প্রতি ভাগের মান হবে ১ ফুট করে। এরপর ০ থেকে বামদিকে ভাগসমূহের নিচে যথাক্রমে ১, ২ এবং ৩ লিখে তার বামপাশে ফুট লিখতে হবে। তৃতীয় পর্যায়ের ভাগের জন্য অঙ্কিত রেখাটির উভয় প্রান্তে দুটি লম্বরেখা টেনে সেগুলোকে ০.১ ইঞ্চি ব্যবধানে ১২ ভাগ (১২ ইঞ্চি = ১ ফুট) করে সমান্তরালে ১২টি রেখা টানতে হবে। শীর্ষ রেখাটিকে নিচের রেখার প্রথম পর্যায়ের ভাগের অনুরূপ ভাগ করে সংযুক্ত করতে হবে। দ্বিতীয় পর্যায়ের ভূমিতে ০ ফুটের সাথে উপরের বাহুর ১ ফুট সংযুক্ত করে একটি কর্ণ টানতে হবে এবং এভাবে ক্রমান্বয়ে ভূমিতে ১ এবং ২ ফুটের সাথে উপরের বাহুর যথাক্রমে ২ এবং ৩ ফুটকে সংযুক্ত করে মোট ৩টি কর্ণ টানতে হবে। তৃতীয় পর্যায়ের উল্লম্ব পাশে বামদিকে নিচ থেকে মান বসিয়ে ইঞ্চি লিখতে হবে। সর্বশেষ স্কেলের ঠিক নিচে প্র. অ. ১ : ৪০ লিখতে হবে।

কর্ণীয় স্কেল



প্র. অ. ১ : ৩৪

চিত্র- ৮.১৩: কর্ণীয় স্কেল

উদাহরণ ২। প্রতিভূ অনুপাত (R.F) ১: ৫০ এর সাহায্যে গজ, ফুট ও ইঞ্চি দেখাতে একটি কর্ণীয় স্কেল অঙ্কন করুন।

প্রশ্নানুসারে,

মানচিত্রে ১ ইঞ্চি ভূমির ৫০ ইঞ্চি দূরত্ব প্রদর্শন করে।

$$\therefore \quad \text{" ৫ " " } \frac{৫০ \times ৫}{৩৬} \text{ " " " } = ৬.৯৪ \text{ গজ} \quad [\text{যেহেতু } ৩৬ \text{ ইঞ্চি} = ১ \text{ গজ}]$$

[৬.৯৪ গজ একটি ভগ্নাংশিক সংখ্যা। তাই একে পূর্ণ সংখ্যায় পরিণত করে নিতে হবে। এক্ষেত্রে ৬.৯৪ কে পূর্ণসংখ্যা ৭ হিসেবে ধরা হলো। কারণ একটি রেখাকে ইচ্ছেমত ভাগ করা যায়। কিন্তু একটি সংখ্যাকে ইচ্ছেমত ভাগ করা যায় না।]

ভূমিতে ৬.৯৪ গজ মানচিত্রের ৫ ইঞ্চি দূরত্ব প্রদর্শন করে।

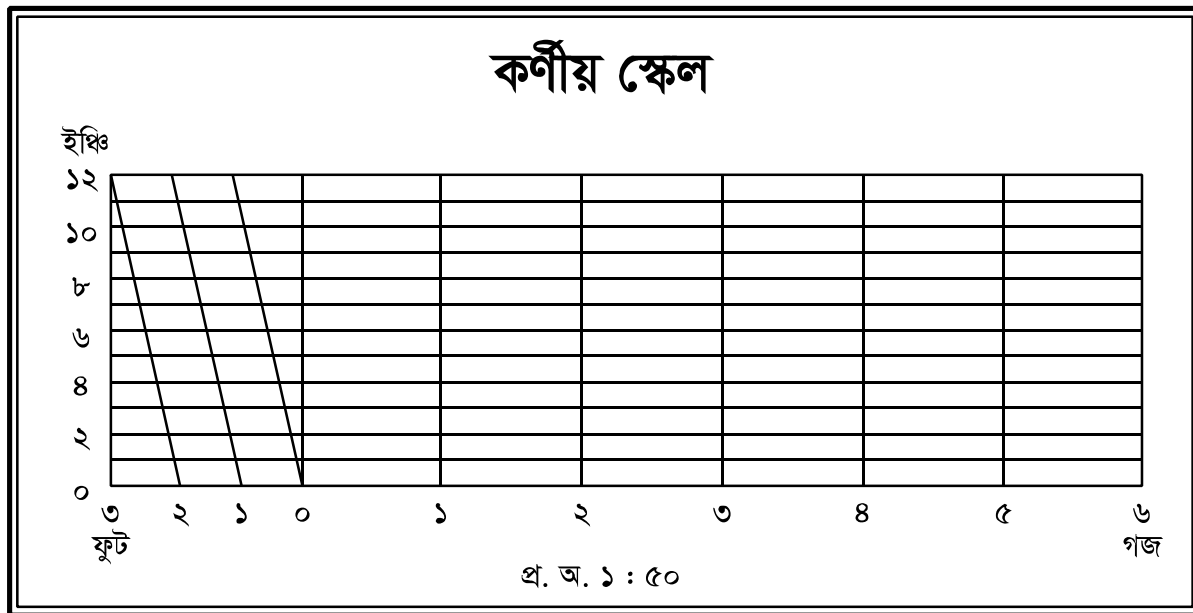
$$\therefore \quad \text{ভূমিতে } ১ \text{ গজ মানচিত্রে } \frac{৫}{৬.৯৪} \text{ ইঞ্চি " " "}$$

$$\therefore \quad \text{ভূমিতে } ৭ \text{ গজ মানচিত্রে } \frac{৫ \times ৬}{৬.৯৪} \text{ ইঞ্চি " " " } = ৫.০৪ \text{ ইঞ্চি।}$$

৬ গজ দেখানোর জন্য মানচিত্রে অঙ্কিত কর্ণীয় স্কেলের দৈর্ঘ্য হবে ৫.০৪ ইঞ্চি।

অঙ্কন পদ্ধতি: ৫.৪০ ইঞ্চি দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট একটি সরলরেখা অঙ্কন করে তাকে সমান ৭ ভাগে ভাগ করতে হবে। প্রতি ভাগের মান হবে ১ গজ করে। সর্ববামের অংশটিকে দ্বিতীয় পর্যায়ের জন্য বাদ দিয়ে পরের ডানদিকের ভাগসমূহের নিচে যথাক্রমে ০, ১, ২, ৩, ৪, ৫ এবং ৬ লিখে তার ডানদিকে গজ লিখতে হবে। দ্বিতীয় পর্যায়ে, সর্ববাম পাশের ভাগকে সমান ৩ ভাগে ভাগ করতে হবে। প্রতি ভাগের মান হবে ১ ফুট করে। এরপর ০ থেকে বামদিকে ভাগসমূহের নিচে যথাক্রমে ১, ২ এবং ৩ লিখে তার বামপাশে ফুট লিখতে হবে। তৃতীয় পর্যায়ের ভাগের জন্য অঙ্কিত রেখাটির উভয় প্রান্তে দুটি লম্বরেখা টেনে সেগুলোকে ০.১ ইঞ্চি ব্যবধানে ১২ ভাগ (১২ ইঞ্চি = ১ ফুট) করে সমান্তরালে ১২টি রেখা টানতে হবে। শীর্ষ রেখাটিকে নিচের রেখার প্রথম পর্যায়ের ভাগের অনুরূপ ভাগ করে সংযুক্ত করতে হবে। দ্বিতীয় পর্যায়ের ভূমিতে ০ ফুটের সাথে উপরের বাহুর ১ ফুট সংযুক্ত করে একটি

কর্ণ টানতে হবে এবং এভাবে ক্রমান্বয়ে ভূমিতে ১ এবং ২ ফুটের সাথে উপরের বাহুর যথাক্রমে ২ এবং ৩ ফুটকে সংযুক্ত করে মোট ৩টি কর্ণ টানতে হবে। তৃতীয় পর্যায়ের উল্লম্ব পাশে বামদিকে নিচ থেকে মান বসিয়ে ইঞ্চি লিখতে হবে। সর্বশেষ স্কেলের ঠিক নিচে প্র. অ. ১ : ৫০ লিখতে হবে।



চিত্র-৮.১৪: কর্ণীয় স্কেল

৮.২ মানচিত্রের সংকোচন ও সম্প্রসারণ (Reduction And Enlargement of Map)

মানচিত্র সংকোচন (Map Reduction)

মানচিত্রকে বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করতে গিয়ে ভূগোলবিদগণ প্রয়োজনমত কখনো মানচিত্রকে বড় বা কখনো ছোট বা সংকোচন করেন একটি সাধারণত স্কেল পরিবর্তনের মাধ্যমে করা হয়ে থাকে। মানচিত্রের সংকোচন বলতে অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর স্কেলে মানচিত্রের আকারগত পরিবর্তনকে বোঝায়। একটি নির্দিষ্ট স্কেলে মানচিত্রকে প্রয়োজন অনুসারে বৃহত্তর স্কেলে বিভিন্ন পদ্ধতিতে সংকোচন করা হয়। কোনো কোনো মানচিত্রকে ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যে অঙ্কন করার জন্য মানচিত্রের সংকোচন প্রয়োজন। এছাড়া পাশাপাশি অবস্থিত একাধিক মানচিত্রকে একটি পরিসরে দেখানোর জন্য মানচিত্রের সংকোচন দরকার।

মানচিত্রের স্কেলে বড় হয়ে আকার ছোট হয় এবং স্কেল ছোট হলে আকার বড় হয়

মানচিত্রের স্কেল পরিবর্তনের সাপেক্ষে উক্ত মানচিত্রের আকার পরিবর্তিত হয়। মানচিত্রের সংকোচনের ফলে মানচিত্রের স্কেল অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর হয়। একটি নির্দিষ্ট স্কেলের মানচিত্রকে প্রয়োজন অনুসারে অপেক্ষাকৃত বৃহৎ স্কেলে আকৃতিগত পরিবর্তনকে মানচিত্রের সংকোচন বলে। যে সমস্ত পদ্ধতিতে মানচিত্রের সংকোচন করা হয়। যথা—

১. যান্ত্রিক পদ্ধতি (Instrumental Method)
২. আলোকচিত্র পদ্ধতি (Photograph Method)
৩. ছক বা বর্গ পদ্ধতি (Square Method)
৪. ত্রিভুজ পদ্ধতি (Triangle Method)

মানচিত্রের সংকোচনে একটি নির্দিষ্ট স্কেলের মানচিত্র এমন একটি স্কেলে সংকোচন করতে হয় যাতে মূল মানচিত্রের বিভিন্ন ভৌগোলিক উপাদানের আকৃতি সঠিক থাকে। কোনো মানচিত্রের সংকোচন খুববেশি হলে মূল মানচিত্রে অবস্থিত বিভিন্ন ভৌগোলিক উপাদানের আকার ও অবস্থানগত ত্রুটি দেখা দেয়। এছাড়া মানচিত্রের সংকোচনের ক্ষেত্রে মানচিত্রের স্কেলের সঠিকতা ও মানচিত্রের আয়তনগত সঠিকতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

মানচিত্র সংকোচন সুবিধা ও অসুবিধা

মানচিত্রের সংকোচনে কোনো মানচিত্রের স্কেল অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর হয়। কোনো বড় মানচিত্রকে ক্ষুদ্র পরিসরে অঙ্কন সুবিধার্থে এবং পাশাপাশি অবস্থিত অনেকগুলো বড় মানচিত্রকে একত্রে দেখানোর নিমিত্তে মানচিত্রের সংকোচন করা। এছাড়াও বৃহৎ মানচিত্রের সামগ্রিক ভৌগোলিক উপাদানের জন্য ক্ষুদ্র পরিসরে অঙ্কনের নিমিত্তে মানচিত্র সংকোচন করা হয়। এছাড়া, ব্যাপক ও বিস্তৃত এলাকার সামগ্রিক ভৌগোলিক উপাদানকে একনজরে উপস্থাপন করার জন্য মানচিত্রের সংকোচন প্রয়োজন। সংকুচিত মানচিত্রে বৃহৎ এলাকার মানচিত্র উপাদান ক্ষুদ্র পরিসরে অঙ্কন করা হয়। ফলে স্থান সংকুলানের অভাবে বিশেষ বিশেষ তথ্য ও বিষয় সাধারণভাবে দেখানো হয়।

মানচিত্র সম্প্রসারণ (Map Enlargement)

মানচিত্রের সম্প্রসারণ মূলত মানচিত্রের আকারগত পরিবর্তন এবং এক্ষেত্রে মানচিত্রের স্কেল ক্ষুদ্রতর হয়। উল্লেখ্য, মানচিত্রের স্কেল ছোট হলে আকার বড় হয়। একটি নির্দিষ্ট স্কেলের মানচিত্রকে প্রয়োজন অনুসারে ক্ষুদ্রতর স্কেলে বিভিন্ন পদ্ধতিতে সম্প্রসারণ করা হয়। অধিকতর তথ্য সংযোজন এবং অধিকতর বিস্তৃত বিতরণ সুবিধার নিমিত্তে মানচিত্রের সম্প্রসারণ প্রয়োজন। এছাড়া, জরিপ কাজের সুবিধার্থে কোনো মানচিত্রকে একটি নির্দিষ্ট স্কেলে সম্প্রসারণ করা হয়।

কোনো মানচিত্রের স্কেল পরিবর্তন সাপেক্ষে উক্ত মানচিত্রের আকার পরিবর্তিত হয়। সুতরাং স্কেল পরিবর্তন দ্বারা মানচিত্রের আকার বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হলে তাকে মানচিত্রের সম্প্রসারণ বলে। অধিকতর তথ্য সংযোজন, ব্যাপক বিবরণ সুবিধা, ভিত্তি মানচিত্র ও জরিপ কাজের সুবিধার্থে মানচিত্রের সম্প্রসারণ প্রয়োজন। যে সমস্ত পদ্ধতিতে মানচিত্রের সম্প্রসারণ করা হয় সেগুলো হলো-

১. যন্ত্রপাতি, প্যান্টোগ্রাফ (Pantograph), ইডোগ্রাফ (Eidograph), সমানুপাতিক কম্পাস (Proportional Compass)
২. ত্রিভুজ পদ্ধতি (Triangular Method)
৩. আলোকচিত্র পদ্ধতি (Photograph Method)
৪. ছক বা বর্গ পদ্ধতি (Square Method)

যন্ত্র ও আলোকচিত্র পদ্ধতি ব্যয়বহুল হওয়ায় এবং সহজলভ্য না হওয়ায় বর্গ পদ্ধতি এবং ত্রিভুজ পদ্ধতিতে মানচিত্রের সম্প্রসারণ কৌশল অধিক ব্যবহৃত হয়। মানচিত্রের সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট স্কেলের মানচিত্র এমন একটি স্কেলে সম্প্রসারণ করতে হয় যাতে মূল মানচিত্রের বিভিন্ন ভৌগোলিক উপাদানের আকৃতি সঠিক থাকে। মানচিত্রের সম্প্রসারণ ব্যাপক হলে ভৌগোলিক উপাদানের আকার ও অবস্থানগত ত্রুটি দেখা দেয়। এছাড়া মানচিত্রের সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে মানচিত্রের স্কেলের সঠিকতা ও মানচিত্রের আয়তনগত সঠিকতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

মানচিত্র সম্প্রসারণের সুবিধা ও অসুবিধা

একটি নির্দিষ্ট স্কেলের মানচিত্রকে প্রয়োজন অনুসারে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র স্কেলে আকৃতিগত পরিবর্তনকে মানচিত্রের সম্প্রসারণ বলে। অধিকতর তথ্য সংগ্রহ, সংযোজন ও বিস্তৃত বিবরণের নিমিত্তে এবং জরিপ কার্যের সুবিধার্থে কোনো মানচিত্রকে একটি নির্দিষ্ট স্কেলে সম্প্রসারিত করা হয়। মানচিত্রের সম্প্রসারণে বিভিন্ন পদ্ধতির ব্যবহার থাকলেও এ গ্রন্থে বর্গ পদ্ধতি ও ত্রিভুজ পদ্ধতিতে মানচিত্রের সম্প্রসারণ প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

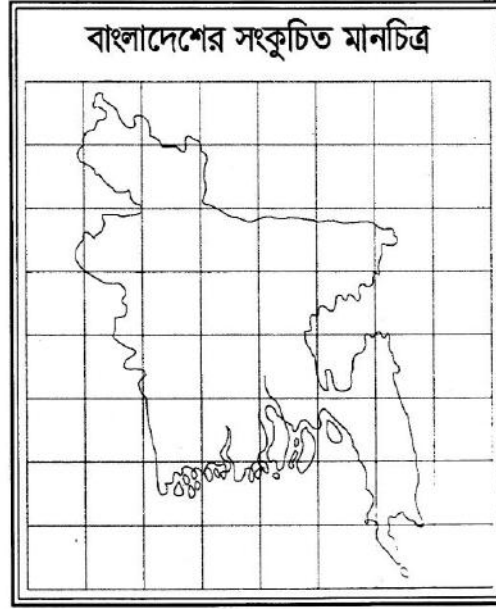
মানচিত্রের সম্প্রসারণের ত্রিভুজ পদ্ধতির তুলনায় বর্গ পদ্ধতি অনেক সহজ ও সুবিধাজনক। ত্রিভুজ পদ্ধতিতে সম্প্রসারিত মানচিত্রের আকারও পরিবর্তন হয়। ত্রিভুজ পদ্ধতিতে দীর্ঘাকৃতির মানচিত্র ছাড়া অন্য কোনো মানচিত্র স্কেলের কাঠামো অনুযায়ী অঙ্কন করা সম্ভব নয়। এ ছাড়া সম্প্রসারিত মানচিত্রের অনুপাত বেশি (যেমন- দ্বিগুণের বেশি) হলে মূল মানচিত্রের সাপেক্ষে সম্প্রসারিত মানচিত্রে বিভিন্ন ভৌগোলিক উপাদান আকার ও আয়তক্ষেত্রে পার্থক্য সৃষ্টি হয়।

মানচিত্র সংকোচন কৌশল: বর্গ পদ্ধতি (Map Reduction: Square Method)

নির্দিষ্ট আয়তনের বর্গের সংকোচন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মানচিত্রের সংকোচন করা হয়। এ পদ্ধতিতে মানচিত্রের সংকোচন প্রক্রিয়ায় মূল মানচিত্রকে সুবিধাজনকভাবে কতকগুলো সমান বর্গক্ষেত্রে বিভক্ত করতে হয়। মানচিত্রের সংকোচন নির্ভর করে প্রতিটি বর্গের বাহুর দৈর্ঘ্যের উপর এবং বাহুর দৈর্ঘ্য নির্ভর করে নতুন ও মূল মানচিত্রের স্কেলের ভগ্নাংশের ওপর। নতুন সংকুচিত মানচিত্রের জন্য অঙ্কিত কাঠামোগত সংকোচন নতুন ও মূল মানচিত্রের স্কেলের অনুপাত নির্ণয়ের মাধ্যমে বের করা হয়। এ ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত সূত্র ব্যবহার করা হয়:

$$\frac{\text{নতুন মানচিত্রের স্কেল}}{\text{মূল মানচিত্রের স্কেল}} = \text{পরিবর্তিত মানচিত্রের অনুপাত}$$

সংকুচিত মানচিত্রের জন্য উল্লিখিতসূত্রের প্রয়োগে নতুন আয়তনের বর্গক্ষেত্র অঙ্কন করার পরে মূল মানচিত্রের বিভিন্ন ভৌগোলিক তথ্যাদি উক্ত মানচিত্রের বর্গের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে নতুন স্কেলের বর্গ অনুরূপভাবে অঙ্কন করলে নতুন স্কেলে মানচিত্রটি সংকুচিত হবে। উল্লেখ্য যে, উল্লিখিতসূত্রের প্রয়োগে নতুন মানচিত্রের অনুপাত ০১ অপেক্ষা কম হলে মানচিত্র সংকুচিত হবে। নিম্নে একটি উদাহরণের সাহায্যে বর্গ পদ্ধতিতে মানচিত্রের সংকোচন প্রক্রিয়া দেখানো হলো-



চিত্র-৮.১৫: মানচিত্র সংকোচন

উদাহরণ ১ : ৬০০০০০ স্কেলে যশোর জেলার একটি মানচিত্রকে ১ : ৮০০০০০ স্কেলে পুনরাঙ্কিত করুন।

নতুন ও মূল মানচিত্রের অনুপাত নির্ণয়ের মাধ্যমে মানচিত্রের সংকোচন করা হয়।

সূত্রানুযায়ী,

$$\frac{\text{নতুন মানচিত্রের স্কেল}}{\text{মূল মানচিত্রের স্কেল}} = \text{পরিবর্তিত মানচিত্রের অনুপাত}$$

$$\therefore \frac{১ : ৮০০০০০}{১ : ৬০০০০০} \quad [১ : ৮০০০০০ \text{ বা } ১/৮০০০০০ \text{ ভগ্নাংশ হিসেবেও লেখা যায়}]$$

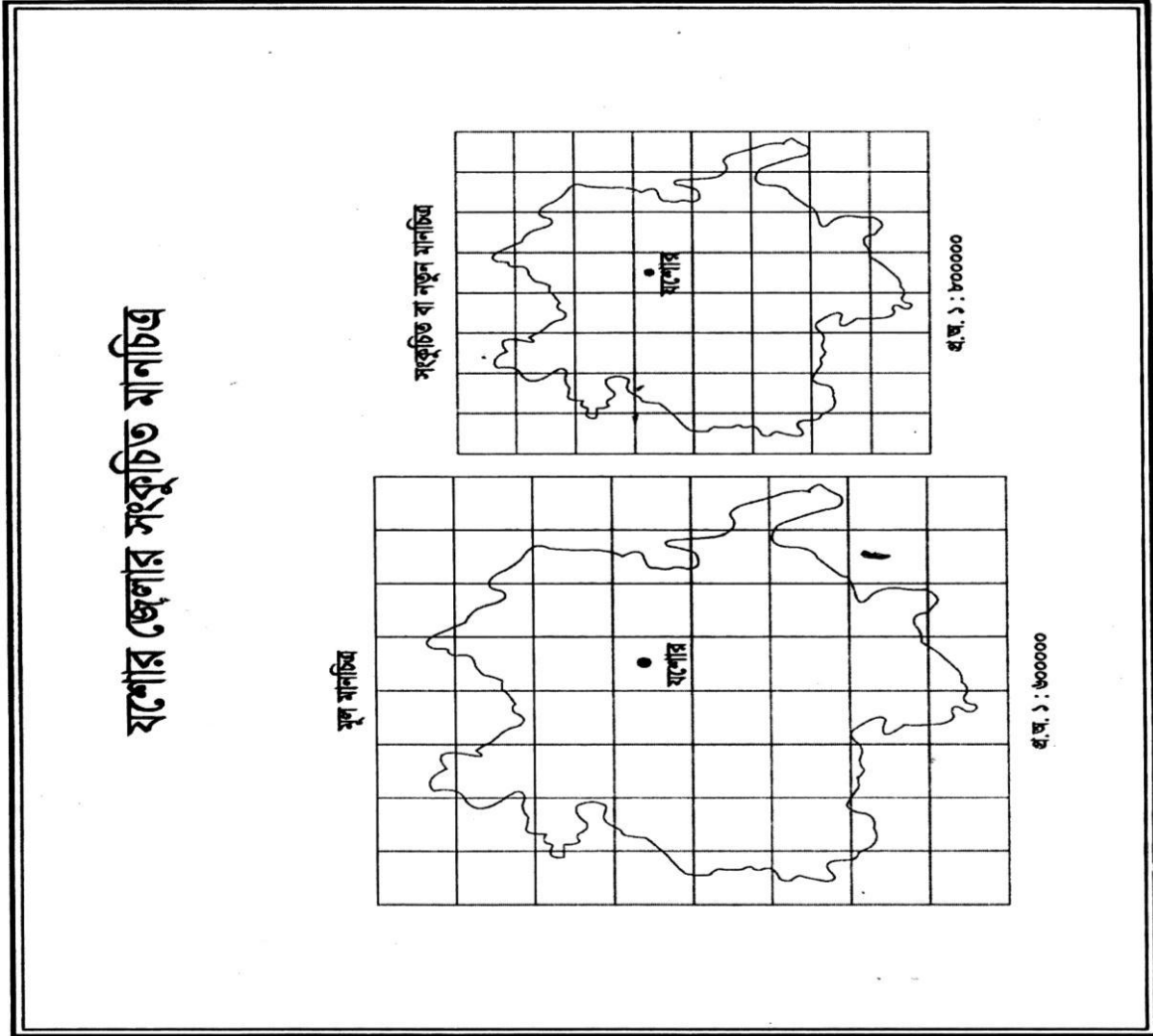
$$\begin{array}{l} ১ \\ \hline ৮০০০০০ \\ \hline ১ \end{array} \quad \text{বা, } \frac{১}{৮০০০০০} \times \frac{৬০০০০০}{১} \quad \text{বা, } \frac{৩}{৪} \quad \text{বা, } ০.৭৫ \text{ গুণ।}$$

মূল মানচিত্রের তুলনায় নতুন মানচিত্র ০.৭৫ গুণ সংকুচিত হবে।

অঙ্কন পদ্ধতি: এ স্তরে মূল মানচিত্রকে চিত্র অনুযায়ী ১ সে. মি. দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট বাহুর সাহায্যে অনুভূমিকভাবে ৮টি এবং উল্লম্বভাবে ৮টি হিসেবে মোট ৬৪টি বর্গে বিভক্ত করা হলো। সংকুচিত মানচিত্রের জন্য ০.৭৫ সে.মি. দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট বাহুর সাহায্যে সমসংখ্যক বর্গক্ষেত্র অঙ্কন করা হলো (চিত্র ৮.১৫)।

এ স্তরে মূল মানচিত্রের বর্গের অনুকরণে সংকুচিত নতুন মানচিত্রের বর্গের মধ্যে মূল মানচিত্র উপাঙ হুবহু রূপান্তর করলে সংকুচিত মানচিত্রের অঙ্কন শেষ হয়। উল্লেখ্য যে, মূল মানচিত্রের তথ্য নতুন মানচিত্রে রূপান্তরের সময় সাবধানতা অবলম্বন প্রয়োজন, অন্যথায় মানচিত্রের আকার ও আয়তনগত পার্থক্য সৃষ্টি হতে পারে।

মনে রাখা প্রয়োজন যে, সূত্র ব্যবহার করতে হলে নতুন স্কেল ও পুরাতন স্কেল উভয়ই প্রতিভূ অনুপাতে হতে হবে। এর কোনো স্কেল যদি বর্ণনায় থাকে তাহলে বর্ণনার মাধ্যমে প্রকাশিত স্কেলকে প্রতিভূ অনুপাতে পরিবর্তিত করে নিতে হবে। আরও স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, প্রাণ্ড ফলাফল অনুসারে বর্গের আকার যদি বেশি বড় হয় তাহলে মানচিত্রটি সঠিক বা নিখুঁত হয় না। বর্গের আকৃতি যতো ছোট হবে নতুন মানচিত্রটি ততো নিখুঁত হবে। সাধারণত মূল মানচিত্র বা সরবরাহকৃত মানচিত্রের বর্গের বাহুর দৈর্ঘ্য ১ ইঞ্চি, ০.৫ ইঞ্চি, ০.২৫ ইঞ্চি অথবা ১ সে. মি. ধরে সেই অনুপাতে নতুন মানচিত্রের বর্গের বাহুর দৈর্ঘ্য নির্ধারণ করা হয়। আবার প্রাণ্ড ফলাফর ভগ্নাংশে পাওয়া গেলে ভগ্নাংশের হররাশি অনুসারে পুরাতন মানচিত্র এবং লব অনুসারে নতুন মানচিত্রের বর্গের বাহু নির্ধারণ করা যায়।



চিত্র-৮.১৬ ও ৮.১৭: মানচিত্রের সংকোচন

৮.৩ মানচিত্রে তথ্য ও উপাত্ত উপস্থাপন এবং আন্তর্জাতিক সাংকেতিক চিহ্ন

মানচিত্রে তথ্য ও উপাত্ত উপস্থাপন

বিভিন্ন ভৌগোলিক উপাত্ত সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে মানচিত্রে প্রদর্শন করাই মানচিত্র তৈরির মূল উদ্দেশ্য। উপাত্তের প্রকৃতিগত ভিন্নতায় এ ভৌগোলিক উপাত্তের চিত্ররূপের উপস্থাপনও বিভিন্ন হয়। মানচিত্রে বিভিন্ন ধরনের উপাত্ত পরিষ্কার ও সুন্দরভাবে প্রদর্শনের জন্য সাধারণত যেসব পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় তা হলো (ক) লেখচিত্র (Graph), (খ) ছায়াপাত (Choropleth of shad), (গ) বিন্দু (Dot) এবং (ঘ) সমরেখ (Isopleth)

বিন্দু মানচিত্র (Dot Map)

বিন্দু প্রকৃতিপক্ষে প্রতীক চিহ্নের এক সহজতম রূপ। এটি বন্টন মানচিত্র নির্মাণে বিশেষ উপযোগী। এ চিহ্নের সাহায্যে বন্টন মানচিত্র গঠিত হয় বলে একে বিন্দু মানচিত্র বলে। প্রতীক চিহ্নের সাহায্যে কোনো নির্দিষ্ট বস্তুর অবস্থান (যেমন- মেরু, বন্দর, গ্রাম, শহর, মন্দির, মসজিদ ইত্যাদি কিংবা জনসংখ্যা, কৃষিজমি প্রভৃতির বন্টনগত অবস্থান) বোঝাতে এ ধরনের মানচিত্র তৈরি করা হয়।

বিন্দু মানচিত্রের প্রকারভেদ (Classification of Dot Map): বিন্দু মানচিত্র সাধারণত দুই ধরনের হয়। যথা-

- ১। **গুণগত বিন্দু মানচিত্র (Qualitative Dot Map):** কোনো বস্তু বা উপাদানের কেবলমাত্র সঠিক অবস্থান বুঝাতে বিন্দুর সাহায্যে যে মানচিত্র গঠিত হয় তাকে গুণগত বিন্দু মানচিত্র বলে। যেমন- বাংলাদেশের শহরগুলোর কিংবা উপকূলীয় বন্দরগুলোর অবস্থান সংক্রান্ত মানচিত্র এ শ্রেণির অন্তর্গত। এ মানচিত্রে বস্তুর অবস্থানগত গুণ বা বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হয়।
- ২। **সংখ্যাগত বিন্দু মানচিত্র (Quantitative Dot Map):** সম আয়তনবিশিষ্ট নির্দিষ্ট মানের বিন্দুর সাহায্যে কোনো বস্তুর বন্টন দেখাতে যে মানচিত্র প্রস্তুত করা হয় তাকে সংখ্যাগত বিন্দু মানচিত্র বলে। জনসংখ্যা, গবাদিপশু প্রভৃতির বন্টন এ ধরনের মানচিত্রে দেখানো হয়।

বৈশিষ্ট্য: সংখ্যাগত বিন্দু মানচিত্রের কতকগুলো বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন-

- বিন্দুগুলোর আয়তন সমান হয়;
- বিন্দুগুলো একটি নির্দিষ্ট মানের;
- বিন্দুগুলো অসমভাবে বণ্টিত হয়;
- বিন্দু মানের উপর বিন্দুর সংখ্যা নির্ভর করে;
- বিন্দুগুলোকে প্রশাসনিক এলাকার মধ্যেই বসাতে হয়। প্রশাসনিক একক যতটা নিম্নস্তরের হয় বন্টনের প্রকৃতি ততোই সুস্পষ্ট হয়।

স্কেল নির্বাচন (Selection of the Scale of Dots): বিন্দু মানচিত্রে বিন্দুর স্কেল অর্থাৎ মান নির্ণয় এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, কারণ এর মানের উপর নির্ভর করে বিন্দুর সংখ্যা যেমন পাওয়া যায় তেমনি মানচিত্রে এদের বন্টন কোনো উপাদানের বন্টনগত চরিত্রকে সঠিকভাবে উপস্থাপন করে। সেজন্য প্রদত্ত তথ্যের বিস্তার অনুযায়ী বিন্দুর স্কেল নির্বাচন করা হয়। সাধারণত তিনটি পদ্ধতিতে স্কেল নির্বাচন করা হয়। পদ্ধতিগুলো হলো-

- ১। **ঐচ্ছিক পদ্ধতি (Arbitrary Method):** এ পদ্ধতিতে এমনভাবে স্কেল নির্বাচন করা হয় যাতে বিন্দুগুলোর সংখ্যা খুব কম বা খুব বেশি না হয়। সেজন্য প্রদত্ত তথ্যের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন মান দেখে ইচ্ছেমত স্কেল নির্বাচন করা যেতে পারে। এ পদ্ধতিতে বস্তুর বন্টনের প্রকৃতিকে মানচিত্রে সঠিকভাবে দেখানো যায় না। এ পদ্ধতি গ্রহণ না করাই ভালো।
- ২। **নির্দিষ্ট সংখ্যা পদ্ধতি (Fixed number Method):** এ পদ্ধতিতে রাশিতথ্যের সর্বোচ্চ মানের জন্য বিন্দুর সংখ্যা ১০০ ধরে স্কেল নির্বাচন করা হয়। ধরি, প্রদত্ত তথ্যে কোনো প্রশাসনিক এলাকার সর্বোচ্চ জনসংখ্যা ৫০,০০০, তাহলে একটি বিন্দুর মান হবে ৫০০ ($৫০,০০০ \div ১০০$) জনসংখ্যা।

৩। ঘনত্ব-নির্ভর পদ্ধতি (Density-based Method): আগের দুটি পদ্ধতিতে সর্বাধিক জনসংখ্যাকে স্কেল নির্বাচনে বিবেচনা করা হয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে উপাদানের সর্বাধিক ঘনত্বকে বিবেচনা করা হয় এবং মানচিত্রে সর্বাধিক ঘনত্ববিশিষ্ট প্রশাসনিক এককের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করে বিন্দুর স্কেল নির্ণয় করা হয়। প্রকৃতপক্ষে, এ পদ্ধতি অবলম্বনে বিন্দু মানচিত্রে গঠন অনেক বেশি নির্ভুল ও যুক্তিযুক্ত হয়। নিম্নের ধাপগুলো অনুসরণ করলে এ ধরনের মানচিত্র অঙ্কন সহজতর হয়। ধাপগুলো হলো-

- উপাদানের ঘনত্ব নির্ণয় করা;
- মানচিত্রে সর্বাধিক ঘনত্ববিশিষ্ট এককের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করা;
- বিন্দুর মান বা স্কেল নির্ণয় করা।

মনে রাখার বিষয় (Points to be Remember)

- বিন্দুর ব্যাস ০.২০ মি.মি. হওয়া বাঞ্ছনীয়;
- বিন্দুগুলোর মধ্যে ফাঁক অসমান হবে। প্রাকৃতিক বা ভূমি ব্যবহারের মানচিত্র ও টপোমানচিত্র দেখে বিন্দুগুলো যথাযথভাবে বসাতে হবে;
- বিন্দুগুলো এমনভাবে বসাতে হবে যাতে সর্বাধিক কেন্দ্রীভবন যুক্ত প্রশাসনিক অঞ্চল থেকে সর্বনিম্ন কেন্দ্রীভবন যুক্ত প্রশাসনিক অঞ্চলের দিকে বিন্দুগুলো ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ে;
- বিন্দুগুলোর বন্টন এমনভাবে হবে যাতে কোনো রেখার সৃষ্টি না হয়।

উদাহরণ ১। বাংলাদেশের জনসংখ্যার জেলাভিত্তিক বন্টন বিন্দুর সাহায্যে দেখান।

সমাধান : ১টি বিন্দুর মান বা স্কেল নির্ণয়।

প্রদত্ত জনসংখ্যা থেকে দেখা যাচ্ছে, ঢাকা জেলার জনসংখ্যা (১,২০,৪৩,৯৭৭) সর্বাধিক যা ১০০টি বিন্দুর সাহায্যে দেখাতে হবে।

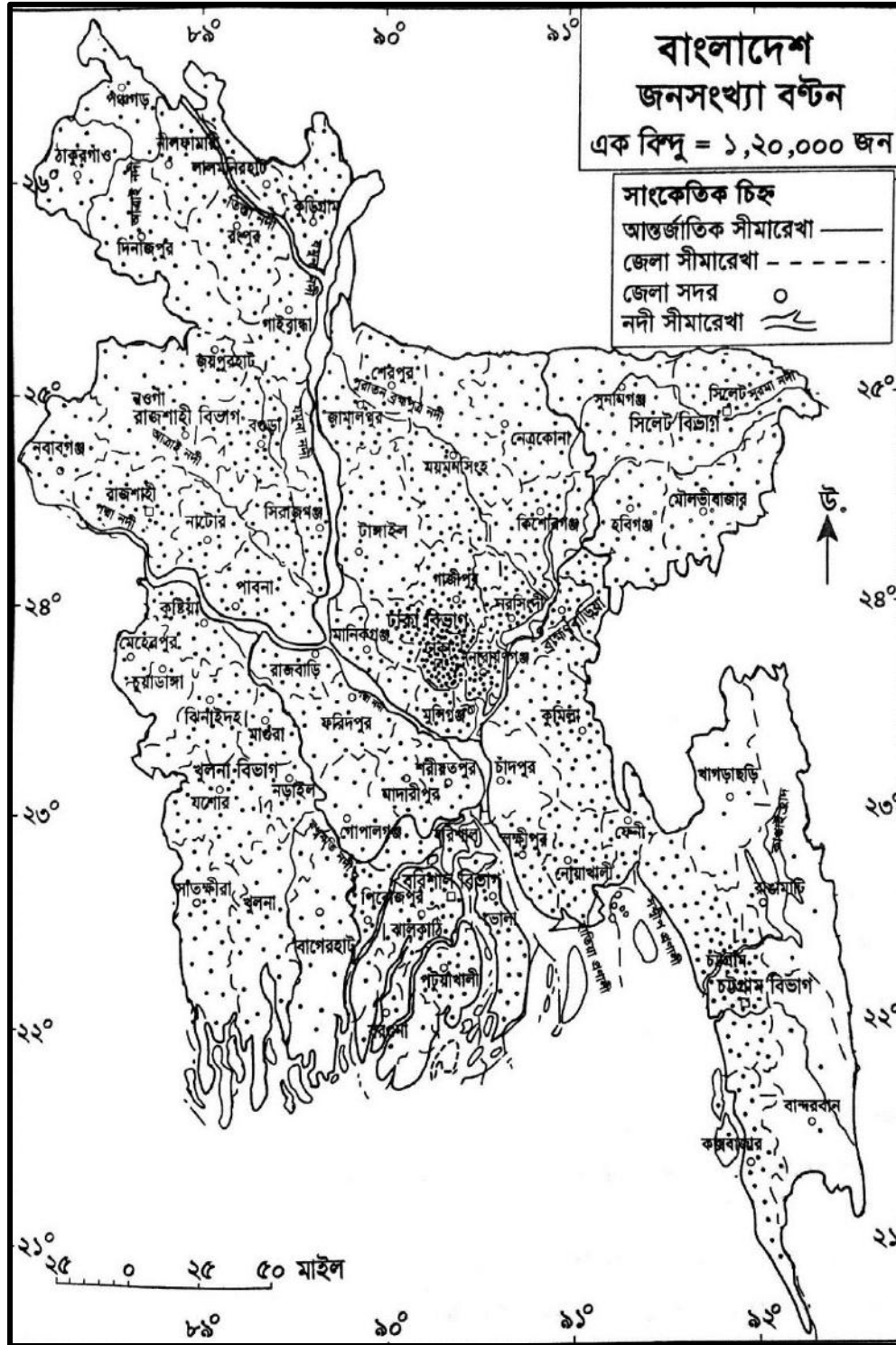
$$\therefore 1 \text{টি বিন্দুর মান বা স্কেল} = 1,20,43,977 \div 100 = 1,20,439.77 \text{ জনসংখ্যা বা } 1,20,000 \text{ জনসংখ্যা}$$

$$\therefore \text{ঢাকা জেলার বিন্দু সংখ্যা} = 1,20,43,977 \div 1,20,000 = 100 \text{টি}$$

বিন্দুর মান দ্বারা প্রতিটি জেলার জনসংখ্যাকে ভাগ দিয়ে সব কয়টি জেলার স্বতন্ত্র বিন্দুর সংখ্যা পাওয়া গেছে। নিম্নের সারণিতে তা দেওয়া হলো।

জেলার নাম	জনসংখ্যা	নির্ণেয় বিন্দুর সংখ্যা	জেলার নাম	জনসংখ্যা	নির্ণেয় বিন্দুর সংখ্যা
(ক) ঢাকা বিভাগ	৪,৭৪,২৪,৪১৮		৩৪। পটুয়াখালি	১৫,৩৫,৮৫৪	১৩
১। ঢাকা	১,২০,৪৩,৯৭৭	১০০	(ঘ) খুলনা বিভাগ	১,৫৬,৮৭,৭৫৯	
২। নরসিংদী	২২,২৪,৯৪৪	১৯	৩৫। যশোর	২৭,৬৪,৫৪৭	২৩
৩। নারায়ণগঞ্জ	২৯,৪৮,২১৭	২৫	৩৬। মাগুরা	৯,১৮,৪১৯	০৮
৪। মানিকগঞ্জ	১৩,৯৪,৮৬৭	১২	৩৭। নড়াইল	৭,২১,৬৬৮	০৬
৫। মুন্সিগঞ্জ	১৪,৪৫,৬৬০	১২	৩৮। বিনাইদহ	১৭,৭১,৩০৪	১৫
৬। গাজীপুর	৩৪,০৩,৯১২	২৮	৩৯। খুলনা	২৩,১৮,৫২৭	১৯
৭। ফরিদপুর	১৯,১২,৯৬৯	১৬	৪০। সাতক্ষীরা	১৯,৮৫,৯৫৯	১৭
৮। গোপালগঞ্জ	১১,৭২,৪১৫	০৮	৪১। বাহেরহাট	১৪,৭৬,০৯০	১২

৯। শরিয়তপুর	১১,৫৫,৮২৮	১০	৪২। কুষ্টিয়া	১৯,৪৬,৮৩৪	১৬
১০। মাদারীপুর	১১,৬৫,৯৫২	১০	৪৩। মেহেরপুর	৬,৫৫,৩৯২	০৫
১১। রাজবাড়ী	১০,৪৯,৭৭৮	০৯	৪৪। চুয়াডাঙ্গা	১,১২,৯০৫	০১
১২। জামালপুর	২২,৯২,৬৭৪	১৯	(ঙ) রাজশাহী বিভাগ	১,৮৪,৮৪,৮৫৭	
১৩। শেরপুর	১৩,৫৮,৩২৫	১১	৪৫। রাজশাহী	৩৪,০০,৮৭৪	২৮
১৪। ময়মনসিংহ	৫১,১০,২২৭	৪৩	৪৬। নাটোর	১৭,০৬,৬৭৩	১৪
১৫। কিশোরগঞ্জ	২৯,১১,৯০৭	২৪	৪৭। চাপাইনবাবগঞ্জ	১৬,৪৭,৫২১	১৪
১৬। টাঙ্গাইল	৩৬,০৫,০৮৩	৩০	৪৮। নওগাঁ	২৬,০০,১৫৭	২২
১৭। নেত্রকোণা	২২,২৯,৬৪২	১৯	৪৯। বগুড়া	৩৪,০০,৮৭৪	২৮
(খ) চট্টগ্রাম বিভাগ	২,৮৪,২৩,০১৯		৫০। জয়পুরহাট	৯,১৩,৭৬৮	০৮
১৮। কুমিল্লা	৫৩,৮৭,২৮৮	৪৫	৫১। পাবনা	২৫,২৩,১৭৯	২১
১৯। ব্রাহ্মণবাড়িয়া	২৮,৪০,৪৯৮	২৪	৫২। সিরাজগঞ্জ	৩০,৯৭,৪৮৯	২৬
২০। চাঁদপুর	২,৪১,৬০১	০২	(চ) রংপুর বিভাগ	১,৫৭,৮৭,৭৫৮	
২১। লক্ষ্মীপুর	১৭,২৯,১৮৮	১৪	৫৩। পঞ্চগড়	৯,৮৭,৬৪৪	০৮
২২। নোয়াখালী	৩১,০৮,০৮৩	২৬	৫৪। দিনাজপুর	২৯,৯০,১২৮	২৫
২৩। ফেনী	১৪,৩৭,৩৭১	১২	৫৫। ঠাকুরগাঁও	১৩,৯০,০৪২	১২
২৪। রাঙ্গামাটি	৫,৯৫,৯৭৯	০৫	৫৬। লালমনিরহাট	১২,৫৬,০৯৯	১০
২৫। বান্দরবান	৩,৮৮,৩৩৫	০৩	৫৭। নীলফামারী	১৮,৩৪,২৩৩	১৫
২৬। খাগড়াছড়ি	৬,১৩,৯১৭	০৫	৫৮। কুড়িগ্রাম	২০,৬৯,২৭৩	১৭
২৭। কক্সবাজার	২২,৪৯,৯৯০	১৯	৫৯। গাইবান্ধা	১৩,৭৯,২৫৫	১১
২৮। চট্টগ্রাম	৭৪,১৬,৩৫২	৬৩	৬০। রংপুর	২৮,৮১,০৮৬	২৪
(গ) বরিশাল বিভাগ	৮৩,২৫,৬৬৬		(ছ) সিলেট বিভাগ	৯৯,১০,২১৯	
২৯। বরিশাল	২৩,২৪,৩১০	১৯	৬১। সিলেট	৩৪,৩৪,১৮৮	২৯
৩০। ঝালকাঠি	৬,৮২,৬৬৯	০৬	৬২। হবিগঞ্জ	২০,৮৯,০০১	১৭
৩১। পিরোজপুর	১১,১৩,২৫৭	০৯	৬৩। মৌলভীবাজার	১৯,১৯,০৬২	১৬
৩২। বরগুনা	৮,৯২,৭৮১	০৭	৬৪। সুনামগঞ্জ	২৪,৬৭,৯৬৮	২১
৩৩। ভোলা	১৭,৭৬,৭৯৫	১৫			



চিত্র ৮.১৮: বাংলাদেশের জনসংখ্যার বণ্টন

সমানুপাতিক বর্গচিত্র (Proportional Square Diagram)

বর্গক্ষেত্র একটি দ্বিমাত্রিক চিত্র। এটি দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে সমান। এটি ক্ষেত্রফল চিত্র (Area diagram) নামেও পরিচিত। কৃষিভূমি, বনভূমি, জনসংখ্যা, বসতবাড়ির সংখ্যা ইত্যাদির পরিমাণ বুঝাতে বর্গচিত্র আঁকা হয়। একটি বর্গক্ষেত্র কোনো উপাদানের সমগ্র পরিমাণকে প্রকাশ করে। বর্গক্ষেত্রের আকার উপাদানের পরিমাণের তারতম্যের উপর নির্ভরশীল। উপাদানের পরিমাণের সাথে বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল সমানুপাতিক হয়। পরিমাণের অনুপাত অনুযায়ী অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রকে আনুপাতিক বর্গচিত্র বলা হয়। একক উপাদান বিশিষ্ট প্রদত্ত তথ্যের উপস্থাপন বর্গচিত্রের মাধ্যমে করা যায়। বর্গচিত্র একটি সুনির্দিষ্ট নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। বর্গচিত্রের ক্ষেত্রফল উপাদানের পরিমাণের সাথে সমানুপাতিক। সুতরাং বলা যায়,

বর্গচিত্রের ক্ষেত্রফল অর্থাৎ বাহুর দৈর্ঘ্য^২ (L^2) = উপাদানের পরিমাণ

∴ বাহুর দৈর্ঘ্য (L) = $\sqrt{\text{উপাদানের পরিমাণ}}$

অঙ্কন পদ্ধতি (Drawing Method): নিম্নলিখিত ধাপগুলো অনুসরণ করে বর্গচিত্র আঁকা হয়।

১। বাহুর দৈর্ঘ্য (L) = $\sqrt{\text{উপাদানের পরিমাণ}}$ - এ সূত্রের সাহায্যে বর্গক্ষেত্রের বাহুর দৈর্ঘ্য নির্ণয় করুন।

২। নির্ণীত বাহুর দৈর্ঘ্যকে রৈখিক স্কেলে (ইঞ্চি বা সেন্টিমিটার) পরিণত করুন। ধরা যাক, কোনো অঞ্চলের জনসংখ্যা ১০০০০ এর জন্য বর্গচিত্র আঁকতে হবে। এখানে জনসংখ্যা হলো উপাদান। অর্থাৎ এটি বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের সমান। এ জনসংখ্যার অনুপাতকে বর্গচিত্রে দেখাতে হলে এর এক পাশের বাহুর দৈর্ঘ্য নির্ণয় করুন।

$$\text{সূত্রানুযায়ী বাহুর দৈর্ঘ্য (L)} = \sqrt{10,000} = 100 \text{ একক}$$

[বি.দ্র. বর্গমূল করার পর উপাদানের বাহুর একককে রৈখিক দৈর্ঘ্যে প্রকাশ করা হয়]

অতএব, ১ ইঞ্চি যদি ১০০ একককে নির্দেশ করে তাহলে ১০০ এককের জন্য ১ ইঞ্চি হবে বর্গক্ষেত্রের একটি বাহুর দৈর্ঘ্য।

৩। রৈখিক স্কেলে নির্ণীত বাহুর দৈর্ঘ্য অনুযায়ী মানচিত্রের বর্গক্ষেত্র অঙ্কন করুন।

স্কেল নির্বাচন (Scale Selection): বর্গচিত্রের স্কেল নির্বাচন অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। এজন্য একটি বিশেষ বিষয়ের দিকে নজর দেওয়া দরকার। বিষয়টি হলো মূল মানচিত্রের আকার বা আকৃতি। বর্গক্ষেত্র এমনভাবে আঁকা উচিত যা মানচিত্রের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। অর্থাৎ, স্কেল এমনভাবে নির্বাচন করা উচিত যাতে বর্গচিত্র মানচিত্রের প্রশাসনিক সীমানার মধ্যেই আঁকা যায়। উপাদানের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন মানের দিকে লক্ষ্য রেখে তাই স্কেল নির্বাচন করা দরকার। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে মানচিত্রের কোনো প্রশাসনিক একক অধিকতর দীর্ঘায়িত হয়। সেক্ষেত্রে বাহুর কোনো একটি অংশ সীমানার বাইরে থাকতে পারে।

মনে রাখার বিষয় (Points to be Remember)

- বর্গচিত্রগুলো এমনভাবে স্থাপন করতে হবে যাতে সেগুলো প্রশাসনিক সীমানাকে স্পর্শ না করে। বিশেষ ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম ঘটতে পারে;
- প্রতিটি বর্গক্ষেত্রের বাহুগুলো একে অপরের সমান্তরাল হবে;
- প্রতিটি বর্গক্ষেত্রের ভূমি কাগজের অনুভূমিক প্রান্তের সাথে সমান্তরালে অবস্থান করবে;
- বর্গচিত্রের ভিতরে রং করবে অথবা ছায়াপাত (Shading) করবে;
- মানচিত্র না দেওয়া হলে একই ভূমিরেখার উপর বর্গক্ষেত্রগুলো আঁকতে হবে;
- বস্তুত মানের মধ্যে থেকে মোটামুটি বড়ো, মাঝারি ও ছোটো মানের কাছাকাছি আসন্ন মানের, যেমন- ১০০, ১০০০ ইত্যাদি পূর্ণ সংখ্যা নিয়ে স্কেল আঁকতে হবে।

উদাহরণ ১। বাংলাদেশের প্রধান নগরের জনসংখ্যা দেওয়া আছে। একে বর্গ পদ্ধতিতে মানচিত্রে দেখান।

বাংলাদেশের প্রধান নগরের জনসংখ্যা

বিভাগের নাম	নগর জনসংখ্যা (জন)
১। ঢাকা বিভাগ	১,৫৫,৯২,৮৩৫
২। চট্টগ্রাম বিভাগ	৬৯,০৫,৪৮০
৩। রাজশাহী বিভাগ	৬,৭০,৩৮৮
৪। খুলনা বিভাগ	২২,৯৭,৩০১
৫। সিলেট বিভাগ	১৪,৬২,৭১১
৬। বরিশাল বিভাগ	৫,১৯,০২৬
৭। রংপুর বিভাগ	২১,০৯,০৯১
মোট	৩,৩৫,৬২,১৮৩

উৎস : আদমশুমারি, ২০১১

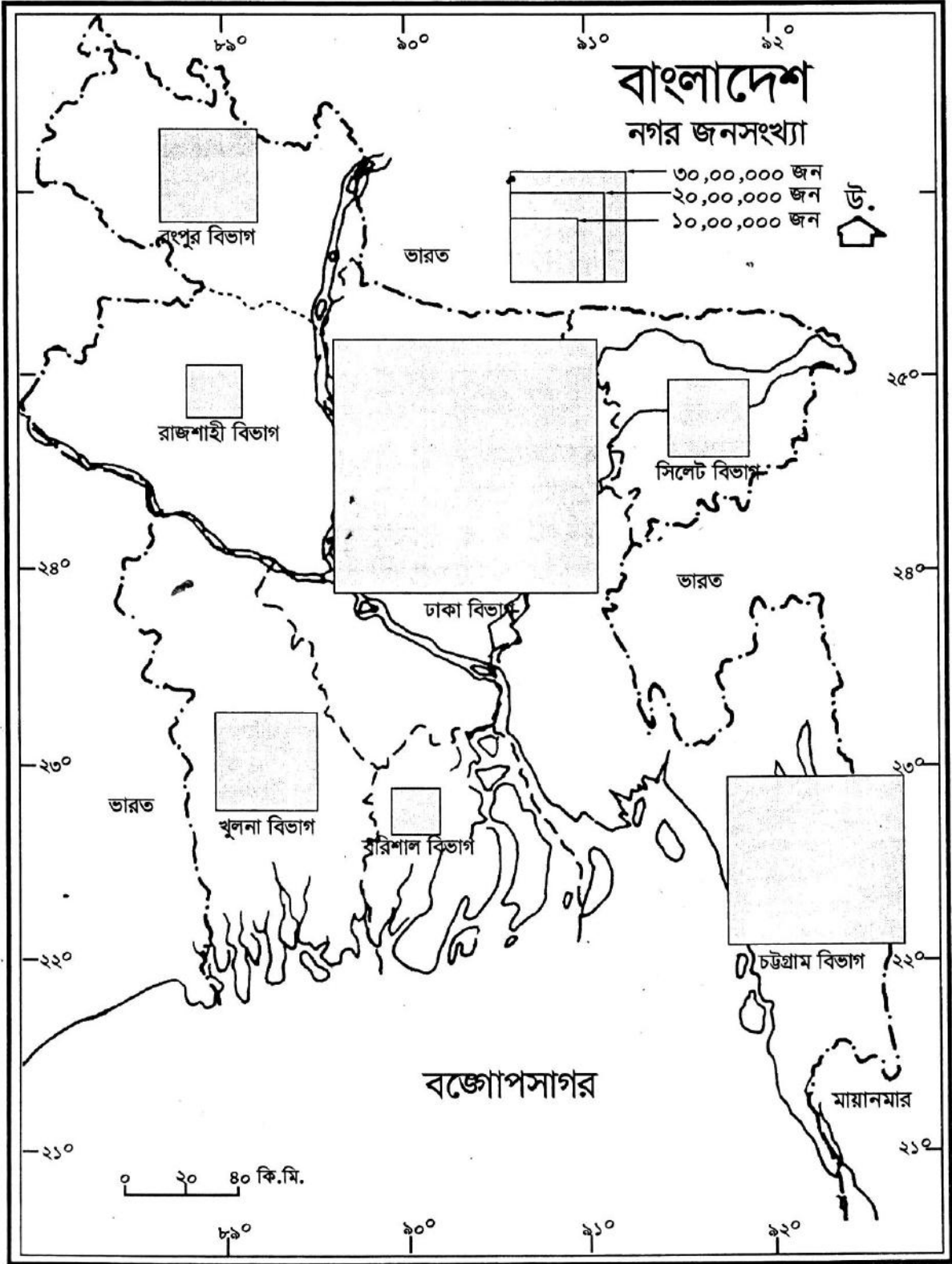
সমাধান : বর্গচিত্রের ক্ষেত্রফল এক্ষেত্রে নগরের জনসংখ্যাকে নির্দেশ করে, তাই লেখা যায়

বর্গচিত্রের ক্ষেত্রফল, $L^2 = Up$ [L = বর্গক্ষেত্রের একটি বাহুর দৈর্ঘ্য, Up = নগর জনসংখ্যা] $\therefore L = \sqrt{Up}$

সারণির মাধ্যমে বর্গচিত্রের বাহুর দৈর্ঘ্য নির্ণয় করা হলো:

বিভাগের নাম	নগর জনসংখ্যা (Up)	বাহুর দৈর্ঘ্য $L = \sqrt{Up}$	ক্ষেে বর্গক্ষেত্রের একক বাহুর দৈর্ঘ্য ইঞ্চিতে (১ ইঞ্চি = ২,৫০০ একক)
১। ঢাকা বিভাগ	১,৫৫,৯২,৮৩৫	৩,৯৪৮.৭৮	১.৫৮
২। চট্টগ্রাম বিভাগ	৬৯,০৫,৪৮০	২,৬২৭.৮২	১.০৫
৩। রাজশাহী বিভাগ	৬,৭০,৩৮৮	৮১৮.৭৭	০.৩৩
৪। খুলনা বিভাগ	২২,৯৭,৩০১	১,৫১৫.৬৮	০.৬১
৫। সিলেট বিভাগ	১৪,৬২,৭১১	১,২০৯.৪২	০.৪৮
৬। বরিশাল বিভাগ	৫,১৯,০২৬	৭২০.৪৩	০.২৯
৭। রংপুর বিভাগ	২১,০৯,০৯১	১,৪৫২.২৭	০.৫৮
নির্দেশক ক্ষেত্রের জন্য			
১।	১০,০০,০০০	১,০০০	০.৪০
২।	২০,০০,০০০	১,৪১৪.২১	০.৫৬
৩।	৩০,০০,০০০	১,৭৩২.০৫	০.৬৯

চিত্রের ব্যাখ্যা: বাংলাদেশের বিভাগীয় নগরের জনসংখ্যার জন্য অঙ্কিত বর্গচিত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, নগরের জনসংখ্যা সর্বত্র সমানভাবে বণ্ণিত হয়। ঢাকা ও চট্টগ্রামে নগর জনসংখ্যা বেশি। খুলনা ও রংপুর নগরে জনসংখ্যা প্রায় একই। এছাড়া রাজশাহী ও বরিশালে নগর জনসংখ্যা কম। কারণ হিসেবে বলা যায়, যে সমস্ত নগরে কাজের সুযোগ বেশি এবং ভূপ্রকৃতি বসবাসের অনুকূল সেই সমস্ত নগরে জনসংখ্যা অধিক।



চিত্র- ৮.১৯: বর্গ পদ্ধতিতে জনসংখ্যার বণ্টনমানচিত্র

মানচিত্রে আন্তর্জাতিক সাংকেতিক চিহ্ন (International Sign Used in Map)

স্থানীয় বৈচিত্র্যসূচক মানচিত্র গঠন ভূগোল শাস্ত্রের একটি প্রধান ও প্রয়োজনীয় বিষয়। এ বিশাল পৃথিবীকে অথবা পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের এক একটি সামাজিক রূপ এ ধরনের মানচিত্রের মধ্যে যেভাবে ফুটিয়ে তোলা যায় অন্য কোনো উপায়েই তা সম্ভব নয়। স্থানীয় বৈচিত্র্যসূচক মানচিত্রে বিভিন্ন প্রতীক চিহ্নের মাধ্যমে ভূপ্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়সমূহের একটি সুন্দর প্রতিচ্ছবি দেখতে পাওয়া যায়। এ প্রতীকগুলোর মাধ্যমে একদিকে যেমন পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা, মালভূমি, হ্রদ, সমভূমি, পুকুর, ঝিল, বনভূমি প্রভৃতি বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিষয়ের পরিচয় পাওয়া যায় তেমনি অন্যদিকে রাস্তাঘাট, হাটবাজার, মসজিদ, মন্দির, হাসপাতাল, খেলার মাঠ, জনবসতি, মানুষের ঘনত্ব, জীবিকা অর্জনের উপায় প্রভৃতি নানা সাংস্কৃতিক তথ্যেরও পরিচয় পাওয়া যায়। এ কারণে কোনো একটি অঞ্চলের সুবিধা-অসুবিধা, পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং নানা সমস্যার সূচক সমাধান করতে চাইলে এ মানচিত্রে তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপনের নিয়মাবলি জানা একান্ত প্রয়োজন। যে কোনো ভাষায় একটি মানচিত্র পাঠ করতে হলে নানা ধরনের প্রতীক চিহ্নের সাহায্য নিতে হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ তাদের স্থানীয় বৈচিত্র্যসূচক মানচিত্রের মধ্যে এ সকল প্রতীক চিহ্ন ব্যবহার করে আসছে। এ কারণে এসব চিহ্নকে আন্তর্জাতিক প্রচলিত প্রতীক চিহ্ন বলে (চিত্র চ.২০)। স্থানীয় বৈচিত্র্যসূচক মানচিত্র পাঠ করার জন্য এ প্রতীক চিহ্নগুলো অত্যন্ত জরুরি বলে মানচিত্রের নিচের দিকে এ প্রতীক চিহ্নগুলোর সূচক (Legend) দেওয়া থাকে। যে ব্যক্তির এ চিহ্নগুলো সম্বন্ধে যত ভালো ধারণা থাকবে তিনি তত ভালোভাবে এ মানচিত্র পাঠ করতে পারবেন।

মানচিত্রে আন্তর্জাতিক সাংকেতিক চিহ্নসমূহ (International sign used in map)

পাকা রাস্তা	কাঁচা রাস্তা	আন্তর্জাতিক সীমারেখা	জেলা সীমারেখা
ব্রডগেজ রেললাইন 	মিটারগেজ রেললাইন 	জলাভূমি 	নদী
হ্রদ 	গ্রাম/বসতি 	মসজিদ 	মন্দির
গাছ 	লাইট হাউস 	বিমানবন্দর 	সেতু
ঈদগাহ 	শিল্পকারখানা 	পর্বত 	বাঁধ

চিত্র-চ.২০: আন্তর্জাতিক সাংকেতিক চিহ্ন

৮.৪ শিক্ষামূলক সফর ও প্রতিবেদন প্রণয়ন

নির্দিষ্ট স্কেলে কাঙ্ক্ষিত মানচিত্র সহকারে কতিপয় শিরোনাম ভিত্তিক কোনো এলাকার ধারাবাহিক ভৌগোলিক তথ্য সন্নিবেশকে ভৌগোলিক বিবরণ বলে। ভৌগোলিক বিবরণের মাধ্যমে কোনো এলাকা সম্বন্ধে বিস্তারিত ধারণা লাভ করা যায়। আঞ্চলিক পদ্ধতিতে ভূগোল পঠন-পাঠনের একটি প্রক্রিয়া হিসেবে ‘ভৌগোলিক বিবরণগুলো’ বিবেচিত।

প্রতিবেদনের রূপরেখা

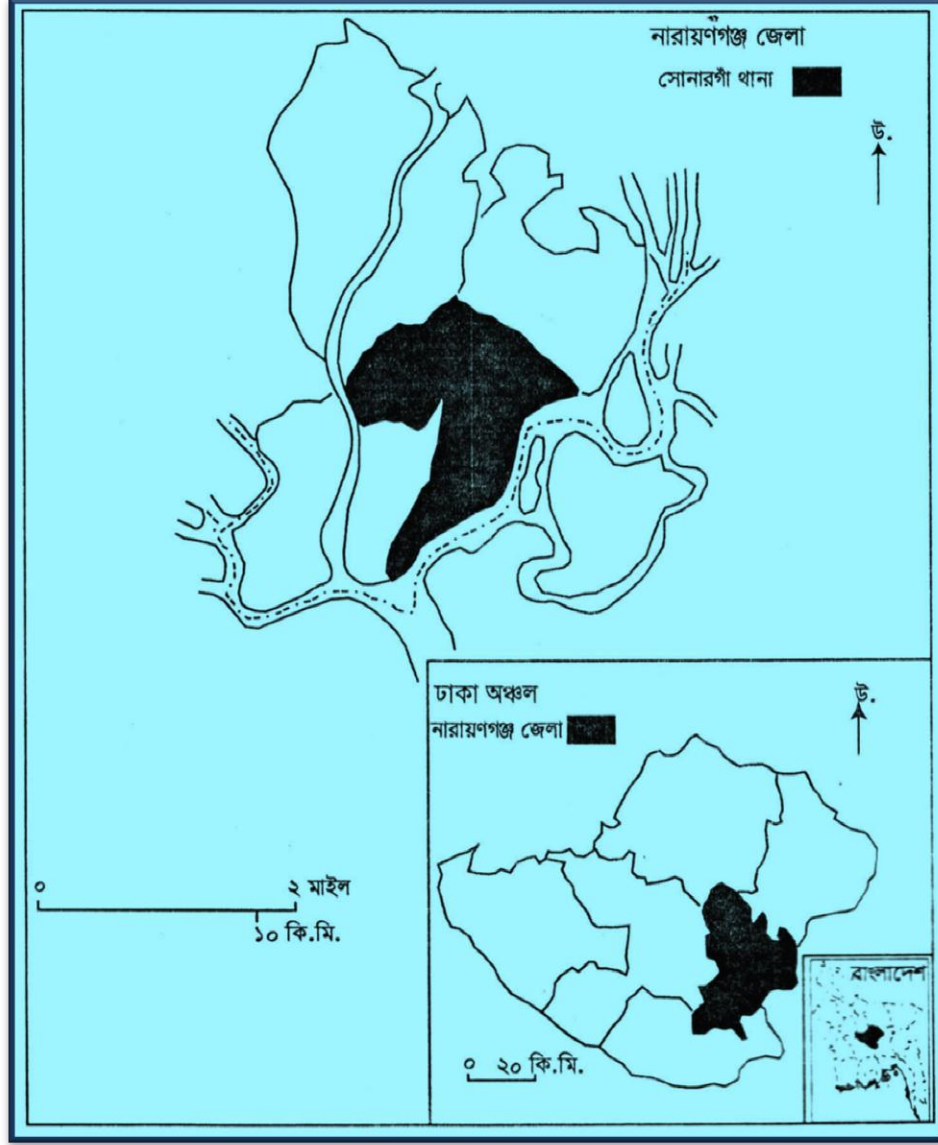
নিজ এলাকার ভৌগোলিক বিবরণ (ব্যবহারিক পরীক্ষার আংশিক পরিপূরক) স্থান: ইউনিয়ন/পৌরসভা: থানা: জেলা: উপস্থাপনায় নাম: শ্রেণি রোলনম্বর: রেজিস্ট্রেশন নম্বর: শিক্ষাবর্ষ:	তত্ত্বাবধায়ক নাম: পদবী: কলেজ	প্রসঙ্গ কথা
---	---	---

কৃতজ্ঞতা স্বীকার 	সূচিপত্র <table><tr><th>বিষয়বস্তু</th><th>পৃষ্ঠা নম্বর</th></tr><tr><td>১.</td><td></td></tr><tr><td>২.</td><td></td></tr><tr><td>৩.</td><td></td></tr></table>	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নম্বর	১.		২.		৩.	
বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নম্বর								
১.									
২.									
৩.									

ভৌগোলিক স্থান: সোনারগাঁও

প্রাচীন রাজধানী সোনারগাঁও ঢাকা শহর থেকে প্রায় ২৬ কি. মি. দূরে এবং নারায়ণগঞ্জ থেকে প্রায় ৫ কি. মি. দূরে মেঘনা নদীর তীরে অবস্থিত। সোনারগাঁওয়ের পূর্ব নাম ‘সুবর্ণ গ্রাম’। এটি বাংলাদেশের স্বাধীন শাসক ঈশা খাঁর রাজধানী ছিল। ঈশা খাঁর স্ত্রী সোনারবিরি নামে এর নাম রাখা হয় সোনারগাঁও।

ঐতিহাসিক পটভূমি: বার ভূঁইয়াদের অন্যতম ঈশা খাঁর শাসনামলে সোনারগাঁওয়ের গৌরব ও ঐতিহ্য ছিল। কিন্তু কালের শ্রোতে বিভিন্ন উত্থান-পতনের ফলে সোনারগাঁওয়ের সে গৌরবময় অতীতের কোনো চিহ্নই এখন দেখা যায় না। সোনারগাঁওয়ের প্রাচীন রাজধানীর বদলে এখন সেখানে কতকগুলো গ্রাম চোখে পড়ে। ধ্বংস চিহ্নের মধ্যে বিরাট দীঘি, মাটির স্তূপ ও কেল্লা দেখা যায়।



চিত্র-৮.২১: পর্যবেক্ষণ এলাকা সোনারগাঁও, নারায়নগঞ্জ

মুঘল আমলের পূর্বেও এখানে বাংলাদেশের মুসলমান শাসকদের রাজধানী ছিল। পরে গৌড় এবং পাণ্ডুয়াতে রাজধানী স্থানান্তরিত হওয়ায় সোনারগাঁওয়ের গৌরব হ্রাস হয়ে যায়। অতীতের অসংখ্য ইমারতের অস্তিত্ব সোনারগাঁওয়ের সর্বত্র বিদ্যমান, বিশেষ করে পানাম এলাকায় দেখতে পাওয়া যায়। এখানে থেকেই শেরশাহের বিখ্যাত গ্রান্ড ট্রাংক রোড আরম্ভ হয়। এখানে গিয়াসউদ্দিন আজম শাহের কবর এবং পাঁচ পীরের মাজার রয়েছে। বর্তমানে সোনারগাঁওয়ে একটি লোকশিল্প জাদুঘর প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে যার নাম ‘শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন জাদুঘর’।

সীমানা: সোনারগাঁ থানা সদরের উত্তরে ভট্টপুর (অংশ), পূর্বে বৈদ্যের বাজার ইউনিয়নের পূর্ব গোপালপট্টা, চান্দেব কীর্তি, বাগিনাথপুর এবং আমিনপুর ইউনিয়নের সাহাপুর (অংশ) পশ্চিমে আমিনপুর ইউনিয়নের পশ্চিম গোপালপট্টা, চক সোনারগাঁও, ভিটি গোবিন্দপুর, রণ ভাওয়াল গোবিন্দপুর, কৃষ্ণপুরা কৃষ্ণপুর, আনা উতাসুখা হাটকোপা মৌজা এবং দক্ষিণে পিরোজপুর ইউনিয়নের ভাটিবান্দা, দিয়ারা মেমখালি মৌজা। মেনিখালি খাল সোনারগাঁও থানা সদরের দক্ষিণে অবস্থিত।

আয়তন: নারায়নগঞ্জ জেলার সোনারগাঁও থানার আমিনপুর ইউনিয়নের অন্তর্গত বারি রামকৃষ্ণপুর, বারি রঘুভাঙ্গা, ভবনাথপুর ও জয়রামপুর নামক চারটি মৌজা এবং ভট্টপুর ও সাহাপুর মৌজার অংশবিশেষ নিয়ে সোনারগাঁও থানা সদর গঠিত। এর বর্তমান আয়তন ০.৭৩ বর্গ কিলোমিটার।

প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য

ভূপ্রকৃতি ও নিষ্কাশন ব্যবস্থা : মেঘনা-ব্রহ্মপুত্র প্লাবনভূমির অন্তর্গত এ অঞ্চলটি অংশ ঢালযুক্ত সমতল। মাঝে মাঝে বসতি এলাকা, কৃষিভূমি, বিস্তীর্ণ বিল এবং রাস্তার পাশের জলাভূমি দেখে স্বভাবতই মনে হয় অধঃপতিত, উপেক্ষিত ও অবহেলিত অবস্থায় সম্পূর্ণ অঞ্চলটি পড়ে রয়েছে। বর্ষার পানি সহজেই নিষ্কাশিত হয়ে পাশের নদীগুলোতে গিয়ে পড়ে। তবে মাঝে মাঝে বন্ধ জলাভূমিও রয়েছে, যেখান থেকে একমাত্র শুষ্ক ঋতুতেই পানি শুকিয়ে যায়।

জলবায়ু: সমগ্র অঞ্চলটি ক্রান্তীয় মৌসুমি জলবায়ুর অন্তর্গত। বাংলাদেশের জলবায়ুর শ্রেণিবিভাগ অনুসারে এ এলাকাটি সাধারণত অর্ধ ক্রান্তীয় জলবায়ু উপভোগ করে। এখানে বার্ষিক গড় তাপমাত্রা ২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১৮০ থেকে ২২০ সেন্টিমিটারের মধ্যে। মে-জুন থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু এবং অক্টোবর-নভেম্বর থেকে উত্তর-পূর্ব মৌসুমি বায়ু এ এলাকার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়। বর্ষার সময় বৃষ্টিপাত সুবিন্যস্ত। এ সময় বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণ ৯০ থেকে ১০০ শতাংশ থাকে কিন্তু শীতের শুষ্ক দিনগুলোতে বাতাসের আর্দ্রতার পরিমাণ থাকে ৪০ থেকে ৬০ শতাংশ।

মৃত্তিকা: নদীবাহিত পলি সঞ্চয়ের ফলে এলাকাটি গঠিত হলেও বহু বছর ব্যবহারের ফলে এবং জৈব উদ্ভিদের প্রভাবে স্থানভেদে মাটির কণার মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। উপরের স্তরে বেলে, বেলে-দোআঁশ ও দোআঁশ মাটির প্রাধান্য থাকলেও নিচের স্তরে বেলে ও বেলে-দোআঁশ মাটি দেখা যায়।

উদ্ভিদ: ক্রান্তীয় অর্ধ জলবায়ুর প্রভাবেও অঞ্চলে বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদের সমারোহ রয়েছে। উদ্ভিদরাজির মধ্যে চিরহরিৎ উদ্ভিদের প্রাধান্য রয়েছে। আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু, পেয়ারা, নারকেল প্রভৃতি ফলবান গাছ ছাড়াও এখানে বরই, পলাশ, শিমুল, কৃষ্ণচূড়া প্রভৃতি পাতাঝরা গাছ দেখা যায়। কাঠ প্রদায়ী উদ্ভিদের মধ্যে কড়ই ও মেহগনি প্রধান। সরকারের বনায়ন নীতির প্রভাবে বেড়ে ওঠা গাছগুলো প্রধানত সড়ক ও রাস্তার ধারে দেখা যায়। এর মধ্যে মাঝে মাঝে দুই একটা দেবদারু, ইউক্যালিপটাস প্রভৃতি ভিন্ন জলবায়ুর গাছও নজরে পড়ে। প্রায় প্রতিটি মৌজায় বাঁশঝাড় রয়েছে, তবে সেগুলোর শ্রীবৃদ্ধি দেখা যায় না। অর্থনৈতিক প্রয়োজনে ব্যাপকভাবে ব্যবহারের ফলে এগুলো হালকা ঝোপে পরিণত হয়েছে। জলাভূমিগুলোতে শাপলা, কেউটেপানা, চকুরি প্রভৃতি দেখা যায়।

অধিবাসীদের জনমিতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য

জনসংখ্যা : ২০০১ খ্রিষ্টাব্দের আদমশুমারি অনুসারে সোনারগাঁও সদরের ছয়টি মৌজার মোট লোকসংখ্যা ৪,০৩৯ জন; এর মধ্যে ২,১৫৩ জন পুরুষ এবং ১,৮৮৬ জন মহিলা। শাহাপুর মৌজা (০.২৫ বর্গ কি. মি.) আয়তনে যেমন বড়, তেমনি এর লোকসংখ্যাও বেশি (২,১০০ জন)। লোকসংখ্যার দিক থেকে ভবনাথপুর দ্বিতীয় (৭৬০ জন), ভট্টাপুর তৃতীয় (৩৮৯ জন), জয়রামপুর চতুর্থ (৩২৭ জন), বারি রামকৃষ্ণপুর পঞ্চম (২৫০ জন), এবং বারি রঘুডাঙ্গা ষষ্ঠ (২১৩ জন)। সমগ্র সোনারগাঁও সদর এলাকার জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিলোমিটার ৫,৫৩৩ জন এবং ৭ বছর উর্ধ্ব অধিবাসীদের মধ্যে শিক্ষিতের হার ৫১। নারী-পুরুষ হারে প্রতি ১০০ জন মহিলায় পুরুষের সংখ্যা দেখানো হয়েছে।

বয়স ও নারী-পুরুষ কাঠামো এবং নির্ভরশীলতার হার: সোনারগাঁও সদর এলাকার বয়স ও নারী-পুরুষ কাঠামোর বাস্তবরূপ(সারণি ৮.১) এ দেখান হয়েছে। এখানে কর্মক্ষম লোকের সংখ্যা ২,০৮৩ জন হলেও এর প্রায় অর্ধেক মহিলা, যারা কেবলমাত্র দৈনন্দিন সাংসারিক কাজকর্ম ছাড়া আর কোনো অর্থনৈতিক কাজ করেন না। পক্ষান্তরে, শিশু ও বয়স্কদের মোট সংখ্যা ১,৯৫৮ জন, এদের মধ্যে মহিলাদের সংখ্যা ৯৭২ জন। এছাড়া পুরুষ ৯৮৫ জনের মধ্যে অধিকাংশই কর্মক্ষম নয়। ০-১৪ ও ৬০ উর্ধ্ব বয়সের সদস্যদের মধ্যে কিছু সংখ্যক মাঠের কৃষিকাজে সহায়তা করলেও তাদেরকে হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। ফলে এ এলাকায় নির্ভরশীলতার হার অনেক বেশি, যা স্থানীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিপন্থী।

সারণি-৮.১: বয়স ও নারী-পুরুষ কাঠামো

বয়ঃশ্রেণি	মোট সংখ্যা	পুরুষ	মহিলা
০-১৪	১,৮৫৭	৯২৭	৯৩০
১৫-৫৯	২,০৮১	১,১৬৭	৯১৪
৬০+	১০১	৫৯	৪২
মোট	৪,০৩৯	২,১৫৩	১৮৮৬

উৎস : ২০০১ আদমশুমারি প্রতিবেদন (নারায়ণগঞ্জ জেলা)

পরিবারের ধরন : সোনারগাঁও সদরে মোট ৭৯ পরিবারের উপর জরিপ চালিয়ে দেখা গেছে যে, এখানে একক পরিবারের সংখ্যা ৫৮টি, যা মোট জরিপকৃত পরিবারের ৭৩.৪২ শতাংশ, যৌথ পরিবারের সংখ্যা ৯টি, যা মোট জরিপকৃত পরিবারের ১১.৩৯ শতাংশ এবং বৃহৎ পরিবারের সংখ্যা ১২টি, যা মোট জরিপকৃত পরিবারের ১৫.১৯ শতাংশ মাত্র।

পরিবারের আকার : সোনারগাঁও সদর এলাকায় জরিপকৃত মোট ৭৯টি পরিবারের মধ্যে ২ জন বা তারও কম সদস্য বিশিষ্ট পরিবারের সংখ্যা ৬টি যা মোট জরিপকৃত পরিবারের ৭.৬ শতাংশ মাত্র; ৩ থেকে ৫ জন সদস্য বিশিষ্ট পরিবারের সংখ্যা ৫০টি, যা মোট জরিপকৃত পরিবারের ৬৩.২৯ শতাংশ এবং ৬ জন বা তারও অধিক সদস্য বিশিষ্ট পরিবারের সংখ্যা ২৩টি, যা মোট জরিপকৃত পরিবারের ২৯.১১ শতাংশ।

সারণি-৮. ২: পরিবারের আকার

সদস্য সংখ্যা (আকার)	পরিবারের সংখ্যা	শতকরা হার
০-২	৬	৭.৬০
৩-৫	৫০	৬৩.২৯
৬+	২৩	২৯.১১
মোট	৭৯	১০০

উৎস : সরেজমিনে জরিপের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য

বৈবাহিক অবস্থা : সমীক্ষা এলাকার মোট ৪,০৩৯ জন অধিবাসীর মধ্যে পুরুষ ও মহিলা মিলিতভাবে ১,৮৫০ জন অবিবাহিত, ২,১৫৬ জন বিবাহিত এবং ৩৩ জন বিধবা বা বিপত্নীক। এ তিন স্তরের লোকসংখ্যার শতকরা হার যথাক্রমে ৪৫.৮০, ৫৩.৩৯ এবং ০.৮২। সুতরাং সমীক্ষা এলাকায় বিবাহিতের সংখ্যা বেশি, যার মধ্যে মহিলাদের হার বেশি।

সারণি-৮.৩: বৈবাহিক অবস্থা

বৈশিষ্ট্য	সংখ্যা	শতকরা হার
বিবাহিত	২,১৫৬	৫৩.৩৯
অবিবাহিত	১,৮৫০	৪৫.৮০
বিধবা/ বিপত্নীক	৩৩	০.৮২
মোট	৪,০৩৯	১০০

উৎস : ২০০১ এর আদমশুমারি প্রতিবেদন, নারায়ণগঞ্জ জেলা

শিক্ষা : সোনারগাঁও সদর এলাকায় বর্তমানে বসবাসকারী অধিকাংশ লোকই মাধ্যমিক বা প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন। এখানে উচ্চ শিক্ষিত লোকের সংখ্যা খুবই কম। তবে অনেক মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে-মেয়েরা স্কুল ও কলেজে লেখাপড়া করছে। অবশ্য দরিদ্র পরিবারের ছেলেমেয়েদের অনেকেই লেখাপড়া করে না। সমগ্র সোনারগাঁও সদর এলাকায় স্বাক্ষরতার হার ৫১ হলেও মহিলাদের স্বাক্ষরতা হার ১২ শতাংশ মাত্র।

ধর্ম : সোনারগাঁও সদরে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। ১৯৪৭ এর পর বহু হিন্দু পরিবার ভারতের পশ্চিমবঙ্গে সপরিবারে চলে যাওয়ায় বর্তমানে এখানে হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের হার মাত্র ১২.১২ শতাংশ। খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বী কিছু লোক বাস করলেও তাদের হার ১ শতাংশেরও কম।

সামাজিক অনুষ্ঠান: মুসলিম, হিন্দু, খ্রিষ্টান সব ধর্মের লোকেরাই নিজ নিজ সামাজিক অনুষ্ঠানাদি পালন করেন। ইদুলফিতর, ইদুল-আজহা, শবেবরাত, শবেকদর প্রভৃতি মুসলিম সমাজের অনুষ্ঠানে সমবেতভাবে সবাই অংশগ্রহণ করেন। হিন্দু ধর্মের দুর্গাপূজা যথেষ্ট জাঁকজমকের সাথে পালন করা হয়। যিশু খ্রিষ্টের জন্মদিন (বড়দিন) খ্রিষ্ট ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় অনুষ্ঠান। বিবাহ বা অনুরূপ অন্যান্য সামাজিক অনুষ্ঠানে হিন্দু-মুসলিম সকলেই মিলিতভাবে অংশগ্রহণ করেন।

বিনোদন : ব্যাপক আকারে বিনোদনের কোনো সুযোগ-সুবিধা সোনারগাঁওয়ে বর্তমানে নেই। বিদ্যুৎশালীরা নিজ নিজ বাড়িতে রেডিও, টেলিভিশন, ভি.সি.পি প্রভৃতি ব্যবহার করেন। এদের হার শতকরা ২৮.২৪ শতাংশ। দেশীয় খেলাধুলা হাডু-ডু-ডু, গোলাছুট প্রভৃতির পাশাপাশি ফুটবল খেলা স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীদের আনন্দ দেয়। বর্তমানে ক্রিকেট খেলা তরুণদের মধ্যে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। মাঝে মাঝে দুই-এক বছর পর যাত্রা অনুষ্ঠান হয়। তবে বাংলাদেশ লোকশিল্প জাদুঘরের প্রাপ্তনে প্রতিবছর শীত ঋতুতে পল্লীজীবনভিত্তিক লৌকিক আচার-অনুষ্ঠান, উৎসব, অভিনয়, লোকজ শিল্পমেলা সোনারগাঁয়ের নিয়মিত সামাজিক-সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের পরিণত হয়েছে।

চারু ও কারুশিল্প: শিল্প সৃষ্টির প্রয়াসে নয়, বরং প্রাত্যহিক জীবনে বেঁচে থাকার তাগিদে কাজ করতে এবং কাজের অবসরে সাধারণ মানুষ যে সব লোক চারু ও কারুশিল্প সৃষ্টি করেছে সেগুলো রূপ ও রসে ভরপুর এবং এগুলোই আবহমান বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। ১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশ সরকার সোনারগাঁওয়ে লোকজ সংস্কৃতির নির্দশনসমূহের সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও পুনরুজ্জীবনের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশন ও জাদুঘর প্রতিষ্ঠা করেন। উপযোগিতার কথা বিবেচনা করে এ প্রতিষ্ঠান প্রাথমিক পর্যায়ে পরীক্ষামূলকভাবে (১) তাঁত (বয়ন, ছাপা, বাটিক ইত্যাদি), (২) মৃৎশিল্প (কুমার ও পটুয়া), (৩) কাঠ ও কাঠ খোঁদাই, (৪) বেত, বাঁশ ও শোলা, (৫) পাট ও পাটজাত দ্রব্য, (৬) পিতল, কাসা ও রূপা, (৭) ঝিনুক, হাড় ও শাখা এবং (৮) হাতে তৈরি মোটা ও তুলোট কাগজ তৈরি প্রশিক্ষণের কাজ হাতে নেয়। এ প্রতিষ্ঠানে অঞ্চলভিত্তিক সংস্কৃতি ফুটিয়ে তুলতে ঐতিহ্যবাহী গ্রামীণ স্থাপত্যের বৈচিত্র্যময় নির্দশনগুলো তুলে ধরার প্রচেষ্টা চলছে।

স্থাপত্য : সোনারগাঁও সদর এলাকায় বহু প্রাচীন স্থাপত্য শিল্পের নজির পাওয়া যায়। বৌদ্ধ শাসন আমলের, হিন্দু শাসন আমলের এবং মুসলিম শাসন আমলের এসব প্রাচীন ও অবলুপ্ত প্রায় বস্তুর অবশেষে পুরা নির্দশনগুলো স্মৃতি চিহ্নরূপে সংরক্ষিত রয়েছে। মসজিদ, সেতু, সমাধি, স্মৃতিস্তম্ভ, দুর্গ প্রভৃতি দেখে সোনারগাঁও এলাকায় অতীত গৌরব ও ঐশ্বর্য সম্বন্ধে ধারণা লাভ করা যায়। আদি মধ্যযুগের ইব্রাহিম দানিশা মানিদের সমাধি, মধ্যযুগের মান্না শাহের সমাধি, পঞ্চদশ শতাব্দীর মোগরাপাড়ার দামাসমাহ দুর্গ, গিয়াসুদ্দীন আযম শাহের সমাধি (১৪১০ খ্রি.), ষষ্ঠদশ শতাব্দীর গোয়ালদী মসজিদ (১৫১৯ খ্রি.), সপ্তদশ শতাব্দীর পাঁচ পীরের সমাধি (সাবিলপুর গ্রামে), পংখীরাজ খালের উপর সপ্তদশ শতাব্দীতে তৈরি তিন খিলান ও দুইকক্ষ বিশিষ্ট পানাম সেতু প্রভৃতি পুরা স্থাপত্য নিদর্শন হিসেবে আজও টিকে রয়েছে।

অধিবাসীদের জীবনযাত্রার মান

বসতি: সোনারগাঁওয়ে বসতি বিন্যাসের স্থানীয় ভূগঠনের প্রভাব সুস্পষ্ট। নদীনালা, ডোবা-জলা পরিবেষ্টিত এ এলাকায় অপেক্ষাকৃত উঁচু স্থানগুলোতে মানব বসতিগুলো কখনও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও নিয়মিত, কখনও প্রায় নিয়মিত, আবার কখনও প্রায় অক্রেম ধরন লাভ করেছে। ঘন বসতিপূর্ণ রামকৃষ্ণপুর, ভট্টাপুর ও শাহাপুর মৌজায় সুখম, ভবনাথপুর ও রঘুডাঙ্গা মৌজায় প্রায় সুখম এবং জয়রামপুর মৌজায় বিক্ষিপ্ত বসতি ধরন দেখতে পাওয়া যায়।

গৃহের ধরন : সোনারগাঁওয়ের সাধারণ মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত লোকের বসবাস বেশি দেখা যায়। বেশিরভাগ পাকা বাড়ি পুরানো ইটের। টিনের চাল, পাটির বেড়া ও কাঁচা মেঝের বাড়ির সংখ্যা বেশি। অবশ্য কোনো কোনো স্থানে নতুন ইটের তৈরি পাকা বাড়ি দেখা যায়। বিক্ষিপ্তভাবে ছড়ানো, ইমারতের ধ্বংসাবশেষ দেখে মনে হয় এলাকাটি অতীতে কোনো এক সময় খুবই সমৃদ্ধশালী ছিল। জেমস ওয়াইজের ভাষায় বলতে হয়- “সোনারগাঁও বাসীদের কাছে সোনারগাঁও প্রাচীন নগরীর অবস্থান হিসেবে বিবেচিত। এর আশেপাশেই অনেক প্রাচীন ইমারত রয়েছে।”

নির্মাণ সামগ্রী: প্রাচীন ইমারতগুলো পাতলা ইট ও সুরকীর গাঁথুনি বিশিষ্ট। এ মাল-মসলা দিয়েই সে মধ্যযুগের এখানে অনেক দোতলা ইমারত তৈরি করা হয়েছে। খিলান, স্তম্ভ, নকশা প্রভৃতিতে রাজমিস্ত্রীর শিল্পীর হাতের ছোঁয়া রয়েছে। মধ্যবিত্তদের ঘরগুলো টিনের ছাউনি ও মুলিবাঁশের বেড়া দিয়ে তৈরি। নিম্নবিত্তদের ঘরগুলো পাটকাঠির বেড়া দিয়ে তৈরি।

শৌচাগার : জরিপকৃত ৭৯ পরিবারের শৌচাগারের মধ্যে ৬টি স্যানিটারি (৭.৫৯ শতাংশ), পাকা শৌচাগার ১১টি (১৩.৯২ শতাংশ) এবং কাঁচা শৌচাগার ৬২টি (৭৮.৪৯ শতাংশ)।

ব্যবহৃত জ্বালানি : জ্বালানি হিসেবে অধিবাসীদের ৮০ শতাংশ কাঠ এবং ২০ শতাংশ কেরোসিন তেল ব্যবহার করেন।

আলো: রাতের অন্ধকার দূর করে প্রয়োজনীয় কাজ সমাধা করার জন্য অধিবাসীদের বেশিরভাগই হারিকেন ব্যবহার করেন। কুপি ব্যবহারকারীদের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। অবশ্য বৈদ্যুতিক বাতি ব্যবহারকারীদের সংখ্যা অনেক কম। মোট অধিবাসীদের ৪৮.৮১ শতাংশ লোক হারিকেন, ৩৪.৫২ শতাংশ লোক কুপি এবং মাত্র ১৬.৬৭ শতাংশ লোক বৈদ্যুতিক বাতি ব্যবহার করেন।

খাবার পানি: সোনারগাঁও সদরে অনেকগুলো টিউবওয়েল রয়েছে। তবে কূপের সংখ্যা কম। বড় আকারের পুকুর থেকে পানি সংগ্রহ করে অনেকে পান করেন। মোট অধিবাসীদের শতকরা ৭৩ জন টিউবওয়েলের পানি, শতকরা ১৯ জন পুকুরের পানি এবং শতকরা ৮ জন কূপের পানি পান করেন।

সারণি-৮.৪: খাবার পানি উৎস

উৎস	টিউবওয়েল	পুকুর	কুয়া	মোট
ব্যবহারকারী	৫৮	১৫	০৬	৭৯
শতকরা হার	৭৩.৪২	১৮.৯৮	৭.৬৩	১০০

উৎস : সরেজমিনে জরিপের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য

চিকিৎসা: সোনারগাঁও সদর এলাকায় ৬টি মৌজার অধিবাসীরা বিভিন্ন রোগ-ব্যধিতে চিকিৎসার জন্য ডাক্তার, কবিরাজ ও হেকিমের সাহায্য গ্রহণ করেন। সংখ্যায় কম হলেও অনেকে পানিপড়া ও ঝাড়ফুক তদবিরে বিশ্বাসী। মোট অধিবাসীদের প্রায় ৬০ শতাংশ হোমিওপ্যাথি ও অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রামীণ ডাক্তার তাদের চিকিৎসা করেন। প্রয়োজনীয় ঔষধ স্থানীয় বাজারে বা ডাক্তার সাহেবের কাছে পাওয়া যায়। শতকরা প্রায় ২৮ জন কবিরাজী চিকিৎসা এবং শতকরা প্রায় ৮ জন হেকিমি চিকিৎসা করান।

সারণি- ৮.৫: চিকিৎসার মাধ্যম

মাধ্যম	ডাক্তার	কবিরাজ	হেকিম	পানিপড়া	ঝাড়ফুক	মোট
সংখ্যা	৪৭	২২	০৬	০২	০২	৭৯
শতকরা হার	৫৯.৪৯	২৭.৮৬	৭.৬০	২.৫৩	২.৫৩	১০০

উৎস : সরেজমিনে জরিপের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য

অধিবাসীদের অর্থনৈতিক অবস্থা

পেশা: স্থানীয় অধিবাসীরা বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত রয়েছেন। ৭৯ জন অধিবাসীদের উপর প্রশ্নমালা সাক্ষাৎকার জরিপের মাধ্যমে দেখা যায়, এখানকার অধিবাসীদের প্রধান পেশা কৃষিকাজ। মোট অধিবাসীদের শতকরা ৩৪.১৮ জন কৃষিকাজ করে জীবিকা নির্বাহ করেন। অবশ্য ভূমিহীন দিনমজুরের সংখ্যাই এদের মধ্যে বেশি; যারা দৈনিক ভিত্তিতে অর্থের বিনিময়ে বিত্তশালীদের কৃষিজমিতে চাষাবাদ করেন। পরোক্ষভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল হলেও বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও কুটির শিল্পে চাকরি করে জীবিকা নির্বাহ করেন শতকরা ৩১.৬৪ জন। ব্যবসা করে জীবিকা নির্বাহ করেন শতকরা ১৬.৪৫ জন। এদের বেশিরভাগই ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী; শহর-গঞ্জ এলাকা থেকে চাহিদাপূর্ণ পণ্যদ্রব্য নিয়ে এসে স্থানীয় অধিবাসীদের ও পথচারীদের কাছে বিক্রি করাই এদের কাজ। অবশ্য জিনিসের দাম ঢাকা বা নারায়ণগঞ্জ থেকে খুব একটা বেশি নয়। অন্যান্য বিভিন্ন ধরনের পেশায় নিয়োজিত রয়েছেন শতকরা ১৩.৭৩ জন। রিক্সা চালনা, দিনমজুর প্রভৃতি পেশা অবলম্বন করে তারা জীবিকা নির্বাহ করেন। স্থানীয় কোনো পুরুষ বা মহিলা শিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করেন না।

ভূমির মালিকানা: এলাকাবাসীদের মধ্যে ভূমির মালিকানা বিভিন্ন ধরনের। ভূমির মালিক কিন্তু নিজে চাষাবাদ করেন না, ভাড়া করা শ্রমিকদের দিয়ে চাষাবাদ করান এমন কৃষকের শতকরা হার ৪৮.১০ জন। পক্ষান্তরে, ২৫.৩১ শতাংশ লোক নিজের জমি নিজে চাষ করেন। অন্যের জমি বর্গা নিয়ে চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করেন এমন বর্গাচাষি লোকের শতকরা হার ৮.৮৬ জন। পক্ষান্তরে, নিজের জমি নিজে চাষ করেন এবং অন্যের জমি বর্গা নিয়ে চাষ করেন এমনচাষির শতকরা হার ১১.৩৯ জন। আর ভূমিহীনদের হার ৬.৩৯ শতাংশ।

সারণি ৮.৬: ভূমির মালিকানা সংক্রান্ত তথ্য

মালিকানার ধরন	উত্তর দাতার সংখ্যা	শতকরা হার
ভূমির মালিক কিন্তু নিজে চাষ করেন না	৩৮	৪৮.১০
ভূমির মালিক এবং নিজে চাষ করেন	২০	২৫.৩১
বর্গাচাষি	৭	৮.৮৬
নিজের জমি নিজে চাষ করেন ও কিছু বর্গা দেন	৯	১১.৩৯
ভূমিহীন	৫	৬.৩৯
মোট	৭৯	১০০

উৎস : সরেজমিনে জরিপের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য

ভূমিতল: সোনারগাঁওয়ে প্রধানত তিনটি ভূমিতল দেখা যায়। প্রথমতল সবচেয়ে উঁচু। মোট জমির প্রায় ৫০ শতাংশ প্রথমতলের অন্তর্গত। বসতবাড়ি, ফলের বাগান, বাঁশবাড়, জ্বালানি তৈরির উপযোগী গাছ, রাস্তা/সড়ক নির্মাণ প্রভৃতি কাজে প্রথম তলের জমিগুলো ব্যবহৃত হয়। কৃষকেরা প্রথম তলের কিছু পরিমাণ জমিতে বিভিন্ন সবজি চাষ করেন। দ্বিতীয় তল মূলত চাষাবাদের জন্য ব্যবহৃত হয়। আউশ, পাট ও আমন দ্বিতীয়তলে উৎপাদিত হয়। কিছু সংখ্যক চাষি শুষ্ক মৌসুমে স্বল্প পরিমাণ জমিতে গম চাষ করেন। ইক্ষু চাষের জন্য দ্বিতীয়তলে উৎপাদিত হয়। কিছু সংখ্যক চাষি শুষ্ক মৌসুমে স্বল্প পরিমাণ জমিতে গম চাষ করেন। ইক্ষু চাষের জন্য দ্বিতীয়তল ব্যবহৃত হয়। মোট জমির ৪০ শতাংশ দ্বিতীয় তলের অন্তর্গত। প্রচুর ডোবা-নালা, ব্যবহৃত উঁচুনিচু জমি তৃতীয় তলের অন্তর্গত। মোট জমির ১০ শতাংশ এ তলে রয়েছে। বিভিন্ন তলের মধ্যে ব্যবধান ১ থেকে ৩ ফুট।

ফসল পদ্ধতি: সোনারগাঁয়ের চাষযোগ্য জমিগুলোতে প্রধানত তিন ধরনের ফসল পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। মোট চাষযোগ্য জমির ১২.৫ শতাংশ এলাকায় বছরে মাত্র একটি ফসল, ৪৩.৭৫ শতাংশ জমিতে বছরে দুইটি ফসল এবং ৪৩.৭৫ শতাংশ জমিতে বছরে তিনটি ফসল উৎপাদিত হয়। তিন ফসলী জমির কিছু অংশ প্রথম তলে অবস্থিত, যেখানে সবজি চাষ করা হয়।

কৃষিকাজে নিয়োজিত জমি: পূর্ণমাত্রায় বর্গাচাষি এবং ভূমিহীনদের কোনো নিজস্ব জমি নেই। অবশিষ্ট ৬৭ জন উত্তর দাতার কৃষিজমির বিন্যাস নিচের সারণিতে দেখান হয়েছে। সমীক্ষা এলাকায় শতকরা ৩১.৩৪ জন লোকের কৃষিজমির পরিমাণ ২ বিঘা বা তারও কম। শতকরা ২৬.৮৭ জনের কৃষিজমির পরিমাণ ২.১ থেকে ৫ বিঘা,; ২৩.৮৮ জনের কৃষিজমির পরিমাণ ৫.১ থেকে ৮ বিঘা; ১১.৯৪ শতাংশ লোকের কৃষিজমির পরিমাণ ৮.১ থেকে ১১ বিঘা এবং মাত্র ৫.৯৭ শতাংশ লোকের কৃষিজমির পরিমাণ ১১ বিঘা বা তারও বেশি। অর্থাৎ অতিঅল্প সংখ্যক গৃহস্থের হাতে অধিক পরিমাণে কৃষিজমি রয়েছে যা চাষাবাদের উন্নতি ও ফসলের ফলন বৃদ্ধির জন্য খুবই ক্ষতিকারক। কারণ ৫.৯৭ শতাংশ লোক নিজেদের সম্পূর্ণ কৃষিজমি সব বছর চাষের কাজে নিয়োজিত করতে পারেন না। ফলে চাষযোগ্য বেশকিছু জমি পতিত পড়ে থাকে। ফলে স্থানীয় অর্থনৈতিক উন্নতি ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

সারণি- ৮.৭ : কৃষিকাজে নিয়োজিত জমি

জমির পরিমাণ	উত্তরদাতা	শতকরা হার
০-২ বিঘা	২১	৩১.৩৪
২.১-৫ বিঘা	১৮	২৬.৮৭
৫.১-৮ বিঘা	১৬	২৩.৮৮
৮.১-১১ বিঘা	৮	১১.৯৪
১১+ বিঘা	৪	৫.৯৭
মোট	৬৭	১০০

উৎস : সরেজমিনে জরিপের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য

কৃষি পদ্ধতি: সোনারগাঁওয়ের কৃষকেরা এখনও পূর্ণমাত্রায় আধুনিক কৃষি পদ্ধতি অনুশীলন করতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠেনি। আর্থিক অসংগতিই এর মূল কারণ। কেবল ৪জন ধনী গৃহস্থ পাওয়ার টিলার ও স্প্রে মেশিন ব্যবহার করেন। সারিবদ্ধ চাষাবাদ ব্যবস্থা অনুশীলনের রীতি অনেকেরই জানা নেই। এর ফলে একর প্রতি উৎপাদনের পরিমাণ অনেক কম। অবশ্য উচ্চ ফলনশীল ধানের প্রজাতির নাম তাঁরা জানেন এবং বীজ রোপণের পর সার, কীটনাশক দ্রব্য ও সেচ পদ্ধতি অনুশীলনের সুফল তাঁরা পেতে শুরু করেছেন।

ব্যবহৃত কৃষি যন্ত্রপাতি: স্থানীয় কৃষকেরা প্রধানত কাঠের লাঙল, জোয়াল, এ, নিড়ানি, খুরপই, কাস্তে, কোদাল, আচড়া, কাঠের বড় হাতুড়ি ব্যবহার করেন। সহজ কিস্তিতে ক্রয় বা ভাড়ার মাধ্যমে উন্নত আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা সম্ভব হলে এসব ক্ষুদ্র চাষি পরিবার সেসবের ব্যবহার করে অধিক পরিমাণে ফসল উৎপাদনে সমর্থ হতে পারতো।

সারের ব্যবহার: সোনারগাঁওয়ের কৃষকেরা চাষাবাদের জন্য কেবলমাত্র ছাই বা গোবর সারের ব্যবহার করে সন্তুষ্ট নয়। আবর্জনা থেকে এবং কচুরিপানা থেকে কম্পোস্ট সার তৈরির কৌশল তাদের জানা নেই বা কেউ কেউ জানলেও কম্পোস্ট সার তৈরি করা ঝামেলা বলে মনে করেন। তাঁরা জৈব সারের পাশাপাশি রাসায়নিক সার ব্যবহার করতে আগ্রহী; কিন্তু অধিক মূল্যের জন্য এ ধরনের সার ব্যবহার করতে পারছেন না। ইউরিয়া, টি.এস.পি এম.পি প্রভৃতি রাসায়নিক সার ব্যবহারকারীর সংখ্যা নিতান্তই কম। মাত্র ৬টি কৃষি পরিবার এরূপ সার ব্যবহার করছেন।

সেচের ব্যবস্থা: কেবলমাত্র প্রকৃতির দেওয়া বৃষ্টির পানির উপর নির্ভর না করে শুষ্ক ঋতুতে, বিশেষ করে শীতের দিনগুলোতে কৃষিজমিতে পানিসেচ করবার সুফল অনেকেই পাচ্ছেন। যেসব জমি শুষ্ক ঋতুতে অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থাকে সেগুলোতে বর্তমানে পানিসেচ করে ফসল উৎপাদন করা হচ্ছে। অবশ্য পানিসেচের আধুনিক যন্ত্র গভীর নলকূপ, অগভীর নলকূপ, শ্যালো মেশিন অনেকেই ব্যবহার করতে পারছেন না। বিশেষ করে ক্ষুদ্র কৃষকেরা এসবের সুযোগ থেকে বঞ্চিত। তাঁরা দোন, সেওতি ও ডোঙ্গার সাহায্যে জলাশয় থেকে পানি কৃষিজমিতে সেচ করেন। অনেকে কলসি, ভাড়, বা বাঁকের মাথার কেরোসিন টিন বেঁধে পরিশ্রমের মাধ্যমে জমিতে পানিসেচ করেন। অল্প কিছু সংখ্যক কৃষক শ্যালো বা অগভীর নলকূপের সাহায্যে জমিতে পানিসেচ করেন।

কীটনাশক দ্রব্যের ব্যবহার: ফসলের বিভিন্ন রোগ ও কীটপতঙ্গ, পোকামাড়ক দমনের জন্য স্থানীয় চাষিরা, বিশেষ করে ধনী গৃহস্থরা রোগভেদে বিভিন্ন ধরনের কীটনাশক দ্রব্য ব্যবহার করেন। ইঁদুর দমনের জন্য খাদদ্রব্যের সাথে এডিন মিশিয়ে রাখা

হয়। মাজরা, লেদা, পামড়ি, ফড়িং প্রভৃতি দমনের জন্য ফুরাডন, বাসুডিন বেশিরভাগ চাষি ব্যবহার করেন। অবশ্য সহজলভ্য হলে ডায়াজিনন, সেভিডোল, কার্বিক্রোন, ডাইমেক্রন প্রভৃতি কীটনাশক দ্রব্য ব্যবহার করতে চাষিরা অভ্যস্ত হয়ে উঠেছেন। তবে অনেক সময় এসব দ্রব্য সহজলভ্য হয় না। তখন কৃষকেরা অসুবিধার মধ্যে পড়েন।

জমিতে ব্যবহৃত বীজ: কৃষকদের মধ্যে অধিকাংশই প্রাচীন পদ্ধতিতে সংরক্ষিত দেশি বীজ ব্যবহার করতে অভ্যস্ত। ধান, পাট, ইক্ষু, গম প্রভৃতি ফসলের উচ্চ ফলনশীল (উফশী) বীজের ব্যবহার এখনও ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়নি। বিশেষ করে বেগুন, আলু, মূলা, টেঁড়শ, বিভিন্ন প্রজাতির সবজি চাষের জন্য দেশি বীজের ব্যবহার বেশি দেখা যায়। চাষিদের ৮৫.৪৯ শতাংশ দেশি বীজ এবং ১৪.৫৯ শতাংশ লোক উফশী বীজ ব্যবহার করেন।

উৎপাদিত কৃষিজ দ্রব্য: বর্তমানে বিভিন্ন সময়ে চাষিরা কৃষিজমিতে ধান, গম, পাট, ইক্ষু, বেগুন, টেঁড়শ, মূলা, ধনিয়া, পুঁইশাক ও লালশাক চাষ করেছেন। প্রধান খাদ্যশস্য ধান চাষে চাষযোগ্য জমির অধিকাংশই ব্যবহার করা হয়। কৃষকদের প্রায় ৪৩ শতাংশ ধান চাষ করেন। গম চাষ এ অঞ্চলে অধুনা প্রবর্তিত হয়েছে। ফরে বেশি চাষি গম চাষ ও পরিচর্যায় অভ্যস্ত হয়ে উঠেন নাই। এজন্য মাত্র ৩.৬ শতাংশ কৃষক গম চাষ করেন। অর্থকরী ফসলের মদ্যে পাট ও ইক্ষু চাষ করা হয়। শতকরা ২৭ জন কৃষক পাট চাষ করেন। ইক্ষু চাষে জমি দীর্ঘদিন নিয়োজিত থাকে বলে মাত্র ১০ শতাংশ কৃষক শীত ঋতুতে ইক্ষু চাষ করেন। কৃষক পরিবারের প্রত্যেকে ঋতুভেদে বিভিন্ন প্রকার সবজি চাষ করেন। বেগুন, পটল, টেঁড়শ, সীম, ফুলকপি, বাঁধাকপি, মূলা, পিয়াজ, রসুন, আদা, হলুদ, ধনিয়া প্রধান সবজি ও মসলা জাতীয় ফসল উৎপাদিত হয়।

শিল্প: আলোচ্য এলাকায় যন্ত্রশিল্প ব্যাপকভাবে বিকাশ লাভ করে নাই। সমীক্ষা এলাকার বাজার সংলগ্ন স্থানে দুইটি ধান ভাঙা/গম ভাঙা কল রয়েছে। অবশ্য কুটির শিল্প ও হস্তশিল্পের জন্য এলাকাটি সুপরিচিত। বিশেষ করে রকমারী তাঁত বস্ত্র, পাটের দোলনা, শিখা, বেতের মোড়া, চেয়ার, মাটির তৈজসপত্র ও পুতুল, কাঠের আসবাবপত্র ও কাঠ খোদাই শিল্পের জন্য এ এলাকা প্রসিদ্ধ।

পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা: নদীপথ অনুন্নত ও অপরিপূর্ণ হওয়ায় অধিবাসীরা জেলা শহর নারায়ণগঞ্জ ও দেশের রাজধানী ঢাকার সাথে সড়কপথে যোগাযোগ রক্ষা করেন। ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের অদূরে অবস্থিত হওয়ায় স্থানীয় অধিবাসীরা বাসের মাধ্যমে যাতায়াত করেন। বিভিন্ন পণ্যদ্রব্য ট্রাক ও লরির মাধ্যমে পরিবাহিত হয়।

ব্যবসা-বাণিজ্য: নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ থেকে নিয়ে এসে ছোট ব্যবসায়ীরা নিজেদের দোকানের মাধ্যমে স্থানীয় অধিবাসীদের কাছে বিক্রি করে। মধ্যস্বত্বভোগী ফড়িয়ারা কৃষি ও কুটির শিল্পজাত দ্রব্য সোনারগাঁও এলাকা থেকে ক্রয় করে অন্যত্র রপ্তানি করে।



চিত্র: ৮.২২ ঐতিহাসিক স্থান (সোনারগাঁও)

উপসংহার

বিখ্যাত সোনারগাঁও নগর এখন শুধু ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে রয়েছে। শতাব্দী কালের ব্যবধানে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে যোগাযোগ সুবিধার ফল শীতলক্ষ্যা ও মেঘনার মধ্যবর্তী ভূভাগ এখন পরিণত হয়েছে একটি উৎপাদনশীল এলাকায়। মহাসড়কের উভয় পাশে বিস্তীর্ণ ফসলের মাঠ, গড়ে উঠেছে বহুতল শিল্প কারখানা। মহাসড়কের বামপাশে পানাম ও গোয়ালদির দিকে এবং ডানে মোংগরাপাড়া ও সন্নিহিত গ্রামঅঞ্চলে সম্প্রতি গড়ে ওঠা আধুনিক বসতি দ্রুত পাল্টে দিচ্ছে পারিপার্শ্বিক পরিবেশ এবং এতে দিনে দিনে এলাকাটি রূপ নিচ্ছে একটি উপশহরে।

প্রশ্নমালা

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. ব্যবহারিক ভূগোল বলতে কী বুঝায়?
২. ব্যবহারিক ভূগোলের প্রয়োজনীয়তা কী?
৩. ব্যবহারিক ভূগোলের পরিধি কতটুকু?
৪. মানচিত্রের স্কেল বলতে কী বুঝায়?
৫. সরল স্কেল বলতে কী বুঝায়?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. সরল স্কেলের ব্যবহার ও সুবিধাসমূহ আলোচনা করুন।
২. প্রতিভূ অনুপাত (R.F) ১: ৪০ এর সাহায্যে গজ ও ফুট দেখাতে একটি সরল স্কেল অঙ্কন করুন।
৩. ১" তে ৭ মাইল এর সাহায্যে একটি কিলোমিটার স্কেল অঙ্কন করুন।
৪. কর্ণীয় স্কেল কাকে বলে? কর্ণীয় স্কেলের ব্যবহার ও সুবিধাসমূহ আলোচনা করুন।
৫. প্রতিভূ অনুপাত (R.F) ১: ৫০ এর সাহায্যে গজ, ফুট ও ইঞ্চি দেখাতে একটি কর্ণীয় স্কেল অঙ্কন করুন।
৬. প্রতিভূ অনুপাত (R.F) ১: ৪০ এর সাহায্যে গজ, ফুট ও ইঞ্চি দেখাতে একটি কর্ণীয় স্কেল অঙ্কন করুন।
৭. মানচিত্রের সম্প্রসারণ ও সংকোচন বলতে কী বোঝায়? এর পদ্ধতিসমূহ বর্ণনা করুন এর সুবিধা ও অসুবিধা আলোচনা করুন।
৮. ভৌগোলিক শিক্ষাসফর প্রতিবেদনের রূপরেখা প্রণয়ন করুন।

গ্রন্থপঞ্জি

আলম, কে. আশরাফুল, হোসেন, মোহাম্মদ ফরহাদ, *অর্থনৈতিক ভূগোল ও বাংলাদেশ (দ্বিতীয় পত্র)*, ঢাকা: পারফেক্ট পাবলিকেশন্স, ২০০৯।

আলম, ড. মোঃ মনিরুল, *জনসংখ্যা ভূগোল*, ঢাকা: স্বজন প্রকাশনী, ২০১৩।

আহমেদ, ফারুক; সারওয়ার, মোঃ আফজাল হোসেন ও চৌধুরী, আনির (সম্পাদনা), *শিক্ষায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি: শিক্ষক কর্তৃক ডিজিটাল উপকরণ তৈরি এবং মাল্টিমিডিয়া ক্লাশরুম পরিচালনা (প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল)*, ঢাকা: একসেস টু ইনফরমেশন (a2i) প্রোগ্রাম, ২০১০।

খান, মোঃ লুৎফর রহমান, মালেক, আব্দুল ও বেগম, রওশন আরা (সম্পাদনায়), *সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষণ*, ঢাকা: মাধ্যমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষাভবন, ২০০০।

খান, ড. মোঃ আবদুল আউয়াল, আখতার, খুরশীদ, *ভূগোল শিক্ষণ*, ঢাকা: মাধ্যমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ২০০০।

খান, মোঃ আবদুল আউয়াল, *আধুনিক শিক্ষায় ভূগোলের স্বরূপ*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৯৪।

চৌধুরী, মোয়াজ্জেম হোসেন, *আঞ্চলিক ভূগোল (দ্বিতীয় পত্র)*, ঢাকা: বাংলাদেশ বুক করপোরেশন লি., ২০০৭।

চৌধুরী, মোয়াজ্জেম হোসেন, *উচ্চ মাধ্যমিক ভূগোল (দ্বিতীয় পত্র)*, ঢাকা: বাংলাদেশ বুক করপোরেশন লি., ২০০৫।

নেসা, বদরুন, *ভূগোল ও ভূগোল শিক্ষাদান*, ঢাকা: প্রভাতী লাইব্রেরী, ১৯৯৯।

বানু, সেলিনা; মরতুজা, ড. এ. এস. এম. গোলাম; আখতার, শিরীন ও বাশার, মোঃ আবুল; আখতার, সালমা ও মালেক, আব্দুল (সম্পাদনা), *সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষণ (প্রশিক্ষক নির্দেশিকা)*, ঢাকা: টিচিং কোয়ালিটি ইমপ্রভমেন্ট ইন সেকেন্ডারি এডুকেশন প্রজেক্ট, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর, ২০০৮।

বানু, সেলিনা, মরতুজা, ড. এস. এম. গোলাম, আখতার, শিরীন, বাশার, মোঃ আবুল *মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ (বি.এড) সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষণ প্রশিক্ষক নির্দেশিকা মডিউল (১,৩,৪ ও ৫)*, টিচিং কোয়ালিটি ইমপ্রভমেন্ট ইন সেকেন্ডারি এডুকেশন প্রজেক্ট, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষামন্ত্রণালয়, ঢাকা-আগস্ট ২০১০।

বাশার, মোঃ আবুল, *মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রয়োজন কেন?*, ঢাকা: দৈনিক সমকাল, ০৬ নভেম্বর ২০১২।

বাশার, মোঃ আবুল, *মাধ্যমিক শিক্ষকদের পেশাগত যোগ্যতা অর্জনের উপায়*, ঢাকা: দৈনিক সংবাদ, ২৪ এপ্রিল ২০১৩।

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ২০১৬।

বাশার, মোঃ আবুল ও হোসেন, মোঃ কবীর, *শ্রেণি কার্যক্রমে ডিজিটাল কন্টেন্ট: মাল্টিমিডিয়া উপস্থাপন*, ঢাকা: দৈনিক সংবাদ, ২২ ডিসেম্বর ২০১৩।

বাংলাদেশে ভূমিকম্প ঝুঁকি, প্রস্তুতি ও করণীয় (সংগৃহীত) বাংলাপিডিয়া/বাংলাদেশে ভূমিকম্প ঝুঁকি, প্রস্তুতি ও করণীয়, মতামত

ভূগোল ও পরিবেশ নবম-দশম শ্রেণি, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ২০১৭

মাধ্যমিক স্তরের সামাজিক বিজ্ঞান ও ভূগোল বিষয়ের সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়ন, মডারেশন ও উত্তরপত্র মূল্যায়ন বিষয়ে শিক্ষক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল, সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (এসইএসডিপি), শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা-জুন ২০১০।

মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সহকারী প্রধান শিক্ষকদের একাডেমিক সুপারভিশন ও ম্যানেজমেন্ট বিষয়ক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল, কোয়ালিটি এডুকেশন সেকশন, ফিমেল সেকেন্ডারি স্কুল এসিসট্যান্স প্রজেক্ট: দ্বিতীয় পর্যায়, ফেব্রুয়ারি ২০০৬।

মান্নান, মোঃ আব্দুল, শামীমা আকতার, বিপ্লব মল্লিক, মীর আবু সালেহ শামসুদ্দীন, সাইফুল্লাহর লিপি, শিক্ষক শিক্ষাক্রম নির্দেশিকা, বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়, ষষ্ঠ শ্রেণি, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ, ঢাকা, এপ্রিল-২০১৭

মাধ্যমিক স্তরের জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২ বিস্তরণ শিক্ষক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল (বিষয়: বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়, বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা, ভূগোল ও পরিবেশ, পৌরনীতি ও নাগরিকতা, অর্থনীতি, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতি) সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (এসইএসডিপি), জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা-ডিসেম্বর ২০১২।

রহমান, মোহাম্মদ আরিফুর, জলবায়ুপরিবর্তন ও দুর্যোগব্যবস্থাপনা, ঢাকা: স্বজনপ্রকাশনী, ২০১১।

রায়, ড. সত্যব্রত, মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকদের বিষয় ভিত্তিক প্রশিক্ষণ: সাধারণ বিজ্ঞান ম্যানুয়াল, কোয়ালিটি এডুকেশন সেল, ফিমেল সেকেন্ডারি স্কুল এসিসট্যান্স প্রজেক্ট: দ্বিতীয় পর্যায়, অক্টোবর ২০০৪।

রায়, সুশীল, শিক্ষণ ও শিক্ষা-প্রসঙ্গ, কলিকাতা: সোমা বুক এজেন্সী, ২০০০।

শাহীদ, ড. হ জ ম হাসিবুশ শাহীদ ও রেজা, আ ন ম গাউছার, ভূগোল ২য় পত্র, (৩য় সংস্করণ), ঢাকা: অক্ষরপত্র প্রকাশনী, ২০১৭।

শাহজাহান, সেলিনা, করিম, ড. শেখ মোঃ রেজাউল এবং শাহীন, জুলেখা, ভূগোল ও পরিবেশ (নবম-দশম শ্রেণি), জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ৬৯-৭০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০, ২০১২।

শাহজাহান, সেলিনা, করিম ড. শেখ মোঃ রেজাউল, শাহীন, জুলেখা ও (সম্পাদনায়: খাতুন, ড. হাফিজা), ভূগোল ও পরিবেশ, ঢাকা: জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ২০১৪।

শাহ্, ডি. এম. ফিরোজ, ভূগোল শিক্ষণ, মিতা ট্রেডার্স, ঢাকা, ১৯৯৯।

শাহ্, ডি. এম. ফিরোজ, ভূগোল শিক্ষণ, মিতা ট্রেডার্স, ঢাকা, ২০০৫।

শাহ্, ডি. এম. ফিরোজ ও অন্যান্য, ভূমিরূপ বিজ্ঞান, কবীর পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০১৭।

শাহ্, ডি. এম. ফিরোজ, মাধ্যমিক শিক্ষা, শিক্ষাক্রম ও শিশুর ক্রমবিকাশ, মিতা ট্রেডার্স, ঢাকা, ২০০৬।

শাহ্, ডি. এম. ফিরোজ, মাধ্যমিক শিক্ষা, মিতা ট্রেডার্স, ঢাকা, ২০১৭।

শাহ্, ডি. এম. ফিরোজ, জেন্ডার স্টাডিজ, মিতা ট্রেডার্স, ঢাকা, ২০১২।

শাহ্, ডি. এম. ফিরোজ, শিক্ষা মনোবিজ্ঞান ও নির্দেশনা, মিতা ট্রেডার্স, ঢাকা, ২০০৪।

শাহ, ড. ডি. এম. ফিরোজ একীভূত শিক্ষা, মিতা ট্রেডার্স, ঢাকা, ২০১৭।

সিকদার, মোঃ জহিরুল ইসলাম, জনবিজ্ঞান ও জনসংখ্যা ভূগোল, অষ্টম সংস্করণ, কনফিডেন্স প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৮।

সিডিএমপি-২, প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল: বাংলাদেশের দুর্যোগ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, কম্পিউটার ডিজিটাল ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

হাসান, মাহবুব, আকন্দ, মতিন, মোঃ আব্দুলএবং হোসেন, মোহাম্মদ ইসতিয়াক, বাংলাদেশ: প্রাকৃতিক ভূগোল ও পরিবেশ, ঢাকা: নীলা কম্পিউটার পয়েন্ট, ঢাকা ১৯৯৫।

Agriculture in Bangladesh collected from

https://en.wikipedia.org/wiki/Agriculture_in_Bangladesh

Asian Development Bank. (n.d.). Poverty in Bangladesh. Retrieved 21 November 2016 from

<https://www.adb.org/countries/bangladesh/povert>

Basha, S.A. Salim & Rao, Dr. Digumarti Bhaskara (Editor), Methods of Teaching Geography, New Delhi: Discovery Publishing House, 2007

BCCSAP, Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan, 2008, Ministry of Environment and Forest, Government of the People's Republic of Bangladesh, September, 2008.

Dasgupta, Mary Ann, Low-Cost, No-Cost Teaching Aids, New Delhi, National Book Trust.

Geography of Bangladesh collected from https://en.wikipedia.org/wiki/Geography_of_Bangladesh

Gopsil, G.H., Teaching of Geography, Patna: Macmillan India Ltd., 1994.

Harichandan, Dr. S.; Shaik, Dr. Asam & Sunni, Mrs. Sujana, *Methods of Teaching Geography*, http://ddceutkal.ac.in/Syllabus/MA_Education/Education_Paper_5_GEOGRAPHY.pdf

List of Bangladesh tropical cyclones From Wikipedia, the free encyclopedia

Map and Globe Skills,

Mahony, Kieran O', Theme-Based Geography Education As an Effective Method of Teaching, Washington: Educare Press, 2000.

NAPA, National Adaptation Programme of Action, Ministry of Environment and Forest, Government of the People's Republic of Bangladesh, Nov., 2008

Population Census, 2011

Rashid, Haroun Er, Geography of Bangladesh, 2nd edn. Dhaka: University Press Limited, 1991.

Seismic Zoning Map of Bangladesh collected from

https://www.researchgate.net/figure/38042670_fig1_Figure-2-Seismic-zoning-map-of-Bangladesh

Smith, Maggie (Editor), Teaching Geography in Secondary School, London: Routledge Falmer, 2002.

Statistical Year Book, Bangladesh-2015, 35th edition, Bangladesh Bureau of Statistics, Government of the People's, Republic of Bangladesh, Sept., 2016

Tourism in Bangladesh, collected from Wikipedia, the free encyclopedia

UNESCO Source Book For the Teaching of Geography, United Nations Education Scientific and Cultural Organization, 1961.

World Population Prospects - Population Division - United Nations. *esa.un.org*. Retrieved 2016-09-15.

<https://www.dcmp.org/guides/8807.pdf>

<http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00221346908981169?journalCode=rjog20>

https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_content

<https://www.zazzlemedia.co.uk/blog/digital-content-types/>

www.rasmussen.edu/media/digital-content/why-digital-content.pdf

www.econtentmag.com/Articles/...EContent/What-is-Digital-Content-79501.htm

<http://bn.banglapedia.org/index.php?title=%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%>

www.indexmundi.com/bangladesh/demographics_profile.html